সেরা কল্পবিজ্ঞান

সম্পাদনা ■ অনীশ দেব



। [illegible] তাঁর নাম হয়তো থেকে যেত অন্য এক ক্ষুদ্র পরিচয়ে। নিতান্তই এক কবিপত্নী রূপে এক লাইনের উল্লেখ পেতেন তিনি। কিন্তু কবি পি. বি. শেলির স্ত্রী, শুধু এই পরিচয়ে আজ আর আবদ্ধ নয় মেরি শেলির নাম। যে-লেখা তিনি শুরু করেছিলেন টীন-এজার হিসেবে, যে-লেখা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একুশ বছরে পা দেবার আগে, সেই 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন : অর দ্য মডার্ন প্রমিথিউস' নামের উপন্যাসটি রাতারাতিই দৃষ্টি কেড়ে নেয় সাহিত্যরসিক মহলের, মেরি শেলিকে করে পরিচিত তথা প্রতিষ্ঠিত। বিক্ষিপ্তভাবে কল্পবিজ্ঞানের আভাস রয়েছে এমন রচনা এর আগেও হয়তো প্রকাশিত হয়েছে, তবু সামগ্রিকতার বিচারে মেরি শেলির 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' উপন্যাসের মধ্য দিয়েই বিশ্বসাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান-সাহিত্যের জয়যাত্রার শুরু—এ-কথা আজ বলা যেতে পারে।

মেরি শেলির উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে। সেই মুহূর্তে অবশ্য 'সায়েন্স ফিকশন' শব্দবন্ধের আবিষ্কার হয়নি। এই শব্দবন্ধের উদ্ভাবক সমালোচক উইলিয়াম উইলসন। ১৮৫১ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি গ্রন্থে এই শব্দযুগলের প্রথম ব্যবহার। আর, জুল ভের্ন এবং এইচ. জি. ওয়েলস-এর মতো তুমুল প্রতিভাবান দুই লেখক যে-মুহূর্তে সাহিত্যে তাঁদের স্থায়ী আসন করে নিলেন, সন্দেহ নেই, সেই মুহূর্ত থেকেই সাহিত্যের এক নতুন শাখা-রূপে অপ্রতিরোধ্য স্থান করে নিল 'সায়েন্স ফিকশন'—এই শব্দবন্ধ।

'সায়েন্স ফিকশন'-এর আদলে তৈরি 'কল্পবিজ্ঞান' শব্দটি এখন বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। শব্দটি যত চেনা, এর সংজ্ঞার্থ অবশ্য ততটা সুনির্দিষ্ট নয় এখনও। কল্পনা ও বিজ্ঞান এই দুই শব্দ মিশেই যে তৈরি হয়েছে কল্পবিজ্ঞান, আঁচ করতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু কতটুকু কল্পনা আর কতখানি বিজ্ঞান থাকবে সার্থক কল্পবিজ্ঞানে, কোন্ বিজ্ঞান হবে কল্পবিজ্ঞানের উপাদান—অলৌকিক কাণ্ডকারখানার কল্পিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, নাকি অনাবিষ্কৃত তবু সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানকল্পনা—তার কোনও চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছনোর সময় হয়নি এখনও। এর অন্যতম একটা কারণ তত্ত্বগতভাবে

৫০.০০

ISBN 81-7215-027-X

কল্পবিজ্ঞানের আশ্চর্য জগৎ

এ-যেন বিজ্ঞানের বেড়াজালে বন্দি এক আধুনিক আরব্যরজনী। কল্পবিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর মায়াময় জগতে প্রবেশের জন্য রয়েছে সাতাশটি ভিন্ন দরজা—সাতাশটি কাহিনী—শুধু 'চিচিং ফাঁক' বললেই হল। একে একে খুলে যাবে অসম্ভবের দুনিয়ার এক-একটি দরজা। শুরু হবে আশ্চর্য ভ্রমণ—

...কোথাও শোনা যাবে অলৌকিক গুহার দৈববাণী, কিংবা দেখা যাবে ক্ষণে ক্ষণে চেহারা বদলানো এক আশ্চর্য জন্তুকে, সময়ের গাড়ি কখনও বেড়াতে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতে, রোবট দাবি করবে মানুষের সমান অধিকার, কিংবা চোখে পড়বে কাচ খেয়ে বেঁচে থাকা এক অদ্ভুত পোকা, অথবা দেখা যাবে কলকাতা ঢেকে গেছে পাঁচ ফুট গভীর তুষারে...

বহুবিচিত্র এইসব বিষয় নিয়ে কল্পবিজ্ঞানের গল্প লিখেছেন।
জগদীশচন্দ্র বসু □ প্রেমেন্দ্র মিত্র □ সত্যজিৎ রায় □ জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার
বিমল কর □ লীলা মজুমদার □ বাল ফোন্ডকে □ গুরনেক সিং □ অদ্রীশ বর্ধন
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় □ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় □ সমরজিৎ কর প্রমুখ

হয়তো এই যে, কোনও সৎ সাহিত্যকেই পুরোপুরি সংজ্ঞার্থের গণ্ডীতে ধরে রাখা যায় না। চলমান সাহিত্যের ধর্মই হল নিজের পরিধিকে বাড়িয়ে চলা, চেনা ছকটিকে ভুলিয়ে দেওয়া।

কোনও সংকলনের নাম যদি হয় 'সেরা কল্পবিজ্ঞান' এবং সেই সংগ্রহকে করে তুলতে হয় সার্থকনামা, একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির মাপকাঠিতেই সেক্ষেত্রে করতে হয় কাহিনীর গ্রহণ-বর্জন। এই সংকলনের সম্পাদক অদ্রীশ বর্ধন নিজে যে শুধু কল্পবিজ্ঞানের লেখক তা নয়, পাঠক হিসেবেও পৃথিবীর তাবৎ কল্পবিজ্ঞান-সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয় তাঁর। সর্বোপরি, বিজ্ঞানের পঠনপাঠন তাঁর জীবিকা। তাই, কোন্ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সংকলনের গল্প-নির্বাচন তাঁর, প্রথমেই সেকথা স্পষ্ট করে তুলেছেন। কল্পবিজ্ঞান-চর্চার উৎস থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত অগ্রগতির এক সর্বাত্মক পরিচয় তুলে ধরে এই সংকলনের মূল্যবান ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন—"কল্পবিজ্ঞান কাহিনীতে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা থাকবে। থাকবে অজানা সম্ভাব্য জগতের কথা, প্রাণীর কথা, আর আগামী দিনের কথা।"

এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সংকলিত এই গ্রন্থের সাতাশটি গল্প। যার কোথাও শোনা যাবে অলৌকিক গুহার দৈববাণী, কোথাও দেখা যাবে ক্ষণে-ক্ষণে চেহারা-বদলানো এক আশ্চর্যজন্তুকে। সময়ের গাড়ি কখনও বেড়াতে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতে, কখনও রোবট দাবি করবে মানুষের সমান অধিকার। কখনও চোখে পড়বে কাচভুক এক অদ্ভুত পোকা, কখনও মনে হবে, কলকাতা ঢেকে গেছে পাঁচ ফুট গভীর তুষারে। বিজ্ঞানের বেড়াজালে বন্দী এ যেন এক আধুনিক আরব্যরজনী। শুধু 'চিচিং ফাঁক' বলার অপেক্ষা, একে-একে খুলে যাবে সাতাশটি দরজা। সাতাশজন লেখকের সাতাশ রকম ভাবে সাজানো অন্দরমহল। রোমাঞ্চকর, মায়াময় এক-একটি অদ্ভুত জগৎ। সেই জগতে আশ্চর্য ভ্রমণের আমন্ত্রণ নিয়ে এল এই 'সেরা কল্পবিজ্ঞান'।

প্রচ্ছদ □ অমিয় ভট্টাচার্য

"Science fiction is no more pseudo-science than fiction is pseudo-truth."

—John Wood Campbell
in *Concerning Science Fiction* (1946)

কল্পবিজ্ঞান প্রসঙ্গে

ভাবতে অবাক লাগে, বিশ্বসাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের সূচনা ঘটেছিল উনিশ-না-পেরোনো এক সদ্য-তরুণীর হাতে। সময়টা ছিল ১৮১৬ সাল। বিশের কোঠায় বয়েস পৌঁছনোর আগেই লেখার কাজ শেষ হয়েছিল। আর বইয়ের আকারে লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে।

প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পড়ে গিয়েছিল সাহিত্যরসিক মহলে। 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন : অর, দ্য মডার্ন প্রমিথিউস' উপন্যাসটি নজর কেড়েছিল গুণিজনের। আর একই সঙ্গে প্রশংসিত হয়েছিলেন লেখিকা মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট শেলি—কবি পি বি শেলির স্ত্রী।

যখন 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' উপন্যাস প্রকাশিত হয় তখন 'সায়েন্স ফিকশন' বা 'কল্পবিজ্ঞান' শব্দবন্ধের জন্ম হয়নি। 'সায়েন্স ফিকশন' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন সমালোচক উইলিয়াম উইলসন, তাঁর 'এ লিট্‌ল আর্নেস্ট বুক আপন এ গ্রেট ওল্ড সাবজেক্ট' বইটিতে। ১৮৫১ সালে ইংল্যান্ডের ডারটন অ্যান্ড কোম্পানি বইটি প্রকাশ করেন। কিন্তু তখনও অনুমান করা যায়নি যে, এক বিশেষ ধরনের গল্প-উপন্যাসকে চিহ্নিত করতে পরে এই শব্দদুটি ব্যবহার করতে হবে।

মেরি শেলির পর, উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে, কল্পবিজ্ঞানচর্চায় জগৎজোড়া খ্যাতি পেয়েছেন জুল ভের্ন। তারও পরে, ১৮৯৫ সালে, অবিশ্বাস্য ক্ষমতা ও প্রতিভা নিয়ে হাজির হয়েছেন এইচ জি ওয়েল্‌স। বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের বিচিত্র প্রয়োগে এইচ জি ওয়েল্‌স নিজের স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন কল্পবিজ্ঞানের জগতে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় কোনও কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি।

১৮৮৬-র এপ্রিলে সুইডেন থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা 'স্টেলা'। জুল ভের্ন ছিলেন এই পত্রিকার অন্যতম লেখক। 'স্টেলা'র পর ইওরোপে জন্ম নেয় অন্যান্য কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম ইংরেজি কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা 'অ্যামেজিং স্টোরিজ'। সম্পাদক হুগো গার্নসব্যাক। 'অ্যামেজিং স্টোরিজ' পত্রিকাটির নামকরণ দেখেই অনুমান করা যেতে পারে, আজকের কল্পবিজ্ঞান বলতে যা বোঝায়, এই পত্রিকার উপকরণ ঠিক তা ছিল না। তখন কল্পবিজ্ঞানের নামে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোমাঞ্চকর অভিযানমূলক কাহিনী প্রকাশিত হত। এগুলোকে বিজ্ঞান-সুবাসিত রূপকথা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

পাশ্চাত্য কল্পবিজ্ঞানকে কল্পলোকের আজগুবি জগৎ থেকে টেনে নামিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীর মর্যাদাসম্পন্ন বেদিতে প্রতিষ্ঠিত করেন জন উড ক্যাম্পবেল। মাত্র সাতাশ বছর বয়েসে 'অ্যাস্টাউনডিং স্টোরিজ' পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে শুরু করেন কল্পবিজ্ঞানের আধুনিক যুগের সূচনা। ১৯৩৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত আমৃত্যু পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন ক্যাম্পবেল। যদিও এর মধ্যে দু'বার পত্রিকাটির নাম বদল করা হয় ('অ্যাস্টাউনডিং সায়েন্স ফিকশন', এবং পরে 'অ্যানালগ')।

জন ক্যাম্পবেল শুধু কল্পবিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাই একটি প্রতিষ্ঠান। প্রথম জীবনে নিজে বেশ কয়েকটি সফল কল্পবিজ্ঞান লিখলেও পরে তাঁর সম্পাদক সত্তা লেখক সত্তাকে গ্রাস করে। সেই সময়ে জন ক্যাম্পবেলকে ঘিরে জড়ো হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন শক্তিমান তরুণ লেখক।

জন ক্যাম্পবেলের ব্যক্তিত্ব, গভীরতা ও কল্পবিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা বহু

কল্পবিজ্ঞান লেখককেই মুগ্ধ করেছিল। ক্যাম্পবেলের হাত দিয়েই আমরা পেয়েছি আইজ্যাক অ্যাসিমভ, রবার্ট হাইনলাইন, ফ্র্যাঙ্ক হাবার্ট, ফিলিপ ডিক প্রমুখ স্বনামধন্য লেখককে। আর জন ক্যাম্পবেলের প্রভাব ছাড়াও যাঁরা এই শাখায় খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁদের অন্যতম হলেন রে ব্র্যাডবেরি ও আর্থার সি ক্লার্ক।

'অ্যাস্টাউনডিং সায়েন্স ফিকশন' পত্রিকাটি অবলম্বন করে শক্তিশালী সম্পাদক ক্যাম্পবেল আধুনিক কল্পবিজ্ঞানের সুষম ধারাটি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন পশ্চিমে। তাঁর দক্ষ পরিচালনায় কল্পবিজ্ঞানের জয়যাত্রার গতি হয়েছিল দ্রুত থেকে দ্রুততর। কিন্তু আমাদের দেশে এরকম ঘটনা ঘটেনি।

কল্পবিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। তবে দেখা গেছে, প্রায় সবক'টি সংজ্ঞার মূল চাবিকাঠি একই। কল্পবিজ্ঞান কাহিনীতে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা থাকবে। থাকবে অজানা সম্ভাব্য জগতের কথা, প্রাণীর কথা, আর আগামী দিনের কথা। তবে এত সত্ত্বেও কল্পবিজ্ঞানের বহুমুখী বিচিত্র জগৎকে সংজ্ঞার বাঁধনে বাঁধা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণী ভূমিকার এই মৌলিক শর্তটি প্রয়োগ করে বাংলাভাষায় কল্পবিজ্ঞানের সূচনা ১৮৯৬ সালে, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কলমে। কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে তাঁর 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' গল্পটি। এর পঁচিশ বছর পরে 'অব্যক্ত' গ্রন্থ প্রকাশের সময়ে জগদীশচন্দ্র গল্পটিকে পরিমার্জনা করেন। নাম দেন 'পলাতক তুফান'। দুটি গল্পের পাঠ তুলনা করলেই বোঝা যায় 'পলাতক তুফান' অনেক পরিণত, পূর্বতন গল্পের নীরস বিজ্ঞানকে রসে সিঞ্চিত করেছে নতুন লেখাটির প্রসাদগুণ। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এই গল্পে কল্পবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে 'সারফেস টেনশান' বা 'পৃষ্ঠটান' তত্ত্বের প্রয়োগ করেছিলেন। বিজ্ঞানের এই তত্ত্বই গল্পটিতে নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা নিয়েছে। ইতিহাস রক্ষার খাতিরে 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' গল্পটি এই সঙ্কলনের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' (চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৯১৯ সালে প্রকাশিত) উপন্যাসেও 'পৃষ্ঠটান' তত্ত্বের প্রয়োগ ছিল। সেখানে পিপে পিপে তেল ঢেলে শান্ত করা হয়েছিল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে। কিন্তু এই তত্ত্ব 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে মোটেই নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা নেয়নি। সেই কারণেই 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসকে আমরা কল্পবিজ্ঞান আখ্যা দিইনি।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের কলমে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের সূচনার পর বেশ কয়েকজন লেখক নিয়মিতভাবে সাহিত্যের এই শাখায় লেখনীচর্চা করেছেন। তাঁদের নির্বাচিত গল্প এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের কল্পবিজ্ঞান পত্র-পত্রিকার সমান্তরাল কোনও নজির এখানে দেখা যায়নি। তবে যে-একমাত্র প্রচেষ্টা এখন ইতিহাস হয়ে আছে তা 'আশ্চর্য !' পত্রিকা।

১৯৬৩ সালের জানুয়ারি থেকে অদ্রীশ বর্ধন 'আকাশ সেন' ছদ্মনামে 'আশ্চর্য !' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। 'আশ্চর্য !' ভারতে প্রকাশিত প্রথম কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা। এই পত্রিকাটিকে ঘিরে সে-সময়ে দারুণ উন্মাদনা দেখা দেয়। উৎসাহী লেখক ও পাঠক একজোট হয়ে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের শ্লথ বিবর্তনকে অনেকটাই দ্রুতগামী করে তুলেছিলেন। একটা স্পন্দনের সৃষ্টি হয়েছিল বাংলা কল্পবিজ্ঞানকে ঘিরে। কিন্তু এই চঞ্চলতা মাত্র বছর ছয়েক স্থায়ী হয়েছিল।

'আশ্চর্য !'-র পর আর যে-দুটি কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয়, তার একটি ক্ষণস্থায়ী 'বিস্ময় সায়েন্স ফিকশন', আর অপরটি অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত

অনিয়মিত 'ফ্যানট্যাস্টিক'। সুতরাং এক হিসেবে 'আশ্চর্য !'-র পর বাংলা কল্পবিজ্ঞানের কোনও শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। ফলে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ধারা আবার শীর্ণ স্রোতস্বিনী হয়ে পড়ে এবং কল্পবিজ্ঞানচর্চা শুধুমাত্রই বিভিন্ন লেখকের একক প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য ১৯৮৬-তে 'আনন্দমেলা' পত্রিকা একটি বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। আর 'দেশ' পত্রিকাও এইরকম একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে ১৯৮৭-র নভেম্বরে। তবে এ-দুটি ঘটনা ব্যতিক্রমেরই নজির।

গত এক দশকে আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে-দ্রুত এবং অভিনব বিবর্তন ঘটেছে তা লক্ষণীয়। এরই কারণে পরোক্ষভাবে কল্পবিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। পাঠক হয়ে উঠেছেন আরও বেশি বিজ্ঞানমনস্ক, বিজ্ঞান-সচেতন। পরিচিত পত্র-পত্রিকায় কল্পবিজ্ঞানের গল্প আর বিলুপ্ত প্রজাতি নয়। বরং তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সামান্য মাপে হলেও অভয়ারণ্যের বন্দোবস্ত হয়েছে, এইটাই আশার কথা।

সূর্যের আলোর বর্ণালীতে সাতটি রঙ পাওয়া যায়। কল্পবিজ্ঞানের বর্ণালীর রঙের সংখ্যা জ্ঞানীগুণীদেরও অজানা। এই সঙ্কলনে নির্বাচিত সাতাশটি গল্পের মাধ্যমে দেশজ কল্পবিজ্ঞানের বর্ণালীর আভাস দিতে চেষ্টা করেছি। পঁচিশটি বাংলা কল্পবিজ্ঞান গল্পের পাশে রয়েছে দুটি মারাঠি কল্পবিজ্ঞানের গল্প। গল্প দুটির বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে তাদের গ্রন্থিত করার লোভ সংবরণ করতে পারিনি। এই সঙ্কলনের বহু গল্পই হয়তো আন্তর্জাতিক গুণমানের নিরিখে এতটুকু খাটো নয়। তবে সমঝদার পাঠকই এর শ্রেষ্ঠ বিচারক। প্রতিটি গল্পের শেষে প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে দেশজ কল্পবিজ্ঞানের বিবর্তনের একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া আগ্রহী পাঠকের কথা মনে রেখে বইয়ের শেষে সংক্ষিপ্ত লেখক-পরিচিতি সংযোজিত হল।

প্রখ্যাত ওলন্দাজ শিল্পী এম সি এশারের 'ড্রাগন' নামক কাঠখোদাই ছবিটি বইয়ের একমাত্র অলঙ্কার হিসেবে সর্বত্র ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৫২-তে কাঠখোদাইয়ের কাজটি করেছিলেন এশার। এই ছবিটির মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন দ্বিমাত্রিক জগতের সঙ্গে বহুমাত্রিক জগতের দ্বন্দ্ব। ছবির দ্বিমাত্রিক তলে বন্দি ড্রাগন প্রাণপণ চেষ্টায় বোঝাতে চায় যে, সে ত্রিমাত্রিক জগতের শরীরী প্রাণী। এর সঙ্গে কোথায় যেন কল্পবিজ্ঞান-ভাবনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কাগজের দ্বিমাত্রিক তলে কলমের আঁচড় কেটে লেখক ফুটিয়ে তুলতে চান বহুমাত্রিক জগতের বহুবর্ণ ছবি। সে-ছবি সার্থক হলে তবেই এ-প্রচেষ্টার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

সঙ্কলনটির সফল প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, সঙ্কলনের গল্প নির্বাচনের সময়ে লেখকরা বা তাঁদের পরিবারবর্গ অকুণ্ঠ সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। প্রুফ সংশোধনের কাজে অনলস তৎপরতা দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছে স্নেহভাজন বিমলকুমার পাল। তার সাহায্য ছাড়া এ-সঙ্কলনের সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ প্রযোজনা সম্ভব ছিল না। 'আশ্চর্য !' পত্রিকার যাবতীয় পুরোনো সংখ্যা যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন অদ্রীশ বর্ধন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করেছেন বন্ধুবর অশোক রায় এবং নিয়মিত আলোচনায় উৎসাহ দিয়েছেন সুহৃদ ভাস্কর রাহা। এঁদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। অলমিতি।

অনীশ দেব

ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ
বিজ্ঞান কলেজ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র



পরিশিষ্ট

লেখক-পরিচিতি



পলাতক তুফান

জগদীশচন্দ্র বসু

বৈজ্ঞানিক রহস্য

কয়েক বৎসর পূর্বে এক অত্যাশ্চর্য ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। তাহা লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে এবং এ-বিষয়ে ইওরোপ এবং আমেরিকার বিবিধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় অনেক লেখালেখি চলিয়াছে। কিন্তু এ-পর্যন্ত কিছু মীমাংসা হয় নাই।

২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার ইংরেজি সংবাদপত্রে সিমলা হইতে এক তারের সংবাদ প্রকাশ হয় :

সিমলা, হাওয়া আপিস, ২৭ **সেপ্টেম্বর :** *বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই ঝড় হইবার সম্ভাবনা।*

২৯ তারিখের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল :

হাওয়া আপিস, আলিপুর : *দুই দিনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। ডায়মণ্ডহারবারে এই মর্মে নিশান উত্থিত করা হইয়াছে।*

৩০ তারিখে যে-খবর প্রকাশিত হইল তাহা অতি ভীতিজনক :

আধঘণ্টার মধ্যে চাপমান যন্ত্র দুই ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে। আগামীকল্য দশ ঘটিকার মধ্যে কলিকাতায় অতি প্রচণ্ড ঝড় হইবে। এরূপ তুফান বহু বৎসরের মধ্যে হয় নাই।

কলিকাতার অধিবাসীরা সেই রাত্রি কেহই নিদ্রা যায় নাই। আগামীকল্য কী হইবে তাহার জন্য সকলে ভীত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

১ অক্টোবর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সমস্ত দিন মেঘাবৃত ছিল, কিন্তু বৈকাল চার ঘটিকার সময় হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। ঝড়ের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

তার পরদিন হাওয়া আপিস খবরের কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন :

কলিকাতায় ঝড় হইবার কথা ছিল, বোধ হয় উপসাগরের কূলে প্রতিহত হইয়া ঝড় অন্য

অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

ঝড় কোন দিকে গিয়াছে তাহার অনুসন্ধানের জন্য দিক্-দিগন্তরে লোক প্রেরিত হইল। কিন্তু তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারপর সর্বপ্রধান ইংরেজি কাগজ লিখিলেন : 'এতদিনে বুঝা গেল যে, বিজ্ঞান সর্বৈব মিথ্যা।'

অন্য কাগজে লেখা হইল : 'যদি তাহাই হয় তবে গরিব ট্যাক্সদাতাদিগকে পীড়ন করিয়া হাওয়া আপিসের ন্যায় অকর্মণ্য আপিস রাখিয়া লাভ কী ?'

তখন বিবিধ সংবাদপত্র তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন : 'উঠাইয়া দাও।'

গবর্নমেন্ট বিভ্রাটে পড়িলেন। অল্পদিন পূর্বে হাওয়া আপিসের জন্য লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার আনানো হইয়াছে। সেগুলি এখন ভাঙা শিশি-বোতলের মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আর হাওয়া আপিসের বড় সাহেবকে অন্য কী কার্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে ?

গবর্নমেন্ট নিরুপায় হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে লিখিয়া পাঠাইলেন : 'আমরা ইচ্ছা করি ভেষজবিদ্যার এক নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। তিনি বায়ুর চাপের সহিত মানুষের স্বাস্থ্যসম্বন্ধ বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।'

মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ লিখিয়া পাঠাইলেন : 'উত্তম কথা। বায়ুর চাপ কমিলে ধমনী স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। তাহাতে সচরাচর আমাদের যে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতে পারে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে কলিকাতাবাসীরা আপাতত বহুবিধ চাপের নিচে আছে :

১ম বায়ু	*প্রতি বর্গইঞ্চি*	*১৫ পাউন্ড*
২য় ম্যালেরিয়া	...	*২০ ,,*
৩য় পেটেন্ট ঔষধ	...	*৩০ ,,*
৪র্থ ইউনিভার্সিটি	...	*৫০ ,,*
৫ম ইনকাম ট্যাক্স	...	*৮০ ,,*
৬ষ্ঠ মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স	...	*১ টন*

বায়ুর ২/১ ইঞ্চি চাপের ইতর বৃদ্ধি "বোঝার উপর শাকের আঁটি"স্বরূপ হইবে। সুতরাং কলিকাতায় এই নূতন অধ্যাপনা আরম্ভ করিলে বিশেষ যে উপকার হইবে এরূপ বোধ হয় না। তবে সিমলা পাহাড়ে বায়ুর চাপ ও অন্যান্য চাপ অপেক্ষাকৃত কম। সেখানে উক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।'

ইহার পর গবর্নমেন্ট নিরুত্তর হইলেন। হাওয়া আপিস এবারকার মতো অব্যাহতি পাইল।

কিন্তু যে-সমস্যা লইয়া এত গোল হইল তাহা পূরণ হইল না।

একবার কোনও বৈজ্ঞানিক বিলাতের 'নেচার' কাগজে লিখিয়াছিলেন বটে। তাঁহার থিয়োরি এই যে, কোনও অদৃশ্য ধূমকেতুর আকর্ষণে আবর্তমান বায়ুরাশি ঊর্ধ্বে চলিয়া

গিয়াছে।

এসব অনুমান মাত্র। এখনও এ-বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। অক্সফোর্ডে যে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে এক অতি বিখ্যাত জার্মান অধ্যাপক 'পলাতক তুফান' সম্বন্ধে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রবন্ধারম্ভে অধ্যাপক বলিলেন, 'তুফান বায়ুমণ্ডলের আবর্তমাত্র। সর্বাগ্রে দেখা যাউক, কীরূপে বায়ুমণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবী যখন ফুটন্ত ধাতুপিণ্ডরূপে সূর্য হইতে ছুটিয়া আসিল তখন বায়ুর উৎপত্তি হয় নাই। কী করিয়া অম্লজান, দ্ব্যম্লজান ও উদ্‌জানের উৎপত্তি হইল তাহা সৃষ্টির এক গভীর প্রহেলিকা! যবক্ষারজানের উৎপত্তি আরও বিস্ময়কর। ধরিয়া লওয়া যাউক, কোনও প্রকারে বায়ুরাশি উৎপন্ন হইয়াছে। গুরুতর সমস্যা এই যে, কী কারণে বায়ু শূন্যে মিলাইয়া যায় না। ইহার মূল কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে পদার্থের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বেশি কিংবা কম। যাহা গুরু তাহার উপরেই টান বেশি এবং তাহা সেই পরিমাণে আবদ্ধ। হালকা জিনিসের উপর টান কম, তাহা অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত। এই কারণে তৈল ও জল মিশ্রিত করিলে লঘু তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে। উদ্‌জান হালকা গ্যাস বলিয়া অনেক পরিমাণে উন্মুক্ত এবং উপরে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করে—কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টান একেবারে এড়াইতে পারে না। আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যে-বৈজ্ঞানিক সত্য বর্ণিত হইল তাহা যে পৃথিবীর সর্বস্থানে প্রযোজ্য এ-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কারণ ইণ্ডিয়া নামক দেশে যদিও পুরুষজাতি গুরু তথাপি তাহারা উন্মুক্ত, আর লঘু স্ত্রীজাতিই সে দেশে আবদ্ধ!

'সে যাহা হউক, পদার্থমাত্রেই মাধ্যাকর্ষণবলে ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ থাকে। পদার্থের মৃত্যুর পর স্বতন্ত্র কথা। মানুষ মরিয়া যখন ভূত হয় তখন তাহার উপর পৃথিবীর আর কোনও কর্তৃত্ব থাকে না। কেহ কেহ বলেন, মরিয়াও নিষ্কৃতি নাই। কারণ ভূতদিগকেও থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির আজ্ঞানুসারে চলাফেরা করিতে হয়। পদার্থও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—পদার্থ সম্বন্ধে পঞ্চত্ব কথা প্রয়োগ করা ভুল। কারণ রেডিয়ামের গুঁতা খাইয়া পদার্থ ত্রিত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আল্‌ফা, বিটা ও গামা এই তিন ভূতে পরিণত হয়। এইরূপে পদার্থের অস্তিত্ব যখন লোপ হয় তখন অপদার্থ শূন্যে মিলিয়া যায়। কিন্তু যতদিন পার্থিব পদার্থ জীবিত থাকে ততদিন পৃথিবী ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারে না।'

যদিও অধ্যাপক মহাশয়, পদার্থ কেন পলায়ন করে না, এ-সম্বন্ধে অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ করিলেন, তথাপি তুফান কেন পলায়ন করিল, এ-সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না।

এই ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব পৃথিবীর মধ্যে একজন মাত্র জানে— সে **আমি**।

পরের অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গত বৎসর আমার বিষম জ্বর হইয়াছিল। প্রায় মাসেক কাল শয্যাগত ছিলাম।

ডাক্তার বলিলেন, সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জ্বর হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি জাহাজে লঙ্কাদ্বীপ যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম।

এতদিন জ্বরের পর আমার মস্তকের ঘন কুন্তলরাশি একান্ত বিরল হইয়াছিল। একদিন আমার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, দ্বীপ কাহাকে বলে?' আমার কন্যা ভূগোল-তত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার উত্তর পাইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিল, 'এই

দ্বীপ'—ইহা বলিয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আমার বিরল-কেশ মসৃণ মস্তকে দুই-এক গোছা কেশের মণ্ডলী দেখাইয়া দিল।

তারপর বলিল, 'তোমার ব্যাগে এক শিশি "কুন্তল-কেশরী" দিয়াছি, জাহাজে প্রত্যহ ব্যবহার করিও। নতুবা নোনা জল লাগিয়া এই দুই-একটি দ্বীপের চিহ্নও থাকিবে না।'

'কুন্তল-কেশরী'র আবিষ্কার এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। সার্কাস দেখাইবার জন্য বিলাত হইতে এদেশে এক ইংরেজ আসিয়াছিল। সেই সার্কাসে কৃষ্ণ কেশর-ভূষিত সিংহই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য দৃশ্য ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজে আসিবার সময় আণুবীক্ষণিক কীটের দংশনে সমস্ত কেশরগুলি খসিয়া যায় এবং এদেশে পৌঁছিবার পর সিংহ এবং লোমহীন কুকুরের বিশেষ পার্থক্য রহিল না। নিরুপায় হইয়া সার্কাসের অধ্যক্ষ এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইল এবং পদধূলি লইয়া জোড়হস্তে বর প্রার্থনা করিল। একে ম্লেচ্ছ, তাহাতে সাহেব! ভক্তের বিনয় ব্যবহারে সন্ন্যাসী একেবারে মুগ্ধ হইলেন এবং বরস্বরূপ স্বপ্নলব্ধ অবধৌতিক তৈল দান করিলেন। পরে উক্ত তৈল 'কুন্তল-কেশরী' নামে জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছে। তৈল প্রলেপে এক সপ্তাহের মধ্যেই সিংহের লুপ্ত কেশর গজাইয়া উঠিল। কেশহীন মানব এবং তস্য ভার্যার পক্ষে উক্ত তৈলের শক্তি অমোঘ। লোকহিতার্থেই এই শুভ সংবাদ দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এমনকি, অতি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সর্বপ্রথম পৃষ্ঠায় এই অদ্ভুত আবিষ্কার বিঘোষিত হইয়া থাকে।

২৮ তারিখে আমি চুসান জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিলাম। প্রথম দুই দিন ভালোরূপেই গেল। ১ তারিখ প্রত্যূষে সমুদ্র এক অস্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিল, বাতাস একেবারে বন্ধ হইল। সমুদ্রের জল পর্যন্ত সীসার রঙের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

কাপ্তানের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম। কাপ্তান বলিলেন, 'যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, অতি সত্বরই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। আমরা কূল হইতে বহু দূরে—এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

এই সংবাদ শুনিয়া জাহাজে যেরূপ ঘোর ভীতিসূচক কলরব হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারিদিক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হইল এবং দূর হইতে এক-এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

তারপর মুহূর্তমধ্যে যাহা ঘটিল তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে। কোথা হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্মুক্ত হইয়া পৃথিবী সংহারে উদ্যত হইল।

বায়ুর গর্জনের সহিত সমুদ্র স্বীয় মহাগর্জনের সুর মিলাইয়া সংহার মূর্তি ধারণ করিল।

তারপর অনন্ত ঊর্মিরাশি একের উপর অন্যে আসিয়া একেবারে জাহাজ আক্রমণ করিল।

এক মহা-ঊর্মি জাহাজের উপর পতিত হইল এবং মাস্তুল, লাইফ-বোট ভাঙিয়া লইয়া গেল।

আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে জীবনের স্মৃতি যেরূপ জাগিয়া উঠে, সেইরূপ আমার প্রিয়জনের কথা মনে হইল। আশ্চর্য এই, আমার কন্যা আমার বিরল কেশ লইয়া যে-উপহাস করিয়াছিল, এই সময়ে তাহা পর্যন্ত স্মরণ হইল: 'বাবা, এক শিশি "কুন্তল-কেশরী" তোমার ব্যাগে দিয়াছি।'

হঠাৎ এককথায় আর-এক কথা মনে পড়িল। বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর

তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে, এ-বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।

অমনই আমার ব্যাগ হইতে তৈলের শিশি খুলিয়া অতি কষ্টে ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ টলমল করিতেছিল।

উপরে উঠিয়া দেখি, সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বতপ্রমাণ ফেনিল এক মহা-ঊর্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

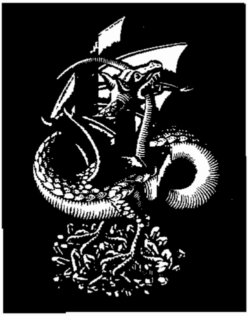
আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ করিয়া 'কুন্তল-কেশরী' বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া শিশি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। মুহূর্তমধ্যে তৈল সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈল স্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল।

এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই এবং এই কারণেই সেই ঘোর বাত্যা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল তৈলের সাহায্যে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

□ ১৯২১





মামাবাবুর নিদ্রাভঙ্গ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

খাতাপত্র, পুরোনো ডায়েরি আবার ঘাঁটতে হল।

স্মরণশক্তি আমার তেমন জোরালো কোনওদিনই না। স্কুলে পড়বার সময় সংস্কৃতে ধাতুরূপ শব্দরূপগুলো মুখস্থ করতে না পারার জন্যেই সবচেয়ে বিপদে পড়তাম। এখন বয়েস বাড়ার সঙ্গে সে-স্মৃতিশক্তির উন্নতি অন্তত হয়নি।

কিন্তু হঠাৎ স্মৃতিশক্তিকে উসকে দেওয়ার জন্যে পুরোনো খাতা, ডায়েরির দরকারই বা হল কেন?

দরকার হল 'আশ্চর্য!' কাগজের সম্পাদকমশাইয়ের জন্যে।

হঠাৎ সেদিন সকালবেলায় আশ্চর্য ব্যাপার!

ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাইরের দরজায় কে 'গণপতিবাবু, গণপতিবাবু' বলে ডাকছেন।

প্রথমটা যেমন হকচকিয়ে গেছলাম তেমনই বিরক্তও হয়েছিলাম একটু। গণপতি আবার কে? না জেনেশুনে এ-বাড়িতে এসে গণপতিকে খোঁজবার মানে কী? গণপতি আমার নাম নয়। এ-বাড়িতে কস্মিনকালে কারুর নাম গণপতি ছিল না।

বেশ একটু রুক্ষ মেজাজ নিয়ে ভদ্রলোককে সে-কথা বলবার জন্যে দরজা খুলতে যেতে যেতেই স্মৃতিটা হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তির বদলে একটু লজ্জাই অনুভব করলাম। তবে বিস্ময়টা সমানই রইল।

গণপতি আমার নাম নয়, তবে একসময়ে এই ছদ্মনামটা ব্যবহার করেছি। ব্যাসদেবের অনুলেখক গণেশের নামটাই এ-ছদ্মনামের অনুপ্রেরণা। গণেশ ব্যাসদেবের ভাষণ লিখে গেছেন। আর আমি লিখেছি মামাবাবুর কীর্তিকাহিনী। ঠিক অনুলেখক না হলেও লিপিকার হিসেবে গণেশের বদলে গণপতি নামটা নিয়েছিলাম। সেই নামেই পত্র-পত্রিকাতে ও প্রকাশকের কাছে চিঠিপত্র লেখা এবং পাণ্ডুলিপি পাঠানোর কাজ করেছি।

কিন্তু এখন হঠাৎ সে-নাম ধরে কে খোঁজ করতে এল? কারণই বা কী?

দরজা খোলার পরই রহস্যটা পরিষ্কার হল।

এসেছেন আর কেউ নয়। 'আশ্চর্য!' কাগজের সম্পাদক। কোনও প্রকাশকের কাছ থেকে

গণপতি হাজরার ঠিকানা জেনে নিয়ে সরাসরি চলে এসেছেন মামাবাবু কেন নীরব সেই খোঁজ করতে।

'আশ্চর্য!' সম্পাদককে কিছুতেই ঠেকানো গেল না। ঘণ্টা দুই বসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর অকাট্য যুক্তিতে মামাবাবুর কীর্তিকাহিনী প্রকাশের ব্যবস্থা করতে রাজি হতেই হল।

সেইজন্যেই খাতাপত্র পুরোনো ডায়েরি ইত্যাদি ঘাঁটা।

পুরোনোর বদলে নতুন কিছু লেখা যায় না এমন নয়। গণপতি হাজরার লেখাই বন্ধ হয়েছে, মামাবাবুর কীর্তিকলাপ তো ফুরিয়ে যায়নি! তবু শুরু যখন করা হল তখন আগেকার কাহিনীগুলোকে বাদ দিলে অন্যায়ই হবে।

বছরকয়েক আগেকার এমনই শীতের দিনের একটি সকাল থেকেই শুরু করা যাক।

সবে তার আগের দিন সন্ধ্যায় দিল্লি থেকে ফিরেছি। দিল্লির হাড়ভাঙা শীতের পরে কলকাতার শীতে কাবু হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু কাবু হয়েছি কলকাতার ধোঁয়া-ধুলো মেশানো বিদ্‌ঘুটে কুয়াশায়।

আগের রাত্রে ফিরে আর মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। পরের দিন সকালেই বার হলাম সেই উদ্দেশ্যে।

ইচ্ছে করে একটু বেলা করেই বেরিয়েছিলাম। মামাবাবুর হালচাল তো আর জানতে বাকি নেই। এমনিতেই বেলা আটটার আগে তাঁর ঘুম ভাঙে না। আর এই শীতের দিনে ন'টার আগে কি আর লেপ-কম্বল ছেড়ে উঠবেন!

ন'টার একটু আগেই অবশ্য এসেছিলাম। এখনও জেগে না থাকলে ঠেলেঠুলে বিছানা থেকে তুলব এই অভিপ্রায়।

কিন্তু বাড়ির কাছে এসে তাজ্জব হয়ে গেলাম। ভোরের গাঢ় কুয়াশা তখনও কাটেনি। একটু ফিকে হয়েছে মাত্র। সেই কুয়াশার মধ্যে মামাবাবুর বাড়ির সামনে প্রথমেই এক পুলিশের গাড়ি দেখে অবাক। শুধু গাড়ি নয়, বাড়ির চারদিকে বেশ জনকয়েক পুলিশ খাড়া পাহারায় দাঁড়িয়ে।

কুয়াশায় দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছে কি না প্রথমটা সেই সন্দেহই হল।

কিন্তু দেখার ভুল নয়, সত্যিই জলজ্যান্ত পুলিশ বাড়ির চারিধারে।

বেশ একটু হ্যাঙ্গামা হল পরিচয় দিয়ে ভেতরে ঢুকতে। সেখানে গিয়েও দেখি জন দুই অফিসার নিচের বাইরের ঘরে মামাবাবুর সঙ্গে আলাপ করছেন। বাড়ির নিচে-ওপরেও দু-চারজন পুলিশকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল।

ব্যাপার কী?

পুলিশ অফিসারদের আলাপ থেকে তেমন কিছুই বোঝা গেল না।

আমি ঘরে ঢোকবার পর প্রথম পরিচয়ের শেষে একজন আগের কোনও কথার খেই ধরেই নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আপনি কিছুই টের পাননি বলছেন? বলছেন, আপনার ঘরের আর সমস্ত বাড়ির কিছুই চুরি যায়নি?'

'না।'

মামাবাবুর সংক্ষিপ্ত উত্তরে ক্লান্ত অসহায় ভাবের সঙ্গে একটু বিরক্তিও যেন মেশানো।

দ্বিতীয় অফিসার সেটুকু বোধ হয় লক্ষ করেই বললেন, 'আপনাকে একটু বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমরা দুঃখিত, কিন্তু আপনার বিপদের কথা ভেবেই এ-হ্যাঙ্গামা করতে হচ্ছে, এটুকু আশা করি বুঝছেন। একটা মানুষ এই বন্ধ বাড়ির ভেতর থেকে সত্যি সত্যি তো আর

হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না।'

'কিন্তু তাকে তো কোথাও খুঁজে পেলেন না!' মামাবাবুর গলায় যেন ক্লান্ত অনুযোগ।

'সেইটেই তো আশ্চর্য। আশ্চর্য কেন, প্রায় আজগুবি!' প্রথম অফিসার বললেন।

'ব্যাপারটা কি একটু জানতে পারি?' এবার না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

প্রথম পুলিশ অফিসার আমার দিকে একটু ভ্রূকুটিভরেই চাইলেন। আমার এ-অনধিকার চর্চাটা তাঁর পছন্দ নয়।

দ্বিতীয় অফিসার একটু উদার। তাঁর কাছে সংক্ষেপে যা জানা গেল তা সত্যিই অদ্ভুত। ভোরের কিছু আগে মামাবাবুর এক প্রতিবেশী মিঃ ভোরা তাঁর গ্যারেজ থেকে মোটর বার করতে বেরিয়ে হঠাৎ একজন লোককে ঝোলানো দড়ি বেয়ে মামাবাবুর ঘরের জানলায় উঠতে দেখেন। গাঢ় কুয়াশার দরুন প্রথমটা তাঁর নিজের চোখের দৃষ্টির ওপরই সন্দেহ হয়। কিন্তু পরে আরও একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে জানলার একটা গরাদে সরিয়ে স্পষ্ট ভেতরে ঢুকতে দেখে মিঃ ভোরা চিৎকার করে মামাবাবুকে ডাকবার চেষ্টা করেন। তাঁর চিৎকারে নিজের বাড়ির ড্রাইভার চাকর বেরিয়ে এলেও মামাবাবুর বাড়ি থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। লোকটা তখন ভেতরে ঢুকে দড়িটাও টেনে তুলে নিয়েছে। মিঃ ভোরা এবার ড্রাইভার ও চাকরকে জানলার নিচে পাহারায় রেখে অন্যদিকে মামাবাবুর বাড়ির দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করেন। কিছুক্ষণ বাদে মামাবাবুর নতুন অনুচর রঘুবীর জেগে দরজা খোলবার পরও মামাবাবুর ঘুম ভাঙতে বেশ সময় লাগে। মামাবাবু অবশ্য অসময়ে ঘুম ভাঙার দরুন আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রথমটা কিছু বুঝতেই পারেন না। তাঁর ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা দড়িটা দেখিয়ে মিঃ ভোরাকে ব্যাপারটার গুরুত্ব তাঁকে বোঝাতে হয়। তা সত্ত্বেও মামাবাবুর বিশেষ উৎসাহ না থাকলেও মিঃ ভোরা তখন পুলিশকে ব্যাপারটা জানান। পুলিশ এসে তন্নতন্ন করে সমস্ত বাড়িঘর খোঁজ করেও কোথাও কাউকে পায়নি। যে-লোকটাকে মিঃ ভোরা স্পষ্ট দড়ি বেয়ে উঠে জানলার গরাদে সরিয়ে মামাবাবুর ঘরে ঢুকতে দেখেছেন, সে-লোকটা তাহলে গেল কোথায়? মামাবাবু একটি চাকর নিয়ে একলাই এ-বাড়িতে থাকলেও বাড়িটি নেহাত ছোট নয়। আসলে সেটি একটি মিউজিয়াম,লাইব্রেরি আর ল্যাবরেটরির সমাবেশ। নিচের কয়েকটা ঘর শুধু বইয়ে বোঝাই। কীটপতঙ্গ আর বিরল জন্তু-জানোয়ারের মরা নমুনা দুটি করে কাচের ঢাকনা দেওয়া নানা আকারের আলমারি আর বাক্সে সাজানো। দোতলায় মামাবাবুর নিজের ব্যবহার্য ঘরগুলো ছাড়া আপাতত সবই ল্যাবরেটরি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মামাবাবুর পুরোনো চাকর মঙপো থাকলে ওপরের ল্যাবরেটরির পাশের একটি ছোট ঘরে শোয়। মাসখানেক হল সে ছুটি নিয়ে গেছে বলে নতুন দরোয়ান রঘুবীর নিচের একটি ঘরে থাকে।

রঘুবীর তাঁর ডাকে দরজা খোলবার পর মিঃ ভোরা নিজে সে-দরজা আবার বন্ধ করে মামাবাবুকে ওপরে ডাকতে পাঠিয়েছেন। বাইরের যে-জানলা দিয়ে লোকটা ঢুকেছিল তার নিচেও মিঃ ভোরার চাকর ঠায় পাহারায় দাঁড়িয়ে। বাড়ি থেকে বেরুবার আর কোনও রাস্তাই নেই কোনওখানে। মামাবাবুর না হয় কুম্ভকর্ণের নিদ্রা। লোকটার ঘরে ঢোকা তিনি টেরও পাননি। কিন্তু লোকটা এই বন্ধ বাড়ির ভেতর থেকে উধাও হয়ে গেল কী করে এই হল সমস্যা।

অফিসার তাঁর বিবরণ শেষ করবার পর আমার মনে যে-প্রশ্নটা উঠেছিল, তিনি নিজেই সেটা প্রকাশ করে তার উত্তর দিলেন। বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারটা মিঃ ভোরার দৃষ্টিভ্রম ভাবতে পারতাম, কিন্তু জানলার ভাঙা একটা গরাদে আর ঘরের মেঝের ওপরকার ফেলে

যাওয়া দড়িটা তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'তাহলে সে এখানেই কোথাও আছে মনে করুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না।' মামাবাবুর গলাটা খুব প্রসন্ন মনে হল না। একটু বিদ্রূপও তাতে যেন মেশানো।

'আপনি বিরক্ত হয়ে পরিহাস করছেন বুঝতে পারছি।' প্রথম অফিসার একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু এ-ব্যাপারে অদৃশ্য মানুষের মতো আজগুবি ব্যাখ্যা তো সত্যি মেনে নিতে পারি না।'

দ্বিতীয় অফিসার হঠাৎ উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনার বাড়িতে লুকনো কোনও চোরা দরজা বা কুঠুরি গোছের কিছু নেই তো?'

'না, মশাই।' এবার মামাবাবুই হেসে উঠলেন : 'আমি রোমাঞ্চ কাহিনীর গোয়েন্দা কি পাপিষ্ঠ নই যে, বাড়িতে ওইসব প্যাঁচ রাখব। আমার বাড়িতে যা আছে চোখেই দেখা যায়। দেখলেনও তো সব।'

'দেখুন!' প্রথম অফিসারের গলায় এবার একটু আহত অভিমানের সুরই শোনা গেল, 'আমরা যেন আপনাকে সাহায্য করতে এসে অপরাধ করেছি মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার মতো লোকের বাড়িতে সন্দেহজনক কিছু ঘটলে আর মিঃ ভোরার মতো সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে তার খবর পেলে কর্তব্য হিসেবে আমাদের যা করবার করতে আসতেই হয়। আমাদের সাধারণভাবে যা করবার করেছি। মিঃ সেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আঙুল-টাঙুলের ছাপ কিছু পান কি না দেখতে এসেছিলেন। চোর বা খুনে যেই এ-বাড়িতে ঢুকে থাকুক, লোকটা অত্যন্ত হুঁশিয়ার। ঢোকবার পর গরাদে জানলা সমস্ত এমনভাবে মুছে দিয়েছে যে, চাকর-বাকরের হাতের ছাপ পর্যন্ত কোথাও মিঃ সেন পাননি। সারা বাড়িতে ওই দড়িগাছটা আর ভাঙা গরাদে ছাড়া আর কিছু দেখতে পাইনি আমিও। তবু রহস্যটা অলৌকিক কিছু বলে ছেড়ে দিতে পারছি না। আপনাকে সেই আগেকার প্রশ্নটাই আবার তাই করছি। আপনি সব দেখেশুনে নিশ্চিন্ত হয়ে এখনও বলছেন যে, কিছুই আপনার বাড়ির কোথাও থেকে চুরি যায়নি? সব যেমন ছিল ঠিক আছে?'

'নিশ্চিত হয়ে চুরি কিছু যায়নি এই কথাই বলেছি।' মামাবাবু রীতিমত গম্ভীর মুখে বললেন, 'কিন্তু সব যেমন ছিল ঠিক আছে তা তো বলিনি!'

'তার মানে?' অফিসার দু'জনের চোখই কপালে উঠল।

'এ আবার কি হেঁয়ালি?' আমিও জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম।

'হেঁয়ালি কিছু নয়।' মামাবাবু আগের মতোই গম্ভীরভাবে বললেন, 'চুরি যাওয়ার বদলে বাড়িতে বাড়তি কোনও জিনিস যদি এসে যায়, তাহলে সব ঠিক আছে তো আর বলা যায় না।'

'চুরি যাওয়ার বদলে বাড়তি জিনিস বাড়িতেএসেছে!' অফিসার দু'জনেই বেশ হতভম্ব ও সেইসঙ্গে একটু বিরক্ত, 'কই এ-কথা তো আগে বলেননি!'

'আপনারা তো জিজ্ঞেস করেননি!' মামাবাবু সরলভাবে জবাব দিলেন, 'আপনারা চুরির কথাই জিজ্ঞেস করেছিলেন।'

মামাবাবুর সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তর্কে যাওয়া নিষ্ফল বুঝে অফিসার মিঃ সেন একটু অধৈর্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়তি জিনিসটা কী?'

'একটা ছোট পিপে বলতে পারেন। আমার পোকামাকড় প্রভৃতির নমুনা যে-ঘরে থাকে সেই ঘরেই সেটা এখন আছে। আগে ছিল না।'

'আশ্চর্য তো! কিসের পিপে তাহলে দেখতে হয়।' মিঃ সেন উঠে দাঁড়িয়ে অন্য

অফিসারকেও ডাকলেন, 'আসুন, মিঃ ধর।'

'কিসের পিপে জানবার জন্যে উঠে গিয়ে দেখতে হবে না।' মামাবাবু মিঃ সেনকে থামালেন, 'ও-পিপের মধ্যে কী আছে আমি জানি।'

'আপনি জানেন।' প্রথম অফিসার মিঃ ধর অবাক হয়ে মামাবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন করে ?'

'অনুমানে।' মামাবাবু এবার একটু হাসলেন, 'আর আমার অনুমান নির্ভুল বলেই ধরে নিতে পারেন।'

অফিসার দু'জনের মুখেই একটু বিরক্তির ভ্রূকুটি যেন ফুটে উঠল। মিঃ সেন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার অনুমানটা তাহলে শুনি। কী আছে ও পিপেয় ?'

'এপিল্যাক্না বোরিয়ালিস।'

'কী!'

অফিসার দু'জনের সঙ্গে আমিও একরকম হতভম্ব।

মিঃ সেনই প্রথম বেশ অপ্রসন্ন সুরে বললেন, 'এ-সময়ে আপনার রসিকতার ঠিক তারিফ করতে পারছি না।'

'রসিকতা আমি করছি না।' মামাবাবুর গলা এবার বেশ গম্ভীর, 'ও-পিপের মধ্যে এপিল্যাক্না বোরিয়ালিস আছে নিশ্চয়ই। আর একটা আধটা নয়, প্রায় এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার বলে মনে করি।'

একটু চুপ করে থেকে বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে মিঃ ধর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এপিল্যাক্না বোরিয়ালিস মানে একরকম পোকা ?'

'হ্যাঁ, কক্সিনেল্লিডি বংশের পোকা। বৈজ্ঞানিক নামটা দাঁতভাঙা হলেও একটা সোজা নাম আছে। ইংরেজিতে বলে "লেডি-বার্ড"। আমাদের দেশে বিদঘুটে বদগন্ধের পোকা বলেই আমরা জানি।'

'কিন্তু ওই পোকা-ভরা পিপে আপনার বাড়িতে রেখে যাওয়ার মানে কী ?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন মিঃ সেন, 'শেষরাত্রে দোতলার জানলা ভেঙে চোর ঢোকার সঙ্গেই বা এর সম্পর্ক কী ?'

মামাবাবু একটু যেন দুঃখের সঙ্গেই বললেন, 'এসব প্রশ্নের জবাব আপনাদেরই খুঁজে বার করা উচিত নয় কি ?'

'হ্যাঁ, তাই করব।' মিঃ ধর একটু রাগের স্বরেই বললেন, 'আপনার একটু অসুবিধে করার জন্যে মাপ চাইছি। এ-বাড়ির ভেতর এখনও কাউকে পাওয়া যায়নি। ভেতরের অনুসন্ধান এখন বন্ধ থাকলেও বাইরে পুলিশ পাহারা ঠিকই থাকবে। আর আপনাকে ও মিঃ ভোরাকে হয়তো একবার কষ্ট করে লালবাজারে যেতে হতে পারে। আপনার চাকরকে এখন একটু নিয়ে যেতে পারি ?'

'দরকার বোধ করলে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবেন।' মামাবাবু একটু যেন অনিচ্ছার সঙ্গে সম্মতি দিলেন, 'কিন্তু ও তো সারারাত বাড়ির ভেতরেই ছিল। ভেতর থেকে বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল, তারও তো প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন।'

'তা পেয়েছি, তবু দু-চারটে প্রশ্ন করে ওর জবানবন্দীটা নিতে চাই। এ-চাকর তো আপনার বিশ্বাসী পুরোনো লোক ?' জিজ্ঞেস করলেন মিঃ ধর।

'অবিশ্বাসের কোনও কারণ তো এখনও পাইনি।' মামাবাবু জানালেন, 'তবে পুরোনো লোক নয়, আমার আগেকার চাকর ছুটি নিয়ে চলে যাওয়ায় একমাস হল কাজ করছে।'

'মাত্র একমাস কাজ করছে !' মিঃ ধর একটু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'একমাসে একটা লোককে কি চেনা যায় ?'

'একমাসে যেমন যায় না তেমনই কখনও কখনও সারাজীবনেও নয় ।' মামাবাবু হেসে বললেন, 'তবে একমাসের মধ্যে সন্দেহ করবার মতো কিছু পাইনি সেই কথাই জানাচ্ছি । তা ছাড়া আজকের যে-ব্যাপার নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাচ্ছেন তার সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক আছে ভাবতে আজগুবি বলে মনে হয় । প্রথমত, ওই দু'মনি বপু নিয়ে রঘুবীরের দড়ি বেয়ে দোতলার জানলায় ওঠাই অসম্ভব । দ্বিতীয়ত, আমার ঘরে একটা অদ্ভুত পোকা-ভরা পিপে এনে রাখবার মতো মানুষ ওকে মনে হয় কি ?'

'হুঃ ।' বলে গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিঃ ধর তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে নমস্কার করে বেশ যেন একটু অপ্রসন্ন মেজাজেই চলে গেলেন ।

'এসব কী ব্যাপার, মামাবাবু ?' অফিসাররা চলে যাওয়ার পর ভর্ৎসনার সুরেই এবার বললাম, 'দু'মাস মাত্র বাইরে গেছি । এর মধ্যে এসব কী বিদঘুটে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছ ! মঙপো বাড়িতে থাকলেও এসব কাণ্ড বোধহয় হতে পারত না । সে ছুটি নিয়ে গেছে শুনেই তো অবাক লাগছে । এতকাল তোমার কাছে আছে । মঙপোকে তো একদিনের জন্যেও কখনও ছুটি নিতে দেখিনি ।'

'কখনও যা হয়নি তা আর হবে না এমন কোনও কথা আছে কি ?' মামাবাবু হাসলেন : 'আমার দোতলার ঘরের জানলা বেয়ে কাউকে কোনওদিন ঢুকতে কেউ এর আগে দেখেছে কি ? না, আমার ঘরে আচমকা অদ্ভুত পোকার পিপে পাওয়া গেছে !'

'সত্যি, সমস্ত ব্যাপারটা তো আজগুবি বলেই মনে হয় । দড়ি বেয়ে জানলা দিয়ে একটা লোক ঢুকল অথচ বন্ধ বাড়ি থেকে বেরুল না । কোথা থেকে একটা অদ্ভুত পোকার পিপে তোমার ঘরের মধ্যে রাখা । এসব রহস্যের কোনও মানে থাকতে পারে তাই তো ভাবতে পারছি না ।'

'রহস্য যত গভীরই হোক একটা মানে নিশ্চয়ই আছে ।' মামাবাবু যেন দার্শনিক মন্তব্য করলেন ।

'মানে কিছু খুঁজে পেয়েছ ?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম ।

'মানেটা যথাসময়ে আপনা থেকে প্রকাশ পাবে । সেই অপেক্ষাতেই আছি । আসুন আসুন, মিঃ ভোরা ।'

মামাবাবুর অসংলগ্ন কথাগুলোতে প্রথমে একটু হতভম্ব হলেও পিছনে চেয়ে মামাবাবুর হঠাৎ অভ্যর্থিত মানুষটিকে দেখতে পেলাম ।

মাঝবয়েসী বেশ লম্বা-চওড়া এক ভদ্রলোক । পরনে দামী সাহেবি স্যুট । মাথায় শুধু দেশি গোল টুপি । চেহারায় পোশাকে সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধির স্পষ্ট ছাপ ।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে এগিয়ে এসে তিনি বললেন, 'বিশেষ জরুরি কাজে সেই সময়টাতেই বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল । চেষ্টা করেও তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলাম না । পুলিশ কিছু হদিস পেয়েছে কি ?'

'পেয়ে থাকলেও আমায় অন্তত জানায়নি ।' মামাবাবু একটু হেসে বললেন, 'শুধু আমার চাকরটিকে থানায় নিয়ে গিয়ে আমায় অসহায় করে গেছে । আপনাকে এক কাপ কফিও খাওয়াতে পারব না ।'

'না, না, কফির আমার দরকার নেই ।' মিঃ ভোরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : 'কিন্তু আপনার চাকর, মানে, রঘুবীরকে থানায় নিয়ে যাওয়ার মানে ! সে তো নেহাত নিরীহ ভালোমানুষ !

দরজা বন্ধ করে সে যে বাড়ির ভেতরেই ছিল তারও প্রমাণ আছে !'

'কিন্তু সে-প্রমাণেও তো ফাঁকি থাকতে পারে ।' মিঃ ভোরার সঙ্গে পরিচিত না হলেও অনাহূত ভাবেই না বলে পারলাম না ।

'কী ফাঁকি ?' মিঃ ভোরা একটু ভ্রূকুটিভরে আমার দিকে চাইলেন ।

'দোতলার জানলা দিয়ে যে ঢুকেছিল তাকে রঘুবীরই নিচের দরজা খুলে প্রথমে বার করে দিয়ে তারপর দরজা বন্ধ করে রেখেছে এরকম হওয়া তো সম্ভব ।' আমার সংশয়টা খুলে বললাম ।

'না, তা সম্ভব নয় ।' মামাবাবু আমার কথাটা তাচ্ছিল্যভরেই উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'প্রথমত, কোনও লোক যদি সত্যি ঢুকে থাকে তাহলে পিছনের জানলা দিয়ে তাকে ঢুকতে দেখে মিঃ ভোরার সামনের দরজায় আসতে যেটুকু সময় লেগেছে তার মধ্যে ওপর থেকে গরাদেতে বাঁধা দড়ি খুলে তুলে রেখে নিচে নেমে এসে বেরিয়ে যাওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব নয় । দ্বিতীয়ত, রঘুবীরকে ওরকম অবিশ্বাস করাই যায় না । রঘুবীর মিঃ ভোরার বহুদিনের বিশ্বাসী চাকর । মঙপো ছুটিতে চলে যাওয়ায় মিঃ ভোরাই রঘুবীরকে আমায় দিয়েছেন ।'

মিঃ ভোরা একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'দেখুন, মানুষ সম্বন্ধে কিছুই অবশ্য বলা যায় না । কিন্তু আমার কাছে বহুদিন বিশ্বাস রেখে কাজ করেছে বলেই রঘুবীরকে নিশ্চিন্তমনে আপনাকে দিয়েছিলাম । আমার বাগানে প্রায় দশ বছর ধরে ও দরোয়ানি করেছে ।'

'হ্যাঁ, বাগান বলতে মনে পড়ল, মিঃ ভোরা ।' মামাবাবু যেন ইচ্ছে করেই আমার বেয়াদপিটা ভোলাবার জন্যে অন্য কথা তুললেন, 'আমার বন্ধু চালিহার কাল আবার একটা চিঠি পেয়েছি । এখন তো সে তার সমস্ত বাগান বিক্রি করতেই চায় । আপনি যে-দাম দিতে চেয়েছিলেন তাইতেই রাজি ।'

'কিন্তু আমি যে আর রাজি হতে পারছি না ।' মিঃ ভোরা মুখখানা কেমন করুণ করে বললেন, 'বছর বছর ওখানকার বাগানের কী হাল হচ্ছে দেখছেন তো ! ফল ধরছেই না । ধরলেও শুকিয়ে যাচ্ছে । লাভের বদলে তাই শুধু লোকসানই গুনছি সবাই । এখন ঘরের পয়সা বার করে নতুন বাগান কেনা মানে ভস্মে ঘি ঢালা নয় কি ?'

'ওসব বাগানের দাম আরও তাহলে পড়ে যাবে মনে করুন !' মামাবাবু চিন্তিতভাবে মিঃ ভোরার দিকে তাকালেন : 'কিন্তু বাগানগুলো বাঁচাবার জন্যে আপনি তো অনেক কিছু করছেন শুনছি । বিদেশ থেকে ওষুধপত্র, আরও কত কী, আমদানিও করেছেন !'

'তা করেছি, কিন্তু ফল তো কিছু পাচ্ছি না ।' মিঃ ভোরা বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'আপনার বন্ধু মিঃ চালিহাকেই জিজ্ঞেস করে দেখবেন । আমি যা যা আনিয়েছি তা তো তাঁকেও ব্যবহার করতে দিয়েছি ।'

'হ্যাঁ, তা দিয়েছেন বটে । চালিহা সেজন্যে কৃতজ্ঞতাই জানিয়েছে…'

মামাবাবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন । কিন্তু এ-বাড়ির দুর্ভেদ্য রহস্যের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে কোথাকার কোন বাগানের লাভ-লোকসানের জোলো আলোচনায় তখন আমার মেজাজ বিগড়ে গেছে । বিরক্ত হয়ে বাধা দিয়ে বললাম, 'তোমাদের বাগানের আলোচনাই তাহলে চলুক । আমি উঠছি ।'

'আহা, উঠবি কেন এর মধ্যেই !' মামাবাবু বেশ লজ্জিত হয়ে পড়লেন : 'বাগানের আলোচনা আর করব না । তবে কিসের বাগান জানলে অতটা ব্যাজার বোধ হয় হতিস না । এসব কমলালেবুর বাগান, বুঝেছিস । আসামের সেরা কমলা !'

আমার মুখের ভাবটা লক্ষ করে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে মামাবাবু আবার বললেন, 'তা

সে কমলা বাগানের কথাও এখন থাক। নিজের চোখেই যখন দু'দিন বাদে দেখতে যাচ্ছিস তখন মুখের আলোচনার দরকারটা কী ?'

বিরক্তি থেকে একেবারে বিমূঢ়তায় পৌঁছে অবাক হয়ে মামাবাবুর দিকে তাকালাম। মিঃ ভোরার অবস্থাও আমারই মতো।

তিনিই প্রথম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি সত্যিই কমলা বাগান দেখতে আসাম যাচ্ছেন নাকি ?'

'হ্যাঁ,' মামাবাবু নেহাত যেন নিরুপায় হয়ে বললেন, 'বাগান যখন বিক্রিই হবে না, তখন বন্ধুকে একটু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেও যাওয়া দরকার।'

একটু থেমে ভুলে যাওয়া কর্তব্যটা এতক্ষণে স্মরণ করে মামাবাবু আমায় দেখিয়ে আবার বললেন, 'আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে গেছি, মিঃ ভোরা। এটি আমার ভাগনে, গণপতি হাজরা নামে পরিচিত। ওকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

কথা বলব কী, আমার গলায় তখন আর আওয়াজ নেই।

দু'দিন নয়, মামাবাবুর নানা অজানা ধান্দায় লালবাজার থেকে কাস্টম্‌স অফিস পর্যন্ত ঘোরাঘুরির পর, প্রায় দিন সাতেক বাদে সত্যিই ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশনের প্লেনে দমদম থেকে গুয়াহাটি, আর সেখান থেকে সারাদিন মোটর হাঁকিয়ে মামাবাবুর বন্ধু মিঃ চালিহার বিশাল কমলালেবুর বাগানের অফিসবাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

সারাদিনের ধকলের পর যে একটু বিশ্রাম করব তারও সুবিধে হল না। চালিহার কাছে জানা গেল তাঁর প্রতিবেশী মিঃ ভোরাও নিজের বাগানে দু'দিন আগে এসেছেন। শুনে মামাবাবুর প্রীতি একেবারে উথলে উঠল। তখনই মিঃ ভোরার সঙ্গে দেখা করতে না গেলেই নয়।

নিরুপায় হয়ে মিঃ চালিহার একটি জিপে মামাবাবুর সঙ্গী হতে হল। প্রায় মাইল দশেক পাহাড়ী রাস্তায় জিপ চালিয়ে মিঃ ভোরার বাগানে যখন পৌঁছলাম তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

মিঃ ভোরার কাঁটাতার-ঘেরা বাগানের গেট বন্ধ।

বিরক্তিটা অনেকক্ষণ ধরেই মনে মনে জমা হচ্ছিল। এবার সেটা আর প্রকাশ না করে পারলাম না। বললাম, 'এই পাহাড় জঙ্গলের দেশে এটা কি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় ? গেট তো বন্ধ দেখছ। মিঃ ভোরার এখন বোধহয় অর্ধেক রাত। চলো, ফিরে চলো।'

মামাবাবু কিন্তু নির্বিকার। জিপের হেডলাইটটা সমানে জ্বেলে রেখে তারস্বরে ইলেকট্রিক হর্ন বাজিয়েই চললেন।

উপায় থাকলে জিপ থেকে রাগের চোটে নেমেই যেতাম। তার বদলে জোর করে ইলেকট্রিক হর্ন থেকে মামাবাবুর হাতটা সরাতে যাচ্ছি, এমন সময় গেটের ওপর থেকেই কে যেন বিকট ভারি গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে আপনারা ? কী চান ?'

প্রথমটা চমকে উঠলেও তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝলাম। গেটের ঠিক মাথাতেই একটা লাউডস্পিকারের চোঙা লাগানো। আগে সেটা চোখে পড়েনি। আওয়াজটা তার ভেতর দিয়েই আসছে।

মামাবাবু চিৎকার করে এবার নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন, মিঃ ভোরার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

খানিকক্ষণ তারপর কোনও সাড়াশব্দ কোথাও না পেয়ে মনে হল মামাবাবুর বাড়াবাড়ির উচিত শিক্ষাই বুঝি হবে। কিন্তু তার পরেই গেটটা আপনা থেকে খুলতে শুরু করল। বোঝা গেল সেটা ইলেকট্রিক তারের সাহায্যে খোলে ও বন্ধ হয়। লাউডস্পিকারের চোঙা থেকেও এবার শোনা গেল, 'গাড়ি নিয়ে ভেতরে আসুন।'

যান্ত্রিক অভ্যর্থনাটা একটু কড়া গোছের হলেও মিঃ ভোরার নিজের অভ্যর্থনাটা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। তাঁর চমৎকার বাংলো-বাড়ির সুসজ্জিত বসবার ঘরে আমাদের সাদরে বসিয়ে তিনি আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন, 'সত্যিই আপনারা আসবেন আমি ভাবতে পারিনি। এত রাত্রে গেটে হর্নের আওয়াজ পেয়ে আমি তো প্রথমটা একটু ভড়কেই গেছলাম। এত রাত্রে এ-অঞ্চলে—'

'হ্যাঁ, আমাদের আসাটা একটু অসময়েই হয়ে গেছে।' মামাবাবু লজ্জিতভাবে স্বীকার করলেন, 'কিন্তু আপনার জন্যে যে-উপহারটা এনেছি সেটা দেওয়ার আগ্রহে সকাল পর্যন্ত আর সবুর করতে পারলাম না।'

'আমার জন্যে উপহার এনেছেন!' মিঃ ভোরার মুখে আনন্দের চেয়ে বিস্ময় বেশি, 'কী উপহার?'

'সেটা খানিক বাদেই জানতে পারবেন।' মামাবাবু হাসিমুখে বললেন, 'এখন সেটা জিপেই রেখে এসেছি।'

মামাবাবুর কথা শুনে আমিও অবশ্য কম বিস্মিত হইনি। জিপে একটা কার্ডবোর্ডের বড় বাক্স মামাবাবু সঙ্গে এনেছেন অবশ্য দেখেছি। প্লেনে আসবার সময়ও সেটা তাঁর কাছেই ছিল। সেটা যে মিঃ ভোরাকে উপহার দেওয়ার জন্যে আনা তা অবশ্য ভাবতে পারিনি। কী সেটা হতে পারে তাও বুঝতে পারলাম না।

আমার চেয়ে মিঃ ভোরার কৌতূহল আরও বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। তিনি বেশ একটু অধীর হয়েই বললেন, 'উপহার এনে আবার জিপে রেখে এলেন কেন?'

'উপহার দেওয়ার আগে একটু ভণিতা করবার জন্যে, সেইসঙ্গে একটা প্রস্তাব করবার জন্যেও।' মামাবাবু মধুরভাবে হেসে বললেন, 'শুনুন, মিঃ ভোরা। আপনাদের এ-অঞ্চলের কমলা বাগানের দুর্দশার কথা শোনবার পর থেকেই এ-বিষয় নিয়ে আমি ভাবছি। ভেবে ভেবে আর পড়াশুনো করে এ-দুর্দশা ঘোচাবার একটা উপায় আমি বার করে ফেলেছি।'

'বলেন কী!' মিঃ ভোরার গলার স্বরে সামান্য একটু যেন বিদ্রূপের আভাস পেলাম। তার জন্যে তাঁকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। এমন বেয়াড়া সময়ে উপহার দেওয়ার নামে এই ভণিতা আমারও তখন খুব ভালো লাগছে না।

মামাবাবুর কিন্তু কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের উৎসাহে বলে চললেন, 'হ্যাঁ, মিঃ ভোরা। আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে, আজ পৃথিবীর নানা অঞ্চলে যে-কমলালেবুর এত আদর তার আদি জন্মভূমি এই ভারত বলেই বৈজ্ঞানিকেরা সন্ধান করে জেনেছেন। যেখান থেকে এ ফল সমস্ত দুনিয়া পেয়েছে সেই ভারতেই কমলার চাষ নষ্ট হয়ে যাবে এর চেয়ে লজ্জার কিছু নেই। কমলাগাছের নানারকম শত্রু আছে। এ-অঞ্চলে যে-শত্রুতে সমস্ত বাগান ছারখার করছে তা প্রধানত হল অ্যাফিড জাতীয় পোকা। পোকা মারার রাসায়নিক ওষুধ দিয়ে তাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু সেসব ব্যবহারে মানুষেরও কিছু আনুষঙ্গিক কুফলের ভয় আছে। ইওরোপ আমেরিকাতে পর্যন্ত কীটপতঙ্গ-নাশক রাসায়নিক ওষুধের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন তাই শুরু হয়ে গেছে। রাসায়নিক ওষুধের চেয়ে অ্যাফিড নির্মূল

করবার অনেক সহজ নিরাপদ উপায় কিন্তু আছে। সেই উপায়ের কথাই আপনাকে প্রথম বলব।'

মিঃ ভোরা একটু যে হাই তুললেন তা আমার দৃষ্টি না এড়ালেও মামাবাবুর নজরেই পড়ল না। তিনি সোৎসাহে বলে চললেন, 'যে-উপায়কে এক হিসেবে ষাঁড়ের শত্রু বাঘ দিয়ে খাওয়ানো বলা যায়। পোকাদের coleoptera বিভাগের coccinellidae বংশের একটি জাতের পোকা আছে ইংরেজিতে যার বাহারে নাম লেডি-বার্ড। এই লেডি-বার্ড পোকা অ্যাফিড জাতীয় পোকার যম। এই লেডি-বার্ডেরও অবশ্য প্রায় তিনহাজার শাখা আছে। ফলের বাগানের শত্রু-পোকা ধ্বংসের জন্যে এই লেডি-বার্ড ব্যবহার করে নানা দেশে, বিশেষ করে ক্যালিফোর্নিয়ায়, আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে। লেডি-বার্ড এখন তাই কোটি কোটি বিক্রি হয়। শীতকালে এ-পোকা জড়ভরত হয়ে ঘুমোয়। সে-সময়ে এদের সংগ্রহ করে তারপর পিপেয় ভরে খরিদ্দারদের কাছে পাঠানো হয়। একটা এক গ্যালনের পিপেতে প্রায় এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পোকা ধরে। একজন বিদেশি ব্যবসাদারের কথা জানি যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় চারশো কোটি লেডি-বার্ড বিক্রি করেছেন। এই লেডি-বার্ডই আপনাদের কমলা বাগানের মুশকিল আসান। ইনসেক্টিসাইড রাসায়নিক ওষুধের বদলে এই লেডি-বার্ড কিনে আপনাদের বাগানে ছাড়ুন।'

মিঃ ভোরা এবার স্পষ্টই হাই তুলে বেশ একটু কৌতুকের স্বরে বললেন, 'আপনার মুশকিল আসানের দাওয়াইয়ের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু দাওয়াইটার কি আপনিই প্রথম সন্ধান পেয়েছেন মনে করেন ? তাহলে বলি শুনুন, আজ দু'বছর ধরে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, এমন কি আমেরিকা থেকে এই লেডি-বার্ডই লক্ষ লক্ষ আমদানি করেছি।'

'তাই নাকি ?' মামাবাবুকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত মনে হল, 'আমি মায়ের কাছে মাসির গল্প করতে এসেছিলাম ! ছিঃ ছিঃ, আমার উপহারটাই মাটি হয়ে গেল দেখছি !'

'আপনি কি আমার জন্যে লেডি-বার্ডই এনেছিলেন নাকি ?' মিঃ ভোরা এবার হেসে উঠলেন : 'তা এনেছেন যখন দিয়ে যান। অধিকন্তু ন দোষায়।'

'হ্যাঁ, এনেছি যখন দিয়ে যেতেই হবে।' মামাবাবু একটু যেন করুণ সুরে বললেন, 'কিন্তু তার আগে যে-প্রস্তাবের কথা বলেছিলাম সেটা সেরে নিই।'

'প্রস্তাব আবার কী ?' মিঃ ভোরার মুখে বিদ্রূপ-মেশানো কৌতুক।

'আপনি আমার বন্ধু চালিহার বাগান আর কিনতে চান না তো ?' মামাবাবু যেন কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

'না, সে-কথা তো আগেই বলেছি।' মিঃ ভোরার গলায় একটু অধৈর্য প্রকাশ পেল, 'জলের দরে ও-বাগান কেনাও তো এখন লোকসান।'

'হুঁ,' মামাবাবু আবার যেন দ্বিধাভরে বললেন, 'তাই আমি চালিহার হয়ে আপনার বাগানটাই কিনতে এসেছি।'

'আমার বাগান ! আমার বাগান কিনতে চায় চালিহা !' মিঃ ভোরার মুখটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে হিংস্র হয়ে উঠে আবার বিদ্রূপের হাসিতে বাঁকা হয়ে উঠল : 'আমার বাগান আমি বিক্রি করব কেন ?'

'করবেন, আপনার বাগানেরও জলের দর হতে পারে বলে।' মামাবাবুর গলা হঠাৎই গম্ভীর।

'মাপ করবেন,' মিঃ ভোরা তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'রাত অনেক হয়েছে, আপনার প্রলাপ শোনবার সময় আমার নেই।'

'সময় যদি না থাকে তাহলে আমি নাচার,' মামাবাবু যেন লজ্জিত হয়ে বললেন, 'চলুন, আমার উপহারটা তাহলে নেবেন চলুন।'

'আমাকে যেতে হবে না। আমার লোক দিয়েই আনিয়ে নিচ্ছি।' মিঃ ভোরার গলায় এখন আর খুব সৌজন্য নেই।

'না, না, তা কি হয়!' মামাবাবু যেন মিনতি করলেন, 'উপহারের মর্যাদাটা অন্তত রাখুন।'

'বেশ, চলুন,' মিঃ ভোরা বিরক্তিভরেই উঠলেন।

ঘর থেকে বারান্দা পেরিয়ে নিচে গিয়ে জিপ থেকে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা খুলেই মামাবাবু প্রায় যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, 'এ কী ব্যাপার!'

গত কয়েক মিনিটের কথাবার্তায় মাথাটা কেমন গুলিয়েই ছিল, মামাবাবুর হঠাৎ এই আর্তনাদে একবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

'কী হল কী মামাবাবু?' জিজ্ঞেস করলাম দিশেহারা হয়ে।

'ফুটো দিয়ে সব বেরিয়ে গেছে!' মামাবাবুর হতাশ চেহারা : 'অথচ এ-বাগানে ঢোকা পর্যন্ত কোথাও ফুটো ছিল না আমি জানি।'

'কী বেরিয়ে গেছে!' মিঃ ভোরা বিদ্রূপের সুরে হেসে উঠলেন : 'কার্ডবোর্ডের বাক্সে তো পোকা রাখবার পিপেই দেখছি। ও থেকে লেডি-বার্ডগুলোই বেরিয়ে গেছে তো?'

'হ্যাঁ।' মামাবাবু কেমন একটু অদ্ভুতভাবে মিঃ ভোরার দিকে তাকালেন।

'তাতে আর হয়েছে কী?' মিঃ ভোরা ব্যঙ্গ করে বললেন, 'ওগুলো বেরিয়ে আমার বাগানেই ছড়িয়ে গেছে এতক্ষণে।'

'তবু নিজের হাতে আপনাকে দিতে পারলাম না।' মামাবাবুকে অত্যন্ত দুঃখিত মনে হল : 'ওগুলো ঠিক সাধারণ লেডি-বার্ড তো নয়। বিশেষ জাতের।'

'বিশেষ জাতের!' মিঃ ভোরার গলার স্বর হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ,' মামাবাবু যেন কাতরভাবে বললেন, 'আমেরিকা থেকে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে আনিয়ে আপনার প্রতিবেশী মিঃ চালিহাকে তাঁর বাগানে ছাড়বার জন্যে যা আপনি উদারভাবে সরবরাহ করেছেন গত এক বছর, এ সেই বিশেষ জাতের লেডি-বার্ড, এপিল্যাক্‌না বোরিয়ালিস্!'

'আপনি—আপনি!' মিঃ ভোরার মুখ দিয়ে যেন ফেনা উঠবে মনে হল : 'আপনি আমার বাগানে ওই পোকা ছেড়েছেন! ইচ্ছে করে পিপের জালে ফুটো করে এনেছেন ওই পোকা ছাড়বার জন্যে!'

'আজ্ঞে, উপকারের প্রতিদান তো দিতে হয়!' মামাবাবু বিনয়ের অবতার : 'আমার বন্ধু চালিহার জন্যে আপনি যা করেছেন তার একটু শোধ না দিলে চলে? এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আন্দাজ ওই পোকা আপনার বাগানে এতক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে। লক্ষ থেকে কোটি হতে ওদের কত আর দেরি হবে? আপনার এ-বাগান জলের দরে নামতেই বা কতক্ষণ! লেডি-বার্ডের মধ্যে ওই বিশেষ জাতের পোকাই উপকারের বদলে চরম সর্বনাশ করে। ক্যালিফোর্নিয়ায় বড় বড় বাগান এক সময়ে ওই পোকার উৎপাতে ছারখার হয়ে গেছল। কিন্তু আপনাকে এসব বলে আবার মায়ের কাছে মাসির গল্প করছি। আপনি সব জেনেশুনেই আশপাশের সমস্ত বাগানের দর নামিয়ে সস্তায় কিনে নেওয়ার ফন্দিতেই তো সাহায্যের ছলে ওই পোকা অন্যদের এতদিন বিলিয়েছেন।'

মিঃ ভোরার তখন প্রায় হাত-পা খিচে ফিট হওয়ার অবস্থা। হিংস্র চিৎকার করে বললেন,

'আপনাকে আমি গুলি করব। আমার ও-গেট যে বিদ্যুতের সাহায্য ছাড়া খোলে না বা বন্ধ হয় না, তা দেখেছেন। বেরুবার উপায় আপনার নেই। আমার বাগানে চুরি করে ঢুকেছেন বলে আমি আপনাকে গুলি করে মারব।'

'না, না, ওসব হ্যাঙ্গামায় যাবেন না।' মামাবাবুর গলা স্নিগ্ধ শান্ত : 'আহাম্মকের মতো নেহাত অসহায়ভাবে কি আপনার বাগানে ঢুকেছি মনে করেন ? লালবাজার মারফত আসাম পুলিশকে সব জানিয়ে তবেই এখানে ঢুকেছি। গেটের বাইরে একটু চেয়ে দেখুন, পুলিশ জিপের হেডলাইটগুলোও তাহলে দেখতে পাবেন। আচ্ছা, নমস্কার। সুবোধ ছেলের মতো গেটটা খোলার ব্যবস্থা করুন গিয়ে।'

মামাবাবুর সঙ্গে জিপে চালিহার বাগানে ফিরতে ফিরতে হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর সবই তো বুঝলাম। কিন্তু ওই এপিল্যাক্না বোরিয়ালিস্ পোকার পিপে তোমার নিচের ঘরে কোথা থেকে এল ? আনলই বা কে ?'

'এল আর কোথা থেকে ?' মামাবাবু হাসলেন : 'ওই মিঃ ভোরার বাড়িরই গোপন গোডাউন থেকে।'

'তার মানে তোমার জানলায় দড়ি বেয়ে যে উঠেছিল সে-ই ওই পিপেটা চুরি করে এনেছিল ? কিন্তু সে কে ! সে বন্ধ বাড়ি থেকে উধাও হলই বা কেমন করে ?'

'শক্ত মানের বদলে সোজা মানেটা খুঁজলেই বুঝবি।'

'যেমন ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'যেমন সে-লোকটা বাইরের কেউ নয়, বাড়িরই লোক। সুতরাং উধাও সে হয়নি, বাড়িতেই ছিল।'

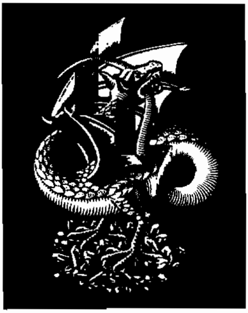
'তার মানে ?' সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, 'তার মানে রঘুবীর যখন হতে পারে না, তখন তুমিই পিপেটা চুরি করে জানলা বেয়ে উঠেছিলে! কিন্তু জানলা বেয়ে কেন ? নিচের দরজা দিয়ে ঢুকলে কী হত ?'

'ঢুকলে রঘুবীর জানতে পারত। সে ভোরার চর। আমি চালিহার বাগানের ব্যাপারে মনোযোগ দিয়েছি জেনে ভোরা আমার ওপর পাহারা রাখতে চেয়েছিল। আমি ইচ্ছে করেই তাই মণ্ডপোকে বুঝিয়ে কিছুদিনের জন্যে সরিয়ে দিয়ে ভোরার দেওয়া লোক নিয়েছিলাম তার বিশ্বাস জাগাবার জন্যে।'

এরপর আমার পক্ষে নির্বাক হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি!

□ ১৯৬৫





ব্যাঘ্র-বিজ্ঞান

লীলা মজুমদার

পদুজ্যাঠার 'আশ্রম'টা রেল-স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে। সাধারণত স্টেশনে অপেক্ষমাণ গরুর গাড়ি আর ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানরা যাত্রী পেলে তাকে নিয়ে টানাটানি করে। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। গত বছর পুজোর সময়ও এসে তাই দেখে গেছে কেষ্ট। এবার সব অন্যরকম। গোড়ায় খুব একটা আসবার ইচ্ছাও ছিল না কেষ্টর। নন্তু, গুণী এরা সব দল বেঁধে দিব্যি দেরাদুন গেল। অনেক করে বলেওছিল। কিন্তু পদুজ্যাঠার নির্বন্ধাতিশয়ে শেষ পর্যন্ত আসতেই হল। নির্বন্ধাতিশয় মানে অতিরিক্ত পেড়াপীড়ি। কেষ্ট তবুও যেত। কিন্তু বাবা বললেন,এক সময় পদুজ্যাঠা যদি তাঁদের পাঁচ ভাইয়ের পড়াশুনোর ভার না নিতেন, তাহলে সর্বনাশ হত। তাঁর এই সামান্য অনুরোধটুকু রাখতে না পারলে, বাবা নাকি নিজের কাছে নিজে মুখ দেখাতে পারবেন না। এর ওপর কিছু বলা চলে না। হয়তো আয়না দেখাই বন্ধ করে দেবেন।

তাছাড়া পদুজ্যাঠার আশ্রমটি খুব খারাপ জায়গা নয়। 'আশ্রম' বলতে বেশ বড়সড় একটা খামার-বাড়ি, ফলফুলের বাগানের মধ্যিখানে আরামের একটা বাংলো-বাড়ি—বলাবাহুল্য সেখানে বিজলির ব্যবস্থা আছে। গোয়ালভরা দুধেলা গাই। মুরগির ঘরে চল্লিশটা মোটা মোটা মুরগি। এন্তার ডিম দেয় তারা, অতিরিক্ত পাখিদের খেয়ে ফেললেও কিছু বলে না। স্থানীয় লোকেরা বড় বড় কই, মহাশির মাছ আনে। একটা লোক যা প্যাঁড়া দিয়ে যায়, সে ভাবা যায় না।

এছাড়া আর-একটা ব্যাপারও ছিল। আসছে বছর ওরা সব উচ্চ মাধ্যমিক দেবে। পদুজ্যাঠার কে একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুর ভাইপোও নাকি যাচ্ছে। তার মেসো নাকি অঙ্কের পেপার সেটারের কে হয়। তাই ওই ছেলের কাছে ভালো ভালো সাজেশন পাওয়া যেতে পারে। এরপর আর না যাওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক বন্ধুও যখন সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর নাম দেখে বাবা বললেন, 'বাঃ! ইনি যে ভারত-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তপস্যা করেও লোকে ওঁর দেখা পায় না আর তিনি সেধে তোকে ডেকেছেন! তোর সৌভাগ্য দেখে হিংসে হয়।' নানা কারণে তাঁর নাম অপ্রকাশ্য।

রেল-স্টেশনে কোনও যানবাহন না পেয়ে কেষ্ট একটু মুষড়ে পড়েছিল। দূরত্বটা খুব

বেশি নয়, হয়তো আড়াই কিলোমিটার মতো। কেষ্ট ক্রস-কান্ট্রি দৌড় জিতেছে। ওর কাছে কিছুই নয়। কিন্তু বনের মধ্যে দিয়ে। তার ভেতর লোকালয় বলে কিছু নেই। বনের নাম অবিশ্যি 'হরিণ-পাল'। ভয়ের কোনও কারণই থাকার কথা নয়। এমনিতে কিছুই মনে হত না। গত বছর গুণী-নন্তুরা সঙ্গে ছিল। অনেক কষ্টে, স্রেফ চোঁ-চোঁ দৌড় লাগিয়ে, গাড়োয়ানদের হাত এড়িয়ে, ওরা বেসুরো গান গাইতে গাইতে বনটুকু পার হয়েছিল। দূর থেকে সে-গানের বিকট সুর শুনে টর্চ হাতে হাসতে হাসতে পদুজ্যাঠার লোকজন সিকি কিলোমিটার এগিয়ে ওদের অভ্যর্থনা করেছিল। তাকে প্রত্যুদ্‌গমন বলে।

এ-বছর ট্রেনটাও আধ ঘণ্টা লেট ছিল। সে এমন কিছু নয়, তার চেয়েও বেশি যে হয়নি সে-ই ভাগ্যি। তখনও দিনের আলোর একটু বাকি ছিল। হয়তো সোয়াছ'টা হবে। গাড়ি থেকে নেমেই দেখে প্ল্যাটফর্ম—যদি ওই নিচু জায়গাটাকে প্ল্যাটফর্ম বলা যায়—সে জায়গাটা ভোঁ- ভাঁ। একটা গাড়োয়ান, কি গরুর বা ঘোড়ার গাড়ি তো নেই-ই, একটা মোট বইবার পর্যন্ত কেউ নেই। অবিশ্যি মোট বলতে কিছু ছিলও না। কাঁধে ঝোলানো একটা থলি আর স্বচ্ছন্দে হাতে নিয়ে যাওয়া যায় একটা জিপ লাগানো ব্যাগ। গত বছরেও এসব জিনিস ছিল, তা ওরা নিজেরাই বয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

তবে বাহক পেলে একটা সঙ্গী পাওয়া যেত। ট্রেন থেকে আর কেউ নামেনি। ঘাবড়ে গিয়ে চেয়ে দেখে স্টেশন-মাস্টারও তাঁর খুদে ঘরটাতে চাবি দিয়ে রওনা দিচ্ছেন। কেষ্ট ছুটে গিয়ে তাঁকে পাকড়াল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, 'পদ্মলোচনবাবু মটর সাইকেল পাঠাননি কেন বুঝলাম না। সঙ্গে হাতিয়ার আছে তো? না থাকলে একলা যেয়ো না বাপু, এই আমি সাবধান করে দিলাম। পরে কিছু হলে কেউ যেন আমাকে না দোষায়। একা যেয়ো না বনের মধ্যে দিয়ে। তার চেয়ে আমার কেবিনটাতেই রাত কাটাও। ভেতর থেকে ছিটকনি লাগিয়ে। গিন্নি বড় বদমেজাজি, তা না হলে আমার কুঁড়েঘরেই নিয়ে যেতাম। কষ্ট হত, কিন্তু নিরাপদে থাকতে। কাল সকালে সেখানে যেতে। তাঁর আক্কেল দেখে অবাক হলাম।'

কেষ্ট রাজি হল না। বলল, 'বেগতিক দেখলে গাছে চড়ব।' স্টেশন-মাস্টার মাথা নাড়লেন: 'আশা করি তার সময় পাবে।' বলেই হনহন করে হাঁটা দিলেন। কেষ্টর গা-টা কেমন শিউরে উঠল। কিন্তু ওর মতো জবরদস্ত ছেলের এইরকম সামান্য কারণে ঘাবড়ালে চলে না। তাই স্টেশনের রেলিং-এর যে-কাঠটা আলগা হয়ে ঝুলে ছিল, সেটিকে খুলে বগলদাবা করে নিয়ে চলল। বনে পৌঁছে দশ পা না যেতেই বনটা তাকে ঘিরে ফেলল।

সত্যিকার বন নয় এটা। পনেরো বছর আগেও নাকি ধু-ধু করত মাঠ। পদুজ্যাঠাই এখানে ইউক্যালিপটাস গাছের চারা এনে বৈজ্ঞানিক নিয়মে সারি সারি লাগিয়েছিলেন। বন-বিভাগে তিনি তেত্রিশ বছর বৃথা চাকরি করেননি। এখন এখানে ঘন বন। শুধু ইউক্যালিপটাস নয়, ও গাছ তো ঝাঁকড়া হয় না, সাদা সুন্দর কাণ্ডটি দেখতে দেখতে লকলক করতে করতে মাথায় সুগন্ধ ফুল-পাতার বোঝা নিয়ে, ত্রিশ ফুট উঁচু হয়ে যায়। তাই মাঝে মাঝে আম, জাম, লিচু, পেয়ারা, বট, অশ্বত্থ, বকুল, কাঠচাঁপা, কাঁঠাল, কী যে নেই তা বলা যায় না। মোট কথা গৃহপালিত গাছে ঠাসবুনটের একটা বনবিশেষ। সেখানে সব কিছু থাকতে পারত—বাঘ, ভালুক, নেকড়ে, ডাকাত। তবে কিনা মানুষের হাতে তৈরি বন তো। এখানে হরিণ ছাড়া কিছু ছাড়া হয়নি। খরগোশ বড্ড সংখ্যায় বাড়ে আর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে গাছপালার গোড়ার মাটির দফারফা করে দেয়। তাই খরগোশ-টরগোশ বারণ। বনের চারধারে শক্ত তারের বেড়া। পদুজ্যাঠা আর তাঁর সহকর্মী নন্দদাদুর ব্যক্তিগত বন। একশো

বিঘে জুড়ে এই বন। স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার দূরে। বনের ওপারে পদুজ্যাঠার খামার-বাড়ি। বলেন নাকি 'আশ্রম'। তাই না আরও কিছু!

এইসব ভাবতে ভাবতে কেষ্ট বনের এক কিলোমিটার পথ অল্প সময়ের মধ্যেই পার হয়ে গেল। পথে একটা লোকের সঙ্গেও দেখা হল না। অথচ গত বছর কাজ ফেরত অন্তত পনেরো-কুড়িজন দেহাতি লোক ওদের থামিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, বড়বাবুকে প্রণাম পাঠিয়েছিল। এমনকি একজন তার ঝাঁকা থেকে পাঁচটা বড় বড় গন্ধরাজ লেবু ওদের প্যান্টের পকেটে গুঁজে দিয়েছিল। তারা সব গেল কোথায়? ওই রাস্তার ওপর কোনও বাড়িঘর ছিল না। এটাকে নিতান্ত আশ্রমে যাওয়ার পথ বলা যায়। কাউকে যে কিছু জিজ্ঞাসা করবে, তারও উপায় ছিল না। স্টেশন-মাস্টারের কাছে কথাটা পাড়তেই তিনি ইঁদুর ধরার কলের মতো কষ্ট করে মুখ বন্ধ করেছিলেন। শুধু এইটুকু বলেছিলেন, 'পদুবাবু দেবতুল্য লোক। দয়ার শরীর। কত উপকার যে নিত্য করেন গরীব-দুঃখীদের জন্যে, তাঁর কোনও ক্ষতি আমি করতে পারব না। লোকের হাঁস-মুরগি গেলে তিনি কী করবেন?'

নাও ঠ্যালা! মন থেকে সব ভয়-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, মস্ত বড় স্টিলের গেট টপকে গেলবারের মতো করে কেষ্ট বনে ঢুকেছিল। বনের বাইরে ততক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে আর বনের মধ্যে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার। বড় টর্চটা জ্বেলে চ্যালাকাঠটা বগলে নিয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে কেষ্ট সাবধানে এগোতে লাগল। এ তো একরকম বলতে গেলে পদুজ্যাঠার বাড়ির হাতার মধ্যে ফলের বাগানের মতো। খালি একটু বেশি বড় আর অনেক বেশি ঘন এই যা। দিনের বেলা হলে এখানে কতরকম মিষ্টি সুরে পাখিরা ডাকত। এ-কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকট গর্জনে সমস্ত বনভূমি কেঁপে উঠল। দূর থেকে শোনা হালুম-হুলুম নয় এ! খুব কাছেই কোথাও ঝটাপট হাঁচড়-পাঁচড় গোঁ-গোঁ গাঁ-গাঁ! পিলে চমকে গেল কেষ্টর। একরকম বলতে গেলে পদুজ্যাঠার স্বহস্তে পালিত বন, যেখানে খরগোশ বাসেও তাঁর আপত্তি—সেখানে বাঘ কী করে আসে৷ নিশ্চয়ই ভুল শুনেছে। কিন্তু আবার শুনল খ্যাঁ—খ্যাঁক—গিয়াও! গিয়াও!

সঙ্গে সঙ্গে টর্চ ঘুরিয়ে চারদিকে আলো ফেলতেই যে-দৃশ্য কেষ্টর চোখে পড়ল, তাতে গাছে ওঠা দূরে থাকুক নড়বার-চড়বার ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেল। দুটো এই প্রকাণ্ড ডোরা-কাটা বাঘ পরস্পরকে খেয়ে ফেলার চেষ্টা করছে! সামনে এক বেচারি হরিণ দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। তাকে দেখে মনে কোথা থেকে সাহস এল কেষ্টর। টর্চটা নেড়ে চ্যালাকাঠ আছড়ে 'হেই, হ্যাসহুস' করতেই কী আশ্চর্য! বাঘদুটো পরস্পরকে ছেড়ে নিমেষের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল। আর কেষ্ট আর হরিণ দু'জনের সে কি দৌড়! বোধ হয় মিনিট পনেরোর মধ্যেই আশ্রমের আলো দেখতে পেল। উফ্! বাঁচা গেল। হরিণটাও গোয়ালের দিকে চলে গেল। কেষ্ট আশ্রমের সদর দরজার ওপর আছড়ে পড়ল: 'পদুজ্যাঠা, কেন লোক পাঠাননি?'

তার সেই হাঁকডাক শুনে সদর দরজা খুলে গেল। চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এল। পদুজ্যাঠাও পড়িমরি করে দৌড়ে এসে কেষ্টকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'কোনও ক্ষতি হয়নি তো তোর?'

কাষ্ঠহেসে কেষ্ট বলল, 'হয়নি যে সেটা শুধু আমার ভাগ্যের আর এই চ্যালাকাঠের জোরে। কী ব্যাপার বলুন তো, জ্যাঠামশাই?' এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে পদুজ্যাঠার পায়ের কাছে কেষ্ট মুচ্ছো গেল।

যখন ফের জ্ঞান হল কেষ্ট দেখে সে পদুজ্যাঠার বসবার ঘরের বাঘছাল ঢাকা কৌচে শুয়ে

আছে। জ্যাঠাইমা খুদে একটা প্লাস্টিকের হাত-পাখা দিয়ে অনাবশ্যক ভাবে ওর মাথায় হাওয়া করছেন আর পদুজ্যাঠা বলছেন, 'ওরে কেষ্ট, উঠে পড়। রাকেশ বুনো হাঁসের দো-পেঁয়াজী করেছে। খোবানির পায়েস করেছে। আর কতক্ষণ মুচ্ছো যাবি!'

আর তাই শুনে জ্যাঠাইমা বলছেন, 'তোমার শরীরে দয়ামায়ার লেশ নেই যে, সারাক্ষণ শুধু খাওয়া আর খাওয়া! ছেলে এখন বাঁচলে হয়!'

পদুজ্যাঠা কিছু বলবার আগেই সটাং উঠে বসে কেষ্ট বলল, 'কই? কোথায় বুনো হাঁসের দো-পেঁয়াজী?'

পদুজ্যাঠা সগর্বে কাকে যেন বললেন, 'দেখছিস তো, এদের হাড়ের জাতই আলাদা। বাঘের মুখ থেকে ফিরে এসেই বলে খেতে দাও! ওরে কেষ্ট, এর নাম সোনামণি! ও-ও এবার হায়ার সেকেন্ডারি দিচ্ছে। হাতমুখ ধুয়ে এসে পাশাপাশি বোস।'

হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এসেই কেষ্ট বুঝতে পারল, আজকের নৈশভোজের প্রধান অতিথি সে নয়। পদুজ্যাঠা যাঁকে আদর করে পাশে বসাচ্ছিলেন, তাঁর বয়েস সত্তরের কম হবে না। পাতলা ছিপেছিপে বেঁটেখাটো মানুষটির টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো নাক, জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো চোখ। একদৃষ্টে তাকালে গা শিরশির করে। তবে সেটা কেষ্টর লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার ফলও হতে পারে। কিংবা মুচ্ছো যাওয়ার আফটার এফেক্ট। জ্যাঠার অন্য পাশে, প্রধান অতিথির মুখোমুখি কেষ্টকে বসানো হল। কেষ্টর বাঁ পাশে সোনামণি। ফর্সা, সুন্দর।

সোনামণি বসেই এক ঢোক জল খেয়ে বলল, 'এখানকার জলে অ্যালকালি আছে বলে খুব উপকারী। আমাকে সর্বদা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি সাবধান থাকতে হয় কিনা। পাতে নুন নেওয়া খুব খারাপ অভ্যেস।'

কেষ্ট জিভে এক চিমটি নুন ঠেকিয়ে বলল, 'কেন।'

সোনামণি বলল, 'কেন কী? কেন তাও জান না?'

কেষ্ট বলল, 'তোমাকেই বা অন্যদের চেয়ে বেশি সাবধানে থাকতে হয় কেন? অম্বলের ব্যামো নাকি? ডন-বৈঠক করলেই সেরে যাবে।'

সোনামণি বোধ হয় একটু বিরক্ত হল: 'সব জিনিস ওরকম স্থূল দৃষ্টিতে দেখলে চলে না, ভাই, কী যেন নাম বললে তোমার?'

'বলিনি এখনও। আমার নাম কেষ্ট।'

'ব্যাস, কেষ্ট? কেষ্ট কী? কৃষ্ণচন্দ্র, কি কৃষ্ণপ্রিয়, কি ওইরকম কিছু নিশ্চয়ই।'

কেষ্ট বলল, 'ঠিক জানি না। ওই রোগা মানুষটিই কি পদুজ্যাঠার বন্ধু, সেই যুগান্তকারী প্রাণী-তাত্ত্বিক, যার নাম গোপনীয়তা দিয়ে মোড়া? আচ্ছা, কেন বল তো?'

সোনামণি বলল, 'দেখ কেষ্ট, মহাপুরুষদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা ঠিক নয়। ছোড়দাদু যদি আরও কয়েক হাজার বছর আগে জন্মাতেন, তাহলে ডাইনোসররা লোপ পেত না।'

'অ্যাঁ! বল কী! টিরানোসরাসরাও লোপ পেত না বোধ হয়। বরং ওরা থাকলে আমরাই লোপ পেতাম। ওরা তো মাংসাশী ছিল। আমাদের প্রকৃতি-বিজ্ঞানে পড়েছিলাম।'

সোনামণি একটু গরম হয়ে হয়তো এর উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় রাকেশ দুটো বড় বাটিতে করে বুনো হাঁসের দো-পেঁয়াজী আর একটা বড় থালায় মোটা মোটা পরোটা ওদের সামনে নামিয়ে বলল, 'ওই ডিশে লেবুর চাকা আর কাঁচা পেঁয়াজ আছে।' তাই দেখেই দু'জনার মন থেকে তর্কাতর্কির ইচ্ছেও চলে গেল।

খোবানির পায়েস খাওয়ার সময় ছোড়দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাশ করে কী করবে ভেবেছ কিছু?'

পদুজ্যাঠা অমনই ফস করে বলে বসলেন, 'আগে পাশ করুক। অঙ্কে তো পণ্ডিত।'

ছোড়দাদু চটে গেলেন : 'বলেছি তো, আমি ওদের এমন কুড়িটা সাজেশ্চন দেব, যার মধ্যে অঙ্কের সমস্ত সম্ভাব্য কোশ্চেন থাকবে। এমনকি আমার কথামতো চললে তার সবগুলোর উত্তরও এমনই পাখি-পড়া করে শিখিয়ে দেব যে, ওদেরও সাধ্য থাকবে না যে, ফেল করে।'

এই অবধি শুনে কেষ্ট এক চামচ ওইরকম স্বর্গীয় পায়েস ভুল নলি দিয়ে গিলে বিষম-টিষম খেয়ে একাকার। তারপর পিঠ থাবড়ানি খক্‌খকানি থামবামাত্র সবাইকে সরিয়ে দিয়ে কেষ্ট বলল, 'তাহলে স্যার, আপনি যখন যা বলবেন, তাই করব।'

ছোড়দাদুর চোখ চকচক করে উঠল : 'দেখো, শেষ পর্যন্ত কথা যেন ঠিক থাকে।' এই বলে উঠে পড়লেন।

কেষ্টর মনে হচ্ছিল, নিরাপদ, স্বহস্তে প্রস্তুত বনের মধ্যে হিংস্র বাঘের উপস্থিতির বিষয়ে কেউ বিশেষ কৌতূহল দেখাচ্ছে না, এ তো ভারি অদ্ভুত। কথাটা উত্থাপন করবে কি না সবে চিন্তা করছে, এমন সময় মুখ থেকে রুপোর গড়গড়ার নলটা বার করে ছোড়দাদু বললেন, 'ঠিকই পাশ করবে। কিন্তু তারপরে ওইসব মামুলি কলেজে যাবে না। সেখানে যারা বিদ্যা দান করে, তারা প্রায় সকলেই এককালে আমার ছাত্র ছিল। তাদের বিদ্যের দৌড় আমার খুব জানা আছে। আমার একটা যুগান্তকারী গবেষণার জন্যে এখনই কয়েকজন বলিষ্ঠ, সাহসী আর জবরদস্ত সাহায্যকারী দরকার। তাদের ভবিষ্যতের জন্যে ভাবতে হবে না। সে ভার আমার। এইরকম অন্তত একজন স্বেচ্ছাসেবক আমার এখনই দরকার। তার এমনই পৌরুষের জোর থাকা চাই যে, সদুদ্দেশ্যে নিজের প্রাণ বিপন্ন করতেও সে মাইন্ড করবে না। অথচ এমন কেউ, যার অভাবে দেশের সেরকম ক্ষতিও হবে না। নইলে পদুর যেরকম প্রাচীন ডানপিটেমির ইতিহাস ছিল আর এই ষাট বছর বয়েসেও যা শরীর, ওকে দিয়েও আমার কাজ চলে যেত। কিন্তু দেশপ্রেমিক হয়ে তো আমি দেশের কোনও বিশিষ্ট নাগরিককে বিপন্ন করতে পারি না। অথচ উপযুক্ত এবং যথেষ্ট ফল দেখাতে না পারলে বর্তমান জাতীয় জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ভেস্তে যাবে। একমাত্র তুমিই সেটার উপায় করতে পারো, কেষ্ট।'

ছোড়দাদুর মতো একজন যুগান্তকারী বিজ্ঞানী তারই ওপর ভরসা করে আছেন, এ-কথা শুনে আত্মসম্মানে আর গর্বে কেষ্টর চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি আরও দেড় ইঞ্চি বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা লজ্জা আর বিনয়ের ভাবেও মনটা ভরে গেল। ছোটবেলা থেকে খালি বকুনিঝকুনি, নিন্দা, শাস্তি, ঠ্যাঙানি খেয়ে এতটা বড় হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষাটা নিতান্ত কপালজোরে কানের কাছ ঘেঁষে তরে গেছিল। বাবা বলেছিলেন তাও নিশ্চয়ই কারও নম্বর যোগ করার ভুলে পাশ করে গেছে, ও আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। তবে খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদিতে ওর জুড়ি ছিল না বলেই এত সহজে উচ্চ মাধ্যমিকে সিট পেয়েছিল। এই প্রথম কেষ্ট কোনও বিদ্বান লোকের কাছে সম্মান পেল।

সে ছোড়দাদুর পায়ে হাত দিয়ে বলল, 'বলুন, কী করতে হবে?'

ছোড়দাদু খুশি হয়ে বললেন, 'আজ আর নয়। অনেক রাতও হয়েছে, তোমারও প্রচুর ধকল গেছে। আর সত্যি কথা বলতে কি একজন উপযুক্ত সহকারীর অভাবে আমিও একেবারে জেরবার হয়ে গেছি। সোনামণিটার ওপর বড় ভরসা ছিল। ভেবেছিলাম এসব গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা পূর্ণ সাফল্য লাভ করার আগে নিজের পরিবারের বাইরে প্রকাশ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তা ব্যাটার বেড়াল দেখলেই ফিট হয়। যাক সেসব দুঃখের

কথা। আর সত্যিই তো বিশাল মানবগোষ্ঠী যার পরম আত্মীয়, তুচ্ছ রক্ত-সম্পর্ক দিয়ে তার কী হবে ? তাছাড়া আত্মীয়স্বজনরা কম ঝামেলাও করে না, কিছু একটা ঘটে গেলেই তা টের পাওয়া যায়। আপাততশোওয়াযাক।' এই বলে হাই তুলে সোনামণির সঙ্গে ছোড়দাদু পাশের বাড়িতে চলে গেলেন। পাশের বাড়ি হলেও আধ কিলোমিটার দূরে। বাহাদুর আর রাকেশ লাঠি-লণ্ঠন নিয়ে পৌঁছে দিয়ে এল।

একটু চিন্তিত ভাবে কেষ্ট শুতে গেল।

পরদিন সকালে সোনামণি এসেছিল কেষ্টকে নিয়ে যেতে। দক্ষিণের জাল-ঘেরা বারান্দায় দু'জনে প্রাতরাশ করল। ওই সাত সকালেই জ্যাঠাইমা কাজুবাদাম আর কিসমিস দিয়ে মোহনভোগ, গরম গরম লুচি আর বাগানের আলু-ভাজা তৈরি করে খাওয়ালেন। পদুজ্যাঠা ভোরে উঠে ছোড়দাদুর ল্যাবরেটরিতে কী কাজ করতে গিয়েছেন।

সোনামণি বলল, 'তুমি বরং এই পথটা ধরে সোজা চলে যাও, ঠিক পৌঁছে যাবে। আমি এখানে পদুমামার পড়ার ঘরে কিছু রেফারেন্স বই দেখি। আজ আমার হাঁটাহাঁটি কিংবা মানসিক উত্তেজনা উচিত হবে না।' এই বলে আরও দু'খানা লুচিতে মোহনভোগ ভরে পাটিসাপটা বানিয়ে খেতে লাগল। জ্যাঠাইমা পুজোর ঘরে। কেষ্ট রাকেশকে বলে, তার সঙ্গ প্রত্যাখ্যান করে একলাই রওনা দিল।

ছোড়দাদু ওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওকে একা আসতে দেখে হেসে ফেললেন : 'ঠিক জানতাম বাছাধন গা-ঢাকা দেবেন। এখানে বোসো, তোমাকে কিছু জ্ঞান দিই। পদু ততক্ষণ গবেষণার ওষুধপত্রগুলো মেপে ঢালুক। তোমার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ দরকার। ব্যাঘ্রপ্রকল্পের কথা শুনেছ ?'

কেষ্ট বলল, 'বাঘ বাড়ানোর উপায় করার নিয়ম যাকে বলা যায়, সেই তো ?'

ছোড়দাদু শুনে মহাখুশি : 'মোক্ষম কথাটি বলেছ, ভাই। বাঘ বাড়ানো কেন দরকার, তা দু'কথায় বলি। প্রকৃতির তৈরি অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে যদি একটা ছোট পতঙ্গও লোপ পায়, জ্ঞানের জগতে তাহলে এতবড় একটা ফাঁক থেকে যায়, অন্য কোনও বড় জানোয়ার দিয়েও যা ভরা যায় না। বড় জীবের কথা ছেড়েই দিলাম। যেমন ধরো ডাইনোসর। এ পৃথিবী অবিশ্যি তার রসদ জোগাতে পারত না। তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমি হয়তো ছোট সাইজের ডাইনোসর বানাতেও পারতাম যদি একটা জ্যান্ত ডাইনোসর পেতাম।'

কী আর বলব, সেই মুহূর্তে নতুন একটা কেষ্ট জন্ম নিল। যে-ছেলে কোনওদিনই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধার ধারেনি, একজন পরম পণ্ডিত তার সঙ্গে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছেন ! এত সৌভাগ্যও তার কপালে ছিল ! ভাগ্যিস এসেছিল এখানে !

ছোড়দাদু বলতে লাগলেন, 'জিন কাকে বলে জানো ?'

একটু সন্দেহের সুরে কেষ্ট বলল, 'ওই যে রঙ-জ্বলা ক্যাম্বিসের মতো জিনিসের সরু ঠ্যাং প্যান্টেলুন হয়—'

'আরে না, না রে না, সে হল জে ই এ এন, আর এ হল জি ই এন ই। জিন। যাকে বংশ-কণিকাও বলতে পারো। যার জোরে একেকটা বংশে একেক রকমের চেহারা কিংবা দোষ-গুণ দেখা যায়। জন্তু-জানোয়ারদেরও তাই।

'ওই প্রাণ-কণিকার সাহায্যেই ডাইনোসরের বাচ্চাও মায়ের মতো খুদে মাথা বিশাল বপু হত। মাছির ছানা মাছি-মা'র মতো হয়। আমার সারা জীবনের বিজ্ঞান অনুশীলন আর অভিজ্ঞতাবলে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে ওই জিনের নব-নব প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে, জানোয়ারদেরও নিজেদের জাতের মধ্যেই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বদলে দেওয়া যায়। তবে পরিবর্তনটা জাতের

মধ্যেই হবে, ভিন্ন জাতে বর্তাবে না। যেমন, গিরগিটিকে হয়তো গোসাপের গুণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে বেজির মতো করা যাবে না।'

এখানে কেষ্ট থাকতে না পেরে বলল, 'যেমন গাধা আর ঘোড়ার ছানা খচ্চর হয়।'

ছোড়দাদু একটু হতাশ ভাবে বললেন, 'আমি বলছিলাম বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে ওষুধ তৈরি করে, সেই ওষুধ প্রয়োগে জানোয়ারের আকৃতি ও চরিত্র বদলে দেওয়া যায়। ঢাকঢাক-গুড়গুড় করে কী হবে, স্পষ্ট করে বলি : ওষুধের সাহায্যে বেড়ালকে প্রায়-বাঘে আর বাঘকে প্রায়-বেড়ালে পরিণত করা যায়। অবাক হলে নাকি ?'

অবাক বলে অবাক ! কেষ্টর থুতনিটা প্রায় গলা অবধি ঝুলে পড়েছিল। অনেক কষ্টে তুলে মুখ বন্ধ করতে হল।

কাষ্ঠ হাসলেন ছোড়দাদু : 'অথচ পৃথিবীতে একমাত্র তোমারই থুতনি ঝুলে পড়ার কারণ থাকতে পারে না। কারণ ওষুধের ফলে বেড়াল কতখানি ব্যাঘ্রত্ব পায় তা তুমি নিজের চোখে দেখেছিলে। মাপে, শরীরের গড়নে, চামড়ার রঙচঙে, গলার স্বরে সে পুরো বাঘ। খালি, ওই যেই না চ্যালাকাঠ নেড়ে হ্যাস করলে,অমনই ল্যাজ তুলে পগার পার। তবু বলতে হবে ওই ডোজেই যে অতখানি সাফল্য হয়েছে, সেটা খুবই কৃতিত্বের কথা। এবার একটা আরও বড় পরীক্ষার সময় এসেছে। তারই জন্য তোমাকে আনা।'

এতক্ষণে কেষ্টর মুখে ভাষা ফিরে এল। সে বলল, 'আপনি এত কথা কী করে জানলেন ? কেউ তো ছিল না।'

কাষ্ঠ হাসলেন ছোড়দাদু : 'মুরগির ছানার সমান সাহসও যদি এদের কারও থাকত, তাহলে তাকে ওষুধ খাইয়ে মানুষ তৈরি করার চেষ্টা করতাম। তাও নেই। নইলে অতদূর থেকে তোমাকে আনা কেন, ভাই ?'

কেষ্ট বলল, 'ছোড়দাদু, আপনি নিজেও তো ওইসব প্রায়-বাঘদের গুণের দৌড় পরীক্ষা করতে পারতেন ?'

ছোড়দাদু আকাশ থেকে পড়লেন: 'আমি ? কী যে বলো, তার ঠিক নেই। ধরো যদি ওষুধের গুণে বাঘত্বটা খানিকটা বেড়েই গেল। তখন আমার মতো একজন যুগান্তকারী গবেষক-অভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ সর্বজাগতিক ব্যাঘ্রপ্রকল্পের জন্য ব্যাঘ্র-বিজ্ঞান প্রয়োগ করে কে বাঘ তৈরি করবে রে ব্যাটা, বল্ ? পৃথিবীময় বাঘ সরবরাহ করা কি চাট্টিখানিক কথা ! প্রকল্পের বাঘরা বছরে একটার বেশি ছানা তো দেয়ই না, বরং কমই দেয়। প্রয়োজন মেটাতে হলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাঘ তৈরি করা ছাড়া কী করা যায় ?'

কৌতূহল চাপতে না পেরে কেষ্ট জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে বোধহয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাঘ থেকে প্রায়-বেড়ালও তৈরি করেছেন ?'

ছোড়দাদু চটে গেলেন : 'তোর দেখছি গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের সবটাই পড়া বাকি আছে। দামী দামী বাঘ খরচ করে বিল্লি বানিয়ে কী হবে শুনি ? কাতারে কাতারে বিল্লি নগরের গ্রামের অলিগলিতে ঘুরে গেরস্তর সর্বনাশ ঘটায়। ইঁদুর-বংশ ধ্বংস করা ছাড়া তাদের কোনও উপকারিতা নেই। আন্তর্জাতিক বাজারে পাতি-বেড়ালের চাহিদা নেই। তাদের দিয়ে বিদেশি মুদ্রা রোজগার হয় না। তবে এইসব লাখে লাখে উদ্বৃত্ত বেড়ালের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে ব্যাঘ্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। তারাই হল কাঁচা উপকরণের নব্বই শতাংশ। এই উপকরণ বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এমনকি আমাদের কলকাতার এজেন্টরা অযাচিত বেড়াল ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গৃহস্থদের কাছ থেকে মাশুল পায়। আমরাও সামান্য কিছু দিয়ে থাকি। এইভাবে আমরা বেকার সমস্যা দূর করবার জন্যেও সাধ্যমতো চেষ্টা করি। ব্যাকগ্রাউন্ড

তথ্য সব শুনেছিস কি, এবার গবেষণাগারে চল্ ।'

গবেষণাগারটা অনেকটা জেলখানার মতো দেখতে।দোতলার সমান উঁচু নিরেট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। তাতে একটা লোহার দরজা বসানো ।দু'জন বন্দুকধারী পাহারাদার চাবি দিয়ে দরজা খুলে, ওদের সঙ্গে ভেতরে ঢুকে আবার দরজায় চাবি দিল।

প্রথম ঘরটাতে তাকে তাকে সারি সারি ছোট-বড় ওষুধের শিশি। মনে হয় বুঝি ডাক্তারখানা। ছোড়দাদু একটা টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। তার ওপর দুটো প্রকাণ্ড বয়েম। একটাতে নীল কালি দিয়ে লেখা 'মার্জার-নির্যাস'। অন্যটা কিছু ছোট। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'ব্যাঘ্রাসব : অতিরিক্ত সেবন হইতে সাবধান'। কেষ্ট হাঁ করে তাকিয়ে দেখল টেবিলের পাশে পদুজ্যাঠা দাঁড়িয়ে একটা নলের সাহায্যে ছোট ছোট শিশিতে ব্যাঘ্রাসব ঢালছেন। ওকে দেখে যেন কেমন হকচকিয়ে গেলেন : 'ও, নন্দু সত্যি সত্যি পরীক্ষাটা করবে তাহলে ?'

ছোড়দাদু অবাক হলেন: 'করব না তো কী ভেবেছ ?'

'কিন্তু—কিন্তু—কেষ্টকে না হলেই কি হত না ?'

ছোড়দাদু গরম হয়ে উঠলেন: 'তাহলে তুমি চাও না যে,তোমার ভাইপোটি উচ্চ মাধ্যমিক ভালোভাবে পাশ করে বনবিভাগের গবেষণাগারে এক বছর অ্যাপ্রেন্টিসের বৃত্তি পাক আর তারপরে ভালো গ্রেডে স্থায়ী চাকরি করুক ?'

কেষ্ট তাঁর আলখাল্লা খামচে ধরে বলল, 'আমি রাজি আছি, ছোড়দাদু, কী করতে হবে বলুন।'

ছোড়দাদু বললেন, 'আগে সব ব্যাপারটা বুঝে নাও। পরে দৈবাৎ কিছু হয়ে গেলে অবিশ্বাসীরা যেন না বলে যে,আমি ছেলেমানুষ ধরে এনে তাকে নেই করে দিয়েছি।'

'ন্-ন্-নেই করে দেবেন নাকি ?'

'আরে না না, ওটা কথার কথা।শোনো তাহলে, এই ব্যাঘ্রাসব বাঘের জিন থেকে চৌয়ানো। পরীক্ষার্থী বেড়ালকে প্রথমে রোজ দু'ফোঁটা করে খাওয়াতে আরম্ভ করি। ক্রমে তার গা-সওয়া হলে ডোজও বাড়িয়ে বাড়িয়ে শেষটা ওই ছোট শিশির গোটা শিশি খাওয়াতে হয়। ডোজ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাঘত্বও বাড়তে থাকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও পরীক্ষাতে পূর্ণ-বাঘত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কাল রাতে যাদের দেখেছিলে তারা পৌনে এক শিশি করে খেয়েছে। দেখতে হয়েছে বাঘের মতো, ডাকটিও তাই, কিন্তু একটু বড় সাইজের শিকার ধরতে ভয় পায় আর লাঠি ঘোরালেই পালায়। অথচ ওদের উপদ্রবে গাঁয়ের লোকে ভয়ের চোটে সন্ধে হতেই দরজায় খিল দেয়। যদিও হাঁস-মুরগির আস্তাকুঁড় ছাড়া কিছুতে ওরা মুখ দেয় না। অসম্ভব ভীতু এদেশের লোকেরা। ভাবতে পারিস্, পুরো শিশি ওষুধ খাওয়া একজোড়া প্রায়-বাঘের ফাইনাল পরীক্ষা স্বেচ্ছাসেবকের অভাবে আজ পর্যন্ত নিতে পারিনি ! স্বয়ং মা সরস্বতী তোকে পাঠিয়েছেন। তোর জন্যেই বিজ্ঞান জগৎ অপেক্ষা করছে। তোর কিছু হলেও আমার "ব্যাঘ্র-বিজ্ঞানে" তুই অমর হবি।' তারপর কেষ্টকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, 'সিনথেটিক রবারের জুতোজোড়া বরং খুলে রেখে যা। বলা তো যায় না, দুনিয়ায় ওই একজোড়াই প্রায়-বাঘ আছে। আমি চাই না সিনথেটিক রবার খেয়ে ওদের কোনও অনিষ্ট হয়। আয় আমার সঙ্গে।'

পদুজ্যাঠা বোধহয় ইশারা করে কিছু বলতে চাইছিলেন। ছোড়দাদু ওঁর দিকে পিঠ ফিরে কেষ্টকে একরকম ঠেলে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘর নয় ঠিক। অনেকটা চিড়িয়াখানার খাঁচা বলা যায়। ঘরের তিন ভাগ জুড়ে মোটা মোটা লোহার গরাদে দিয়ে তৈরি একটা খাঁচাই

বটে। বিকট বেঘো গন্ধ। খাঁচার পিছনে একটা নিচু দরজা দিয়ে বোধ হয় প্রায়-বাঘদের শোওয়ার ঘরে যেতে হয়। সে-দরজাটাকে ওপর থেকে ফেলে বন্ধ করতে হয়। খাঁচার ছাদের ওপর চড়ে দরজা খোলা-বন্ধ করা যায়। খাঁচার বাইরে ছাদে ওঠার লোহার সিঁড়িও আছে। দরজাটা আপাতত বন্ধ। দরজার ওপরে একটা আংটা। তাতে দড়ি বাঁধা। খাঁচার ছাদ থেকে দড়ি টেনে দরজা তোলা বা নামানো যায়। সমস্ত ব্যবস্থা সরল ও প্রকট।

বন্ধ দরজাটা মোটা মোটা লোহার শিক দিয়ে তৈরি। তার পিছনে অন্ধকারে দু'জোড়া ক্ষুধার্ত চোখ জ্বলছে, নিভছে। কেষ্টর গা শিউরে উঠল। ঠাকুমার কথা মনে পড়ল। ওইরকম চোখ জ্বলে আর নেভে। কেষ্ট মুখ ফিরিয়ে ছোড়দাদুকে বলল, 'ওরা বেড়াল তো ঠিক ?'

ছোড়দাদু বললেন, 'বরং আদ্য-বেড়াল বলতে পারিস।'

'মানে—ইয়ে—ওদের বেঘো ভাবটা কমাবার জন্যে কিছু করা যায় না ? না না, ভয় খাচ্ছি না। ভয় খেয়ে তো আর পরীক্ষায় পাশ করা যাবে না—বলছিলাম কি, পুরো শিশি ওষুধ খেয়ে ওরা এখন বড় জানোয়ার দেখেও ভড়কাচ্ছে না।'

ছোড়দাদু মুচকি হাসলেন : 'দুটো শিংওলা হরিণকে তাড়া করে মেরে অর্ধেকটা খেয়েছে। পরের রাতে আবার কিলের কাছে ফিরে গিয়ে শেষ করেছে। এর বেশি কী চাস ? হাজার হোক, রি-কন্ডিশন্ড বেড়াল বই তো নয়।'

কেষ্ট বলল, 'ওদের বাঘত্ব কমাবার উপায় নেই ?'

'নেই মানে ? অমন কাঁচা কাজ নন্দলাল বাঁড়ুয্যে করে না, বুঝলি ? ওই যে দেখে এলি মার্যারি-নির্যাস, ওরই বড় ডোজ রোজ খাওয়ালে ক্রমশ বেড়ালত্বে পতন হতে বাধ্য। আইন-ফাইনের কথা মনে রেখে, এক বছরের চেষ্টায় ও একশোটি প্রয়াত বেড়ালের সাহায্যে ওটি হয়েছে। আর কিছু জানতে চাস ? পরে যেন ওই পদুই না বলে বসে চোখ বেঁধে তোকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি। ভালো কথা, ওই যে তোর দু'পাশে দু'জন বন্দুকধারী রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাঘ বিগড়োলে তৎক্ষণাৎ ওরা গুলি করবে।'

কেষ্ট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'এককে গুলিতেই মরবে তো ?'

ছোড়দাদু চটে গেলেন : 'না ! তোর দেখছি বড় বেশি ধানাইপানাই। সাহসে না কুলোয় তো এখনও বল্। আমি সোনামণিকেই বলেকয়ে রাজি করাই। পাশ না করলে তার বাবাও তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে বলে শাসাচ্ছে। ওই গুলিতে মরে না, খালি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হয়। ঢুকবি কি না ?'

কেষ্টর আঁতে ঘা লাগল। মুখ্যু বলতে পারে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ ওকে ভিতু বলে পার পায়নি। ভাঙা গলায় তাই বলল, 'বেশ, দরজা খুলে দিন, আমি ঢুকছি।' বলে নিজেই খাঁচার মেন দরজাটা খুলল।

ছোড়দাদু তাঁর সঙ্গের তৃতীয় লোকটাকে খাঁচার ছাদের দিকে ইশারা করলেন। সে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল। সকলের চোখ সেদিকে। হেনকালে ঘরের মেন দরজাটা ফাঁক করে পদুজ্যাঠা নিঃশব্দে ঢুকে, কেষ্টর কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে বললেন, 'ঠেকায় পড়লে সেফটিপিনটা খুলে দিয়ে দেখিস কী মজা হয়।' এই বলেই নিমেষের মধ্যে ভ্যানিশ হয়ে গেলেন। আর কেউ লক্ষই করল না।

কেষ্ট যেই খাঁচার ভেতরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, অমনই ঢুকবার দরজায় ছিটকিনি দিয়ে ছোড়দাদু খাঁচার ছাদের লোকটিকে বললেন, 'এবার তোল্!'

সঙ্গে সঙ্গে ঘর-র-র করে মুভি ক্যামেরা চলতে শুরু করল। কেষ্ট চুলটা কপাল থেকে

সরিয়ে সবে ভাবছিল, হাতদুটো কোমরে রাখলে ভালো দেখাবে কি না, এমন সময় সে কী বেঘো হুঙ্কার ! ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে গুঁড়ি মেরে, ক্রূর দৃষ্টি হানতে হানতে জানোয়ার দুটো এগোতে লাগল। কে বলবে বাঘ নয় ! উৎকট বেঘো গন্ধে কেষ্টর নাড়ি উলটে আসছিল। আর হয়তো দু'পা এগিয়েই লাফ দিয়ে ঘাড় মটকাবে এবং ছোড়দাদু ওদের পূর্ণ বাঘত্ব-প্রাপ্তির জয়োল্লাসে ফেটে পড়বেন। আর ঠাকুমা যখন শুনবেন—নাঃ, কক্ষনো না। কেষ্ট সেফটিপিনটা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কম করে দুশো ছোট-বড় নেংটি ইঁদুর ঝোলা থেকে লাফিয়ে পড়ে, সটান ভেতরের ঘরের বাসী খাদ্যের গন্ধের দিকে স্রোতের মতো ছুটল ! অমনই বাঘ দুটোও 'গেল ! গেল ! গেল !' বলে বিকট স্বরে 'ম্যাঁও ম্যাঁও' করতে করতে তাদের পিছন-পিছন ধাওয়া করল। তারাও ঘরে ঢুকেছে আর তাদের ব্যাঘ্রত্ব-প্রাপ্তির হৃদয়-বিদারক ব্যর্থতায় মুহ্যমান ছোড়দাদুও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন এবং ছাদের থেকে পদুজ্যাঠা ছোট ঘরের দরজাটা ঘটাং করে ফেলে বন্ধ করে দিলেন। তারপর তরতর করে ছাদ থেকে নেমে ছিটকিনি খুলে দিতেই কেষ্ট ছিটকে বেরিয়ে এল।

পদুজ্যাঠা ছোড়দাদুর শরীর ডিঙিয়ে কেষ্টকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগলেন, 'ঠিক আছিস্ তো, বাপ ? কামড়ায়-টামড়ায়নি তো ?'

তাই শুনে অন্যদের খুব হাসি পেলেও, কেষ্টর কিন্তু কেন জানি কান্না পাচ্ছিল। সে ঝোঁকের মাথায় নিচু হয়ে পদুজ্যাঠার মাথায় চুমু খেয়ে নিল।

পদুজ্যাঠা ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন, 'ব্যাটাচ্ছেলে ওদের দু'দিন স্রেফ উপোস করিয়ে রেখেছিল। কামড়ালে কিছুই আশ্চর্য হতাম না।'

এই সময় ওদের পায়ের কাছ থেকে জড়ানো গলায় ছোড়দাদু বলে উঠলেন, 'উফ্ ! কী ম্যাগনিফিসেন্ট ফেলিওর ! বেড়াল কখনও পূর্ণ বাঘ হয় না—এই মহাসত্য প্রমাণ করে দিলাম। বইতে তাই লেখা থাকবে। কেষ্ট, তুই পাশের জন্যে আর চাকরির জন্যে ভাবিসনে। এই পরীক্ষাটা দিয়েই ব্যাঘ্র-বিজ্ঞানের কাজ শেষ হয়ে গেল। এটাই বইয়ের শেষ অধ্যায়। এরপর আমার "বৃক্ষ-বিস্ফোরণ" শুরু হবে। তুই হবি আমার ডান হাত। ব্যাঘ্র-বিজ্ঞানের লাস্ট পেজে ব্যাঘ্র-সম্মুখী তোর ছবি থাকবে। আবার বৃক্ষ-বিস্ফোরণের প্রচ্ছদপটে দেখা যাবে, তুই গাছের গায়ে ইঞ্জেকশন দিচ্ছিস্।'

কেষ্ট খুশি হয়ে বলে, 'ফিল্মটা কবে রিলিজ হবে, স্যার ?'

'না বাপু, আমি সত্যজিৎ রায়ের ছাড়া কারও ফিল্ম দেখি না। নিজেরও না। তবে এটা পদু তোকে আমাদের স্ক্রিন-রুমে দেখিয়ে দেবে। ভারি মূল্যবান একটা প্রামাণিক তথ্য এটা। বেশি দেখালে ছিঁড়ে-ফিড়ে যেতে পারে।'

খুব খারাপ লোক ছিলেন না ছোড়দাদু। সেদিন বিকেলেই কোথা থেকে কেক-ফেক বানিয়ে, ওঁদের হিমঘরে চকোলেট আইসক্রিম বানিয়ে মহাভোজ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কেষ্ট যখন পরীক্ষার বিফলতার কথা তুলে সহানুভূতি জানাতে গিয়েছিল, ছোড়দাদু আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'বিফলতাই হল সাফল্যের ভিত, তাও জানিস্ না ! আমার একহাজার ব্যর্থতার জন্যেই আজ আমার এত নাম। আর সেরকম বিফলতাই বা কোথায় দেখলি ? এর ফলে আমাদের ব্যাঘ্র সরবরাহের ব্যবসার চেয়েও বেশি প্রতিষ্ঠা ও অর্থাগম হবে। সার্কাসওলারা, ছোটদের পার্কের মালিকরা, বড়লোকেরা যেই আমাদের ফলাও করে সচিত্র বিজ্ঞাপন দেখবে, অমনই তারা লাইন দিয়ে কল্প-ব্যাঘ্র কিনতে আসবে, এই আমি বলে দিলাম। অবিকল ব্যাঘ্রের মতো চেহারা আর গর্জন, অথচ নিরামিষাশী ! ইঁদুর আর হরিণকে নিরামিষ বললে কোনও দোষ হয় না। আমিও তো নিরামিষ খাই, তাই বলে কি কাল রাতে

বুনো হাঁস পাত থেকে ফেলে দিয়েছিলাম ? গেরস্তের ছেলেদের সব খেতে হয়।'

ফিরে যাওয়ার আগে ছোড়দাদু আর পদুজ্যাঠা কেষ্টকে অনেক ভালো ভালো উপহার তো দিয়েছিলেনই, উপরন্তু সেই প্রশ্নোত্তরের তালিকাটি, আর সেটি পড়াবার জন্য সোনামণির বাবাকে কেষ্টর বাড়ির মাস্টার করে দিয়েছিলেন এবং কেষ্টর নির্বন্ধাতিশয়ে সোনামণিকে ক্ষমা করেছিলেন।

এইসব ঘটনার পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। কেষ্ট আর সোনামণি নিখিল ভারত বৃক্ষপ্রকল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় স্থায়ী কর্মী। পাশ করে অবধি বৃক্ষের কাজ নিয়েই ওরা মেতে আছে। বাংলার গৌরব বলা যায় ওদের। দু'জনের বাড়িতে দুটি সিকি-ভোজ-খাওয়া অতি-বেড়ালকে খেলতে দেখা যায়। স্মৃতিচিহ্ন এরা।

□ ১৯৮৩





চৌহান গুম্ফার দেওতা

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

ডাক্তারি পাশ করার পর মণিময় কোথায় বসে প্র্যাকটিস শুরু করবে এ-নিয়ে একটা সমস্যা বাধল। বাড়ির সকলের ইচ্ছে কলকাতাতেই বসুক। বাড়িতে একটা ডাক্তার থাকা ভালো। নতুন ডাক্তার হলেও ছোটখাটো এটা-ওটা ব্যাপারে সুবিধা অনেক। তাছাড়া কলকাতাই হচ্ছে টাকা কামাবার জায়গা। একবার পসার জমিয়ে ফেলতে পারলে তখন আর তোয়াক্কা কিসের ? পৈতৃক বাড়ি তো একটা আছেই, হয়তো আরও দু-একটা হবে। গাড়ি হবে, ফ্রিজ হবে, আরও কত কী। আপাতত নিচেকার কোণের ঘরটায় একটা মেসোনাইটের পার্টিশন করে নিলেই দিব্যি চেম্বার তৈরি হয়ে যাবে। তারপর সাজিয়ে গুছিয়ে বসতে পারলে রোগী আসতে কতক্ষণ ?

মণিময়ের মেসোমশাই জোর দিয়ে বললেন, 'শুধু রুগী ? রুগীর বাপ আসতে পথ পাবে না দেখে নিও। ও যা তুখোড় ছেলে !'

বন্ধুরা বলল, 'এখানে কেন বসে বসে পচবি ? পসার জমাতে দশটি বছর ধরে রাখ। তার চেয়ে মিলিটারিতে নাম লেখা—একেবারে কমিশন্ড র‍্যাঙ্ক দিয়ে শুরু করবি। পাঁচ-সাতশো টাকা তো তখন হাতের ময়লা !'

মণিময়ের কিন্তু কোনওটাই মনঃপূত হল না। নতুন নতুন দেশ দেখে বেড়ানো ওর একটা বহুদিনের শখ। কলকাতায় গেড়ে বসলে আর বেরুবার উপায় থাকবে কি ? আর প্রাইভেট প্র্যাকটিস একবার জমে উঠলে ছুটিছাটার প্রশ্নই উঠবে না। তার চেয়ে দূরে কোনও একটা জায়গায় কোনও হাসপাতালে চাকরি নিতে পারলে মন্দ হয় না।

অবশেষে মণিময় খবরের কাগজের 'ওয়ান্টেড' কলম দেখে দেখে এখানে ওখানে দরখাস্ত ছাড়তে শুরু করল। কোনও কোনও জায়গা থেকে সাড়াও যে এল না এমন নয়, কিন্তু জায়গাটাও তো পছন্দ হওয়া চাই ! এমন সময় হঠাৎ একদিন এক টেলিগ্রাম এসে হাজির : 'এক্ষুনি এসে কাজে যোগ দিন। ইন্টারভিউয়ের প্রয়োজন নেই। টি এম ও-তে আসবার খরচ পাঠানো হচ্ছে।'

টেলিগ্রামখানা এসেছে সুদূর রাজস্থান থেকে। পাঠিয়েছেন পচাসগড় স্টেটের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি। মহারাজা তাঁর রাজধানীতে সম্প্রতি যে-নতুন হাসপাতাল তৈরি

করিয়েছেন এবং স্বর্গীয় মহারানীর নামে যাকে নামাঙ্কিত করা হয়েছে, সেই হাসপাতালের ভার নেওয়ার জন্য একজন ডাক্তারের প্রয়োজন। ও-অঞ্চলে বাঙালি ডাক্তারের খুব সুনাম। কবে কোন্ আদ্যিকালে কোন বাঙালি ভদ্রলোক ভাগ্যান্বেষণে ওই সুদূর অঞ্চলে গিয়ে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন এবং ওই শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়ে শুধু ওখানকার জনচিত্তই হরণ করেননি, সমস্ত বাঙালি জাতটাকেই ওদেশবাসীর কাছে সম্মানাস্পদ করে দিয়ে গেছেন। তাই মহারাজার নির্দেশ—'বংগালি ডাগ্‌দর' পেলে যেন আর অন্য কোনও দেশের লোককে না নেওয়া হয়। যে-ক'খানি দরখাস্ত পড়েছিল তার মধ্যে মণিময়ের দরখাস্তখানাই ছিল একমাত্র বাঙালির। তাই এই জরুরি তলব।

বাড়িতে দু-একজন আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু মণিময় তাতে বিশেষ কান দিল না। তা ছাড়া মাইনেটাও ছিল বেশ ভদ্রগোছের। আর নতুন দেশ দেখার প্রলোভন তো ছিলই।

দীর্ঘ পথ পার হয়ে মণিময় যথাসময়ে এসে তার নতুন কাজে যোগ দিল। নামে রাজধানী হলেও এবং সে-নামের সঙ্গে পঞ্চাশটা গড়ের উল্লেখ থাকলেও শহরটি নেহাতই ছোট। শহরই হয়তো বলা চলে না ওকে। তবু হালে নতুন মহারাজার উৎসাহে ওটাকে একটু আধুনিক করার চেষ্টা হচ্ছে। স্কুল, লাইব্রেরি, ডাকঘর, হাসপাতাল ইত্যাদি সবই আছে। কলেজ অবশ্য এখনও হয়নি, তবে তেমন সংখ্যক ছাত্র পেলে তাও একটা খোলবার ইচ্ছে আছে।

শহর বড় না হলেও প্রাকৃতিক দৃশ্য কিন্তু এখানকার অপরূপ। রাজস্থান মরুভূমির দেশ, কিন্তু পচাসগড়ের আশপাশ ঘিরে শ্যামল বনভূমিরও অভাব নেই। আর পাহাড়ের সংখ্যা তো অগুন্তি। যেদিকে চাওয়া যায় সেদিকেই পাহাড়। কোনওটা একেবারে কাছে, মনে হয় দু'পা এগোলেই গিয়ে ছোঁওয়া যাবে। আবার কোনওটা ঝাপসা মেঘের মতো, দূর আকাশের গায়ে লেপটে আছে যেন। মোটের ওপর জায়গাটা ভারি ভালো লেগে গেল মণিময়ের।

অধিবাসীরা অবশ্য সকলেই রাজস্থানি। কিছু আদিবাসী আছে—ভিল ও অন্যান্য খণ্ড জাতের। তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। অল্প কয়েকজন গুজরাটি এবং সিন্ধিও আছে। তারা সবাই ব্যবসায়ী। কিন্তু বাঙালি আছে মণিময় ছাড়া মাত্র একটি পরিবার: স্থানীয় ডাকঘরের পোস্টমাস্টার। তা তিনিও বহুদিন ধরে এদেশে বাস করে করে অনেকটা এদেশিদের মতোই হয়ে গেছেন। তবে বাংলা ভুলে যাননি। লোকটি খুব আলাপী। প্রথম দিনই এসে যেচে বাড়ি বয়ে আলাপ করে গেছেন এবং রবিবার দুপুরবেলা খাবার নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করে গেছেন। বলেছেন, এখানে তো কারও সঙ্গে বাংলায় বাতচিত করার ফুরসত মেলে না, তাই একজন খাস বংগালিকে পেয়ে মাস্টারমশায়ের গৃহিণীই কথা বলার জন্য খুব উৎসুক হয়ে উঠেছেন। মণিময় মেহেরবানি করে গেলে তাঁরা সত্যিই বড় খুশ হবেন।

প্রথম কয়েকটা দিন হাসপাতালের কাজকর্ম বুঝে নিতে একরকম করে কেটে গেল। অবশ্য এ-ব্যাপারে কম্পাউন্ডারজীও প্রচুর সাহায্য করলেন। তিনি স্থানীয় লোক, বয়েসেও কতকটা প্রবীণ। কাজেই মণিময়ের কোনও অসুবিধা হল না। নার্স যে-ক'জন ছিল, কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ না হলেও কাজ শেখার উৎসাহ দেখা গেল সকলেরই। তাছাড়া কাজের দায়িত্ব সম্বন্ধে তারা বেশ সচেতন মনে হল। সুতরাং মণিময়ের কাজ দু'দিনেই বেশ হালকা হয়ে এল এবং কয়েকদিন পরেই বিকেলের পর বেশ খানিকটা অবসরও মিলতে লাগল।

মণিময় এ-সময়টুকু যতদূর সম্ভব ভ্রমণের কাজে খরচ করতে লাগল। এ-অঞ্চলে

বেড়ানোর জায়গার অভাব নেই। পাহাড় আর বন একত্র ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে রুক্ষতাও যে নেই তা নয়, কিন্তু সে যেন সৃষ্টিতে খানিকটা বৈচিত্র্য আনার জন্যই।

রোগীর সংখ্যা এখনও তেমন বাড়েনি। হাসপাতালের অনেক বেড খালিই পড়ে থাকে। আউটডোরের রোগীই বেশি। তারা সকালের দিকেই আসে। অনেককেই দূরের গাঁ থেকে আসতে হয়, ফলে বিকেলে এলে সেদিন আর ঘরে ফেরা সম্ভব নয়। সুতরাং বিকেলের দিকে কাজ থাকে না বললেই চলে।

এ-অঞ্চলে যাতায়াতের বাহন হিসাবে এখনও পর্যন্ত সাধারণত ঘোড়াই ব্যবহার করার রেওয়াজ। মণিময়েরও বাহন একটি সুপুষ্ট টাট্টু। হাসপাতাল থেকেই সেটি তাকে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য বড় ঘোড়াও ছিল, কিন্তু মণিময়ই সাহস করে নেয়নি। বাঙালির ছেলে, ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস কোনওদিনই ছিল না। এখন দায়ে পড়ে চড়তে হচ্ছে। কী জানি, বড় ঘোড়া নিলে যদি শেষ পর্যন্ত সামলাতে না পারে! কম্পাউন্ডারজী অবশ্য অভয় দিয়েছিলেন এবং ডক্টর-সাহাবের ভয়ের কথা শুনে নার্সরাও নাকি আড়ালে হেসেছিল, কিন্তু তবু মণিময়কে বিচলিত করা যায়নি।

তা টাট্টুটি ভালোই। মণিময়ের বেশ পোষ মেনে গেছে ক'দিনেই। মণিময় আদর করে তার নাম রেখেছে চৈতক। রানা প্রতাপের দেশের ঘোড়া তো! এই 'নবচৈতকের' পিঠে চড়ে মণিময় এখন নিশ্চিন্ত মনে দূরদূরান্তরে টহল দিয়ে বেড়ায়। ঘোড়া কদমে ছুটলেও ঘাবড়ায় না।

সন্ধের পর পোস্টমাস্টার মশাই নীলিবাবু (আসল নাম নীলরতন ভাদুড়ি) প্রায় রোজই আসেন। মাঝে ম্যাঝে স্থানীয় দু-চারজন মাতব্বর লোকও আসেন। নানা গল্প হয়। মণিময় চায়ের জোগাড় রেখেছে। চা খেয়ে সবাই খুব খুশি।

মণিময় প্রায় রোজই তার ভ্রমণকাহিনী শোনায়। নতুন কিছু দেখলে তার সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়।

সেদিনও এইরকম গল্প চলছিল।

'আজ কোথায় ঘুমে এলেন?' পোস্টমাস্টার প্রশ্ন করলেন।

'ঘুমে' মানে ঘুমিয়ে নয়, ঘুরে। মণিময় এসব ভাষায় এখন বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। সে জবাব দিল, 'আজ একটা নতুন পাহাড় দেখলাম। আজ একটু দূরে প্রায় ক্রোশ তিনেক পথ চলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি জঙ্গলেরই মাঝখানে একটা অদ্ভুত ধরনের পাহাড়। পাথুরে পাহাড়—পাথরের রঙটা প্রায় কালো, ওপরে গাছপালাও খুবই কম, লম্বা পাহাড়টা এঁকেবেঁকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। তার একদিকটায় জঙ্গল চোখে পড়ল, কিন্তু সামনের দিকটা শুকনো খটখটে—গাছপালা নেই বললেই চলে। আর—'

'অওর ঘুমে একঠো গুম্ফা ভি জরুর দেখা?' স্থানীয় শ্রোতাদেরই একজন অসমাপ্ত কথাটা শেষ করে দিলেন।

নীলিবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। পাহাড়ের মুখের কাছে হলেও 'গুম্ফা' মানে গোঁফ নয়, গুহা।

'পাহাড়ের মুখে নিশ্চয়ই একটা বড় গুহা লক্ষ করেছেন?'

'হ্যাঁ, মনে হল গুহাই বটে। তবে ঘোড়ার ওপর থেকেই দেখেছি তো, ভালো করে লক্ষ করা হয়নি।'

পূর্বোক্ত শ্রোতাটি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'সাচ বাত, সাচ বাত!'

নীলিবাবু বললেন, 'ওই পাহাড়টার গল্প আগে আপনাকে বলা হয়নি। ওই পাহাড়টিকে এখানকার লোকেরা বলে চৌহান পাহাড়, হয়তো একসময়ে এদিকে চৌহান বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন, নামটা তাঁরাই দিয়ে থাকবেন। কিন্তু ওই পাহাড়ের চেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে ওর ওই গুহাটি। পাহাড়ের নাম থেকে ওরও নাম হয়েছে চৌহান গুম্ফা। প্রবাদ—প্রবাদ কেন, এ-অঞ্চলের সকলে পরীক্ষা করে দেখেছে, ওই গুহার অধিষ্ঠাতা হচ্ছেন এক দেওতা—যিনি নাকি ত্রিকালজ্ঞ। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কিছুই তাঁর অজানা নয়। গুহায় ঢুকে দেবতাকে পুজো দিয়ে খুশ করতে পারলে তিনি ভক্তকে দৈববাণী দিয়ে তার তকলিফ দূর করে দেন।'

মণিময় শুনে অবাক হয়ে গেল। বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

নীলিবাবু বললেন, 'আপনারা একালকার লেখাপড়া-জানা ছোকরা, হয়তো এসব কথা বিশোয়াস করতে চাইবেন না। কিন্তু যা বলছি সব ঠিক—বিলকুল সত্যি।'

স্থানীয় ভদ্রলোক দু'জনও মাথা নেড়ে সায় দিলেন, 'হুঁ, সাচ বাত, সাচ বাত।'

তারপর নীলরতনবাবু যা বলে গেলেন তার ভাবার্থ এইরকম : চৌহান গুম্ফার দেবতা বড় জাগ্রত দেবতা, কত শত বছর ধরে তিনি ওইখানে অধিষ্ঠান করছেন কেউ বলতে পারে না। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা বলেন, তাঁদের ঠাকুরদা'দের মুখে তাঁরা ওই দেবতার কাহিনী শুনেছেন। তাঁরা আবার শুনেছেন তাঁদের ঠাকুরদা'দের কাছে। এইভাবে পুরুষ পরম্পরায় একই কাহিনী শুনে এসেছেন তাঁরা। কিন্তু শোনাই নয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়েছেন হাতেনাতে বহুবার। যখনই কেউ বিপদে পড়ে, গুহার মুখে গিয়ে দেবতার পূজা দেয়। তারপর মনের কথা—দেবতাকে যা বলবার তা ওইখানে দাঁড়িয়েই বলে যায়। তখন আশেপাশে কারও থাকবার নিয়ম নেই। দেবতাকে যা বলবার তা একমাত্র দেবতাই শুনবেন। বাইরের লোকের তা শোনা মহাপাপ। ফলে মনের যে-কোনও গোপন কথা, গোপন পাপের কথা নির্বিচারে উচ্চারণ করতে বাধা নেই। দেবতা শোনেন সেই কথা—সেই পাপের কথা। তারপর প্রায় এক মিনিট চুপ করে থাকেন। শেষে তাঁর দৈববাণী শোনা যায়। প্রথমটা পাপের জন্য হয়তো ভর্ৎসনা করেন। তারপর, যদি প্রসন্ন হন, সংক্ষেপে বলে দেন কী করতে হবে। আর আশ্চর্য, দেবতার সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললে সমস্ত বিপদ, কেটে যায়। এসব তাঁদের প্রত্যক্ষ দেখা। কারণ কত দূর-দেশ থেকেও কত লোক আসে তাদের পাপের অনুশোচনা জানাতে। দেবতার দৈববাণী শুনতে, তাঁর আদেশ নিতে। অবশ্য সকলেই যে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করতে পারে তা নয়। কিন্তু তার জন্য তো দেবতা দায়ী নন।

সঙ্গের ভদ্রলোকদের একজন যোগ করলেন, শুধু তাই নয়, এখানকার রাজপরিবারের লোকদেরও ওই চৌহান গুম্ফার দেবতার প্রতি প্রবল ভক্তি। স্বর্গীয় মহারাজ ফতে সিং তো বাবার নিত্য পূজার জন্য আলাদা টাকারই ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। প্রত্যহ সেই বরাদ্দ থেকে বাবার জন্য ফলমূল, মিষ্টি, নৈবেদ্য, আরও কত কীদেওয়ারব্যবস্থা আছে। তাছাড়া ভক্তরাও নিয়ে আসে অনেক কিছু।

তবে সব কিছুই হয় দিনের বেলা। 'সাম' হলে পরে সবাই চলে যায়। তখন এই পাহাড়ের মধ্যে থাকা দেবতারই নিষেধ।

'গুহাটা খুব বড় বুঝি ? খুব লম্বা ?'

'ওরে ব্বাবা, বহুৎ, বহুৎ। গুহা না বলে সুড়ঙ্গ বললেই ঠিক বলা হয়। একবার একদল ভক্ত বাবার সঙ্গে মুলাকাত করবে বলে গুহার ভেতর দিয়ে মশাল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু প্রায় এক মাইল পার হয়েও তার কোনও অন্ত পায়নি। শেষে ভয় পেয়ে চলে আসে। কে জানে কোথায় ওর শেষ। পাহাড়টাও তো বহুৎ বহুৎ লম্বা।'

'পাহাড়টার ওদিকটায় কী আছে ?'

'সে কেউ জানে না। ভয়ানক জঙ্গল ওদিকটায়। শের-উর থাকাও বিচিত্র নয়। সেখানে কে যাবে ? কার অত সাহস ?'

মণিময়ের ভারি কৌতূহল হল। বলল, 'আচ্ছা, এরপর যেদিন কেউ দেবতার কাছে নিবেদন করতে যাবে, আমাকে বলবেন, আমিও যাব। দেখে আসব।'

'দুসরা লোক তো তখন থাকা বারণ। তবে হ্যাঁ, আপনার নিজের কোনও মনস্কামনা থাকে তো আপনি একা গিয়ে বলবেন। বাবা খুশ হলে জরুর আপনাকে পথ বাতলিয়ে দেবেন।'

রবিবার দুপুরে বিশেষ কোনও কাজ ছিল না। মণিময় ভাবল একটা লম্বা ঘুম দিয়ে নেবে। তারপরই মনে পড়ল অনেকগুলো চিঠি জমে আছে, জবাব দেওয়া হচ্ছে না। না ঘুমিয়ে আজ বরং সে-কাজটাই সেরে ফেলা যাক। বিশেষ করে সমীরণকে একটা চিঠি না দিলেই নয়।

সমীরণ মণিময়ের বাল্যবন্ধু এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফিজিক্সের ছাত্র। সম্প্রতি একটা প্রাইভেট কলেজে প্রফেসারি নিয়েছে। ভারি দিলদরিয়া তার মেজাজ, আর কোনও কিছুতে ভয়-ডর নেই। তার ওপর দেশভ্রমণের নেশা তারও প্রবল।

বেশ একটা লম্বা চিঠিই লিখে ফেলল মণিময় সমীরণকে। চিঠির শেষে লিখল : 'দেশ বেড়াতে ভালোবাসিস, কিন্তু আমি যেখানে আছি এরকম জায়গায় বোধহয় কখনও আসিসনি। সামনের ছুটিতে চলে আয় না! দেখবি, প্রকৃতির বৈচিত্র্য কাকে বলে। পাহাড় আর ময়দান, জঙ্গল আর মরুভূমি যেন জায়গাটা দখল করবার জন্যে পাল্লা দিয়ে চলেছে। লোকগুলোও তেমনই। কতক ব্যবসাবুদ্ধিতে ধুরন্ধর, কতক একেবারে সেই আদিম যুগের সরলতার প্রতিমূর্তি। কথাবার্তায়, চালচলনে—সব কিছুতে। তাছাড়া এখানকার খণ্ড জাতিদের রীতিনীতিও অদ্ভুত। যত দেখবি ততই অবাক লাগবে। আর সবচেয়ে অবাক-করা জিনিস দেখবি এখানকার চৌহান গুম্ফা—যার কথা তোরা, বিজ্ঞানীরা, হয়তো বিশ্বাস করতেই চাইবি না। কিন্তু আমি নিজে সেদিন গিয়ে পরীক্ষা করে দেখে এসেছি—একেবারে সত্যি।'

এইটুকু লিখে তারপর মণিময় চৌহান গুম্ফার কাহিনী বেশ বিশদ করে গুছিয়ে জানাল। শেষে লিখল, 'তোর তো এখন কোনও ঝক্কি নেই। কলেজ বন্ধ হলেই চলে আয় না। তোদের তো বছরে ছ' মাসই ছুটি।'

কিন্তু চিঠি পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই যে সমীরণ সত্যি সত্যি চলে আসবে, মণিময় তা ভাবতে পারেনি। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন এল, তখন আর তার আনন্দ ধরে না। এখানে, হাজার হোক, সবাই স্বল্পপরিচিত। যতই খোশগল্প কর না কেন—যাকে বলে প্রাণ খুলে কথা বলা—তা আর হয় কই ? এইবারে সে-দুঃখ ঘুচবে।

সমীরণ একাই এল বটে, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এল দুটো ভারি ভারি সুটকেস।

'এত বড় বড় দুটো সুটকেস বয়ে নিয়ে এসেছিস কেন ? রাজ্যের সরঞ্জাম সব সঙ্গে করে এসেছিস বুঝি ?'

'তা এনেছি। আমার সরঞ্জাম মানে তো বই। ভাবলাম, যখন যাচ্ছি পুরো ছুটিটাই

কাটিয়ে আসব। আর, সত্যি বলতে কি, কলকাতায় বসে পড়াশুনো একদম হচ্ছিল না। তাই বইও নিয়ে এলাম যতগুলো পারি। বেড়াবার ফাঁকে ফাঁকে বাকি সময়টা বই নিয়ে কাটানো যাবে। তুই তো হাসপাতাল নিয়ে ব্যস্ত থাকবি, তখন আমি কি করব ?'

আরও একটা টাট্টু ঘোড়ার ব্যবস্থা করে নিল মণিময়—সমীরণের জন্য। ঘোড়ায় চড়া সমীরণের অল্পস্বল্প অভ্যাস ছিল আগেই। একদিনের চেষ্টাতেই সে রীতিমত পোক্ত হয়ে উঠল।

'ঘোড়ার একটা নাম রাখ।' বলল মণিময়।

'নাম ? বেশ তো ! তোর তো চৈতক, আমি আর এক কাঠি এগিয়ে যাই। আমার ঘোড়ার নাম হোক উচ্চৈঃশ্রবা। উচ্চারণ করতে একটু খটমট লাগবে ? তা লাগুক। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের ঘোড়ার নাম তো, একটু খটমট হবেই। তবে ওর চেয়েও কত খটমট ল্যাটিন নাম আমাদের মুখস্থ করতে হয়। উচ্চৈঃশ্রবা তো তার কাছে ডালভাত !'

দু'দিন যেতে না যেতেই সমীরণ প্রস্তাব করল, 'চল, এবার তোর সেই গুম্ফা দেখে আসি। সেই যেখানে তোদের দেবতা না দেওতা বসে বসে ভোগ খাচ্ছেন আর থেকে থেকে দৈববাণী ছাড়ছেন।'

তার কথার সুরে কৌতূহলের চাইতে অবিশ্বাস এবং উপহাসের ভাবটাই যেন বেশি।

মণিময় বলল, 'না রে, আমিও গোড়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলাম ব্যাপারটা, গেঁয়ো কুসংস্কার ভেবে। কিন্তু একদিন নিজে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতেই মত বদলাতে হল। সত্যি, অদ্ভুত ! যুক্তি দিয়ে এর কোনও ব্যাখ্যা করতে পারিনি। তাছাড়া, পৃথিবীর কতটুকু আমরা জানি ? সব কিছুকেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কত অঘটন তো এখনও ঘটে, যার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই দেওয়া যায় না।'

সমীরণ যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ তো, কাল রোববার, কালই চল না হয় !'

পাহাড়ী পথে দুটো টাট্টু খটখট করে ছুটে চলেছে। ঘোড়সওয়ার দু'জনেই বাঙালি এবং দু'জনেই বয়েসে তরুণ।

চারদিকের দৃশ্য নয়নাভিরাম। এক জায়গায় একঝাঁক বনময়ূর স্বচ্ছন্দচিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একসঙ্গে এত ময়ূর ওরা কোনওদিন দেখেনি। কোথাও বা পথ একদম ফাঁকা। দু'পাশে শুধু রুক্ষ পাথরের ঢিবি, একটা কাঁটাঝোপও নেই। তারপর খানিক পরেই আবার হয়তো শুরু হল অল্প অল্প জঙ্গল।

বেশ কয়েক মাইল পার হয়ে আসবার পর অবশেষে দূরে চৌহান পাহাড়ের রুক্ষ কালো মূর্তি চোখে পড়ল। লম্বা পাহাড়ের শ্রেণী এঁকেবেঁকে চলে গেছে জঙ্গলের দিকে, মাইলের পর মাইল—কত দূর কে জানে !

খানিক পরেই ওরা পাহাড়ের সামনে এসে পৌঁছল। ঘোড়া দুটো ততক্ষণে বেশ ঘেমে গেছে। মণিময় বলল, 'এবার নেমে পড়া যাক। এটুকু পথ হেঁটেই যাওয়া যাবে।'

দুটো গাছের সঙ্গে ঘোড়া দুটো বেঁধে দু'জনে এগিয়ে চলল।

পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখা গেল, সত্যি ওর মুখের কাছেই একটা বড় গহ্বর। এইটেরই নাম গুম্ফা। দু'জনে সেই গুম্ফার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তখনও সূর্যের আলো একেবারে নিভে যায়নি, তবে বেলা পড়ে আসছে। মণিময় বলল, 'সন্ধের পর এখানে থাকবার নিয়ম নেই। তাড়াতাড়ি চল।'

'কার নিয়ম ? কে বানাল ?'

'তোর খুঁতখুতোনি এখনও গেল না দেখছি। সায়েন্স পড়লেই কি মানুষ ওইরকম নাস্তিক হয়ে পড়ে ? কিন্তু কই, জগদীশ বোস তো হননি। তাঁর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ফটকে কপারপ্লেটের ওপর তিনি নিজে হাতে লিখে গেছেন : "দেবতার নামে এই মন্দির উৎসর্গ করিলাম।" আর তুই তো জগদীশ বোসের চাইতে বড় বিজ্ঞানী নয় ! কিন্তু বাজে কথা বাদ দে। দেখবি তো তাড়াতাড়ি দেখে নে।'

সমীরণ বলল, 'চল, ভেতরটা ভালো করে দেখি। ওখানেই তো পুজো দিতে হয়। ওটা নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ জায়গা নয়।'

ভেতরে একটা জায়গা বেশ চওড়া। সামনে একটা বেদির মতো। তাতে সিঁদুর-চন্দন লেপা। ফুল-বেলপাতাও পড়ে আছে কিছু। মণিময়ও পকেটে করে দুটো ফুলের মালা নিয়ে এসেছিল। মালা দুটো সেইখানে রেখে সে হাত জোড় করে প্রণাম করল। তার দেখাদেখি সমীরণও এবার প্রণাম জানাল দেবতার উদ্দেশে। তারপর, একটু যেন ইতস্তত করে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'দেওতা, মুঝ পর করুণা কীজিয়ে।'

এক মিনিট সব চুপ। তারপরই হঠাৎ সেই গহ্বরের মুখ কম্পিত করে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব এল, 'মন্‌বাঞ্ছা পূরণ হোগা।'

মনে হল সেই গম্ভীর শব্দে সমস্ত গহ্বরের মুখ যেন আরও খানিকক্ষণ থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এমনটা সমীরণ ভাবতেই পারেনি।

খানিক পরে সমীরণ যেন সংবিৎ ফিরে পেল। সে আবার পাগলের মতো বেদির সামনে গিয়ে বলল, 'বহুৎ মেহেরবানি দেওতা ! ম্যাঁয় পাপী হুঁ। মেরা মুক্তি ক্যায়সে ?'

আবার মিনিটখানেক সব চুপচাপ। তারপর আবার সেইরকম গম্ভীর শব্দে গুহার মুখ প্রকম্পিত করে শব্দ এল : 'জপ কর, তপ কর।' তারপর আর কিছু না। সমীরণ ফের কী বলতে গেল। কিন্তু দেবতা এবার নিরুত্তর। তাঁর যা আদেশ তা তিনি দিয়ে দিয়েছেন।

দু'জনেই তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছে। সত্যি, এ তো মানুষের গলা বলে মনে হয় না ! ওরকম জলদগম্ভীর, গুহা-কাঁপানো শব্দ কি মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরোতে পারে ? কখনওই না !

তাছাড়া আশেপাশে জনপ্রাণীর কোনও সাড়াশব্দও নেই। গুহার মধ্যে কেউ লুকিয়ে আছে ? অসম্ভব। সমীরণ পকেট থেকে তীব্র শক্তিশালী একটা আট-ব্যাটারির টর্চ বার করে পাগলের মতো এগিয়ে চলল গুহার ভেতর দিয়ে। অগত্যা মণিময়ও ছুটল তার সঙ্গে।

গুহা তো নয়, ঠিক যেন সুড়ঙ্গ। কিন্তু চলেছে এঁকেবেঁকে। কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে—যেমনভাবে বাইরেও পাহাড়টা এঁকেবেঁকে চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। প্রায় দশ-বারো মিনিট হেঁটেও কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সমীরণ টর্চ দিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল আনাচে কানাচে। না, কেউ নেই। কোথাও নেই। সব হু-হু করছে ফাঁকা।

মণিময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রায় আধ মাইল হাঁটা হল বোধহয় গুহার ভেতরে। এখান থেকে যদি শব্দ না এসে থাকে তবে আর কোত্থেকে আসবে ? চল, এবার ফিরে যাই। সন্ধের আগে যেভাবে হোক বেরোতেই হবে।'

সমীরণের কণ্ঠে এখন আর কোনও অবিশ্বাসের ছাপ নেই। সে শান্ত গলায় অভিভূতের মতো বলল, 'হ্যাঁ, চল।'

সারারাত ছটফট করছিল সমীরণ। রাতে ঘুম এল না একেবারে। এ কী কাণ্ড! সত্যিই কি

দেবতা তাকে অভয় দিলেন ? কী তার মনোবাঞ্ছা নিজেই সে জানে না। জপ-তপ করবে ? কিন্তু কী করবে ? ওসবে তার কোনওদিনই বিশ্বাস নেই। ছেলেবেলায় পড়ত : 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'—ছাত্রদের তপ হচ্ছে অধ্যয়ন। কিন্তু সে তো আর এখন ছাত্র না! অধ্যাপকদের তপও কি তবে অধ্যাপনা ? নাকি···নাঃ, সে আর ভাবতে পারছে না।

সকালে চা খাওয়ার পর মণিময় বলল, 'তুই তো এখন বই নিয়ে বসবি। আমি যাই, হাসপাতালটা ঘুরে আসি। সোমবার অন্যদিনের চাইতে রুগী আবার একটু বেশি আসে।'

'নাঃ, আজ আর পড়তে ভালো লাগছে না। আমিও একটু ঘুরে আসি। পথঘাট তো চেনা হয়ে গেছে। তাছাড়া হাঁটবারও প্রয়োজন নেই। ঘোড়ায় চড়া বেশ রপ্ত হয়ে গেছে আমার।'

'হ্যাঁ, তোর উচ্চৈঃশ্রবা আমার চৈতকের চেয়েও প্রভুভক্ত।'

সমীরণ আজ আর রসিকতার কোনও জবাব দিল না। তার অন্যমনস্ক ভাবটা তখনও কাটেনি।

সমীরণ ফিরল বেশ বেলা করে। মণিময় তার আগেই হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে।

'কোথায় ছিলি এত বেলা অবধি ? এঃ, ধুলোয় যে সারা শরীর মাখামাখি হয়ে গেছে!'

'সকালের রোদে আবার সেই চৌহান পাহাড়টা দেখে এলাম। বাইরে কতটা লম্বা মেপে দেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু প্রায় তিন মাইল গিয়েও ওর শেষ পেলাম না। ওর ওধারটা এত জঙ্গল যে, এগুনোও গেল না আর।'

সন্ধেবেলা নীলরতনবাবুরা এলেন। আজ শুধু চৌহান পাহাড় নিয়েই ওদের গল্প হল। কত বিস্মৃত ঘটনা, কত অলৌকিক ঘটনা—একে একে বলে গেলেন নীলিবাবু। তাঁর সঙ্গী সেই রাজস্থানি ভদ্রলোকটিও সেদিনকার মতো থেকে থেকে সায় দিলেন : 'সাচ বাত, সাচ বাত।' ওঁদের কাছে জানা গেল চৌহান গুম্ফার দেওতা শুধু রাজস্থানিদের কাছেই নমস্য নন, ওখানকার আদিবাসীরাও তাঁকে ঠিক ভগবানের মতো মান্য করে। ওরা বলে, 'তিমডি দেবতা।' কথাটা সম্ভবত ত্রিমূর্তি থেকে এসেছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এঁরাই কি সেই ত্রিমূর্তি ? নাকি শিবেরই তিনটে রূপ ?

সমীরণ কিন্তু পরদিনও সকালবেলা বই নিয়ে বসতে পারল না। একটু বেলা হতেই উসখুস করতে লাগল। তারপর একফাঁকে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সেদিনও সে ফিরল অনেক দেরি করে।

পরপর তিন-চারদিন এইরকম ঘটল। মণিময় ঠাট্টা করে বলল, 'কী হল তোর ? নাস্তিক যখন আস্তিক হয় তখন তার এইরকমই হয় বুঝি ? বেশ আছি বাবা আমরা। ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করে এসেছি বরাবর। কোনও অনিদ্রা ব্যাধি ধরেনি। কিন্তু, সত্যি, কী হল তোর বল তো! কোনও সাধু-সন্নিসীর সাক্ষাৎ পেয়েছিস ? এবার দীক্ষা-টিক্ষা নিবি নাকি ?'

সমীরণ অন্যমনস্কভাবে বলল, 'সত্যিকার সাধুর দেখা পেলে দীক্ষা নিতে দোষ কি ?'

মণিময় এ-জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। একটু থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

কিন্তু পাহাড়টা একবার ঘুরপাক খেয়ে আসতেই হবে। যেভাবে হোক। যদি সত্যি দেবস্থান হয় তবে তো পাহাড় পরিক্রমায় অখণ্ড পুণ্য সঞ্চয়। যেমন হয় কৈলাস পাহাড় পরিক্রমা করলে। আর যদি তা না হয় ?

নাঃ, সমীরণ মহাসমস্যায় পড়েছে। তার ফিজিক্স কোথায় তলিয়ে গেছে। ফিলসফি এসে তাকে হটিয়ে দিচ্ছে যেন। কিন্তু ফিলসফিই বা বলা কেন ? এ যেন তার চেয়েও

বেশি। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় যোগীরা হয়তো এরই সন্ধানে সংসারকে তৃণের মতো তুচ্ছ জ্ঞান করে বেরিয়ে এসেছেন।

কিন্তু একটা থিওরি তখনও তার মাথায় থেকে থেকে উঁকি মারছিল। সেইটেই সে একবার শেষবারের মতো পরখ করে দেখতে চায়।

তাই পরদিন আবার ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সমীরণ। আজ খুব ভোরে। চা খাওয়া পর্যন্তও অপেক্ষা করল না।

কাল সে দেখেছে মাইল তিনেক যাওয়ার পর একটা ঘাস-গজানো অস্পষ্ট রাস্তা পাহাড়ের পাশ থেকে বেরিয়ে কোনাকুনিভাবে চলে গেছে। নেহাতই পায়ে চলা সরু রাস্তা। আর সে রাস্তা যে কালেভদ্রে ছাড়া ব্যবহার করা হয়, এরকম মনে হয় না। তাছাড়া সে-রাস্তা ধরে এগোলে পাহাড় থেকে আরও দূরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবু মনে হয়েছিল, ও-পথটায় বোধহয় তত জঙ্গল নেই। আজ সে তাই এদিকটাই ঘুরে আসবে ঠিক করেছিল। তাই একটু তাড়াতাড়ি বেরোনো দরকার। আজ সে যাওয়ার সময় পিঠে বন্দুকটাও বেঁধে নিয়েছে। একেবারে জনহীন অজানা জায়গা। কোনও বুনো জানোয়ার সামনে পড়লে আত্মরক্ষার জন্যও সেটা দরকার।

সেই নতুন উলটোমুখী পথটা খুঁজে বার করতে আজও তেমন কষ্ট হল না। উচ্চৈঃশ্রবাকে ঠিকমত দানাপানি খাওয়ানোয় তার মেজাজটাও ভালো ছিল। সে সওয়ারকে নিয়ে নতুন রাস্তায় জোর কদমেই চলতে লাগল। প্রায় মিনিট পনেরো চলবার পর দেখা গেল পথটা আবার বেঁকে পাহাড়ের দিকেই মোড় নিয়েছে। সমীরণ খুশিই হল দেখে।

হ্যাঁ, সত্যি তাই। একটু বাদেই পথটা একেবারে চৌহান পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলতে লাগল। আর আশ্চর্য, এদিকটায় জঙ্গল প্রায় নেই বললেই চলে। আরও মাইল দুই যেতেই দেখা গেল পাহাড়টা ঢালু হতে হতে একসময়ে সমতলভূমিতে ঠেকেছে। অর্থাৎ ওইখানেই তার শেষ। সমীরণ আবার খুশি হল। তাহলে পাহাড়টা পরিক্রমা করা হয়তো অসম্ভব হবে না।

এবারে পাহাড়টা চক্কর দিয়ে উলটো দিকে চলতে লাগল সমীরণ। অর্থাৎ শহরের দিকে। যদিও শহর ওখান থেকে বহুদূর। মাঝে মাঝে পথ একেবারে মুছে গেছে, মাঝে মাঝে জঙ্গলও আসছে, কিন্তু ঘোড়া চালাবার পক্ষে একেবারে অসম্ভব জায়গা নয়।

দূরে চারদিকে ধু-ধু করছে রাজস্থানের মরুপ্রান্তর। আশেপাশে দু-চার ক্রোশের মধ্যে মানুষ তো ছার, কোনও জীবিত প্রাণী আছে বলে মনে হয় না। তবে এখানে-ওখানে গাছের ওপর ক্বচিৎ দু-চারটে নাম-না-জানা পাখি দেখা গেল। বনময়ূরও একজায়গায় দেখা গেল কয়েকটা। ঘোড়ার রাশ আলগা করে দিয়ে সমীরণ বসে রইল তার পিঠে। ঘোড়া আপনমনে চলতে লাগল।

যেতে যেতে একজায়গায় গিয়ে থমকে গেল ঘোড়াটা। কী ব্যাপার! না, সামনের জঙ্গল থেকে আর-একটা ঘোড়া যেন চরতে চরতেই বেরিয়ে এসেছে। বুনো ঘোড়া নয়, পিঠের ওপর চটের গদি বসানো, জিন লাগানো। অর্থাৎ শুধু ঘোড়া নয়, ঘোড়সওয়ারও আছে তাহলে!

সমীরণ বন্দুকটা হাতে করে নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। ঘোড়াটাকে একটা বাবলা জাতের গাছের সঙ্গে বেঁধে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সেই জঙ্গলের দিকে—যেদিক থেকে অন্য ঘোড়াটা বেরিয়ে এসেছিল।

কিন্তু এত ঘন জঙ্গলেও কি লোক থাকতে পারে? এ যে একেবারে দুর্ভেদ্য অরণ্য!

তবু সমীরণ পিছু হটল না। তার থিওরি সে পরখ করে দেখবেই। খানিকটা এগিয়ে যেতেই কিন্তু দেখা গেল, বাইরে থেকে দুর্ভেদ্য মনে হলেও ভেতরটা একটা ছোট লতাবনের মতো। মানুষের পায়ের রেখায় সেখানেও মনে হল একটা পায়ে-চলা পথের সৃষ্টি হয়েছে। সমীরণ এগিয়ে চলল সেটা ধরে। পথটা যেন পাহাড়ের দিকেই চলে গেছে।

খুব বেশিদূর যেতে হল না। একটু পরেই পাহাড়ের তলায় এসে গেল সে। আর, সেই পাহাড়ের জঙ্গল-ঢাকা মুখে যা দেখল, তাতে তার চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল।

এদিকেও পাহাড়ের মুখে একটা বড় গহ্বর—দিব্যি চকচকে ঝকঝকে। অর্থাৎ এখানেও যে মানুষের গতিবিধি আছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

সমীরণ বারেক ইতস্তত করে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল। একটু যেতেই, আরে, এ কী কাণ্ড! সামনে দু-তিনজন লোক না! হ্যাঁ, লোকই তো! সংখ্যায় তিনজন। দিব্যি আরাম করে বসে নিঃশব্দে তামাক টানছে। হুঁকোয় শব্দ হচ্ছে না বটে, কিন্তু ধোঁয়া উঠছে কলকে থেকে। তাদের সামনে স্তূপীকৃত খাবার : ফলমূল, মণ্ডা, পুজোর প্রসাদ হিসাবে দেবতাকে যা দেওয়া হয়। লোকগুলো কিন্তু কেউ কথা বলছে না, ইশারায় ইঙ্গিতে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করছে।

সমীরণ গুহার দেওয়ালের খাঁজে শরীরটাকে যতটা সম্ভব মিশিয়ে দিয়ে নিজেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে গেল। বন্দুকটা এমনভাবে ধরে রইল যে, দরকার হলেই সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে।

হঠাৎ সমস্ত গুহার মুখ প্রকম্পিত করে একটা বিকট শব্দ ভেসে এল। সমীরণ কান খাড়া করে শুনল : 'তিমড়ি দেওতা কি জয়!'

গুহার এদিকে যারা বসে ছিল তারা হুঁকো রেখে দিয়ে সতর্ক হয়ে বসল। সমীরণকে তারা কেউ দেখতে পায়নি।

আবার শব্দ ভেসে এল গুমগুম করে। প্রথমে তিনবার জয়ধ্বনি। তারপর শোনা গেল কে যেন কাঁদো-কাঁদো গলায় বলছে, 'দেওতা, মেরা কসুর সুনিয়ে!'

এবার এধার থেকে একটি লোক, মনে হল সেই-ই দলের সর্দার, গম্ভীর কণ্ঠে হেঁকে উঠল, 'বাতলাও বেটা!'

সমীরণের থিওরি মিলে গেছে। রহস্যের সমাধান পেয়ে গেছে সে। সে আর সময় নষ্ট না করে সেখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, 'চুপ রহো, চোট্টা!'

তারপর? গুহায় যেন বাজ পড়েছে। 'দেওতার' দল প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই ব্যাপারটা আঁচ করে ফিরে তাকাল এবং সমীরণকে আবিষ্কার করামাত্র মারমুখী হয়ে ছুটে এল তার দিকে। কিন্তু সমীরণ তখন তার বন্দুক বাগিয়ে ধরেছে। হাত দুটো ওপরে তোলা ছাড়া তখন আর তাদের গত্যন্তর ছিল না।

ওদিকে গুহার অপর প্রান্ত থেকে তখন অবিরাম ভেসে আসছে নানা ধরনের প্রশ্ন। কিন্তু কোনও জবাব নেই। দৈববাণী বন্ধ হয়ে গেছে। সমীরণই বন্ধ করে দিয়েছে 'দেওতা'র মুখ।

সমীরণের সাহস আছে বলতে হবে। অসম সাহস। কী করে ওই সাহস তার এসেছিল তা সে নিজেই বলতে পারে না। তিন-তিনটে লোককে শুধু একটা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে দিব্যি পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেছিল সে। তারপর তাদেরই ঘোড়ায় তাদের চড়িয়ে, নিজের ঘোড়ার সঙ্গে সেই ঘোড়াগুলি বেঁধে ওই দীর্ঘ পথ তাদের নিয়ে শহরে ফিরে এসেছিল।

বাড়িতে নয়—সোজা কোতোয়ালিতে নিয়ে জমা দিয়ে এসেছিল তাদের। বলা বাহুল্য, এত কাণ্ডের পর ফিরতেও প্রায় সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। মণিময় তো ভেবেই আকুল।

এই ব্যাপার নিয়ে সমস্ত পচাসগড় ঘিরে কয়েকদিন ধরে তুমুল আন্দোলন চলে এবং তারপর মামলা শুরু হলে ওই অঞ্চলের কাগজগুলিতে ফলাও করে তার বিবরণ বার হয়। সেই সময় যারা ওখানে ছিল তারা সবাই জানে। বলা বাহুল্য, সমীরণই ছিল ওই মামলার প্রধান এবং একমাত্র সাক্ষী। অবশ্য পরে মহারাজার পুলিশ ফোর্স গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে যে-রিপোর্ট দিয়েছিল, তাও নেহাত কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। ওরই মধ্যে একদিন মণিময়ের কোয়ার্টারে সান্ধ্য আসরে সমীরণ যে-বিবৃতি দিয়েছিল তার সারমর্ম এখানে তুলে দিচ্ছি :

'মণিময়ের নিমন্ত্রণে এখানে আসবার সময় খানকয়েক ফিজিক্সের বই নিয়ে এসেছিলাম। তার মধ্যে শব্দ-বিজ্ঞানের ওপরও কয়েকখানা বই ছিল—ওই নিয়েই তখন আমি পড়াশুনো করছিলাম কিনা! এখানেও এসে যে সেই বই-ই এত কাজে লাগবে তা কে ভেবেছিল!

'বরাবরই আমি একটু নাস্তিক। ফলে গুহার মধ্যে দেবতার দৈববাণী—এ সেই প্রাচীন গ্রিক পুরাণে পড়লেও বর্তমান যুগে হজম করা আমার পক্ষে সত্যি কষ্টকর ছিল। আমার বৈজ্ঞানিক যুক্তিই বারেবারে এসে এ-বিশ্বাসে বাধা দিচ্ছিল। যাই হোক, সত্যি কথা বলতে কি, মণিময়ের সঙ্গে প্রথম যেদিন চৌহান গুহায় যাই, সেদিন সেই দৈববাণী প্রত্যক্ষ করে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ, গুহার মধ্যে সুড়ঙ্গপথে প্রায় আধ মাইল গিয়েও তন্নতন্ন করে খুঁজে ওর অন্য কোনও রহস্য উদ্ধার করতে পারিনি। মনে আছে, সেদিন সারা রাত ঘুম আসেনি চোখে, বারেবারে মনে হচ্ছিল তবে কি এতদিনে যা-কিছু জেনেছি সব ভুল ? দেবতার অভিশাপ, দেবতার আশীর্বাদ, এ শুধু মানুষের মনগড়া কল্পনা নয়, বাস্তবেও এর প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে ?

'প্রথমটা মনে হল, হয়তো তাই হবে। আমারই ভুল। নইলে পুরুষ পরম্পরায় যে-ঘটনা ঘটে আসছে এবং এখানে যেটাকে একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার বলে মনে করা হয়, তা কি ভুল হতে পারে ? তবুও যুক্তি দিয়ে বারবার বিচার করতে গিয়ে মন সায় দিচ্ছিল না। তাই পরদিনই সকালবেলা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে পাহাড়টা আবার ঘুরে এলাম। এরকম কয়েকদিন চলল। পাহাড়টার ওপাশে ঘন জঙ্গল থাকায় ওর শেষ খুঁজে পেলাম না।

'এদিকে, আগেই বলেছি, এই সময় আমি শব্দ-বিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। শব্দ যে আসলে বাতাসের ঢেউ ছাড়া আর কিছু নয়, এ আপনারা জানেন। অবশ্য বাতাস ছাড়া অন্য কোনও জিনিসের মাধ্যমে ঢেউ তুলতে পারলেও শব্দ পাঠানো যায়। তবে আমাদের চারদিকেই বাতাসের সমুদ্র থাকায় সাধারণত যেসব শব্দ আমরা শুনি তার ঢেউ বা পরিভাষায় যাকে বলে শব্দ-তরঙ্গ, তা বাতাসের ভেতর দিয়েই ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলে।

'এখন, আলো যেমন কোনও জায়গায় পড়লে ঠিকরে আসে, শব্দের বেলাতেও ঠিক তাই হয়। আলোর বেলায় আমরা ভালো বাংলায় বলি আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, শব্দের বেলায়ও তেমনই বলা যায়, শব্দও প্রতিফলিত হতে পারে। গুহার ভেতর সুড়ঙ্গপথে চলতে গিয়ে আমি দেখেছিলাম, সে-সুড়ঙ্গ ঠিক সোজা বেরিয়ে যায়নি, এঁকেবেঁকে বেঁকাচোরা পথে এগিয়ে গেছে। আমার সন্দেহ হল : আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে, গুহার এ-মুখে কোনও শব্দ করলে তা বেঁকাচোরা দেওয়ালে ঠোক্কর খেতে খেতে ওপাশে গিয়ে হাজির হবে। ক্যারাম খেলার রিবাউন্ড করার সঙ্গে এর খানিকটা সাদৃশ্য আছে। কিংবা, বলতে পারি,

ব্যাপারটা অনেকটা প্রতিধ্বনির মতো। কিন্তু প্রতিধ্বনির শব্দ ঠোক্কর খেতে খেতে বেরোবার পথ না পেলে তবেই আবার ফিরে আসে। কোনও বড় গম্বুজের নিচে দাঁড়িয়ে এই রকম আওয়াজ করলে সে-আওয়াজ প্রায় সবটাই কী করে আবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে তা আপনারা জানেন। কিন্তু সুড়ঙ্গের অপর মুখ যদি খোলা থাকে তবে ওই শব্দ ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এগিয়ে চললেও শেষ পর্যন্ত ফিরে আসবে না। ও-মুখ দিয়ে তা বেরিয়ে যাবে। গুহার ওই মুখে যদি কেউ বসে থাকে, তবে সে ওই শব্দ ওখানে বসে বসেই শুনতে পাবে। কারণ ধাক্কা খেলে শব্দের তীব্রতা বড় একটা কমে না, বরং তার গাম্ভীর্য আরও বেড়ে যায়—এও পরীক্ষা করেই জানা গেছে। এইভাবে সামান্য শব্দও ধাক্কা খেতে খেতে মাইলের পর মাইল চলে যেতে পারে এবং ততদূরে বসেও তা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া এমন কিছু অসম্ভব নয়। এখন, যদি আবার কেউ গুহার ওই মুখে বসে একইরকম ভাবে কোনও শব্দ করে, তাহলেও সেই শব্দ আবার ধাক্কা বা ঠোক্কর খেতে খেতে গুহার এ-মুখে এসে হাজির হবে। আর এদিকে যে-লোক থাকবে, সেও ওই শব্দ শুনতে পাবে বেশ জোরালো এবং গম্ভীর সুরে।

'এখন, আপনারা হয়তো জানেন, শব্দের গতি সেকেন্ডে প্রায় ৩৪১ মিটার। সুতরাং আমার থিওরি যদি ঠিক হয়, তাহলে সুড়ঙ্গটা মাইল তিনেক লম্বা হলে তবেই তার এক মুখ থেকে অন্য মুখে শব্দ পৌঁছতে লাগবে প্রায় আধ মিনিট। যদি কেউ ওই শব্দ শুনবার পর ওদিক থেকে কিছু বলে, তবে তাও এদিকে আসতে লাগবে প্রায় আধ মিনিট। তা হলে দাঁড়াচ্ছে কী ? এদিকের কোনও লোক যদি তথাকথিত দেবতাকে উদ্দেশ করে কোনও কথা বলে, তবে তার জবাব সে শুনতে পাবে পুরো এক মিনিট পরে—যদি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেওয়া হয়। এখানেও ঠিক তাই হচ্ছিল। কাজেই তখন আমার মনে হল, আমার থিওরি সত্যি কি না জানতে হলে আগে জানা দরকার, সুড়ঙ্গ বা গুহাটা সত্যি কত বড় এবং তার অন্যদিকে আর কোনও খোলা মুখ আছে কি না।

'সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে মণিময়ের সঙ্গে অনেকটা গিয়েও তার যে কোনও শেষ পাইনি তা মণিময়ের নিশ্চয়ই মনে আছে। তখন মনে হল, বাইরে থেকে পাহাড়টা একবার চক্কর দিয়ে আসতে পারলে ওটা কতটা লম্বা জানা যাবে এবং কোনও খোলা মুখ থাকলে তাও সহজে ধরা পড়বে। কয়েকদিনের চেষ্টাতেও যখন পাহাড় চক্কর দেওয়ার পথ খুঁজে পেলাম না, তখন সত্যি একটু দমে গিয়েছিলাম। কারণ পাহাড়ের বাইরে দিয়ে ঘোরা যত সহজ, সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যাওয়া তত সহজ নয়। আর হেঁটে পাক্কা তিন মাইল সুড়ঙ্গ ভাঙা তো আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। কিন্তু শেষে হঠাৎ পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় উলটো দিকে বেরোনো একটা অস্পষ্ট পায়ে চলা পথ দেখে কেমন খটকা লাগল। পথটা যদিও অন্যদিকে গেছে কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে ওদিকে কোথায় যাবে ? আশেপাশে কোনও গ্রাম আছে বলে শুনিনি। তবে কি লোককে ভাঁওতা দেওয়ার জন্যে অমনভাবে পথটা কেউ ঘুরিয়ে দিয়েছে ? তা যদি হয় তবে আবার ওটা পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলে আসবেই। দেখলাম, সত্যি তাই। আর তারপরেই পাহাড়ের সীমানা খুঁজে পাওয়া গেল।

'পাহাড় চক্কর দিয়ে যখন ফিরে আসছি, তখন দৈব হঠাৎ আমায় একটু সাহায্য করল। ওই যে কথায় বলে, "পুরুষকারকে দৈব সাহায্য করে"। আমার মধ্যে হয়তো একটু পুরুষকার টুঁ মেরে থাকবে। যাই হোক, ওটা না হলে হয়তো আসল রহস্যটা ধরা মুশকিল হত। একটা জিন-লাগানো ঘোড়া হঠাৎ পাহাড়ের গা-ঘেঁষা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। বুঝলাম, জিন যখন লাগানো আছে, তখন সওয়ারও আছে। কিন্তু ওই দুর্ভেদ্য জঙ্গল থেকে

পোষা ঘোড়া বেরিয়ে এল কী করে ? সাহসে ভর করে এগিয়ে গেলাম। একটু খুঁজতেই একটা লতাবন পাওয়া গেল, আর তার খানিক পরেই অবাক হয়ে দেখলাম পাহাড়ের এ মুখেও একটা বড় গহ্বর। হয়তো সবটাই স্বাভাবিক গুহা। খানিকটা কেটে তৈরি হওয়াও অসম্ভব নয়। তাহলে কি আমার অনুমান সত্যি ?

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। ভেতরে ঢুকেই দেখি তিন মূর্তিমান বসে নিঃশব্দে হুঁকো টানছে। তাদের সামনে স্তূপীকৃত ফলমূল—ভক্তেরা যা আগের দিন দেবতার জন্যে দিয়ে গেছে। সন্ধের পর ওগুলো তুলে নিয়ে আসতে কোনও বাধা নেই, কারণ তখন দেবতার আজ্ঞায় ওটি সাধারণের নিষিদ্ধ এলাকা।

'তাহলে খাওয়া জুটছে ভালোই। শুধু খাওয়া নয়, দক্ষিণাও নিশ্চয়ই আছে সঙ্গে। তা ছাড়া স্বয়ং মহারাজা ফতে সিং-এর বরাদ্দের কথা তো আগেই শুনেছি।

'লোকগুলো কিন্তু কথা বলছিল ইশারায়। হুঁকোও এমনভাবে টানছিল যাতে কোনও শব্দ না হয়। তার কারণও সহজেই বোঝা গেল। জোরে কথা বললেই তা গুহার গায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে একেবারে ও-মুখে চলে যাবে আর তাহলে হয়তো দেওতার ভক্তেরা ধরে ফেলবে যে, তাদের "তিমড়ি" আসলে তাদেরই মতো রক্ত-মাংসের মানুষ। তবে হ্যাঁ, ত্রিমূর্তির জায়গায় তিন মূর্তিমান।

'ভাগ্যিস বন্দুকটা সঙ্গে ছিল। তারই ভরসায় আত্মগোপন করে একটু দাঁড়াতেই সব রহস্যের অবসান হল। তারপর ওই বন্দুকের ওপরেই ভরসা করে সাহসে ভর দিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করলাম। ভাগ্যিস ওদের কাছে কোনও অস্ত্র ছিল না। আর অতর্কিতে আমার এই বন্দুক-ধরা ব্রিচেস-পরা বাঙালি চেহারা দেখে ওরা হয়তো খুবই ভড়কে গিয়েছিল। টুঁ শব্দটি না করে ধরা দিল। নইলে বাধা দিলে, একা তিনজন গাঁট্টাগোট্টা "দেওতাকে" কব্জা করা আমার একার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তারপর ওদের এতটা পথ টেনে এনে কোতোয়ালিতে জমা দিয়ে একটা ডায়েরি করাতে যে প্রায় সন্ধে হয়ে যাবে, এতে আর বিচিত্র কি ?'

নীলরতনবাবু বললেন, 'কিন্তু ওই দেওতা তো বহু পুরুষ ধরে ওইরকম দৈববাণী দিয়ে আসছিলেন। আমাদের ঠাকুরদা'র ঠাকুরদা'র ঠাকুরদা'র আমলেও তো ওইরকম হয়েছে।'

সমীরণ হেসে বলল, 'ওই বুজরুকি বংশগত। এক ধরনের লোক আছে, যারা এইভাবেই পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে লোক ঠকিয়ে খায়, এবং নিজে গত হওয়ার আগে কৌশলটি পরের পুরুষকে শিখিয়ে দিয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে দেখুন, এদের বাপ-ঠাকুরদা'রাও নিশ্চয়ই ওই কর্ম করে গেছেন এবং এদের ছেলেপিলেরাও হয়তো ইতিমধ্যেই এ-বিদ্যায় তালিম নিতে শুরু করে দিয়েছে। তবে বাহাদুরি আছে বলতে হবে। এত বছর ধরে এমন গোপনে কার্যোদ্ধার করা বড় সহজ কথা নয়। আরও আশ্চর্য, এই গুহার এদিককার মুখটা চিরকালই এমন দুর্ভেদ্য জঙ্গলের আড়ালে লুকনো ছিল যে, এত বছরেও কেউ সেটার অস্তিত্ব টের পায়নি। অবশ্য দেবতার ওপর অসীম বিশ্বাসও হয়তো এর একটা কারণ। ওদিকটা খুঁজে দেখবার কথা কারও হয়তো মনেও হয়নি কোনওদিন।'

মণিময় বাধা দিয়ে বলল, 'আহা, সমীরণ, তুমি ভুলে যাচ্ছ এটা কাদের দেশ। দেবতার নামে এখানে এমন একটা মোহ আছে, যার ফলে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও অনেক কিছু বিশ্বাস করে বসে। এই আমিই তো···'

নীলরতনবাবুর সঙ্গী ভদ্রলোক দু'জন একসঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'সাচ বাত, সাচ বাত।'

□১৯৬৫



জীবন্ত বেতার

বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ। রেলগাড়ি চলছে। ফার্স্ট ক্লাস কামরায় চারটি বার্থে আমরা চারজন যাত্রী। দু'জন মিলিটারি অফিসার মেজর বর্ধন আর মেজর রাজিন্দর সিং। রাত হলেও শুয়ে পড়বার মতো সময় হয়নি। তাই আমরা নিচের সিটে বসে গল্প করছিলাম।

রাষ্ট্রদ্রোহী মিজোদের উৎপাতের কথা বলছিল ওরা। মাত্র কয়েকদিন আগে ডিনামাইট দিয়ে ওরা একখানা ট্রেন উড়িয়ে দিয়ে অনেক লোক মেরে ফেলেছে। পিছন থেকে কোনও শত্রু রাষ্ট্র ওদের উসকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছিল এবং কেনই বা এরা তাদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছে এইসব গল্পও মিলিটারি অফিসাররা আমাদের শোনাচ্ছিল।

গাঢ় অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রেলগাড়ি চলছে। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে আমরা শুধু অন্ধকারই দেখছি। হঠাৎই এক ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি থেমে গেল। ঝাঁকুনি দিল বেশ জোরেই। বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল। বৈরী মিজো বা নাগাদের কাজ নয় তো?

মেজর সিং বলল, 'একবার দেখা যাক।'

কিন্তু মুখ বাড়িয়ে গভীর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখলাম না। মেজর তার শক্তিশালী টর্চের আলো জানলা দিয়ে বাইরে ফেলল। দেখা গেল, শুধুই জঙ্গল। একটা জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। রাত বেশি গভীর হয়নি, তাই যাত্রীরা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কী ব্যাপার হয়েছে দেখবার চেষ্টা করছিল, তবে নামতে কেউ সাহস করছিল না। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল গার্ড তার লণ্ঠন নিয়ে ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে আসছে; মনে হল বেশ ভয়ে ভয়ে। দুই মেজর তখন তাদের রিভলভারে টোটা পুরে নিয়ে শক্তিশালী টর্চ নিয়ে নেমে পড়ল। আমরা, অসামরিক মানুষ দু'জন, গাড়িতেই বসে রইলাম।

ওরা ফিরে এলে ওদের কাছে শুনলাম, লাইন জুড়বার ফিশপ্লেট কারা যেন সরিয়ে ফেলেছে। ড্রাইভার সন্দেহ করে গাড়ি না থামালে গাড়ি লাইন থেকে পড়ে যেত। তারপর যে কী হত বোঝাই যাচ্ছে।

আমরা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'তাহলে খুব বেঁচে গেছি। কিন্তু পাশ থেকে যদি ওরা আক্রমণ করে?'

মেজর হেসে বলল, 'সুবিধে হবে না। তিনখানা বগি বোঝাই সৈন্য যাচ্ছে। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র।'

আমি বলে ফেললাম, 'ওঃ, তাহলে সৈন্যদের মেরে ফেলার জন্যেইগাড়ি উলটে দেওয়ার ব্যবস্থা। তাহলে নিশ্চয়ই ওরা জানত যে এই ট্রেনে সৈন্য যাচ্ছে।'

মেজর হাসল, বলল, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'তাহলে নিশ্চয়ই গুপ্তচর মারফত খবর পেয়েছে ওরা।'

মেজর বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো বোঝা যাচ্ছে।'

এই কথার পর আস্তে আস্তে গুপ্তচরের কথা এসে পড়ল। আমি প্রথম মহাযুদ্ধের প্রসিদ্ধ গুপ্তচর মাতাহারির গল্প তুললাম।

মেজর বর্ধন বলল, 'ওসব পুরোনো কায়দা। নতুন কায়দার গুপ্তচর অনেক দেখেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজদের হয়ে লিবিয়ায় যুদ্ধ করেছি। মাঝে মাঝেই শুনেছি যে এক-একজন গুপ্তচরকে ধরে গুলি করা হল। গুপ্তচরদের যে কত কৌশল ছিল তা মহাযুদ্ধের পর প্রকাশ পেয়েছিল। আপনারা নিশ্চয়ই অনেক প্রবন্ধে বা বইয়ে সেসব কায়দা-কৌশলের কথা পড়েছেন। কিন্তু আমার নিজের চোখে যে-অদ্ভুত বিজ্ঞানসম্মত গুপ্তচরবৃত্তির কৌশল দেখেছি তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। ঘটনাটা কেন জানি না প্রকাশ করা হয়নি।'

কৌতূহল প্রকাশ করলাম। বললাম, 'আমাদের শোনাতে বাধা আছে কি ?'

মেজর বলল, 'না, বাধা কিছু নেই। তবে সরকার যখন প্রকাশ করেনি—তাই একটু—'

আমরা চেপে ধরলাম : ঘটনাটা যখন সত্যি, আর এখন যুদ্ধও যখন চলছে না, তখন বলতে বাধা কী ?

মেজর একটু ভেবে নিল। দু'জনে কীসব পরামর্শ করে নিল। তারপর বলল, 'আচ্ছা, শুনুন তাহলে :

আমাদের সৈন্যদলে লোকটা হরনাম সিং বলেই পরিচিত ছিল। লোকটা ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা, উর্দু, হিন্দি আর পাঞ্জাবি ভাষা জানত, অনর্গল বলতেও পারত। আর বিদেশি ভাষার মধ্যে ইংরেজি আর জার্মান ভাষা জানত। ও বলত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনেক দিন ধরে জার্মানিতে বন্দি ছিল। সেখানে থেকেই জার্মান ভাষা শিখেছে। যাই হোক, কোথা থেকে ও জার্মান ভাষা শিখেছে তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনি। লোকটা সৈন্যবিভাগে কোনও চাকরি করত না, অথচ সৈন্যদলের ছোট-বড় সব মানুষের সঙ্গেই দহরম-মহরম ছিল। দাড়ি, চুল, পাগড়ি, বালা, কৃপাণ নিয়ে লোকটা যার সঙ্গে যেমন ভাষা বলা দরকার বলত। ওর ছিল একটা দোকান। তাতে সৈন্যদলের উপযোগী টুকিটাকি অনেক জিনিস পাওয়া যেত। অনেক অফিসারকে ডেকে দোকানে তুলে এটা ওটা খাওয়াত। আর মাঝে মাঝেই ওর জার্মানি বাসের অভিজ্ঞতার কথা শোনাত। পাকিস্তানের সঙ্গে যেবারে যুদ্ধ বাধে আমাদের দল তখন কাশ্মীরে। সেখানেই হরনাম সিং-এর দোকান। লোকটা প্রায়ই আসে, মেলামেশা করে। আমরা তখন খুব সাবধানে আছি। কথাবার্তাও মাপজোখ করে বলি। কী জানি কখন কোন গুপ্তচর মারফত কোন কথা ফাঁস হয়ে যায়।

হরনামকেও বলে দেওয়া হল ও যেন যখন তখন আমাদের ক্যাম্পে না আসে। হরনাম বলল, 'নিশ্চয়ই। আপনারা মানা করলে আমার আসবার দরকার কী ?'

এক রাত্রে আমাদের সেনাপতি কর্নেল রঙ্গনাথের তাঁবুতে আমরা একখানা ম্যাপ খুলে

আলোচনা করছি এমন সময় সান্ত্রী এসে বলল, 'বাইরে হরনাম সিং এসেছে। আমি ওকে চিনলেও ঢুকতে দিতে চাইনি। সে তখন এই চিরকুটটা আমার হাতে দিয়েছে। বলেছে কর্নেলের হাতে দিতে।'

কর্নেল চিরকুটটা দেখে হরনামকে ডেকে আনতে হুকুম দিলেন।

চিরকুটটায় লেখা ছিল : 'শত্রুদের গতিবিধির রাস্তা সম্বন্ধে নির্ভুল সংবাদ জোগাড় করেছি। যদি দয়া করে আসতে দেন তবে সামনে এসে বলতে পারি। নিজের দেশের স্বার্থে এ-খবর আমাকে বলতেই হবে।'

হরনাম এসে বলল, 'এই এই রাস্তায় পাকিস্তানীরা আসছে। এলাকাটার একখানা ম্যাপ পাওয়া যায় না, তাহলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারি—'

ম্যাপখানা হরনামের আসবার আগেই লুকনো হয়ে গিয়েছিল। এখন হরনাম চাইতেই আবার বের করা হল। কারণ হরনামকে অবিশ্বাস করবার কারণ কিছুই ঘটেনি। তার ওপর এমন একটা খবর দিতে এসেছে।

ও তখন পকেট থেকে একটা দামী পেনসিল বের করল। পেনসিলটা বেশ চকচকে ধাতুর তৈরি, সোনার ক্লিপ বসানো। ও বোতাম টিপে সীস বের করে নিয়ে ম্যাপের ওপর দেখিয়ে দেখিয়ে পাকা সেনাপতির মতো শত্রুর গতিবিধির কথা বলতে লাগল।

কর্নেল বললেন, 'তুমি এত কথা জানলে কী করে ?'

সে সেলাম করে বলল, 'অনেকদিন এদেশে আছি। এদিককার রাস্তা জঙ্গল সব আমার চোখের সামনে। বহু লোকের সঙ্গেই জানাশোনা। কাজেই খবর পেতে আমার অসুবিধে হয় না। দেশের স্বার্থে চেনা লোককে গুপ্তচরের মতো কাজে লাগিয়েছি। তারা যে যেখানে যা পায় এসে আমাকে খবর দেয়।'

যাই হোক হরনামের দেওয়া খবর আমাদের খুব উপকারে লাগল। বিশেষ জায়গাগুলো অবরোধ করে এগোতেই বিশজন পাকিস্তানী গেরিলা ধরা পড়ে গেল। তাদের সঙ্গে হাতবোমা আর টমিগান ছিল।

কর্নেল হরনামকে ডেকে অভিনন্দন জানালেন।

ও হেসে বলল, 'দেশের সেবা আমার কর্তব্য।'

দু-একদিন পরে ও আবার আমাদের গোপন বৈঠকের সময় এসে চিরকুট পাঠাল।

কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে পাঠালেন।

সেদিন আর ম্যাপটা লুকনো হয়নি। হরনাম পেনসিলটা বের করে গোটা ম্যাপটার আলোচনা শুরু করে দিল।

কর্নেল বললেন, 'তুমি গোটা ম্যাপটার আলোচনা শুরু করলে কেন ?'

হরনাম বলল, 'কোথায় ভুল আছে দেখছি। ম্যাপটা যেই তৈরি করুক এতে এই জায়গাগুলো বেশ দুর্বল। এইখান দিয়ে শত্রুরা অনায়াসে এসে পড়তে পারে। এইসব বড় বড় ঘাঁটি হারালেই আমরা দুর্বল হয়ে পড়ব।'

কর্নেল এবার চটে উঠলেন। বললেন, 'তোমাকে আমাদের প্ল্যানের ভুল ধরাবার জন্যে ডাকা হয়নি। কোনওকিছু খবর থাকলে বলতে পারো।'

হরনাম যেন থমকে গেল এমন ভাবে বলল, 'বলব, নিশ্চয়ই বলব। শুধু এইগুলো দুর্বল জায়গা বলে মনে হল, তাই ধরিয়ে দিলাম। তবে হ্যাঁ, যা বলতে এসেছিলাম তা হল ওই ম্যাপের তিনশো বারো পয়েন্ট বলে যে-জায়গাটা দেখা যাচ্ছে ওখানে শত্রুদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাড়াতাড়ি চেষ্টা করলে ধরা যেতে পারে।'

কর্নেল তাড়াতাড়ি বেতার সঙ্কেত পাঠালেন ওই জায়গায় খোঁজ নেওয়ার জন্য। আশ্চর্য ব্যাপার! হরনামের কথাই ঠিক। তিনজন মেশিনগানধারী ধরা পড়ল।

কর্নেল বললেন, 'হরনাম লোকটা কাজের। ওর দেওয়া খবরের ভিত্তিতেই আমরা কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য ধরলাম। ওকে আমাদের গোয়েন্দা-বিভাগের কাজে নিলে ভালো হয়।'

এই ঘটনার ঠিক দু'দিন পরে হরনাম আমাদের ম্যাপ দেখে যে-জায়গাটা দুর্বল বলেছিল সেই জায়গাটা দিয়েই পাকিস্তানের আক্রমণ হল। আর আমাদের সৈন্যরা পিছু হটে এল।

আমরা তখন বলাবলি করলাম, 'হরনাম তো ঠিকই বলেছিল। ওর দেখছি সামরিক জ্ঞানও খুব।'

এরপর একদিন হরনামকে ডেকে এনে আমাদের গোপন বৈঠকের সময় কর্নেল বললেন, 'হরনাম, তোমার কাজে আমরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমাদের গোয়েন্দা-বিভাগে কাজ নাও।'

হরনাম সেলাম করে বলল, 'সাহেব, আমি দোকানদারী করি। বাপ-ঠাকুরদার কিছু জমি-জমা আছে তাই দিয়ে বেশ চলে যায়। এই যে আপনাদের কাছে এইসব খবর দিয়ে দেশের সেবা করি, এর কোনও দাম নিতে চাই না। তবে আমার কাজে যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে আমাকে তলব দিলেই আমি যা-যা খবর থাকবে সব জানিয়ে যাব।'

এরপর থেকে ওর আসা-যাওয়া আরও বেড়ে গেল। এমনকি আমাদের গোপন বৈঠকেও ও উপস্থিত থাকত। ওর সামনেই আমরা খোলাখুলি সব কথা আলোচনা করতাম।

ব্যাপারটা সবার আগে নজরে পড়ল এক বাঙালি অফিসারের—নাম ক্যাপ্টেন বসু। সে-ই আমাদের এক বৈঠকের সময় বলল, 'আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে। আপনাদের বলি বলি করেও বলতে পারছি না।'

কর্নেল বললেন, 'বলেই ফেলো।'

বসু বলল, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে হরনাম পাকিস্তানী গুপ্তচর।'

ঘরে, যেন বোমা ফাটল! সবাই চুপ।

কর্নেল বললেন, 'সন্দেহের কারণ কী? হরনামের কথায় বিশ্বাস করে আমরা কত পাকিস্তানী সৈন্য ধরেছি—একেবারে অস্ত্র সমেত।'

বসু বলল, 'হ্যাঁ, ধরেছি ঠিকই। ষাটজন অশিক্ষিত সৈন্য আর সামান্য হালকা কিছু অস্ত্র। আর দিয়েছি অত্যন্ত সাবধানে রাখা পাঁচটা গোপন ঘাঁটি। যার সংবাদ আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। এমনকি সৈন্যদলেরও অনেকেই জানে না। আর একমাত্র আমাদের গোপন বৈঠকেই ওইসব নিয়ে আলোচনা হয়। সে-সময় বাইরের লোকের মধ্যে একমাত্র হরনামই থাকে। শত্রুপক্ষ কিন্তু ওই ঘাঁটিগুলোতে এমনভাবে আক্রমণ করছে যেন মনে হয় তারা সবই জানে। এর কারণ কী?'

সবাই ভাবনায় পড়ে গেলাম। বসুর সব যুক্তিই সত্যি। ফেলনা নয়। হরনাম যেদিন বলল, এই দুটো দুর্বল ঘাঁটি, তার ঠিক পরদিনই ওই দুটোতে আক্রমণ হল, আর আমাদের পিছিয়ে আসতে হল।

'নাঃ', কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সন্দেহ রাখা ঠিক নয়। এখনই হরনামের বাসায় চলো, সার্চ করা যাক। দেখা যাক, ট্রান্সমিটার বা ওই ধরনের কিছু পাওয়া যায় কিনা। আর ও সাবধান হওয়ার আগেই হঠাৎ খানাতল্লাশ হওয়া ভালো।'

'তবে এও ঠিক—' কর্নেল আরও বললেন, 'ও যদি গুপ্তচর না হয় তবে এই ব্যাপারের পর ও আর আমাদের সাহায্য করবে না। তবুও ক্যাপ্টেন বসুর কথা উড়িয়ে দেওয়া চলে না।'

কয়েকজন সিপাই নিয়ে আমরা পাঁচজন অফিসার গভীর রাতেই চললাম ওর বাসায়। হরনাম তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ধাক্কাধাক্কিতে লাফিয়ে উঠেই সে হতভম্ব। বলল, 'কী ব্যাপার, কর্নেল সাহেব ?'

কর্নেল বললেন, 'হরনাম, আমরা একটা সংবাদ পেয়েছি যে তুমি পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছ। তুমি যেখানে আছ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। আমরা তোমার ঘর সার্চ করব।'

হরনাম হেসে বলল, 'এই কথা ! তা সন্দেহ যখন হয়েছে সার্চ করবেন নিশ্চয়ই। যদিও জানি কিছুই পাবেন না। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে আপনারা আমাকে গুপ্তচর ভাবলেন, এই জন্যেই। আচ্ছা ওই চেয়ারটায় বসব ?

কর্নেল বললেন, 'বোসো, কিন্তু টেবিলের ড্রয়ার খুলো না যেন।'

হরনাম চেয়ারে বসল। টেবিলের ওপর ওর সেই পেনসিলটা ছিল। হাত দিয়ে সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। এদিকে সব সিপাইরা ওর ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল।

ও একটুও বিচলিত না হয়ে বসে রইল। হঠাৎ বলল, 'আপনারা কেউ জার্মানি ভাষা জানেন ?'

আমরা বললাম, 'না।'

তখন ও বলল, 'আপনাদের এই সন্দেহ আর সার্চ করা দেখে আমার জার্মানির বিখ্যাত কবি হাইনের একটা কবিতা মনে পড়ছে।'

এই বলে ও সুর করে জার্মানি ভাষায় কিছু বলল।

আমাদের মন তখন উত্তেজিত। ওর মানে আমরা শুনতে চাইলাম না। এর মধ্যে তল্লাশি দল এসে পড়ল। বলল, কিছুই পাওয়া যায়নি।

কর্নেল বললেন, 'হরনাম, আমরা দুঃখিত।'

হরনাম বলল, 'না না, এতে দুঃখের কিছু নেই। আপনারা মিলিটারি অফিসারের যা কর্তব্য তাই করেছেন। রাত অনেক হয়েছে, একটু কফি খেয়ে যান। ভালো কফি এনেছি।'

এরপর থেকে হরনামের দাম আরও বেড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ও আরও বেশি মেলামেশা করতে লাগল। মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে দু-চারটে পাকিস্তানীকে ধরিয়েও দিতে লাগল।

এইখানেই যদি ঘটনার শেষ হয়ে যেত তবে আপনাদের কাছে এ গল্প করতেও পারতাম না। কারণ আমাদের সব ঘাঁটিই পাকিস্তানের হাতে ধ্বংস হয়ে যেত। আর তার সঙ্গে আমরাও মরতাম। কিন্তু ভগবান সদয়।

একদিন শুনলাম হরনাম পাগল হয়ে গেছে। আমরা দুঃখিত হয়ে ওর বাড়ি গেলাম। ও তখন চুপ করে বসে ছিল।

কর্নেল বলল, 'হরনাম, কেমন আছ ?'

হরনাম একটু হাসল। বলল, 'আসুন কর্নেলসাহেব,' বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়ে মাথা চাপড়াতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল, 'আঃ,এ কী উৎপাতে পড়লাম ! আঃ, কে আমাকে বাঁচাবে !'

কর্নেল বললেন, 'কী হয়েছে তোমার তা বলবে তো।'

ও তখন চুপ করেছে। চেয়ারে বসে বলল, 'কর্নেলসাহেব, কিছু খাবেন ?' বলতে বলতেই আবার লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে লাগল আর পাগলের মতো পায়চারি করতে লাগল।

কর্নেল বললেন, 'না, তোমার অসুখ, এখন আর কিছু খাওয়াতে হবে না।'

ও তখন চুপ করেছে। বলল, 'না না, এমন আর কী অসুখ—ও কিছুই নয়।' বলতে বলতেই আবার চেঁচাতে আরম্ভ করল।

দু-তিনদিনের মধ্যে ওর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। মাঝে-মাঝেই চেঁচায়। খায় না, ঘুমোয় না।

আমরা তখন ওকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। ও যাবেই না। তখন জোর করে হাত পা বেঁধে গাড়ি করে ওকে হাসপাতালে পাঠানো হল। হাসপাতালের ডাক্তার দু-তিন দিন পর্যবেক্ষণ করে মানসিক রোগের বড় হাসপাতালে পাঠালেন।

সেখান থেকে যে-খবর এল তা শুনে আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল। বড় হাসপাতালে প্রথমে ওর মাথার এক্স-রে ফটো তুললে তাতে দেখা গেল ওর মাথার পিছনের হাড়ের ওপর ঠিক কানের পিছনে দু'দিকে দুটো যন্ত্র লাগানো আছে, আর জিভের নিচেও একটা যন্ত্র লাগানো আছে। ওর চুলদাড়ি সব কামিয়ে ফেলে দেখা গেল ওর চামড়ায় কয়েকটা অপারেশনের দাগ আছে। তখন অপারেশন করে যন্ত্রগুলো বের করে নেওয়া হল।

দেখা গেল, কানের পিছনে যে-যন্ত্র ছিল সেটা হল বেতারের গ্রাহক যন্ত্র বা রিসিভার, আর জিভের নিচে যেটা ছিল সেটা হল প্রেরক যন্ত্র বা ট্রান্সমিটার।

এইবার সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। ওই লোকটার এইসব লুকনো যন্ত্রপাতির খোঁজ পাওয়া কারও সাধ্য ছিল না। বুঝলাম, ও যখন আমাদের সঙ্গে বসে ম্যাপ নিয়ে আলোচনা করত তখন ওই ট্রান্সমিটারে খবর চলে যাচ্ছিল। আর পাকিস্তান ওর দেওয়া সব খবরই ধরে নিচ্ছিল। ওখান থেকে যেসব নির্দেশ আসত বা ওরা যা প্রশ্ন করত তাও ওর গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ত। কিন্তু সব যন্ত্রই তো শরীরের মধ্যে। হাজার খানাতল্লাশি করলেও বোঝবার উপায় নেই। আর ওই পেনসিলটা ছিল যন্ত্র চালু করবার সুইচ। ওটা হাতে নিয়ে সুইচ টিপে ও কথাবার্তা বলত।

আমরা শিউরে উঠলাম। কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! কিন্তু পাকিস্তান তো যন্ত্রবিদ্যায় এত উন্নতি করেনি। এই যন্ত্র তারা পেল কোথায় ?

মেজর বলল, 'পাকিস্তানের কী সাধ্য ওই যন্ত্র লাগায়। লোকটার আসল নাম রহমান বে। ও পশ্চিম জার্মানিতে থাকার সময়েই ওই যন্ত্র লাগিয়েছিল। ওকে পশ্চিম জার্মানি পাঠিয়েছিল পূর্ব জার্মানিতে গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে। ওর আসল বাড়ি পাকিস্তানে। জার্মানি থেকে ও পালিয়ে আসে পাকিস্তানে। পাকিস্তান তো এমন গুপ্তচর পেয়ে লুফে নিয়েছে। এমনটা হতে পারে এ ওদের কল্পনার বাইরে ছিল। প্রচুর মাইনেও দিত ওকে। ওর মাইনে গভর্নরের চেয়েও বেশি ছিল। এসব কথা পরে জেরার মুখে ও স্বীকার করেছিল।'

আমরা বললাম, 'হরনাম হঠাৎ পাগল হয়ে গেল কেন ?'

মেজর বলল, 'আসলে ও পাগল হয়নি। হঠাৎ যন্ত্রটা বিগড়ে গেছিল। সুইচটা আর কাজে লাগত না। সব সময়ে ওই ওয়েভলেংথে যে-কথাবার্তা হত, দুনিয়ার সব দেশ থেকে সেইসব কথা গান বক্তৃতা ধরা পড়তে লাগল ওর গ্রাহক যন্ত্রে। সারা দুনিয়া থেকে কিছুক্ষণ বাদে বাদেই যদি এমন উৎপাত শুরু হয় তবে মানুষটা ঠিক থাকবে কেমন করে। তবুও

হরনাম হাসপাতালে যেতে চায়নি শুধু ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লই।'

আমরা বললাম, 'আপনারা যেদিন ওর বাড়ি সার্চ করলেন সেদিন জার্মান ভাষায় ও কবিতা বলল কেন?'

মেজর বলল, 'ওটা ওর চালাকি। আমরা জার্মান ভাষা জানি না এটা জেনেই ও জার্মান ভাষায় ওদের ঘাঁটিতে জানিয়ে দিয়েছিল যে, ওর বাড়ি সার্চ হচ্ছে, ওকে সন্দেহ করা হয়েছে।'

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'লোকটা সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হল?'

মেজর হাসল। বলল, 'আইনত প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, কিন্তু জানেনই তো ভারত সরকার পাকিস্তানের মতো কড়া নয়। তাই লোকটা এখনও জেলেই আছে। আর ক্যাপ্টেন বসুর দূরদৃষ্টির জন্যে তাকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে।'

□১৯৭৯





আশ্চর্জন্তু

সত্যজিৎ রায়

আগস্ট ৭

আজ এক আশ্চর্য দিন।

সকালে প্রহ্লাদ যখন বাজার থেকে ফিরল, তখন দেখি ওর হাতে একটার জায়গায় দুটো থলি। জিজ্ঞেস করাতে বলল, 'দাঁড়ান বাবু, আগে বাজারের থলিটা রেখে আসি। আপনার জন্যে একটা জিনিস আছে, দেখে চমক লাগবে।'

আমার তেত্রিশ বছরের পুরোনো প্রৌঢ় চাকর আমাকে চমক দেওয়ার মতো কিছু আনতে পারে ভেবে আমার হাসি পেল। কী এনেছে সে থলিতে করে?

মিনিটখানেকের মধ্যেই প্রশ্নের জবাব পেলাম, আর চমক যেটা লাগল সেটা যেমন-তেমন নয়, এবং তার মাত্রা অনুমান করা প্রহ্লাদের কর্ম নয়।

থলি থেকে বার করে যে-জিনিসটা প্রহ্লাদ আমার হাতে তুলে দিল সেটা একটা জানোয়ার। সাইজে বেড়ালছানার মতো। চেহারার বর্ণনা আমার মতো বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এককথায় দেওয়া সম্ভব নয়। প্রাণিবিদ্যাবিশারদদের মতে পৃথিবীতে আন্দাজ দু'লক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর জানোয়ার আছে। আমি তার বেশ কিছু চোখে দেখেছি, কিছুর ছবি দেখেছি, আর বাকি অধিকাংশেরই বর্ণনা পড়ে জেনেছি তাদের জাত ও চেহারা কীরকম। প্রহ্লাদ আমাকে যে-জন্তুটা দিল সেরকম জন্তুর বর্ণনা আমি কখনও পড়িনি। মুখ দেখে বানর শ্রেণীর জানোয়ার বলেই মনে হয়। নাকটা সাধারণ বাঁদরের চেয়ে লম্বা, কপাল বাঁদরের তুলনায় চওড়া, মাথাটা বড়, আর মুখের নিচের দিকটা সরু। কান দুটো বেশ বড়, চাপা, এবং ওপর দিকটা শেয়াল-কুকুরের কানের মতো ছুঁচোল। চোখ দুটো মুখের অনুপাতে বড়ই বলতে হবে—যদিও লরিস বাঁদরের মতো বিশাল নয়। পায়ের প্রান্তভাগে থাবার বদলে পাঁচটা করে আঙুল দেখেও বাঁদরের কথাই মনে পড়ে। লেজের একটা আভাসমাত্র আছে। এ ছাড়া, গোঁফ নেই, সারা গায়ে ছোট ছোট লোম, গায়ের রঙ তামাটে। মোটামুটি চেহারার বর্ণনা হল এই। মাথাটা যে বড় লাগছে, সেটা শৈশব-অবস্থা বলে হতে পারে—যদিও শৈশব কথাটা ব্যবহার করলাম আন্দাজে। এমনও হতে পারে যে, এটা একটা পরিণতবয়স্ক জানোয়ার, এবং এর জাতই ছোট।

মোটকথা এ এক বিচিত্র জীব। প্রহ্লাদ বলল, এটা তাকে দিয়েছে জগন্নাথ। জগন্নাথ থাকে উশ্রীর ওপারে ঝলসি গ্রামে। সে নানারকম শিকড়-বাকল সংগ্রহ করে গিরিডির বাজারে বেচতে আসে সপ্তাহে দু-তিনবার। আমিও জগন্নাথের কাছ থেকে গাছগাছড়া কিনে আমার ওষুধ তৈরির কাজে লাগিয়েছি। জগন্নাথ জন্তুটাকে পায় জঙ্গলে। সে জানে প্রহ্লাদের মনিবের নানারকম উদ্ভট জিনিসের শখ, তাই সে জানোয়ারটা আমার নাম করেই তাকে দিয়েছে।

'কী খায় জানোয়ার, সে-বিষয়ে বলেছে কিছু ?'

'বলেছে।'

'কী বলেছে ?'

'বলেছে শাকসবজি ফলমূল ডালভাত সবই খায়।'

'যাক, তাহলে তো কোনও চিন্তাই নেই।'

চিন্তা নেই বললাম, কিন্তু এতবড় একটা ঘটনা নিয়ে চিন্তা হবে না সে কী করে হয় ? একটা সম্পূর্ণ নতুন জাতের প্রাণী, যার নামধাম স্বভাবচরিত্র কিছুই জানা নেই, যার কোনও উল্লেখ কোনও জন্তু-জানোয়ারের বইয়েতে কখনও পাইনি, সেটা এইভাবে আমার হাতে এসে পড়ল, আর তাই নিয়ে চিন্তা হবে না ? কেমনতরো জানোয়ার এটা ? শান্ত না মিচকে ? কোথায় রাখব একে ? খাঁচায় ? বাক্সে ? বন্দি অবস্থায় না ছাড়া অবস্থায় ? একে দেখে আমার বেড়াল নিউটনের প্রতিক্রিয়া কী হবে ? অন্য লোকে এমন জানোয়ার দেখলে কী বলবে ?

একে নিয়ে কী করা হবে সেটা ভাবার আগে আমি জন্তুটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করলাম। আমার কোল থেকে তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলাম ওটাকে। সে দিব্যি চুপচাপ বসে রইল। তার দৃষ্টি সটান আমার দিকে। ভারি অদ্ভুত এ-চাহনি। এর আগে কোনও জানোয়ারের মধ্যে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এ-চাহনিতে ভয় বা সংশয়ের কোনও চিহ্ন নেই, হিংস্র বা বুনোভাবের লেশমাত্র নেই। এ-চাহনি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, আমার ওপর তার গভীর বিশ্বাস। আমি যে তার কোনও অনিষ্ট করব না, সেটা সে জানে। এছাড়াও চাহনিতে যেটা আছে, সেটাকে বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সত্যি করেই জন্তুটা বুদ্ধিমান কি না, তার পরিচয় না পেলেও, তার চোখের মণির দীপ্তিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তার মস্তিষ্ক সজাগ। সেই কারণেই সন্দেহ হচ্ছে যে, এ-জন্তু হয়তো শাবক নয়। অবিশ্যি এর বয়েসের হদিস হয়তো কোনওদিনও পাওয়া যাবে না। যদি দেখি এর আয়তন দিনে-দিনে বাড়ছে, তাহলে অবিশ্যি বুঝতে হবে এর বয়েস বেশি হতে পারে না।

আজ সকাল সাতটায় জন্তুটা আমার কাছে এসেছে। এখন রাত পৌনে এগারোটা। ইতিমধ্যে পশুসংক্রান্ত যত বই, এনসাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদি আছে আমার কাছে, সবগুলো ঘেঁটে দেখেছি। কোনও জন্তুর বর্ণনার সঙ্গে এর সম্পূর্ণ মিল নেই।

সকালেই নিউটনের সঙ্গে জন্তুটার মোলাকাত হয়ে গেছে। আমার কফিখাওয়ার সময় নিউটন আমার কাছে এসে বিস্কুট খায়। আজও এল। জন্তুটা তখনও টেবিলের ওপরেই রাখা ছিল। নিউটন সেটাকে দেখেই দরজার মুখে থমকে দাঁড়াল। আমি দেখলাম তার লোম খাড়া হচ্ছে। জন্তুটার মধ্যে কিন্তু কোনও চাঞ্চল্য লক্ষ করলাম না। সে কেবল আমার দিক থেকে বেড়ালের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে। অবিশ্যি এই দৃষ্টির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। খুব অল্পক্ষণের জন্য হলেও, তার মধ্যে একটা সতর্কতার আভাস ফুটে উঠেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিউটনের পিঠের লোমগুলো আবার বসে গেল। সে জানোয়ারের দিক

থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে একটা ছোট্ট লাফে আমার কোলে উঠে বিস্কুট খেতে লাগল।

জন্তুটাকে মেপে রেখেছি। নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা অবধি সাড়ে ন' ইঞ্চি। এটার ছবিও তুলে রেখেছি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। রঙিন ছবি, কাজেই পরে রঙ-পরিবর্তন হলে বুঝতে পারব। খাওয়ার ব্যাপারে আজ আমি যা খেয়েছি তাই খেয়েছে, এবং সেটা বেশ তৃপ্তিসহকারে। আজ বিকেলে একবার আমি ওটাকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। একবার মনে হয়েছিল গলায় একটা বকলস পরিয়ে নিই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাতে করে তুলে নিয়ে ঘাসের ওপর ছেড়ে দিলাম। সে আমার পাশেপাশেই হাঁটল। মনে হয় সে এর মধ্যেই বেশ পোষ মেনে গেছে। জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আমার বেশি সময় লাগে না এটা আমি দেখেছি। এর বেলাও সেটা বিশেষভাবে লক্ষ করলাম।

এখন আমি শোবার ঘরে বসে ডায়েরি লিখছি। জন্তুটার জন্য একটা প্যাকিং কেসের মধ্যে বিছানা করে দিয়েছি। মিনিট পাঁচেক হল নিজে থেকেই সে বাক্সের মধ্যে ঢুকেছে।

অকস্মাৎ আমার জীবনে এই নতুন সঙ্গীর আবির্ভাবে আমার মন আজ সত্যিই প্রসন্ন।

আগস্ট ২৩

আজ আমার কতকগুলো জরুরি চিঠি এসেছে। সে-বিষয়ে বলার আগে জানিয়ে রাখছি যে, এই ষোলো দিনে আমার জন্তু আয়তনে নিউটনকে ছাড়িয়ে গেছে। সে এখন লম্বায় ষোলো ইঞ্চি। তার স্বভাবচরিত্রেরও কতকগুলো আশ্চর্য দিক প্রকাশ পেয়েছে, সে-বিষয়ে পরে বলছি।

জন্তুটিকে পাওয়ার দু'দিন পরেই তার ছবিসমেত পৃথিবীর তিনজন প্রাণিবিদ্যাবিশারদকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলাম। কীভাবে এটাকে পাওয়া গেল, এবং এর স্বভাবের যেটুকু জানি সেটা লিখে পাঠিয়েছিলাম। এই তিনজন হলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন ড্যাভেনপোর্ট, ইংল্যান্ডের স্যার রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল, ও জার্মানির ডঃ ফ্রীডরিশ একহার্ট। তিনজনেরই উত্তর আজ একসঙ্গে পেয়েছি। ড্যাভেনপোর্ট লিখছেন—বোঝাই যাচ্ছে পুরো ব্যাপারটা একটা ধাপ্পাবাজি। এই নিয়ে তাঁকে যেন আমি আর পত্রাঘাত না করি। ম্যাক্সওয়েল বলছেন, জন্তুটা যে একটা হাইব্রিড তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হাইব্রিড হল, দুটি বিভিন্ন জানোয়ারের সংমিশ্রণে উদ্ভূত একটি নতুন জানোয়ার। যেমন ঘোড়া আর গাধা মিলে খচ্চর। ম্যাক্সওয়েল চিঠি শেষ করেছেন এই বলে—'পৃথিবীতে আনকোরা নতুন জানোয়ার আবিষ্কারের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সমুদ্রগর্ভে কী আছে না আছে তার সব খবর হয়তো আমরা জানি না, কিন্তু ডাঙার প্রাণী সবই আমাদের জানা। তোমার এই জন্তুকে আরও অনেকদিন স্টাডি করা দরকার। এর স্বভাবে তেমন কোনও চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়লে আমাকে জানাতে পারো।'

ডঃ একহার্ট হচ্ছেন এই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন। তাঁর চিঠিটা একটু বিশেষ ধরনের বলে সেটা সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি।

একহার্ট লিখছেন—

প্রিয় প্রোফেসর শঙ্কু,

তোমার চিঠিটা কাল সকালে পেয়ে আমি সারারাত ঘুমোতে পারিনি। তুমি ছাড়া

অন্য কেউ লিখলে আমি সমস্ত ব্যাপারটা প্রতারণা বলে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে এ-প্রশ্নই ওঠে না। কী আশ্চর্য এক জানোয়ার যে তোমার হাতে এসে পড়েছে সেটা আমি পঞ্চান্ন বছর পশু সম্বন্ধে চর্চা করে বুঝতে পারছি। তোমার তোলা ছবিই এই জানোয়ারের অনন্যসাধারণতা প্রমাণ করে। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তাই তোমার দেশে গিয়ে জানোয়ারটা দেখে আসা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু একটি বিকল্প ব্যবস্থায় তোমার আপত্তি হবে কি না পত্রপাঠ লিখে জানাও। তুমি যদি এখানে আসো তবে তার খরচ বহন করতে আমি রাজি আছি। আমার অতিথি হয়েই থাকবে তুমি। তোমার জানোয়ারের জন্যেও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আমি করব। আমি আপাতত অসুস্থ, ডাক্তার আমাকে দু'মাস বিশ্রাম নিতে বলেছে। যদি নভেম্বর মাসে আসতে পারো তাহলে খুব ভালো হয়। আমি তোমার সঙ্গে যথাসময়ে যোগাযোগ করব—অবিশ্যি যদি জানি যে, তোমার পক্ষে আসা সম্ভব হচ্ছে।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। ইতি

ফ্রীডরিশ একহার্ট

আমি একে জানিয়ে দেব যে, আমার যাওয়ার ইচ্ছে আছে—অবিশ্যি যদি আমার জন্তু বহাল তবিয়তে থাকে।

এবার জন্তুটার বিষয়ে বলি।

ক'দিন থেকেই লক্ষ করছি জন্তুটা আর আমার সামনে চুপচাপ বসে থাকে না। আমার সঙ্গ সে পরিত্যাগ করে না ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে যেন একটা স্বাধীন মনোভাব এসেছে। আমি যখন পড়ি বা লিখি তখন সে সারা ঘরময় নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করে। মনে হয় ঘরের জিনিসপত্র সম্বন্ধে তার বিশেষ কৌতূহল। আলমারির বই, ফুলদানির ফুল, টেবিলের ওপর কাগজকলম দোয়াত টেলিফোন—সব কিছু সম্পর্কে তার অনুসন্ধিৎসা। এতদিন সে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে দেখেই সন্তুষ্ট ছিল, আজ হঠাৎ দেখি চেয়ার থেকে টেবিলে উঠে সে আমার ফাউনটেনপেনটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। এই নাড়াচাড়ার মধ্যে একটা বিশেষত্ব লক্ষ করলাম। তার বুড়ো আঙুল কাজ করে মানুষ বা বাঁদরের মতোই। ডাল আঁকড়ে ধরে গাছে চড়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে বলে বানরশ্রেণীর জানোয়ারের এই কেজো বুড়ো আঙুলের উদ্ভব হয়েছিল। একেও জঙ্গলে থেকে গাছে চড়তে হয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম।

এছাড়া আর-একটা লক্ষ করার জিনিস হল—সে কলমটা দেখছে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে। বানরশ্রেণীর মধ্যে এক ওরাংউটান, ও সময় সময় শিম্পাঞ্জিকে, কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা যায়। গোরিলা দু'পায়ে দাঁড়িয়ে বুকে চাপড় মারে বটে, কিন্তু সেই পর্যন্তই। আমার জন্তু কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

তারপর দাঁড়ানো অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে একটা কাগজ টেনে নিয়ে কলমটা দিয়ে তার ওপর হিজিবিজি কাটতে শুরু করল। আমার চল্লিশ বছরের পুরোনো অতি প্রিয় ওয়াটারম্যান কলম। পাছে তার নিবটা এই জন্তুর হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে যায় তাই বাধ্য হয়ে সেটাকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে সোফা ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলাম। জন্তু যেন আমার উদ্দেশ্য অনুমান করেই হাত বাড়িয়ে কলমটা আমার হাতে দিয়ে দিল।

এই ঘটনা থেকে তিনটে নতুন তথ্য জানতে পারলাম জন্তুটা সম্পর্কে।

১· তার বুড়ো আঙুল মানুষ বা বাঁদরের মতো কাজ করে।

২· সে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বাঁদরের চেয়ে বেশিক্ষণ।

৩· তার বুদ্ধি বানরশ্রেণীর বুদ্ধিকে অনেকদূর অতিক্রম করে যায়।

আরও কত কী যে শিখব এই বিচিত্র জানোয়ারটিকে স্টাডি করে তা কে জানে!

সেপ্টেম্বর ২

জন্তুটা এ ক'দিনে আরও তিন ইঞ্চি বেড়েছে। এখন এর আয়তন মোটামুটি একটা মাঝারি সাইজের কুকুরের মতো। অথবা বছর চারেকের মানুষের-বাচ্চার মতো। এটা বলছি, কারণ, জন্তুটা এখন প্রায়ই দু'পায়ে হাঁটে, হাতে করে খাবার তুলে মুখে পোরে, দু'হাতে গেলাস ধরে দুধ খায়। শুধু তাই নয়, ওকে আর মাঠে নিয়ে যেতে হয় না। ও আমার বাথরুম ব্যবহার করে। গত সপ্তাহে ওর জন্য কয়েকটা রঙিন পেণ্টুলুন করিয়েছি। সেগুলো পরতে ও কোনও আপত্তি করেনি। আজ তো দেখলাম নিজেই পা গলিয়ে পরার চেষ্টা করছে।

আরও একটা বিশেষত্ব লক্ষ করছি। সেটা হল, ঘরে কথাবার্তা হলে ও অতি মনোযোগ দিয়ে শোনে। শোনার সময় তার ভুরু কুঁচকে যায়—সেটা কনসেনট্রেশনের লক্ষণ। আমি জানি এটা অন্য কোনও জানোয়ারের মধ্যে দেখা যায় না। এটা বিশেষ করে লক্ষ করছিলাম যখন কাল অবিনাশবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম।

অবিনাশবাবু আমার প্রতিবেশী এবং বহুকালের আলাপী। এই একটি ভদ্রলোককে দেখলাম যিনি আমাকে কোনওরকম আমল দেন না। বা আমার কাজ সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করেন না। জন্তুটাকে দেখে তিনি ভুরু ঈষৎ কপালে তুলে কেবল বললেন, 'এটা আবার কী বস্তু?'

আমি বললাম, 'এটি একটি আনকোরা নতুন শ্রেণীর জানোয়ার। এর নাম ইয়ে।'

অবিনাশবাবু চুপ করে চেয়ে আছেন আমার দিকে। তারপর বললেন, 'কী হল—মনে পড়ছে না নামটা?'

'বললাম তো—ইয়ে।'

'ইয়ে?'

'ইয়ে। সেটা বাংলা ইয়েও হতে পারে, আবার ইংরিজি **E.A.** অর্থাৎ এক্স্ট্রর্ডিনারি অ্যানিমলও হতে পারে।'

ইয়ে নামটা আমি গতকালই স্থির করছি। ইয়ে বলে দু-একবার ডেকেও দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরানো থেকে মনে হয় সে ডাকে সাড়া দিচ্ছে।

'বাঃ, বেশ নাম হয়েছে,' বললেন অবিনাশবাবু, 'কিন্তু এ কিছু করবে-টরবে না তো?'

জন্তুটা অবিনাশবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের বাঁ হাতের কবজিটা ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রিস্টওয়াচটা দেখছিল। আমি বললাম, 'আপনি কিছু না করলে নিশ্চয়ই করবে না।'

'হুঁ...তা এটাকে কি এখানেই রাখবেন, না জু গার্ডেনে দিয়ে দেবেন?'

'আপাতত এখানেই রাখব। এবং আপনাকে একটা অনুরোধ করব।'

'কী?'

'আমার এই নতুন সম্পত্তিটি সম্বন্ধে দয়া করে কাউকে কিছু বলবেন না।'

'কেন?'—অবিনাশবাবুর দৃষ্টিতে কৌতুকের আভাস—'যদি বলি আপনি একটি ইয়ে সংগ্রহ করেছেন তাতে দোষটা কী? ইয়েটা যে কী সেটা না বললেই হল!'

'এটা চলতে পারে।'

প্রহ্লাদ কফি এনে দিয়েছে। ইয়ে সোফায় ঠেস দিয়ে বসে ঠিক আমাদেরই মতো করে

কাপের হাতলে ডান হাতের তর্জনী গলিয়ে দিয়ে সেটা মুখের সামনে ধরে চুমুক দিয়ে কফি খাচ্ছে।

এই অবাক দৃশ্য দেখেও অবিনাশবাবুর একমাত্র মন্তব্য হল, 'বোঝো !'

একটা মানুষের বিস্ময়বোধ বলে কোনও বস্তু নেই, এটা ভাবতে অবাক লাগে।

সেপ্টেম্বর ৪

আজ এক আশ্চর্য ঘটনা ইয়ে সম্পর্কে আমার এতদিনের ধারণা তছনছ করে দিয়েছে।

দুপুরে আমার পড়ার ঘরে বসে সদ্য ডাকে আসা 'নেচার' পত্রিকার পাতা উলটে দেখছিলাম। ইয়ে আমার পাশে সোফাতে বসে একটা কাচের পেপারওয়েটে চোখ লাগিয়ে সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। এরই মধ্যে সে যে কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে টের পাইনি। হঠাৎ আমার ল্যাবরেটরি থেকে একটা টিনের বাক্স উলটে পড়ার শব্দ পেয়ে ব্যস্তভাবে উঠে গিয়ে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেললাম।

বর্ষার সময় আমার বাগানে মাঝে মাঝে সাপ বেরোয়, সেটা আমি জানি। তারই একটা বোধহয় বারান্দা দিয়ে আমার ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছিল। যে-সে সাপ নয়, একেবারে গোখরো। সেই সাপ দেখি এখন ইয়ের কবলে পড়েছে। সাপের গলায় দাঁত বসিয়ে আমার জন্তু তাকে ধরেছে মরণ-কামড়ে। আর সেইসঙ্গে সাপের লেজের আছড়ানি সে রোধ করছে সামনের দু'পা দিয়ে।

ঘটনাটা চলল এক মিনিটের বেশি নয়। কারণ এই আসুরিক আক্রমণ যে সাপকে সহজেই পরাস্ত করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

থেঁতলানো, মরা সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে এবার ইয়ে পিছিয়ে এল। বিজয়গর্বে তার দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, সেটা আমি ঘরের বিপরীত দিক থেকে শুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ইয়ের দাঁত আমি আগে পরীক্ষা করেছি ; সে-দাঁত দিয়ে এ-কাজটা অসম্ভব। কারণ মাংসাশী জানোয়ারের তীক্ষ্ণ শ্ব-দন্ত বা কুকুরে-দাঁত ইয়ের ছিল না।

আর সাপের দেহ যেরকম ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, সে-কাজটা করার মতো তীক্ষ্ণ নখ—যাকে ইংরেজিতে বলে 'ক্ল'—সেও এ-জন্তুর ছিল না।

প্রহ্লাদকে ডেকে সাপটা ফেলে দিতে বলে আমি ইয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম।

'ইয়ে, তোমার মুখটা হাঁ করো তো দেখি।'

বাধ্য ছেলের মতো এই আশ্চর্য জন্তু এককথায় আমার আদেশ পালন করল।

না। এমন দাঁত তো আগে ছিল না, হঠাৎ এর আবির্ভাব হল কী করে ?

চার পায়ের বিশটা আঙুলে যে তীক্ষ্ণ নখ এখন দেখলাম, সে-নখও আগে ছিল না।

কিন্তু বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়।

দশ মিনিটের মধ্যে নখ ও দাঁত আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

পশুবিজ্ঞান এই রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারে কি ? মনে তো হয় না।

নভেম্বর ১

কাল জার্মানি রওনা হব। আমাকে যেতে হবে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আন্দাজ সত্তর কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কোবলেনৎস শহরে। একহার্টকে গত ক'মাসের ঘটনাবলী জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। সে দ্বিগুণ উৎসাহে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। যাতায়াতের

সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। সাতদিন আমি একহার্টের অতিথি হয়েই থাকব।

ইয়ের আয়তন গত দেড়মাসে আর বাড়েনি, যদিও তার বুদ্ধি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। আজকাল মাঝে মাঝে সে বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তাকে চতুষ্পদ বলতেও দ্বিধা হয়। কারণ অধিকাংশ সময়েই সে দু'পায়ে হাঁটে।

পর্যবেক্ষণের ফলে আরও যে-কয়েকটি তথ্য ইয়ে সম্বন্ধে জানা গেছে সেগুলো লিপিবদ্ধ করছি :

১· বদলে-যাওয়া পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়েনেওয়ার আশ্চর্য স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে এ-জন্তুর। সে জঙ্গল থেকে এলেও, মানুষের মধ্যে বাস করে তার স্বভাব দিনে দিনে মানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে।

২· গোখরোর ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, শত্রুকে পরাস্ত করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকৃতি এই জানোয়ারকে দিয়েছে। বেজির স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে সাপকে বেকায়দায় ফেলার। এ-ব্যাপারে বেজির নখ ও দাঁত তাকে সাহায্য করে। ব্যাঙের সে-ক্ষমতা নেই, তাই ব্যাঙ সহজেই সাপের শিকারে পরিণত হয়। একদিন হঠাৎ যদি সাপের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ব্যাঙের নখ ও দাঁত গজায় তাহলে সেটা যত আশ্চর্য ঘটনা হবে, আমার জন্তুর সহসা নখ-দন্ত উদ্‌গমও সেইরকমই আশ্চর্য ঘটনা। আমি জানি, আবার যদি তাকে সাপের সামনে পড়তে হয়, তাহলে আবার তার নখ ও দাঁত গজাবে।

৩· এই জানোয়ারের জাতটাই হয়তো বোবা, কারণ এই ক'মাসে একটিবারের জন্যও সে কোনওরকম শব্দ করেনি।

নভেম্বর ৫

ইয়ে আর-একবার চমকে দিয়েছে আমাকে।

আমি ওর জন্য একটা বাক্স তৈরি করিয়ে নিয়েছিলাম, যেটা এয়ারওয়েজের কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করে প্লেনের লেজের দিকে ক্যাবিনের মধ্যেই রাখা হয়েছিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছনোর দশ মিনিট আগে আমি ইয়ের কাছে গিয়েছিলাম তাকে একটা গরম কোট পরিয়ে দেব বলে। গিয়ে দেখি ইয়ের চেহারা বদলে গেছে ; তার সর্বাঙ্গে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা লোম গজিয়ে তাকে বরফের দেশে বাসের উপযুক্ত করে দিয়েছে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার আর-একটা জলজ্যান্ত প্রমাণ।

ফ্রাঙ্কফুর্টে নেমে দেখি আশি বছরের বৃদ্ধ ডঃ একহার্ট নিজেই এসেছেন আমাকে রিসীভ করতে। এয়ারপোর্টে আর ইয়েকে বাক্স থেকে বার করলাম না, কারণ ওরকম সৃষ্টিছাড়া জানোয়ারকে দেখলে যাত্রীদের মধ্যে হইচই পড়ে যেত। একহার্ট অবিশ্যি পুলিশের বন্দোবস্ত করেছিলেন। তাছাড়া কোনও সাংবাদিক বা ফোটোগ্রাফারকে আমার আসার খবরটা দেননি।

একহার্টকে দেখে বলতে বাধ্য হলাম যে, তাঁর বয়স যে আশি সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। সত্যি বলতে কি, পঞ্চাশ-বাহান্নর বেশি মনে হয় না। একহার্ট হেসে বললেন যে, সেটা জার্মানির আবহাওয়ার গুণ।

পথে গাড়িতে ভদ্রলোককে ইয়ের লোম গজানোর খবরটা দিলাম। একহার্ট বললেন, 'তোমার জানোয়ারের বিষয় যতই শুনছি ততই আমার বিস্ময় বাড়ছে। আমি ইচ্ছে করেই অন্য কোনও প্রাণিবিদ্‌ বা বৈজ্ঞানিককে তোমার আসার খবরটা দিইনি, কারণ তাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি যে, তারা ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারটা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে

দেখে না। তাদের কাছে ইন্ডিয়া এখনও রোপ-ট্রিক্ আর স্নেক-চার্মারের দেশ।'

এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা কোবলেনৎস পৌঁছে গেলাম। শহরের বাইরে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে একহার্টের বাসস্থান। আমি জানতাম যে, একহার্টের পরিবার জার্মানির সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্যতম। বাড়ির ফটকে 'শ্লস্ একহার্ট' অর্থাৎ একহার্ট কাস্‌ল ফলক তার সাক্ষ্য বহন করছে। কাস্‌লের চারদিক ঘিরে নানান গাছে ভরা বিস্তীর্ণ বাগান, তাতে গোলাপের ছড়াছড়ি। বাড়িতে প্রবেশ করার আগেই একহার্ট জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর স্ত্রী বছর চারেক হল মারা গেছেন। এখন বাড়িতে থাকেন চাকর-বাকর ছাড়া একহার্ট নিজে এবং তাঁর মহিলা সেক্রেটারি। সদর-দরজা দিয়ে ঢুকেই মহিলাটির সঙ্গে আলাপ হল। নাম এরিকা ওয়াইস। চেহারায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পেলেও, তার সঙ্গে একটা উদাস ভাব লক্ষ করলাম।

বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই বাক্স থেকে ইয়েকে বার করলাম। সে তৎক্ষণাৎ করমর্দনের ভঙ্গিতে একহার্টের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বলেই হয়তো একহার্টের হাতটা তৎক্ষণাৎ প্রসারিত হল না। সেই অবসরে ইয়ে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল সেক্রেটারির দিকে। শ্রীমতী ওয়াইসের চোখে বিস্ময় ও পুলকের দৃষ্টি আমি ভুলব না। জানোয়ারের প্রতি প্রকৃত মমত্ববোধ না থাকলে এ-জিনিস হয় না।

একহার্ট বললেন, 'আমার কুকুর দুটোকে আপাতত বন্দি করে রেখেছি। কারণ তোমার এ-জানোয়ারকে দেখে তাদের কী প্রতিক্রিয়া হবে বলা মুশকিল।'

আমি বললাম, 'আমার বিশ্বাস তোমার কুকুর যদি সভ্যভব্য হয় তাহলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে না, কারণ আমার বেড়াল আমার জন্তুকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করেছে।'

হাঁটতে হাঁটতে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকতেই একটা দৃশ্য দেখে কেমন যেন থমকে গেলাম।

এ কি প্রাণিতত্ত্ববিদের বাড়ি, না প্রাণিহত্যাকারীর? ঘরের চারদিকে এত জন্তু-জানোয়ারের স্টাফ্-করা মাথা আর দেহ শোভা পাচ্ছে কেন?

একহার্ট হয়তো আমার মনের ভাবটা আন্দাজ করেই বললেন, 'আমার বাবা ছিলেন নামকরা শিকারি। এসব তাঁরই কীর্তি। এই নিয়ে বাপের সঙ্গে আমার বিস্তর কথা-কাটাকাটি হয়েছে।'

ইয়ে ঘুরে ঘুরে জন্তুগুলো দেখছিল। চা আসার পর সে-ও আমাদের সঙ্গে সোফায় বসে পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে লাগল। একহার্টের দৃষ্টি বারবার তার দিকে চলে যাচ্ছে সেটা আমি লক্ষ করছিলাম। ইয়ে যে ভারতীয় ভেলকি বা ধাপ্পাবাজি নয় সেটা আশা করি ও বুঝেছে। কিন্তু আশি বছর বয়েসে সে এমন স্বাস্থ্য কী করে রেখেছে সেটা এখনও আমার কাছে দুর্বোধ্য। আলাপ আর-একটু জমলে পর এর রহস্যটা কী সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে।

চা-পান শেষ হলে পর একহার্ট সোফা থেকে উঠে পড়ে বললেন, 'আজকের দিনটা তুমি বিশ্রাম করো। তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেবে এরিকা। কাল সকালে ব্রেকফাস্টের সময় আমার একটি পশুপ্রেমিক বন্ধুর সঙ্গে তোমার আলাপ হবে। আমার বিশ্বাস তাকে তোমার পছন্দ হবে।'

আমার দুটো সুটকেস একহার্ট-ভৃত্য আগেই আমার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, এবার কার্পেটে মোড়া বাহারের সিঁড়ি দিয়ে এরিকার সঙ্গে আমি গেলাম দোতলায়। থাকার ব্যবস্থা উত্তম। দুটি পাশাপাশি ঘর, একটিতে আমি, একটিতে ইয়ে। জানোয়ার কী খাবে জিজ্ঞেস করাতে এরিকাকে বললাম, 'আমরা যা খাই তা-ই খাবে। ওকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই।'

এরিকা শুনে একটা নিশ্চিন্তভাব করার পরমুহূর্তেই তাঁর চাহনির ওপর যেন একটা সংশয়ের পর্দা নেমে এল। তিনি যেন কিছু বলতে চান, কিন্তু ইতস্তত করছেন।

'আর কিছু বলার আছে কি ?' আমি আশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করলাম।

'মানে ভাবছিলাম···তোমার কাছে কোনও অস্ত্র আছে কি ?'

'কেন, এখানে কি চোর-ডাকাতের উপদ্রব হয় নাকি ?'

'না, তা নয়, কিন্তু···ভাবছিলাম···তোমার জন্তুর তো একটা প্রোটেকশন দরকার। এমন আশ্চর্য প্রাণী···'

'ভয় নেই, আমার পিস্তল আছে।'

'পিস্তল ?'

পিস্তল শুনে এরিকা ভরসা পেলেন না। বোধহয় বন্দুক কি স্টেনগান বললে আরও আশ্বস্ত হতেন।

আমি আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তলের মহিমা আর এঁর কাছে প্রকাশ করলাম না। শুধু বললাম, 'ভয় নেই। পিস্তলই যথেষ্ট।'

ভদ্রমহিলা চাপা কণ্ঠে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। মনে একটা সামান্য খট্‌কার অনুপ্রবেশ রোধ করতে পারলাম না। যদিও জানি যে আমার পিস্তলের মতো ব্রহ্মাস্ত্র আর দ্বিতীয় নেই।

ইয়ে ইতিমধ্যে নিজে থেকেই তার ঘরে চলে গেছে। গিয়ে দেখি সে জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে। আশা করি তার মনে কোনও উদ্বেগ নেই। এই অবোলা জীবের মন বোঝা সব সময় আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তার যদি কোনও অনিষ্ট হয় তাহলে আমার অবস্থা হবে শোচনীয়। এই ক'মাসে তার ওপর গভীর মায়া পড়ে গেছে।

নভেম্বর ৬

আজ কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। তার সঙ্গে কিছু চমক লাগাবার মতো ঘটনাও ঘটেছে, এবং সেটা, বলা বাহুল্য, ইয়েকে কেন্দ্র করে।

কাস্‌পার মাক্সিমিলিয়ান হেলব্রোনার—এই গালভরা নামের অধিকারী হলেন একহার্টের বন্ধু। তবে এঁকে আমি কাস্‌পার বলেই উল্লেখ করব। কারণ একহার্টও তাঁকে ওই নামেই ডাকেন। একহারা, ঢ্যাঙা চেহারা, মাংসের অভাবে চোয়াল ও চিবুকের হাড় বেরিয়ে মুখে একটা পাথুরে ভাব এনেছে, তার সঙ্গে রয়েছে একজোড়া ঘন ভুরু আর একমাথা কদমছাঁট চুল। চেহারা দেখলে সম্ভ্রমের চেয়ে শঙ্কাই হয় বেশি। ইনি যে কখন কী করে বসবেন বলা যায় না।

একহার্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'কাস্‌পার আমার অনেককালের বন্ধু। জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে ইনি বিশেষ উৎসাহী ও ওয়াকিবহাল।'

ইয়ে অবশ্য আমার সঙ্গেই ছিল। কাস্‌পার তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কেবল একটি মন্তব্যই করলেন : 'হোয়াট এক্সকুইজিট ফার !'

ইয়ের গায়ের লোম যে অতি মসৃণ এবং সুদৃশ্য সেটা সকলেই স্বীকার করবে। বিশেষ করে গোলাপির মধ্যে এমন হলুদের আভা আর কোনও জানোয়ারের লোমে আমি দেখিনি। কিন্তু লোমের প্রতি কাস্‌পার সাহেবের এই লোলুপ দৃষ্টি আমার মোটেই ভালো লাগল না। এই লোমের জন্য কত নিরীহ প্রাণীকে যে হত্যা করা হয়ে থাকে—বিশেষত পশ্চিমে—তার হিসাব নেই। চিঞ্চিলা নামে একটি ইঁদুরজাতীয় জানোয়ার আছে। তার

লোম অভিজাত মেমসাহেবদের এত প্রিয় যে, একটি জানোয়ারের লোমের জন্য তাঁরা দশ-বিশ হাজার টাকা দিতেও প্রস্তুত। মনে মনে বললাম, হে ঈশ্বর, লোমব্যবসায়ীর দৃষ্টি যেন আমার এই জন্তুটির ওপর না পড়ে।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে বাকি কথা হল। ইয়েকে টেবিলে বসে খেতে দেখে কাস্‌পার বললেন, 'আশ্চর্য ট্রেনিং দিয়েছ তো তোমার জানোয়ারকে। এ যে দেখছি শিম্পাঞ্জিকেও হার মানায়।'

আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, ইয়ে যা করছে তার কোনওটাই আমি তাকে শেখাইনি। আসলে ওর পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণের ক্ষমতা অসাধারণ।

'পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ খাপ খাইয়ে নেওয়ার যে-কথাটা তুমি বলছিলে, তার কোনও নমুনা দেখাতে পারো কি?'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'আমি তো ওকে ডিমনস্ট্রেশন দেওয়ার জন্যে আনিনি। সেটা যদি তোমার সামনে আপনা থেকেই ঘটে তাহলেই দেখতে পাবে। আসলে সব প্রাণীকেই প্রকৃতি আত্মরক্ষার কতকগুলো উপায় সমেত সৃষ্টি করে। বাঘের গায়ের ডোরা আর বুটি তাদের জঙ্গলের গাছপালার মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়ে মিশে থাকতে সাহায্য করে। তাছাড়া এক জানোয়ার যাতে সহজে অন্য জানোয়ারের শিকার না হয়ে পড়ে তারও ব্যবস্থা থাকে। শজারুর কাঁটা অনেক জাঁদরেল জানোয়ারকেও বেকায়দায় ফেলে দেয়। অনেক জানোয়ারের গায়ের উগ্র গন্ধ তাদের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যারা অপেক্ষাকৃত নিরীহ জানোয়ার—যেমন হরিণ বা খরগোশ—প্রকৃতি তাদের দিয়েছে দ্রুতবেগে পলায়নের ক্ষমতা। অবিশ্যি এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। সব জানোয়ার শত্রুর হাত থেকে সমান নিরাপদ নয়।'

'তুমি বলছ তোমার এই জন্তু আত্মরক্ষার উপায় জানে?' প্রশ্ন করলেন কাস্‌পার।

আমি বললাম, 'তার দুটো পরিচয় আমি পেয়েছি। গোখরো সাপের আক্রমণ থেকে সে যে শুধু নিজেকে বাঁচিয়েছে তা নয়, সাপকে সে যুদ্ধে পরাজিত করেছে। আর শীতের প্রকোপ থেকে সে কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়েছে সে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। আত্মরক্ষার তাগিদেই ক্রমবিবর্তনের ফলে যে পৃথিবীর প্রাণীর রূপ পালটেছে সে তো জানোই। জলের যখন অভাব হল তখন আদিম জলচর প্রাণী প্রথমে হল উভচর। তারপর স্থলচর। সরীসৃপের ডানা গজিয়েই হল প্রথম উড়ন্ত জানোয়ার—সেও তো পরিবেশ বদলের জন্যেই। এসব পরিবর্তন হতে কোটি কোটি বছর লেগেছিল। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোটা তো চোখের নিমেষে হয় না!'

'কিন্তু তোমার জানোয়ারের ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে?' বললেন কাস্‌পার।

'তাই তো দেখলাম চোখের সামনে।'

কথাটা কাস্‌পার বিশ্বাস করলেন বলে মনে হল না। আমি ভেবেছিলাম একহার্ট আমাকে সাপোর্ট করবেন, কিন্তু তাঁকেও ভ্রূকুঞ্চিত দেখে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম।

প্রাতরাশের পর একহার্ট প্রস্তাব করলেন, তাঁর বিস্তীর্ণ বাগানটা একটু ঘুরে দেখে আসার জন্য। রাত্রে তুষারপাতের ফলে সেই বাগানে এখন বরফের গালিচা বিছানো রয়েছে, সেটা সকালে উঠে জানলা দিয়ে দেখেছি।

আমি প্রস্তাবে আপত্তি করলাম না।

বাগানটা যে কতখানি জায়গা জুড়ে তা আমার ধারণা ছিল না। অবিশ্যি সবটাকেই বাগান বললে ভুল হবে। ফুলগাছের পাট কিছুদূর গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। তারপরে সবই

বড় বড় গাছ, তার মধ্যে অধিকাংশই পাইন জাতীয়। এটাকে বন বললেই ঠিক বলা হবে।

আমি একহার্টকে প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় জানোয়ারের কণ্ঠস্বর শুনে সেটা আর করা হল না।

হাউন্ডের ডাক। অ্যালসেশিয়ান।

'হানসেল আর গ্রেটেলও দেখছি বেড়াতে বেরিয়েছে,' বললেন একহার্ট।

আমি প্রথমে ইয়ের হাত ধরে হাঁটছিলাম, তারপর নিজেই হাতটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন তার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখি তার ভুরু কুঁচকে গেছে।

এবার প্রায় একশো গজ দূরে কুকুর দুটোকে দেখতে পেলাম। দুটোর গলাতেই বকলস, চামড়ার দড়ি এক্‌হার্টের চাকরের হাতে ধরা।

কুকুর আর আমরা পরস্পরের দিকে এগিয়ে চলেছি। দূরত্ব যখন আন্দাজ ত্রিশ গজ, তখন অ্যালসেশিয়ান দুটো থেমে গেল, তাদের দৃষ্টি সটান ইয়ের দিকে। আমরা চারজনেও থেমে গেছি। আমি ইয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা ধরে নিলাম। কাস্‌পার ও এক্‌হার্ট, বুঝতেই পারছি, ঘটনা কোন্ দিকে যায় তাই দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন।

দুটো কুকুরের দড়িতেই যে টান পড়ছে, সেটা আমি লক্ষ করছিলাম, আর সেইসঙ্গে মৃদু হুঙ্কারও শুনতে পাচ্ছিলাম মাঝে মাঝে।

হঠাৎ প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টানে এক্‌হার্ট-ভৃত্যকে বরফের ওপর ফেলে দিয়ে হানসেল আর গ্রেটেল ছুটে এল আমাদের দিকে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার হাতে একটা টান অনুভব করাতে দেখলাম ইয়ে বিদ্যুদ্বেগে বাঁ দিকে ছুটে গিয়ে একটা তুষারাবৃত ঝোপের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে ভয় পেয়েছে। এই জোড়া-প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করার ক্ষমতা প্রকৃতি তাকে দেয়নি।

প্রায় যন্ত্রের মতোই আমিও ছুটে গেলাম ইয়ের পিছনে, আর আমার পিছনে এক্‌হার্ট ও কাস্‌পার।

কুকুর দুটোর হিংস্র চাহনি আগেই লক্ষ করেছিলাম ; এবার দেখলাম শিকারের লোভে তাদের পাগলের মতো ছোটাছুটি। তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে আমার জন্তুকে।

আমি প্রমাদ গুনলাম। বাধ্য হয়ে চেঁচিয়ে বলতে হল, 'দোহাই ডঃ এক্‌হার্ট, আপনার কুকুর দুটোকে থামান।'

'ইম্‌পসিব্‌ল,' রুদ্ধস্বরে বললেন এক্‌হার্ট, 'এ-অবস্থায় ওদের থামানো ভগবানের অসাধ্য।'

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার—যেদিকে ইয়ে গিয়েছিল সেই দিকেই গিয়েছে কুকুর দুটো, কিন্তু আমার সেই পোষা অনুগত জানোয়ারের কোনও চিহ্ন নেই।

প্রায় পাঁচ মিনিট উদ্দাম দাপাদাপির পর হানসেল আর গ্রেটেল হাল ছেড়ে দিয়ে জিভ বার করে হাঁপাতে লাগল, আর তাদের পরিচালক এগিয়ে গিয়ে কুকুরের গলার দড়ি হাতে তুলে নিল।

'ওদের বাড়িতে নিয়ে যাও,' হুকুম করলেন এক্‌হার্ট।

'কিন্তু তোমার জানোয়ার কোথায় উধাও হল ?' প্রশ্ন করলেন কাস্‌পার।

আমিও অবিশ্যি সেই কথাই ভাবছিলাম। অথচ আশেপাশে মাটিতে গর্ত বা গাছের গায়ে ফোকরও নেই যাতে তার ভেতর লুকনো যায়।

কুকুর দুটো প্রায় বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছনোর পর আত্মপ্রকাশ করল আমার আশ্চর্য জানোয়ার।

কিন্তু এ কী হয়েছে তার চেহারা ? সে কি এতক্ষণ বরফে গড়াগড়ি করেছে ?

না, তা নয়। তার গায়ের রঙ, তার চোখের মণি, তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ হয়ে গেছে ধবধবে সাদা। সে এখন একটা তুষারপিণ্ডের শামিল। এই অবস্থায় এই পরিবেশে তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

'গট্ ইন হিমেল !' চেঁচিয়ে উঠলেন কাস্‌পার। হ্যাঁ, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ এই অবস্থায় স্বাভাবিক। এমন আশ্চর্য ঘটনা এই দুই জার্মান নিশ্চয়ই কোনওদিন দেখেননি।

আমরা চারজন আবার এক্‌হার্ট কাস্‌লে ফিরে এলাম। সবাই মিলে সোফায় বসতে কাস্‌পারই প্রথম মুখ খুললেন।

'তোমার এই মহামূল্য সম্পত্তির ভবিষ্যৎ কী তা তুমি স্থির করেছ ?'

সহজ উত্তর। বললাম, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ওকে আমার কাছেই রাখব। ও আমার সঙ্গী। এই ক'মাস আমিই ওকে প্রতিপালন করেছি।'

'কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসেবে বিশ্বের প্রাণিবিদ্‌দের প্রতি তোমার কোনও দায়িত্ব নেই ? তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাও তোমার এই জন্তুকে ?'

'লুকিয়ে রাখতে চাইলে আমি তাকে এখানে এনেছি কেন ? ভবিষ্যতে তাকে কেউ দেখতে চাইলে আমার দেশে আমার বাড়িতে আসতে পারেন। আমার দরজা খোলাই থাকবে। জন্তু আমার কাছে নিরাপদে থাকবে। এখানে এনে কী হল তা তো দেখলেন। এরকম ঘটনা যে আরও ঘটবে না তার কী বিশ্বাস ?'

'কোনও পশুশালায় রাখতে আপত্তি কী ?'

'সেটা রাখলে আমার নিজের দেশের পশুশালাতেই রাখব। কলকাতার চিড়িয়াখানা নেহাত নিন্দের নয়।'

'হুঁ...'

কাস্‌পার উঠে পড়লেন।

'ঠিক আছে। আমি তাহলে আসি। আমার একটা প্রস্তাব ছিল, সেটা বোধহয় তুমি গ্রহণ করবে না। আমি আর এক্‌হার্ট মিলে তোমাকে বিশ হাজার মার্ক দিতে রাজি আছি তোমার ওই জন্তুর জন্যে। আমাদের দিলে সারা পৃথিবী ওর অস্তিত্ব জানতে পারবে। তার ফলে তোমার নামটাও অমর হয়ে থাকত। কারণ তুমিই যে ওটা দিয়েছ আমাদের, সে-কথা আমরা গোপন রাখতাম না।'

'তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। এ-প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারব না।'

কাস্‌পারের সঙ্গে একহার্টও বেরিয়ে গেলেন, বোধহয় বন্ধুকে গাড়িতে তুলে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হল।

শ্রীমতী এরিকা ওয়াইস। চোখেমুখে গভীর উদ্বেগের চিহ্ন।

'তুমি একা আছ,' বললেন শ্রীমতী ওয়াইস, 'তাই তোমাকে একটা কথা বলে যাই। প্রাণিবিদ্ একহার্টের মৃত্যু হয়েছে এক মাস আগে। তিনিই তোমাকে প্রথম চিঠিটা লিখেছিলেন। ইনি তাঁর ছেলে। এঁরও নাম ফ্রীডরিশ। ইনি শিকারি; জন্তু-জানোয়ারের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা নেই। তুমি কালই চলে যাও এখান থেকে। আমি তোমার টিকিটের বন্দোবস্ত করে দেব। এখানে থাকা নিরাপদ নয়।'

'কিন্তু তুমি তাহলে কার সেক্রেটারি ?'

'এঁর নয়, এঁর বাবার। আমি কতকগুলো কাজ শেষ করে এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে যাব।'

'আর কাস্‌পার ভদ্রলোকটি কে ?'

'ওডিয়ন সার্কাসের মালিক। সার্কাসের সঙ্গে একটা পশুশালা আছে, তাতে নানারকম উদ্ভট জানোয়ার—'

বাইরে জুতোর শব্দ। এরিকা পাশের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন।

'তোমাকে আজ আর বিরক্ত করব না,' ঘরে এসে বললেন এক্‌হার্ট। 'আমাদের প্রস্তাবের কথাটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ। কাল সকালে আবার তোমার সঙ্গে বসব।'

এক্‌হার্ট চলে গেলেন। এতক্ষণ ইয়ের দিকে দৃষ্টি দিইনি, এবার চেয়ে দেখি সে আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে এসেছে।

এখন রাত এগারোটা বাজে। ইয়ের ঘরে গিয়ে দেখে এসেছি সে ঘুমোচ্ছে। আজকের অভিজ্ঞতাটা কি তার কাছে একটা বিভীষিকা, নাকি সে এ-জাতীয় ঘটনা উপভোগ করে ? যে-কোনও প্রাণীই জন্মগ্রহণ করে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে—এক হল আত্মরক্ষা, আর দুই,' খাদ্য আহরণ করে দেহের পুষ্টিসাধন করা। দ্বিতীয়টার ব্যাপারে ইয়ের আপাতত কোনও সমস্যা নেই—অন্তত আমার কাছে সে যতদিন আছে। আর প্রথমটি যে সে অনায়াসেই করতে সক্ষম, তার প্রমাণ তো পাওয়াই গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, আজ এরিকা যে-বিপদের কথা বললেন, সেটা কী ধরনের বিপদ ? জানোয়ারের সঙ্গে ইয়ে যুঝতে পারে, কিন্তু মানুষের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তার শক্তি কতটুকু তা তো জানা নেই।

এ-বিষয়ে কাল ভাবা যাবে। দেখি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

নভেম্বর ৭

কাল রাতের চরম শিহরন জাগানো ঘটনা আর তার অদ্ভুত পরিসমাপ্তির কথা কোনও দিন ভুলব না।

কাল এগারোটায় শুয়ে পড়লেও ঘুম আসতে দেরি হয়েছিল। একহার্টের প্রতারণার ব্যাপারটা বারবার মনের মধ্যে মোচড় দিচ্ছিল। বোঝাই যাচ্ছে তার বাপের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে সে আমার জন্তুটিকে হাত করার লোভে আমাকে এখানে আনিয়েছে। সে আমাকে যাতায়াতের খরচ দেবে বলেছিল, এখনও দেয়নি। হয়তো ভেবেছিল জন্তুর জন্য বিশ হাজার মার্ক দিলে সেটা পুষিয়ে যাবে। সে-টাকা যে আমি নেব না, সেটা কি এক্‌হার্ট ভেবেছিল ?

ঘুমটা এল একেবারে ম্যাজিকের মতো। বাইরে সিঁড়ির নিচে গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে বারোটা বাজতে আরম্ভ করল সেটা শুনেছি, কিন্তু শেষ হওয়াটা আর শুনিনি। অর্থাৎ তার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুমটা ভাঙল মাঝরাতে। প্রথমে মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। তারপর বুঝলাম আমার শরীরটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা হচ্ছে ; আর তারপরেই দেখলাম আমি বন্দি, অনড়। আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে। আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তল বালিশের তলায়, সেটারও নাগাল পাওয়ার জো নেই। ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে চোখ পড়াতে দেখলাম সাড়ে তিনটে। বাইরে পূর্ণিমার আলো, তাই হঠাৎ মনে হয়েছিল বুঝি ভোর হয়ে গেছে।

ঘরে অন্তত চার-পাঁচজন লোক সেটা দেখতে পাচ্ছি। একজনের হাতে টর্চ, সেটা আমার দিকে ঘোরানো রয়েছে। পাশের ঘরেও পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি। ইয়ে কি তাহলে— ?

'প্রফেসর শঙ্কু, তোমার আশ্চর্য জন্তু না মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে

পারে ? আত্মরক্ষার অদ্ভুত সব উপায় সে নাকি চোখের পলকে উদ্ভব করতে পারে ? এবারে বোঝা যাবে তার ক্ষমতার দৌড় ।'

এক্‌হার্টের গলা । দরজার মুখটাতে দাঁড়িয়ে আছে সে ।

'শাইনার, শুল্‌ট্‌স—ওকে ওই পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড় করাও ।'

দু'জন লোক আমাকে এক হ্যাঁচকায় বিছানা থেকে তুলে নিয়ে টেনে-হিঁচড়ে ইয়ের ঘরের দরজার সামনে নিয়ে গেল ।

এই ঘরেও ফিকে চাঁদের আলো, অন্ততপক্ষে ছ-সাতজন লোক, এখানেও টর্চের আলো ঘোরাফেরা করছে । তিনজন লোকের হাতে দড়ি, থলি, জাল—অর্থাৎ জানোয়ার ধরার যাবতীয় সরঞ্জাম । অন্য দু'জন লোকের হাতে ধাতব বস্তুর ঝলসানি দেখে বুঝলাম আগ্নেয়াস্ত্রেরও অভাব নেই ।

কিন্তু বিছানা যে খালি সে তো দেখতেই পাচ্ছি ।

দুটো লোক উপুড় হয়ে খাটের তলায় টর্চ ফেলল, আর সেই মুহূর্তে ঘটল এক তুলকালাম কাণ্ড ।

একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ দমকা হাওয়ার মতো আমার নাকে প্রবেশ করে আমার চোখ থেকে জল বার করে দিল । ল্যাবরেটরিতে নানান কেমিক্যাল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার ফলে কোনও গন্ধই আমাকে কাবু করতে পারে না । কিন্তু এই বীভৎস গন্ধের যে একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে মানুষকে ঘায়েল করার, সেটা বুঝতে পারছিলাম ।

যারা এসেছিল তারা কেউ এ-গন্ধ সহ্য করতে না পেরে নাকে রুমাল দিয়ে প্রায় ছটফট করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । এক্‌হার্টও অবশ্য এই দলে পড়েন ।

এরপরেই শুনতে পেলাম এক্‌হার্টের চিৎকার । তিনি বাইরের কোনও একটা জানলা দিয়ে মুখ বার করে বাগানে জমায়েত দলকে উদ্দেশ করে বলছেন, 'তোমরা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থেকো—জন্তুটা জানলা দিয়ে পালাতে পারে !'

আমার দৃষ্টি ইয়ের ঘর থেকে একচুল নড়েনি ।

এবার খাটের তলা থেকে আমার প্রিয় আশ্চর্য জন্তুটি বার হয়ে এল । তারপরে এক লাফে বাগানের জানলার সামনে পৌঁছে আরেক লাফে জানলার বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ল । সে কি ওই অস্ত্রধারীদের শিকার হতে চলেছে ?

না, তা নয় । কারণ এই সঙ্কট-মুহূর্তে পালাবার একমাত্র উপায় এই জন্তু উদ্ভব করেছে তার স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে । ক্রমবিবর্তনের অমোঘ নিয়ম লঙ্ঘন করে চোখের নিমেষে এই স্থলচর চতুষ্পদের ডানা গজিয়েছে ।

জানলা দিয়ে বেরিয়ে সে নিচের দিকে না গিয়ে বিস্তৃত ডানার সাহায্যে তীরবেগে উঠল ওপরদিকে । আমি দৌড়ে গিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম জ্যোৎস্নাধৌত ম্লান আকাশে তার দ্রুত সঞ্চরমাণ পক্ষবিশিষ্ট দেহ ক্রমে বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে । বাগান থেকে পরপর দুটো গুলির শব্দ পাওয়া গেল, কিন্তু এই অবস্থায় বন্দুকের নিশানা ঠিক রাখা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় ।

নভেম্বর ১৭

শ্রীমতী এরিকার দৌলতে যুগপৎ আমার মুক্তি, ও বন্ধু-সমেত এক্‌হার্টকে পুলিশের হাতে সমর্পণ—এই দুটোই সম্ভব হয়েছিল ।

গিরিডি ফেরার সাতদিন পরে খবরের কাগজে পড়লাম নিকারাগুয়ার গভীর অরণ্যে এক পশু সংগ্রহকারী দল একটি আশ্চর্য নতুন জানোয়ারের সাক্ষাৎ পেয়েছে। এই জানোয়ার নাকি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দলের লোকেদের দিকে বারবার সেল্যুটের ভঙ্গিতে ডান হাতটা তুলে কপালে ঠেকাচ্ছিল। কিন্তু তাকে যখন জাল দিয়ে ধরতে যাওয়া হয়, তখন সে চোখের নিমেষে একটা একশো ফুট উঁচু গাছের মাথায় চড়ে ডালপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। পশুসংগ্রহকারী দল নাকি এই জানোয়ারের লোভে তাদের অভিযানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছে।

জানোয়ারের বর্ণনা থেকে তাকে আমারই ইয়ে বলে চিনতে কোনও অসুবিধা হয় না। এতদিন মানুষের মধ্যে থেকে সে মানুষের স্বভাব আয়ত্ত করেছিল, এখন আবার জঙ্গলের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কিছুদিন খোঁজার পরই যে এ-অভিযাত্রী দল হাল ছাড়তে বাধ্য হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু ইয়ে কি তাহলে আর ফিরে আসবে না আমার কাছে ?

না এলেই ভালো। যতদিন তার আয়ু, ততদিন তার আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে সে বেঁচে থাকুক। আমার বৈজ্ঞানিক মনের একটা অংশ আক্ষেপ করছে যে,তাকে ভালো করে স্টাডি করা গেল না, তার বিষয়ে অনেক কিছুই জানা গেল না। সেইসঙ্গে আর-একটা অংশ বলছে যে, মানুষের সব-জেনে-ফেলার লোভের একটা সীমা থাকা উচিত। এমন কিছু থাকুক, যা মানুষের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করতে পারে, বিস্ময় জাগিয়ে তুলতে পারে।

☐ ১৯৮৩





বিচিত্র সেই রামধনু

বিমল কর

ঘাটশিলায় বেড়াতে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ। আমরা একই বাড়ির ভাড়াটে ছিলাম। আমি থাকতাম বাড়ির পশ্চিম দিকে—সস্ত্রীক। উনি থাকতেন পুবের দিকে। একা।

ভদ্রলোকের নাম শিবতোষ মৈত্র। বয়েস বছর বাহান্নর বেশি হবে না। কিন্তু ওঁকে দেখলে মনে হত প্রায়-বৃদ্ধ। মাথার চুল একেবারে সাদা, গায়ে মাংস না-থাকার মতনই, হাড় হাড় চেহারা। চোখ দুটি গর্তে ডোবানো, চোখের তলায় নীলচে দাগ কালো হয়ে উঠেছে। ওঁর গায়ের রঙ খুবই ফরসা, 'ধবধবে' বলা যায়। তবে অমন ফরসা রঙের ওপর শ্বেতী ধরলে কেমন যেন দেখায়। মনে হত, সর্বাঙ্গ যেন পুড়ে গিয়েছিল।

মানুষটিকে বড় নিঃসঙ্গ,অসহায় দেখাত। লক্ষ করে দেখতাম, উনি সকাল বিকেল ছাড়া বাইরে বড় একটা বেরোন না। স্টেশনের কাছের একটা দোকান থেকে টিফিন কেরিয়ারে করে ওঁর খাবার আসত। চায়ের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছিলেন।

আমার স্ত্রীর ধারণা হয়েছিল, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বিপত্নীক। এক-আধ বছরের মধ্যে স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। এমন ধারণা আমার গৃহিণীর কেন হয়েছিল আমি জানি না।

এক-আধ দিন অপেক্ষা করে নিজেই শিবতোষবাবুর সঙ্গে আলাপ করলাম। শুনলাম, উনি কলকাতার লোক, থাকেন শোভাবাজারের দিকে। এল আই সি-তে চাকরি করেন। ভালো চাকরি।

প্রথম আলাপেই লক্ষ করলাম, ভদ্রলোক অত্যধিক সিগারেট খান। ওঁর গলার স্বর সরু এবং ভাঙা ভাঙা। কথা বলার সময় অগোছালো হয়ে যান, খানিকটা যেন বেশি অন্যমনস্ক থাকেন। হাত কাঁপার রোগ আছে।

দিন কয়েক আলাপের পর একটা জিনিস আমার নজরে পড়ল। শিবতোষ প্রায়ই এমন ব্যবহার করেন যেন তিনি চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছেন না। 'আকাশে কি মেঘ করল ?' 'ওগুলো কী উড়ে গেল বলুন তো, বক ?' 'ডালিমগাছের তলায় একটা লোক বসে আছে না ?'—এইরকম সব কথা। চোখে দেখছেন ঠিকই—তবু সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

একদিন আমি বললাম, 'আপনি কি চোখে কম দেখেন ?'

'না।'

'তাহলে ?'

সামান্য চুপ করে থেকে শিবতোষ বললেন, 'চোখে যা দেখি সব সময় বিশ্বাস করতে পারি না।'

অদ্ভুত জবাব। হেঁয়ালি।

বার কয়েক কেন, প্রায়ই উনি ওই কথাটা বলেন দেখে আমি একদিন বললাম, 'আপনি চোখে ভালোই দেখেন। কাগজ পড়ার সময় ছাড়া চশমাও পরেন না। অথচ বলেন, চোখে যা দেখেন সব সময় বিশ্বাস করতে পারেন না। কেন বলুন তো ?'

'বলে কী হবে ?'

আমি হেসে বললাম, 'হয়তো কিছুই হবে না। তবে আমি চোখের ডাক্তার। আগে হয়তো আপনাকে বলেছি। বড় ডাক্তার নই। ডাক্তার হিসেবেই জানতে ইচ্ছে করে।'

শিবতোষ কথার কোনও জবাব দিলেন না। অনেকটা পরে বললেন, 'ও, আপনি তো চোখের ডাক্তার! ...না, ডাক্তার আমি আগেও দেখিয়েছি। চোখের দোষ নেই।'

'তবে ?'

'তবে!...কী জানি, আপনাকে কী বা বলব! নিজের চোখকে কে আর অবিশ্বাস করে। কিন্তু আমার চোখকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারি না। কেন পারি না—সে-কথা শুনলে আপনি আমায় পাগল বলবেন।'

'আমি কিছুই বলব না।'

'দেখুন, আমি অনেককেই কথাটা বলেছি। সবাই ভেবেছে আমি হয় বানানো গল্প বলছি, না হয় আমার মাথার মধ্যে একটা পাগলামি ঢুকে গিয়েছে।'

'মাথার মধ্যে পাগলামি ঢুকলে তার একটা কারণ থাকে। আপনাকে দেখে আমার তো পাগল মনে হয় না।' বলে আমি হাসলাম।

শিবতোষ আবার একটা সিগারেট ধরালেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। আঙুলগুলো হলুদ। উনি একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

আমি অপেক্ষা করে থাকলাম।

শেষে উনি বললেন, 'ঠিক আছে। বলেছি অনেককে, আপনাকেও না হয় বলব। আপনি বিশ্বাস করবেন না, আমি জানি।...আজ থাক। কাল শুনবেন।'

পরের দিন সন্ধেবেলায় শিবতোষ আমাকে তাঁর কাহিনী শোনান।

'আমার এই অভিজ্ঞতা আপনি বিশ্বাস করবেন বলে মনে হয় না। না করাই স্বাভাবিক। বছর দুই আগে, অন্য কেউ যদি আমাকে এরকম একটা ঘটনার কথা শোনাত আমিও বিশ্বাস করতাম না। ভাবতাম, গল্পের গরু গাছে উঠেছে।' বলে শিবতোষ তাঁর কথা শুরু করলেন :

'সামান্য ভূমিকা দিয়ে শুরু করি।

'গত বছরের আগের বছর বর্ষার পর আমার শরীরটা হঠাৎ খারাপ হতে শুরু করে। মাঝে মাঝে জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা, অনিদ্রা, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট—এইসব উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। পাড়ার বলাই ডাক্তার আমার বন্ধু। প্রথমটায় ফ্লু, ডেঙ্গু—যা মনে এল বলল সে ; বলে কয়েকটা সাধারণ বাজারী ওষুধ খাওয়াল। তাতে কোনও লাভ হল না। তখন বলল, ম্যালেরিয়া হতে পারে। কলকাতায় এখন ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। হয় ম্যালেরিয়া না হয় মিক্সড টাইফয়েড। বলাই ডাক্তার আমার রক্ত মলমূত্র পরীক্ষা করাল। কিছু পেল না। তবু সে ম্যালেরিয়া টাইফয়েড দুই চিকিৎসাই চালিয়ে গেল কিছুদিন। শেষে ই সি জি হল,

এক্স-রে হল। না, কিছু নেই। বলাই ডাক্তার তখন তামাশা করে বলল, "দেখো হে শিবু, তোমার এই অসুখটা হল বুড়ো হওয়ার অসুখ। বিয়ে-থা করলে না, বয়েস পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। মেয়ে হলে বলতাম, ইয়ের সময় হয়েছে, এখন খানিকটা গোলমাল হবে। তুমি একে মদ্দা, তায় আইবুড়ো। তোমায় যে কী বলব!...এক কাজ করো, মাসখানেক বাইরে কোথাও গিয়ে কাটিয়ে এসো। হ্যাভ এ চেঞ্জ। তবে তীর্থ করতে যাওয়ার মতন মন নিয়ে যেয়ো না। হালকা মন নিয়ে যাবে, মজা করে থাকবে, ফুর্তিফার্তা করবে। এন্‌জয় করবে, বুঝলে। দু-চার পাত্র টানতেও পারো। মোট কথা, বুড়ো হয়ে যাচ্ছ—এই ভাবটা ঝেড়ে ফেলবে মন থেকে, শরীর থেকে, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

'বলাই ডাক্তার বন্ধু লোক, সে আমাকে নিয়ে তামাশা করতেই পারে। হেসে বললাম, "তাহলে তুমি বলছ, এটা বুড়ো হয়ে আসার রোগ?"

'"হ্যাঁ। মানে, কোনও রোগই নয়। জ্বরজ্বালা এমনই হয়েছিল, সেটা সেরে গিয়েছে। তোমার যা আছে, এখন তা হল ফেটিগ, ডিপ্রেশান, খানিকটা সাইকোলজিক্যাল লোন্‌লিনেস।...হ্যাভ এ চেঞ্জ। অল রাইট হয়ে যাবে।"

'আমি চলে আসছিলাম। হঠাৎ বলাই ডাক্তারের কী যেন মনে পড়ে গেল। বলল, "একটু বসো। রিসেন্টলি দু-একটা ফাইল পেয়েছি ওষুধের। আমার স্যার আমেরিকা গিয়েছিলেন, লেকচার ট্যুরে। কিছু স্যাম্পল নিয়ে এসেছেন ওষুধের। আই হ্যাভ ওয়ান অর টু ফাইলস। নার্ভে ভালো কাজ দেবে। তোমায় একটা দি।"

'বলাই খুঁজে-পেতে ছোট একটা শিশি বার করল। শিশির মধ্যে ছ'টা ক্যাপসুল। দেখতে একেবারে লাল, টকটকে লাল। ছোট্ট পুঁতির মতন অনেকটা।

'বলাই বলল, "কলকাতায় থাকতে থাকতে একটা খাবে। খেয়ে আমার কাছে আসবে। একবার দেখে নেব।"

'"কেন?"

'"বাইরের ওষুধ। খাঁটি আমেরিকান হে। সব ওষুধ সবাইকে সুট করে না। সাবধান হওয়া ভালো।"

'"একটা খেয়েই যদি ফটাশ হয়ে যাই।"

'"আমি আছি।" বলে বলাই হাসল: "আরে অত ঘাবড়িয়ো না। মরবে না। স্রেফ ড্রাগ।"

'ওষুধের শিশিটা পকেটে পুরে আমি চলে এলাম।

'তার পরের ঘটনা তেমন কিছু নয়। প্রথম ক্যাপসুলটা খেয়ে বলাইয়ের কাছে গেলাম। সে আমায় ভালো করে দেখল। বলল, "ঠিক আছে। নাথিং রং।"

'"তাহলে?"

'"বেরিয়ে পড়ো।...ওষুধটা সপ্তাহে একবার করে খাবে। খালি পেটে খেয়ো না। ছ'টা ক্যাপসুলে তোমার দেড় মাস কেটে যাবে। যদি দেখো শরীরে কোনও অস্বস্তি বোধ করছ, স্টপ ইট, আর খেয়ো না। ঘুমের গোলমাল হলেও বন্ধ করে দিয়ো। তবে আমার মনে হয় না, কিছু গোলমাল হবে। ও কে।"

'বলাই ডাক্তারের কথা মতন আমি পুজোর ক'দিন পরই কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। অফিসে ছুটি নিয়েছি টানা। কলকাতা থেকে বেরুবার সময় মা, ছোট ভাই, ভাইয়ের বউ বারবার বলে দিল, যাচ্ছি যখন শরীর সারাতে, হুট করে না ফিরে আসি। আমার ভাইঝি টুকি আমার গার্জেন। বড্ড পাকা। বলল, "জেঠু, বেশি চা-সিগারেট খাবে

না। আর রোজ গার্গেল করবে। তোমার গলা খসখস সেরে যাবে।"

'কলকাতা থেকে অনেকদিন পরে বেরুলাম। ভালোই লাগছিল।

'যাওয়ার অনেক জায়গা থাকলেও আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম—বারকিবুইয়ায় যাব। জায়গাটা মধ্যপ্রদেশে। নাগপুরে নেমে গাড়ি বদলেও যাওয়া যায়, আবার আজকাল বাসেও যাওয়া চলে। নাগপুর থেকে শ' মাইল মতন।

'বারকিবুইয়ায় আমার বন্ধু রাজশেখর থাকে। রাজশেখর আমার বন্ধু এবং দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই। অনেকবার সে আমাকে তাদের কাছে যেতে বলেছে। যাব যাব বলি—যাই না, মানে হয়ে ওঠে না যাওয়া।...এখানে একটা কথা বলি। রাজুর স্ত্রী সুনন্দার সঙ্গে আমার একবার বিয়ের কথা উঠেছিল বাড়ি থেকে। আমি রাজি হইনি। এমনিই হইনি—কেননা আমার বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না। বিয়ের সম্বন্ধটা পরে রাজুর সঙ্গে পাকা হয়।

'হোটেল-মোটেল ধর্মশালা আমার ভালো লাগে না। আমি বরাবরই গৃহপালিত পশুর মতন গৃহই পছন্দ করি। বারকিবুইয়াই আমার পছন্দ হয়েছিল। নিজেদের আত্মীয়জনের কাছে থাকব, গল্পগুজব করব, খাব দাব ঘুমোব, গাদা গাদা ডিটেকটিভ বই পড়ব, বেড়াব—আবার কী চাই!

'দেওয়ালির ঠিক আগেই আমি বারকিবুইয়া পৌঁছে গেলাম। রাজশেখর আর সুনন্দা আমায় অভ্যর্থনা করল। রাজু একেবারে আহ্লাদে আটখানা।

'বারকিবুইয়ায় আমি পৌঁছেছিলাম দেওয়ালির দু'দিন আগে। দেখতে দেখতে আট-দশ দিন কেটে গেল। সময় যে এমন হু-হু করে কেটে যায় আমার জানা ছিল না।

'দেওয়ালির ধুম বলতে যে কী বোঝায় আমি কাশীতে দেখেছি। কানপুরেও। বছর সাত-আট আগে বেড়াতে গিয়ে দেখেছিলাম। বারকি-তে তার চার আনাও ছিল না। হ্যাঁ, এখানকার লোক বারকিবুইয়াকে ছোট করে বারকি বলে। জায়গাটা ছোট। কোলিয়ারি এলাকা। শ' খানেক কি দেড়েক লোক। তবে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে এদের শহর। সেখানে লোকজন, বাজারহাট, সিনেমা হাউস সবই আছে।

'ছোট জায়গা, লোকজন অল্প, তবু দেওয়ালিতে আলো জ্বলল মন্দ নয়। বাজি পুড়ল, হইচই হল, নেশা আর জুয়া বসল তিন নম্বর সার্কেলে। ওটা কোলিয়ারির লেবার এলাকা। এদিকে ম্যানেজার এঞ্জিনিয়ারের কোয়ার্টার। কথায় বলে বাংলো। আসলে খানিকটা বড়সড় কটেজ। মাথায় খাপরার ছাদ, ছাদের তলায় অ্যাসবেস্টসের সিলিং, সাদা রঙ করা। কল নেই, জল আছে। কুয়োর জল। চমৎকার স্বাদ।

'এখানে বাঙালি তিন-চার ঘর। কম্পাসবাবু সরকারমশাইয়ের বাড়িতে কালীপুজো হল। ম্যানেজার চাড্ডাসাহেবের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া হল রাত্রে। একেবারে নিরামিষ। চাড্ডা পরিবারে মাছ-মাংস চলে না। তবে মদ চলে অল্পস্বল্প।

'আমার ভালোই লাগছিল। জায়গাটা চুপচাপ, শান্ত। গাছপালা ঝোপজঙ্গলে ভর্তি। পাহাড়ী জায়গা। দিনের বেলায় খানিকটা কাজকর্মের হইহল্লা, বিকেলের পর থেকে একেবারে শান্ত হয়ে আসে।

'সকাল থেকে সময়টা যে কেমন করে কাটছিল নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া, গল্পগুজব, দুপুর-ঘুম, এ-বাড়ি ও-বাড়ির লোকের সঙ্গে পরিচয় করে সন্ধে হল কি হল না—তাসের আসর বসে গেল। রাজশেখরের বাড়িতেই।

'আমি কাজ-চালানো গোছের তাস খেলতে পারি। রাজশেখর আর তার বউ সুনন্দা দু'জনেই পাকা তাসুড়ে। চাড্ডাসাহেবও ভালো তাস খেলেন। তবে রোজ হাজির থাকতে

পারেন না। মাথুর আর তার বউ এসে তাসের আসরে বসে যায়। নয়তো প্রাণ। প্রাণময় ঘোষ।

'এরকম একটা জায়গায় সময় কাটাবার জন্যে যে একটা নেশা, তাস-পাশার থাকা দরকার সেটা বুঝতে পারি। ওদের অবশ্য ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু দু'জনেই হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে। নাগপুরে। এবারে তারা তাদের কাকার বাড়ি জব্বলপুরে গিয়ে দেওয়ালি করছে। বারকিতে এসে কেউ বেশিদিন থাকতে চায় না।

'সুনন্দা দুঃখ করে বলে, "কী জানি এ-বনবাস কবে শেষ হবে।"

'রাজু—মানে রাজশেখরকে জিজ্ঞেস করলে বলে, "আমার সয়ে গেছে। এখন আর খারাপ ল্যাগে না। তাছাড়া কি জানো, শিবুদা, আমি পাস করা ডিগ্রি পাওয়া এঞ্জিনিয়ার নই। ছিলাম অ্যাপ্রেনটিস—শ'ওয়ালেসের কোলিয়ারিতে। হাতেকলমে কাজ শিখেছি। একটা ডিপ্লোমাও জুটিয়েছি। বড় জায়গায় কে আমাকে চাকরি দেবে। এখানে পুরোনো হয়ে গিয়েছি। মাইনেপত্র মন্দ পাই না। কয়লা, ইলেকট্রিসিটি ফ্রি। একটা কাজের লোকের জন্যে টাকা দেয়। বড় কোলিয়ারিতে কেউ আমায় পুছবে না। আমি ভালো আছি।"

'রাজু সত্যিই ভালো ছিল।

'সুনন্দা বোধহয় অতটা ভালো ছিল না। তবে অসুখী নয়। তারও বয়েস হয়ে এসেছে। ঠিক বলতে পারব না, হয়তো চল্লিশের বেশি। দেখতে ভালো। তবে সামান্য মোটা। একটা জিনিস আমার ঠিক ভালো লাগত না। সুনন্দার চোখ। বড় বেশি ডাগর, অত্যন্ত উজ্জ্বল। মনে হত সে যেন আমার ব্যাপারে একটু বেশি কৌতূহল নিয়ে সব কিছু দেখে। কখনও কখনও তার চাপা হাসিও আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিত। কেন সে অমন করে মাঝে মাঝে হাসে—আমি বুঝতে পারতাম না।

'তা প্রায় দিন পনেরো কেটে যাওয়ার পর একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারলাম মাথাটা কেমন ভার হয়ে আছে। না, ঠিক মাথাধরা নয়—মাথার মধ্যে যেন কিছু চাপ হয়ে আছে। চোখের চারপাশেও সামান্য ব্যথা।

'সুনন্দা বলল, "ঠাণ্ডা লেগেছে। শীত পড়তে শুরু করার মুখে এমন ঠাণ্ডা লাগে। আপনি কলকাতার লোক, এই ঠাণ্ডা চট করে আপনার সহ্য হয়নি।"

'কথাটা ঠিকই। ঠাণ্ডা পড়ছিল।

'চা-জলখাবার খাওয়ার পর আমি আমার ওষুধটা খাই। সেই ক্যাপসুল। বলাই ডাক্তার যেটা দিয়েছিল। এ-যাবৎ দুটো খাওয়া হয়েছে। একটা কলকাতায়, একটা এখানে এসে। তৃতীয়টা খাওয়ার কথা।

'খাব কি খাব না করে যথারীতি ওষুধটা খেয়ে ফেললাম। না খাওয়ার কোনও কারণ ছিল না। ওষুধটা খেয়ে আমার কোনও ক্ষতি হয়নি। বরং লাভ হয়েছে। যেমন বারকিতে এসে আমি চনমনে বোধ করি, ভালো খিদে হয়, আর রাত্রে মড়ার মতন ঘুমোই।

'মাথা সময় মতন ঠিক হয়ে যাবে ভেবে নিয়ে আমি রোজকার মতন একটু ঘোরাফেরা করতে বেরুলাম।

'এখানে ভালো সিগারেট পাওয়া যায় না। শহর থেকে আনাতে হয়। রদ্দি সিগারেট কিনে হাঁটতে হাঁটতে কোলিয়ারির অফিস। ছোট অফিস। তবু যাই। সামান্য গল্পগুজব করি। বাসী কাগজ দেখি।

'অফিসে সরকারবাবু ছিলেন না। কাজে বেরিয়েছেন। রাজু গিয়েছে তার নিজের কাজে। অল্পক্ষণ বসে চলে আসার সময় মনে হল, মাথার অবস্থা একইরকম আছে।

'বাইরে রোদ মরা মরা দেখাচ্ছিল। ঘোলাটে।

'বাড়ি ফিরতে সুনন্দা বলল, "চা করি ?"

'"করো।…কী ব্যাপার বলো তো, আকাশটা ঘোলাটে দেখছি !"

'"বৃষ্টি হতে পারে।"

'"বৃষ্টি ?"

'"কেন, কাল রাত থেকেই বুঝতে পারছেন না—কেমন বাদলা বাদলা হাওয়া রয়েছে !"

'"আমি ভেবেছি শীতের বাতাস।"

'"শীতের সঙ্গে বাদলা। এরকম হয়, এক-আধ পশলা হঠাৎ বৃষ্টি হয়—থাকে না।"

'আর কিছু বললাম না। নিজের ঘরের দিকে চলে গেলাম।

'রাজুদের বাড়ি বড় নয়, কিন্তু বাড়ির চৌহদ্দি অনেকটা। কাঁটালতা, লোহার জালি, মোটা রশির মতন মোটা মোটা তারের টুকরো, কাঠকুটো দিয়ে চৌহদ্দি ঘেরা রয়েছে। গাছপালার শখ আছে রাজুদের। ফুলবাগান ফলবাগান থেকে সবজিবাগান—কোনওটারই অভাব দেখি না। তবে টুকরো টুকরো বাগান। কুয়োতলার কাছে মস্ত এক কুলঝোপ। ফটকের কাছে একসার মোরগ-ঝুঁটি ফুল।

'আমার ঘরের সামনে বারান্দায় ক্যাম্বিসের চেয়ার সব সময় পাতা থাকে। অনেকটা সময় ওখানে বসেই কেটে যায়। বইটই যা জোটে পড়ি, গাছপালা দেখি, আকাশ রোদ দেখি, পাখির ডাক শুনি। আলস্য যে কত উপভোগ্য সেটা যেন এখানে এসে বুঝতে পারছিলাম।

'সুনন্দা চা দিয়ে গিয়েছিল। এটা তৃতীয় দফার চা।

'চা খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে একবার ঘরে গেলাম। ফিরে এলাম গোটা দুই বই হাতে করে। পুরোনো বই। চাড্ডাসাহেবের বাড়ি থেকে আনা। ডিটেকটিভ আর থ্রিলার। সঙ্গে ছিল ছেঁড়াখোঁড়া একটা "রিডার্স ডাইজেস্ট"। পুরোনো।

'মাথা কিন্তু একইরকম। বাড়ছে না, কমছেও না, চোখ দুটো মাঝে মাঝে অকারণে ঝাপসা হয়ে আসছিল। অন্যমনস্কভাবে ছেঁড়াখোঁড়া পত্রিকাটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখে পড়ল, পাতার পাদপূরণের জন্যে মাঝে মাঝে জ্ঞানীবচন ছাপা রয়েছে। পড়তে বেশ লাগে। বেশ।

'প্রায় আচমকা নজরে পড়ল একটি ছোট্ট বাণী। প্রাচীন কোনও চীনা জ্ঞানীজনের। ছোট্ট, কিন্তু চমৎকার। বাণীটির বাংলা ভাবার্থ করলে দাঁড়ায় : "একটুকরো সময়ের গণ্ডিতে মানুষের জীবন বাঁধা। একটিমাত্র মুহূর্ত, তারপর আর কিছু নেই। মানুষের জীবন হল, ক্ষণিক স্ফুলিঙ্গ। যেন একটা ফুটো দিয়ে দেখা রেসের ঘোড়া।"

'জ্ঞানীদের সব কথা স্পষ্ট করে বোধ হয় বোঝা যায় না, অনুভব করা যায়। আমি যে কী অনুভব করছিলাম কে জানে ! মনে হচ্ছিল, অনন্ত সময়ের স্রোতে জীবন তো সত্যিই একটি মুহূর্ত। মুহূর্তমাত্র।

'অন্যমনস্কভাবে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। রোদ মোটেই উজ্জ্বল নয়, ধুলোর মতন রঙ হয়ে আছে। বেশ ঘোলাটে। মোরগফুলের লাল ঝকঝক করছে না। কয়েকটা গোলাপ ফুটেছে বাগানে। একগুচ্ছ মরসুমি ফুল সদ্য ফুটতে শুরু করেছে। কুলঝোপে কয়েকটা পাখি নাচছে। দু-চারটে প্রজাপতি উড়ছিল।

'সুনন্দা এসে বলল, "স্নানের আগে বলবেন, গরম জল করে দেব।"

'"ক'টা বাজল ?"

'"সাড়ে দশটা হবে।"
'"ঘুম পাচ্ছে কেন বলো তো ?"
'"রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি ?"
'"কই ! ভালোই ঘুম হয়েছে।"
'"তাহলে গা-মাথা ভারের জন্যে অমন হচ্ছে। একটু গড়িয়ে নিন না। ঘণ্টাখানেক পরে আমি ডেকে দেব। উঠে স্নান করে নেবেন।"'
'আমি সুনন্দাকে দেখছিলাম। ওর রঙ খুব ফরসা নয়, কিন্তু যতটুকু ফরসা তার মধ্যেই মসৃণ ভাব রয়েছে। হাত-পায়ের গড়ন ভালো। মাথায় ঘন চুল। তবে চোখ দুটি বড় ডাগর। মণি যেন নীলচে।
'সুনন্দা বলল, "আজ বিকেলে আপনাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুব। আপনার ভাই দুপুরে ওদের বড় অফিসে যাবে চাড্ডাসাহেবের সঙ্গে।"
'" বেশ তো, যাওয়া যাবে। রাজু ফিরবে কখন ?"
'" কোলিয়ারি থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবে। আবার বেরিয়ে পড়বে।"
'সুনন্দা আর দাঁড়াল না।
'আমিও হাই তুলে উঠে পড়লাম। একটু গড়িয়ে নেওয়াই যাক।
'ঘরে এসে দেখি একজোড়া প্রজাপতি জানলার কাছে উড়ে বেড়াচ্ছে। বাগান থেকে এসেছে। বাগানেই চলে যাবে।
'বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম।

'সুনন্দা ঠিকই বলেছিল। শেষ-বিকেলে বৃষ্টি হয়ে গেল। ঠিক যেন কালবৈশাখীর বৃষ্টি। ঝড় উঠল, বিদ্যুৎ চমকাল ভীষণ করে। বাজ পড়ল, আর ঝোড়ো বৃষ্টি। আধঘণ্টা বড় জোর। তারপর সবই স্বাভাবিক। আকাশে অল্পস্বল্প মেঘ থাকলেও তাতে আর জলের ভার ছিল না। শেষ-বিকেলের আলো উঠেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। হেমন্তকাল, শীত আসি আসি করছে, কতক্ষণ আর আলো থাকবে!
'সুনন্দা ছিমছাম হয়ে বেরিয়ে এসে বলল, "চলুন।"
'আমিও তৈরি ছিলাম। বললাম, "চলো। কিন্তু যাব কোথায় ? যেরকম বৃষ্টি হয়ে গেল।"
'সুনন্দা হেসে বলল, "এ কি আপনাদের কলকাতা ? এখানে জল দাঁড়ায় না, কাদা হয় না। পাহাড়ী খটখটে জায়গা। একটু ভিজে ভিজে ভাব ছাড়া আর কিছু দেখবেন না।"
'"যাবে কোথায় ?"
'" ভেবেছিলাম আপনাকে নিয়ে ডুলি পাহাড় যাব। এখন আর সময় নেই। কাছাকাছি জায়গা থেকে ঘুরে আসি।"
'আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। মাথা ভারের ভাবটা কমেছে। কিন্তু চোখ দুটো জড়িয়ে আসছিল।
'সুনন্দা বলল, "ও দিকটায় চলুন। আরও ফাঁকা।"
'"চলো।"
'রাজুদের কোলিয়ারি ছোট। গোটা দুই পিট। কয়লা শুনেছি তেমন ভালো নয়। কয়লার পাঁজা করে ওরা চব্বিশ ঘণ্টা কয়লা পোড়ায়। সুনন্দা বলে রাবণের চিতা। সত্যিই তাই। পশ্চিমের দিকটায় সকাল-সন্ধে খালি ধোঁয়া আর ধোঁয়া। রাত্রে পাঁজার আগুন

চোখেও পড়ে। এই কয়লা-পোড়া গন্ধটা এখানের বাতাসে চব্বিশ ঘন্টাই পাওয়া যায়। নয়তো বারকি অন্যসব দিক থেকে চমৎকার। এখানকার মাটি শক্ত, মাঠঘাট ঢেউ খেলানো, গাছপালা অজস্র।

'সুনন্দার সঙ্গে তাড়াতাড়ি হাঁটা যায় না। সে একটু ধীরেসুস্থে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলে। গল্প করে। আমি দোষ দিই না তাকে। যাকে সে ঠাট্টা করে "বনবাস" বলে সেই বনবাসে থাকতে থাকতে তার কথা বলার সঙ্গী ফুরিয়ে গিয়েছে। আমি নতুন মানুষ। কত কথাই না তার থাকতে পারে আমাকে শোনাবার জন্যে।

'আমরা খানিকটা এগিয়ে আসতেই দেখি, গোটা চারেক কালিঝুলি মাখা ভাঙাচোরা ট্রাক কোলিয়ারির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এগুলো কয়লা-বওয়া ট্রাক। এখানে রেল লাইন নেই। কয়লা বোঝাই করে নিতে ট্রাক আসে। প্রায়ই দেখি, সন্ধের গোড়ায় ট্রাকগুলো আসে। ফাঁকা। রাতটা এখানেই কাটায়। পরের দিন সকাল থেকে কয়লা বোঝাই করে। দুপুরের আগেই চলে যায়।

'হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, খানিকটা আগে বৃষ্টি হয়েছে বলে মনেই হয় না। মাটি গাছপালা সামান্য ভিজে আছে, নয়তো অন্য কোনও লক্ষণ নেই ঝড়বৃষ্টি হওয়ার। আকাশও প্রায় পরিষ্কার। আলোও মরে এল। পাতলা অন্ধকার দেখতে দেখতে ঘন হয়ে আসছে। এলেও ক্ষতি নেই। শুক্লপক্ষ এখন। আজ কোন তিথি কে জানে! ত্রয়োদশী না চতুর্দশী' চাঁদ উঠে আসবে এখুনি।

'সুনন্দা প্রায় একতরফাই কথা বলছিল।

'আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি। আধ-মাইলটাক হবে। অন্ধকার হয়ে গেল। এবার বাতাসে সিরসিরে ভাব রয়েছে। শীতের বাতাস হয়তো।

'"টর্চ এনেছ?" আমি বললাম।

'"না," সুনন্দা মাথা নাড়ল।

'"তাহলে আর এগিয়ে কাজ নেই।"

'"চলুন, ওইটুকু যাই, তারপর ফিরব। এখুনি চাঁদ উঠবে।"

'এখানে জায়গাটা ঢালু মাঠের মতন। এবড়ো খেবড়ো জমি। ছোট ছোট পাথর। মাঝে মাঝে সেগুনচারা, না হয় কাঁটাঝোপ। ফণিমনসার মতন গাছও চোখে পড়ে।

'মাঠ শেষ করে সুনন্দা বলল, "বসবেন একটু?"

'কাছেই একটা পাথর পড়ে ছিল। বড় পাথর। বললাম, "বসা যাক।"

'আমরা বসলাম।

'ভালোই লাগছিল। জায়গাটা নির্জন। গাছপালা মাঠের গন্ধ। দূরে কোলিয়ারির বাতি জ্বলছে। কয়েকটি টিমটিমে তারা যেন ফুটে উঠেছে ওপাশে।

'সুনন্দা বলল, "আপনি যদি ডিসেম্বর মাসে আসতেন, কিংবা জানুয়ারিতে, আরও ভালো লাগত।"

'"শীত পড়ে যেত জোর! তাই না?"

'"হাড়কাঁপানো শীত। দিনের বেলায় যেমন রোদের আরাম, রাত্তিরে শীতের—"

'"আরাম!" বলে আমি হেসে উঠলাম।

'সুনন্দাও হাসল।

'ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরানো গেল।

'সুনন্দা এখানকার শীতের গল্প বলতে লাগল। ওদের সবজিবাগানে কপি, পালংশাক,

কড়াইশুঁটি হয়। কুয়োর জল আরও মিষ্টি হয়ে যায় খেতে। রাত্রে তাদের ঘরে ফায়ার প্লেসের মতন করে আগুন জ্বালাতে হয়—এত শীত।

'"আবার একবার আসা যাবে— ।"

'"আর এসেছেন !"

'"আসব। জায়গাটা আমার পছন্দ হয়েছে। তোমরা যা খাতির করছ সেটাও কম কী !" আমি হাসলাম।

'সুনন্দা বলল, "আমাদের কাছে কেউ তো আসে না। দু-চারবার বড়জোর কেউ এসেছে।"

'"চলো, ওঠা যাক।"

'আমি উঠে পড়ে পায়চারি করার মতন কাছেই দু-চার পা হাঁটছি, সামান্য তফাতে দেখি বিশাল এক দিঘির মতন গর্ত। দিঘি বলা ঠিক হল না। জল নেই। অন্তত চোখে দেখা যাচ্ছে না। পুরো জায়গাটা যেন মাটির তলায় নেমে গিয়েছে। বিরাট কোনও ভূমিকম্পে মাটি ধসে পাতালে নেমেযাওয়ারমতন অবস্থা। অনেকখানি জায়গা। ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভর্তি। এভাবে অতটা জায়গা মাটির তলায় নেমে যেতে আমি আর দেখিনি। জায়গাটার এপাশে খানিকটা বেড়া মতন। কাঠের ভাঙা খুঁটি, লোহার খুঁটি, কোনওরকমে ঝোলানো একটা তারকাঁটা। তাও পুরোটা নয় বলে আমার মনে হল।

'ততক্ষণে আকাশে চাঁদ উঠেছে। হালকা জ্যোৎস্না ফুটছিল।

'"কী ব্যাপার বলো তো !" আমি সুনন্দাকে বললাম, "জায়গাটা এভাবে পাতালে তলিয়ে গেছে কেন ?"

'সুনন্দা উঠে এল। বলল, "ওখানটায় একসময়ে পুকুরে-খাদ ছিল।"

'"পুকুরে-খাদ !"

'"মাটি কেটে পুকুরের মতন করে নিয়ে কয়লা তুলত।"

'"তাহলে তো মাটির একেবারে গায়ে গায়ে কয়লা ছিল।"

'"এরকম খাদ এখানে অনেক ছিল। সব জায়গাতেই থাকে।"

'"তুমি দেখছি অনেক শিখে গেছ !" বলে আমি ঠাট্টা করে হাসলাম।

'সুনন্দা বলল, "বা রে, কয়লাঅলার সঙ্গে ঘর করছি—শিখব না !"

'আমরা দু'জনেই হেসে উঠলাম।

'সুনন্দা বলল, "এ-জায়গাটা ওইভাবেই পড়ে আছে। আমরা এসেও দেখেছি। কত বছর পড়ে আছে কে জানে ! পঞ্চাশ, ষাট···, বেশিও হতে পারে।"

'"ফেন্সিং দিয়ে রেখেছে কেন !"

'"অনেক সময় গরু-ছাগল ঢুকে পড়ে। নামে। তারপর পা হড়কে পড়ে গেলে একেবারে পাতালে। মরে।"

'"কত নিচু ?"

'"তা বলতে পারব না। দিনের বেলায় দেখলে আন্দাজ করতে পারবেন। তা তিন-চারতলা বাড়ির সমান।"

'সামান্য তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মুখ যখন প্রায় ফিরিয়ে নিচ্ছি হঠাৎ আমার মনে হল, হালকা ধোঁয়ার মতন একরাশ ধোঁয়া যেন ওই বিশাল দিঘির মতন জায়গাটার মাঝামাঝি থেকে উঠে এসে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

'"ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে না !" আমি বললাম।

‘সুনন্দা বলল, “কুয়াশা। জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে জায়গাটা, বৃষ্টি হয়েছে, এদিকে হেমন্তকাল, কুয়াশা জমছে।”

‘হয়তো সুনন্দা ঠিকই বলেছিল, গাছগাছালির মধ্যে এই অক্টোবর মাসের সন্ধের গোড়ায় কুয়াশা নামতেই পারে। হালকা জ্যোৎস্নায় জড়িয়ে গিয়েছে কুয়াশা। ধোঁয়ার মতন দেখাচ্ছে।

‘কুয়াশা জমছিল জমুক। আমার উচিত ছিল ফিরে আসা। কিন্তু ফেরা হল না। চোখের ভুল কিনা জানি না, আমার মনে হল, কুয়াশার সাদার সঙ্গে নীল—নীলচে আভা মিশে যাচ্ছে। সামান্য তাকিয়ে থাকতেই বুঝতে পারলাম, চোখের ভুল নয়। খুব দ্রুত নীলের রঙ ছড়িয়ে যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে নীলচে আভা মেশানো জ্যোৎস্না-জড়ানো কুয়াশা যেন বয়ে যেতে লাগল। কিন্তু কোথায়!

‘কয়েক পা এগিয়ে গেলাম।

‘সুনন্দা বলল, “কোথায় যাচ্ছেন?”

‘“একটু দেখি নীল কুয়াশা।”

‘“ওদিকে যাবেন না! সন্ধে হয়ে গেল। ঝোপজঙ্গল সাপখোপ কোথায় কী আছে!”

‘“যাচ্ছি না। একটু এগিয়ে দেখছি। তুমি দাঁড়াও।”

‘পনেরো-বিশ পা হয়তো এগিয়েছি, ভাঙাচোরা ফেন্সিংয়ের ওপারে এসে দাঁড়ালাম। সুনন্দা আমার পিছনেই ছিল। সে আমার সঙ্গে আছে স্পষ্ট বুঝতে পেরে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম। তারপর আর পা বাড়াতে পারলাম না। আমার হাত-পা থেমে গেল।

‘আমি ঠিক জানি না, চোখের সামনে কী ঘটছিল। কিন্তু ঘটছিল। সেই নীল কুয়াশা গাঢ় হতে হতে আচমকা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর আগুনের শিখার মতন জ্বলতে লাগল। অদ্ভুত দৃশ্য। সহস্র নীল শিখা যদি ক্রমাগত দমকা বাতাসে কাঁপতে থাকে, যদি ঢেউয়ের মতন ফণা তুলে এক পাশ থেকে আর-এক পাশে ক্রমাগত আছড়াতে থাকে—কেমন লাগতে পারে!

‘ভয় পেয়ে আমি সুনন্দাকে ডাকলাম চিৎকার করে। গলা উঠল কি উঠল না—জানি না; কোনও সাড়া পেলাম না সুনন্দার।

‘আমার হাত-পা তখন অসাড় না আমি অচেতন অবস্থায় ছিলাম বলতে পারব না। চারপাশে কেমন এক তাপ অনুভব করছিলাম। শরীর জ্বালা করছিল। আর হঠাৎ অনুভব করলাম, আমি যেন বজ্রাহত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। নিজের কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আমার কোনও সাড় নেই। আমার চারপাশের তাপ বাড়তে বাড়তে অসহ্য হয়ে উঠল। গায়ের পাশে যেন চুল্লি জ্বলছে। হয়তো দরদর করে ঘামছিলাম। হয়তো গায়ের চামড়া পুড়ে যাচ্ছিল। কী যে হচ্ছিল বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই। এমনকি তখন কী অনুভব করছিলাম—তাও বোঝানো যায় না।

‘আমার মনে হল, এবার আমি মারা যাব। হয়তো আর দু-চার মুহূর্ত। এখন আর আমার করার কিছু নেই। শুধু কয়েক মুহূর্ত মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা। তাহলে কি তাই হল? এ-জীবন শুধু একটি মুহূর্ত হয়ে থাকল। কেউ আমাকে অদৃশ্য থেকে দেখল, রেসের ঘোড়ার মতন আমি এক নিমেষের জন্যে তার চোখে পড়ে হারিয়ে গেলাম।

‘মৃত্যুর জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম। প্রতিটি মৃত্যু-মুহূর্ত যেন জলের ফোঁটার মতন একটি একটি করে আমার মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি মরছিলাম না। কেন, কে জানে!

'ক্রমশ দেখি আমার চারপাশের তাপ কমে আসছে। দ্রুতই কমে যাচ্ছিল। আর সেই নীল শিখাও ক্রমেই মিলিয়ে আসতে লাগল। হ্যাঁ, মিলিয়ে এসে রামধনুর মতন বেঁকে আকাশের দিকে উঠে গেল। তারপর মিলিয়ে গেল কোন অদৃশ্যে কে জানে!

'কী যে হচ্ছিল ঈশ্বরই জানেন। সমস্ত তাপ চলে গেল। মুছে গেল নীল শিখা। শুধু সাদা কুয়াশা ভাসতে লাগল। ঝিঁঝির ডাক কানে এল।

'তারপর দেখি, কুয়াশার মধ্যে একটি মানুষ। যেন ভেসে আছে।

'লক্ষ করতে করতে একসময় মনে হল, কোনও মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কে? কে ও? কে? ওখানে কেন?

'আরও কিছুটা স্পষ্ট হল মেয়েটি। সুনন্দা নাকি?

'সুনন্দা বলেই মনে হল। কিন্তু এ কেমন সুনন্দা? ওকে লম্বা দেখাচ্ছিল। ভীষণ লম্বা। যেন গাছের লম্বা পাতার মতন আকৃতি। মাথার দু' পাশ থেকে চুল গড়িয়ে এসে পায়ের পাতা ছুঁয়েছে। সম্পূর্ণ নগ্ন। অথচ মাথার সেই বিশাল চুল—যা দু' পাশ থেকে ওর পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে এসেছিল—সেই চুল ওর নগ্নতা ঢেকে রেখেছে।

'সুনন্দা এগিয়ে আসছিল না। ছবির মতন দাঁড়িয়ে ছিল।

'দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে আরও দীর্ঘ হল। তারপর হারিয়ে গেল। আর তাকে দেখতে পেলাম না।

'চারদিক স্তব্ধ। ঝিঁঝি ডাকছে। কুয়াশা আর জ্যোৎস্না মিলেমিশে মিহি বৃষ্টির মতন ছড়িয়ে রয়েছে।

'আমি জানি না, কেমন করে কখন আমি বাড়ি ফিরতে শুরু করলাম। সাধারণ সুস্থ মানুষের মতন যে আমি হাঁটছি না—নিজেই বুঝতে পারছিলাম। আমার পা কাঁপছিল, টলছিল, হাত যেন নড়ছিল না। বুক আর মাথা অদ্ভুত লাগছিল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা আমি কি হারিয়ে ফেলেছিলাম! মাথা একেবারে ফাঁকা।

'বাড়ির কাছাকাছি এসে আমার যেন সামান্য হুঁশ হল।

'সুনন্দা আমার পাশে পাশে রয়েছে। ও আমায় কী বলছিল আমি খেয়ালই করতে পারছিলাম না।

'প্রথম যখন খেয়াল হল আমি শুনলাম সুনন্দা বলছে, "আপনার কী হয়েছে?"

'ওর দিকে তাকালাম। এই সুনন্দা সাধারণ সুনন্দা, যেমন তাকে আমি রোজই দেখছি। কোথাও কোনও বিকৃতি নেই।

'"কথা বলছেন না?" সুনন্দা বলল।

'আমি কথা বললাম। গলার স্বর কেমন শোনাল জানি না: "তুমি কোথায় ছিলে?"

'"কখন?"

'"আমি যখন ওই জায়গাটায় ছিলাম?"

'"আপনি এগিয়ে গেলেন। আমি বারণ করলাম। খানিকটা পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

'"পাশে ছিলে না?"

'"না।"

'"আমি তোমায় ডেকেছিলাম। শুনতে পাওনি?"

'"না। কখন ডাকলেন?"

'"আমি তোমায় ডেকেছিলাম।... তুমি কিছু দেখতে পাওনি?"

'"না। কী দেখব?"

'"সেকি।...কুয়াশা কেমন নীল হয়ে উঠল। উঠে জ্বলজ্বল করতে লাগল। শেষে আগুনের মতন... !"

'"কী বলছেন আপনি ?"

'"আমি যে দেখলাম। নীলে নীল, ফণার মতন মাথা তুলে নীলের শিখা দুলছিল। এপাশ থেকে ওপাশ...। তারপর রামধনুর মতন আকাশে..."

'সুনন্দা হেসে ফেলল: "আপনার চোখের ভুল।"

'"চোখের ভুল ! এতবড় ভুল কেমন করে হবে। আমি যে তোমাকেও দেখলাম।"

'"আমাকে ! কোথায় ?"

'"ঠিক ওইখানটায়।"

'সুনন্দা হাসতে লাগল। বলল, "আপনার মাথা খারাপ ! আমি ওখানে যাব কেন ? আমি তো প্রায় বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওদিকে যেতে আমার ভয় করে। সাপখোপ, পোকামাকড়, জঙ্গল...। আপনাকে আমি বারণও করলাম যেতে !"

'আমি অবাক হয়ে সুনন্দার মুখ দেখছিলাম। ও কি কিছুই দেখেনি ? তাহলে আমি কেন দেখলাম ? চোখের ভুল ? মনের ভুল ? মতিভ্রম !

'"কিন্তু আমি যে নিজের চোখে সব দেখলাম, সুনন্দা। এমন আশ্চর্য অবিশ্বাস্য জিনিস আর কখনও দেখিনি। তোমায় কেমন করে বোঝাব, কী আমি দেখেছি।"

'সুনন্দা বলল, হালকা করে, "ভুল দেখেছেন। আর আমাকে আপনি দেখবেন কেমন করে। আমি অনেকটা পিছনে ছিলাম। সামনে যাইনি।"

'"ঠিক। তবু— ?"

'"তবুটবু কিছু নয়।...আপনি আমায় প্রথম দেখেছিলেন কুড়ি-বাইশ বছর আগে। আমাকে আপনার বোধহয় পছন্দ হয়নি। আমার বিয়ে হয়েছিল আসানসোলে। বিয়েতেও আপনি যাননি। আর দু' যুগ পরে এখানে আমাকে দেখছেন।... আমাকে হঠাৎ অত কষ্ট করে অ-জায়গায় দেখতে যাবেন কেন !"

'আমি আর কিছু বললাম না। সুনন্দার কথার মধ্যে খোঁচা ছিল হয়তো।

'বাড়ি ফিরে ভালো করে চোখ মুখ ঘাড় হাত-পা ধুয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। নিজেকে অসুস্থ দুর্বল মনে হচ্ছিল। সেই কুয়াশা, নীল শিখার ঢেউ, বিচিত্র রামধনু, অসহ্য তাপ, গাছের লম্বা পাতার মতন সুনন্দার সেই অদ্ভুত চেহারা আমার মাথার মধ্যে জড়িয়ে জট পাকিয়ে আমাকে যেন পাগল করে তুলছিল।

'রাজু তার বড় অফিসের কাজ সেরে শহর ঘুরে ফিরল, সামান্য রাত করে।

'আমার ইচ্ছে ছিল না সেদিনই কথাটা তুলি। আমাদের দু'জনকে খেতে বসিয়ে সুনন্দাই তামাশার গলায় কথাটা তুলল।

'রাজু বলল, "কী হয়েছে, শিবুদা ?"

'আমি যতটা পারি তাকে বললাম।

'রাজু সব শুনে হাসতে লাগল। বলল, "ওই জায়গাটা ডেজার্টেড। এখানকার কোলিয়ারি খোলার সময় কাজ হয়েছিল ওখানে। সে কী আজকের কথা ! পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের ব্যাপার। একে কোলিয়ারি, তার ওপর আবার অনেকটা সাবসাইড করে গেছে। ওদিকে তুমি গেলে কেন ? বেকায়দায় গিয়ে পড়লে ষাট-সত্তর ফিট তলায় চলে যেতে। ওখানে কেউ যায় না।"

'"কিন্তু আমি হঠাৎ এরকম অদ্ভুত জিনিস দেখলাম কেন ?"

'"দেখনি। তোমার···তোমার হয়তো তখন ওইরকম মনে হয়েছিল। কী যে বলে ইলিউসান না কী—তাই হয়তো হবে। ও নিয়ে ভেবো না। চোখের ভুল অমন হয়। আমার নিজেরই কতবার হয়েছে, এক দেখতে এক দেখেছি।"

'চোখের ভুল মানুষমাত্রেরই হয়। তবে তার একটা সীমা আছে, বা মাত্রা রয়েছে। আমার এতবড় ভুল কেন হবে আমি বুঝতে পারলাম না।

'সেদিন সারারাত আমার ছটফট করে কাটল। কেন, কেন আমি অমন অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম—আমার মাথায় আসছিল না! একে কী হ্যালুসিনেশন বলে? কী জানি! আমার চেতনা আর অবচেতনার মধ্যে কি কোনও গোলমাল হয়ে গিয়েছিল? বলাই ডাক্তার যে-ওষুধটা দিয়েছিল—বিদেশি ক্যাপসুল—সেটা খাওয়ার জন্যেই কি এইরকম স্নায়বিক একটা কাণ্ড ঘটল?

'কোনও কিছুই আমার মাথায় আসছিল না।

'পরের দিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে সেই একই জায়গায় গেলাম। দেখলাম তফাত থেকে। কোনওরকম অদ্ভুত কিছু চোখে পড়ল না।

'বারকিবুইয়ার ব্যাপারটা আমি হয়তো ভুলে যেতে পারতাম, বা কখনও কখনও মনে পড়ত হয়তো—ভাবতাম আমার মতিভ্রম ঘটেছিল কিংবা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম—কিন্তু আরও কিছু কিছু ঘটনা ঘটল যার জন্যে ঘটনাটা আমি ভুলতে পারলাম না।

'ওই আশ্চর্য ঘটনার পর আমার শরীর আবার খারাপ হতে লাগল। এই যে দেখছেন, আমার গায়ের চামড়ায় শ্বেতীর মতন দাগ ধরেছে—এটা শ্বেতী নয়। অন্তত ডাক্তাররা বলে, না। অবশ্যই এটা পিগমেনটেশন—কিন্তু কেন? কেন আমার সমস্ত মাথার চুল সাদা হয়ে গেল দেখতে দেখতে, তারও কোনও কারণ নেই। আপনি জানেন না, আমার শরীর এরকম রোগা ছিল না। দিন দিন আমি রোগা হয়ে যেতে লাগলাম। অ্যানিমিয়ায় ধরল। কিডনির গোলমাল শুরু হল।

'বারকি থেকে ফিরে এসে আমি বলাই ডাক্তারকে ব্যাপারটা বলেছিলাম। সে আমায় নিয়ে তামাশা করল। তারপর বলল, ওষুধের জন্যে এমন হতে পারে না। আজগুবি ব্যাপার দেখার জন্যে ওষুধকে দায়ী করা উচিত নয়। সে বলল, "ঠিক আছে এখন তুমি কলকাতায় রয়েছ। আবার একটা ক্যাপসুল খাও—আমি দেখতে চাই তোমার কী হয়!"

'আমিও সাহস করে আবার ওষুধ খেলাম। না, কোনও ঘটনাই ঘটল না যাকে আমি অবিশ্বাস্য বলতে পারি। তবে হ্যাঁ, আমার শরীর খারাপ হতে লাগল।

'আরও একটা ঘটনা আমাকে বড় মুষড়ে দিল। বারকি থেকে চলে আসার মাস তিনেক পরে রাজুর চিঠি থেকে আমি জানতে পারলাম, সুনন্দার পেটের বাচ্চা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। হওয়ারকোনও কারণ ছিল না সঙ্গত, তবু হয়েছে। তার মাথার চুলও পাতলা হয়ে পড়ে যাচ্ছে। দিন দিন রোগা হয়ে পড়ছে। চোখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে ওর খুব তাড়াতাড়ি।

'আপনি হয়তো বলবেন, আমার দেখা অদ্ভুত সেই দৃশ্যের সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্ক নেই। অন্য কারণ থাকতে পারে।

'যে-কারণই থাকুক, আমি নিজে ব্যাপারটাকে আলাদা করে ভাবতে পারি না। হ্যাঁ, আমি জানি—সুনন্দা আমার মতন অদ্ভুত কিছু দেখেনি। কিন্তু সে যে আমার কাছাকাছি ছিল এটা তো ঠিকই। গায়ের পাশে না থেকে খানিকটা তফাতে ছিল এই পর্যন্ত।··· যে যাই বলুক, আমি নিজে যা দেখেছি তা মিথ্যে বলতে পারি না, ভাবতেও পারি না। কিছু একটা হয়েছিল, সেটা কী আমি জানি না, কিন্তু হয়েছিল।···আমি মশাই, আজ দু' বছর ধরে তারই জের

টেনে যাচ্ছি ; শরীরে মনে ।'

শিবতোষ তাঁর কথা শেষ করে উঠে পড়লেন । বললেন, 'একটু বসুন, আসছি । জল তেষ্টা পাচ্ছে, খেয়ে আসি ।'

উনি চলে গেলেন, আমি বসে থাকলাম ।

ভদ্রলোকের কথা আমি অবিশ্বাস করছিলাম না । কিন্তু তাঁর দেখা দৃশ্য সম্পর্কে আমার পুরোপুরি সন্দেহ হচ্ছিল । মনে হচ্ছিল, যে-কোনও কারণেই হোক শিবতোষবাবু সাময়িকভাবে একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন । এটা সম্ভব । এক-একসময় মানুষের মন তার অধিকারের বাইরে চলে যায় । সে অন্য কোনও জগতের বা অবস্থার মানুষ হয়ে পড়ে । আজকাল নানান ওষুধপত্র বেরিয়েছে যাতে একজন স্বাভাবিক মানুষকে সাময়িকভাবে তার বোধ বুদ্ধি চেতনার অন্য স্তরে নিয়ে যাওয়া যায় ।

শিবতোষবাবুর ক্ষেত্রে এমন কী ঘটেছে ? মনে হয়, আবার হয় না । বলাই ডাক্তারের দেওয়া বিদেশি ওষুধ খেয়ে যদি এমন হত—তবে আগেই হতে পারত । এবং পরেও । কিন্তু হয়নি ।

তাহলে ?

খানিকটা পরে শিবতোষ ফিরে এলেন । হাতে দু'কাপ চা । এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ফ্লাস্কে ভরে রাখি । বারবার করার হাঙ্গামা বেশি । নিন, খান ।'

আমি চা নিলাম ।

শিবতোষও বসলেন । চুমুক দিলেন চায়ে । দিয়ে সিগারেট ধরালেন, আমার দিকে প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন ।

আমি বললাম, 'আপনি অনেককেই আপনার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন । কেউ কোনও কারণ বলতে পারেনি ?'

'না । তবে আমি একটা ব্যাখ্যা নিজেই বার করার চেষ্টা করেছি । ...আপনি হয়তো মনে মনে হাসবেন । কিন্তু উপায় কী বলুন ! সবাই যদি আমায় অবিশ্বাস করে, পাগল ভাবে—অথচ আমি নিজে জানি—আমি যা দেখেছি তা ঠিক—তবে একটা ব্যাখ্যা তো আমার পাওয়া দরকার ।'

'আপনার কথাই বলুন ।'

'দেখুন, একটা কথা আমরা সবাই বলি, এ-জগৎ বড় বিচিত্র, কত কী অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে । কিন্তু আমরা জানি না, আমাদের ভাবনাচিন্তার মধ্যে অদ্ভুত বলতে যে-ধারণা রয়েছে তার বাইরেও এমন অদ্ভুত ঘটনা আগে ঘটেছে পরেও ঘটবে যার কোনও উত্তর আমরা খুঁজে পাব না বোধ হয় । আমাদের ধারণায় যা অদ্ভুত তার বাইরেও অনেক অদ্ভুত হল এ-জগৎ । ...যাক গে, আপনাকে আমি যা বলছি সেগুলো আমার মনগড়া ব্যাখ্যা। আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন না । ...সত্যি বলতে কি, সবাই যখন আমাকে পাগল-টাগল ভাবতে লাগল, বিশ্বাস করতে চাইল না আমার কথা—আমি তখন নানারকম বইপত্র ঘাঁটতে লাগলাম । অবিশ্বাস্য ঘটনা নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে বিদেশে । সেসব বই কিছু কিছু এখানেও খোঁজ করলে পাওয়া যায় ।' বলে শিবতোষ থামলেন, দম নিলেন যেন, সিগারেট ধরালেন আবার ।

শিবতোষ বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের এই বিশ্বজগতে তিনটি আদি—মানে বেসিক—শক্তি কাজ করে যাচ্ছে । বিজ্ঞানীরা একে বলেন ফোর্স । এই তিনটি শক্তি হল : ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, গ্র্যাভিটেশনাল আর নিউক্লিয়ার । এদের তিনের

মধ্যে কী যে অদ্ভুত নাড়ির সম্পর্ক, একে অন্যকে যেন জড়িয়ে আছে।...সত্যি বলতে কি—ম্যাগনেটিজম ব্যাপারটার গুপ্ত রহস্য নাকি যৎসামান্যই জানা গেছে। পণ্ডিতরা তো তাই বলেন। ...যাক গে আমি শুধু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এফেক্টের ব্যাপারটার কথাই বলছি। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আমেরিকা, জার্মানি, ইংল্যান্ডে নানারকম গোপন গবেষণা হতে থাকে—কী করে শত্রুকে ঘায়েল করার মতন ভীষণ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে কব্জা করা যায়। অ্যাটম বোমার মতন ভয়াবহ অস্ত্রটা আমেরিকাই আগে তৈরি করে ফেলে। তার ফলে কী হয়েছিল—সে তো সকলেরই জানা। কিন্তু আর-একটা ঘটনা ঘটেছিল, কিংবা ঘটানো হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। এই ঘটনা হল, যে-কোনও বস্তুকে সাময়িকভাবে অদৃশ্য করে ফেলা। প্রচণ্ড শক্তিশালী—মানে ইনটেনসিফায়েড ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে পারলে এটা নাকি সম্ভব হয়। একে বলা যেতে পারে "এক্সপেরিমেন্ট ইনভিজিবিলিটি"। এ-ব্যাপারেও আমেরিকা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। এমনকি তারা ফিলাডেলফিয়ার সামরিক নৌ-ঘাঁটিতে একটা গবেষণা চালায়। সেটা ১৯৪৩ সালের কথা। একটা ডেস্ট্রয়ারকে কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য করে রাখে। অবশ্য সরকারিভাবে কোনওদিন কথাটা স্বীকার করা হয়নি। কারণ গবেষণা সফল হলেও তার ফলাফল হয়েছিল মারাত্মক। ডেস্ট্রয়ারের নাবিকরা কেউ আর স্বাভাবিক অবস্থায় জীবন কাটাতে পারেনি। তাদের অনেকেই অসুস্থ, পাগল, বিকারগ্রস্ত, এমনকি পঙ্গু হয়ে পড়ে। এদের অনেকের মতে, যখন তাদের ডেস্ট্রয়ারকে অদৃশ্য করা হয়—তখন তারা এমন এক অদ্ভুত জগতে চলে যায়—যা অকল্পনীয়। দৃশ্যত অদ্ভুত, এমনকি সেই জগতের সবই অদ্ভুত।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি কি বলতে চান, আপনি নিজে এইরকম কোনও—'

আমাকে বাধা দিয়ে শিবতোষ বললেন, 'না, আমি তা বলতে চাই না। আমি আমেরিকায় ছিলাম না, ছিলাম বারকিবুইয়ায়। আমি কোনও নেভির লোক নই, ন্যাভাল ইয়ার্ডেও ছিলাম না। আমার ওপর কোনও এক্সপেরিমেন্ট করা হয়নি।'

'তবে ?'

'তবে এমন হতে পারে, হয় প্রাকৃতিক কোনও কারণে, তার খেয়ালে, কিংবা অদ্ভুত কোনও যোগাযোগের ফলে আচমকা ওই জায়গায় অত্যন্ত দুর্বল কোনও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়ে যায়। ফিলাডেলফিয়ায় যা ঘটেছিল—সেখানে বিজ্ঞানীরা একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক আবরণ তৈরি করেছিলেন। বলতে পারেন ক্যামোফ্লেজ। এখানে মানুষ নিজে কিছু করেনি, প্রকৃতিগত কোনও কারণে হয়ে গিয়েছিল। কেন হয়েছিল আমি জানি না। ...পরিত্যক্ত পুকুরে কয়লা-খাদ, খানিকটা আগে হয়ে যাওয়া ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাত। জ্যোৎস্না... ! কী জানি !'

'তা যদি হয়ে থাকে তবে আপনি আর আপনার বন্ধুর স্ত্রী তো একই অবস্থায় ছিলেন—'

'হ্যাঁ, সেটাই থাকার কথা। কিন্তু আমার মনে হয়, এখানে একটা অন্য ব্যাপার ঘটেছিল। আমি যে-জায়গায় গিয়ে পড়েছিলাম—বা যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই জায়গাটা সরাসরি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে পড়েছিল। আর সুনন্দা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে ওই ফিল্ডের সীমা শেষ হয়ে গেছে। তার ফলে আমি একটা আবরণের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। আমাকে সুনন্দা দেখতে পাচ্ছিল না। আমি যখন তাকে চিৎকার করে ডাকি সে শুনতেও পায়নি। আমি যে-অদ্ভুত বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি—সে দেখতে পায়নি।'

'আপনারা তো খুব তফাতে ছিলেন না।'

'না। পঁচিশ-তিরিশ বা চল্লিশ গজ তফাতে থাকতে পারি। কিন্তু তাতে কী! সব জিনিসেরই সীমা আছে। নদী এক জায়গায় শেষ হয়ে ডাঙা শুরু হয়। আমি যে-ফিল্ডের মধ্যে ছিলাম, সুনন্দা তার বাইরে পড়ে গিয়েছিল। তাতে সে আমার মতন অদ্ভুত দৃশ্য অবশ্য দেখেনি। তবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের বাইরে থাকলেও তার কিছু খারাপ ফলাফল—যাকে আমরা ব্যাড এফেক্ট বলি, সে-এফেক্ট সে এড়াতে পারেনি। ...না, পারেনি। খুব সম্ভব তার সন্তান নষ্ট হওয়া, শরীর খারাপ, মাথার চুল পাতলা হওয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে।'

'আপনার বেলায় ক্ষতি বেশি হয়েছে—ওঁর বেলায় কম?'

'হ্যাঁ। আমার তাই মনে হয়। ...আমার কী মনে হয় জানেন ডাক্তারবাবু, যে-কোনও কারণেই হোক আমি একটা খুবই সামান্য—যৎসামান্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেইনবো—বা ধরুন ওই ধরনের একটা রামধনুর মতন কোনও কিছুর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, সুনন্দা তার সামান্য বাইরে ছিল। সে আমার মতন আশ্চর্য জিনিস দেখেনি, কিন্তু এই বিশ্রী ব্যাপারটার ছোঁয়া পুরোপুরি এড়াতে পারেনি। বেচারা!... দেখুন, আমি অবিবাহিত, আমার বয়েস হয়েছে, আমার এই নষ্টস্বাস্থ্য, গায়ের এই দাগ, নানান মানসিক অশান্তি নিয়ে আমি হয়তো আর দু-এক বছর বাঁচতে পারি। নাও পারি। তাতে ক্ষতি নেই বিশেষ। কিন্তু সুনন্দার কী হবে? তার স্বামী আছে, ছেলেমেয়ে হতে পারে। তার যদি আরও কোনও ক্ষতি হয়—! হতেও তো পারে! ...না—আমি ভাবতে পারি না। ...আপনি বিশ্বাস করুন, আজকাল আমি সুনন্দার কথাই বেশি করে ভাবি।'

'আপনি কি ওঁকে বা ওঁদের কিছু জানিয়েছেন?'

'না না, তাই কি কেউ জানায়! তাতে সুনন্দার আরও ক্ষতি হবে। মানসিক ক্ষতি।'

'এখন তাহলে— ?'

'এখন আর আমার কী করার আছে! আমি নিজের দেখা দুঃস্বপ্ন নিয়ে যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছি। আর আছি সুনন্দার চিন্তা নিয়ে। ওর কথা আজকাল এত ভাবি, রোজই ভাবি যে মনে হয় একসময় ওকে আমি বিয়ে করতাম, ও আমারই স্ত্রী হত—হয়তো এর চেয়ে বেশি ওকে নিয়ে ভাবতাম না। কী জানি আগে ওকে বিয়ে না করে ওর ক্ষতি করেছিলাম কি না! কিন্তু এই বয়েসে কিছু না জেনেই ওর ভীষণ ক্ষতি করলাম, ডাক্তারবাবু! আমি বড় ভয়ে ভয়ে থাকি। ভাবি কোনওদিন আবার রাজুর চিঠি পেয়ে জানব, সুনন্দার চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে, মাথার চুল সব পড়ে গেছে কিংবা সাদা হয়ে গেছে আমার মতন। ও রক্তহীনতায় অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। ...জানি না কী হবে। কেন এমন হল? সবই আমার দুর্ভাগ্য।'

শিবতোষ চুপ করে গেলেন। তাকিয়ে থাকলেন শূন্য চোখে।

শিবতোষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল, উনি হয়তো অকল্পনীয় অ-জাগতিক কোনও দৃশ্য দেখে থাকলেও থাকতে পারেন। তার কোনও সদুত্তর উনি পাননি। আমারও জানা নেই। কিন্তু এখন আমি স্পষ্টই অনুভব করছি, এই পঞ্চাশোর্ধ্বে প্রায়-প্রৌঢ় বয়েসে ভদ্রলোক এই পার্থিব জগতের অন্য এক বিচিত্র রামধনুর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে অন্য একজনকে দেখছেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নয়। বিষণ্ণ প্রেমের দৃষ্টিতে। উনি কি সেটা অনুভব করেন? জানি না। সুনন্দা কি কোনওদিন অনুভব করবে? তাও জানি না।

□ ১৯৮৭



শিলাকান্থ

দিলীপ রায়চৌধুরী

এ জায়গাটা আমার ভারি ভালো লাগে। সমুদ্র যেন কবে আপন খেয়ালে এই পাহাড়ে ঘেরা নির্জন খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, তারপর আর বেরোতে পারেনি। জোয়ারের সময় দুই পাহাড়ের মাঝখানে ওই সিংহদুয়ারের মতো পথ দিয়ে হু হু করে জল ছুটে আসে। তারপর নিষ্ফল আক্রোশে সারাদিন পাথরের গায়ে মাথা খুঁড়ে মরে।

জাহাজ-কোম্পানির লোকেদের বুদ্ধি আছে। বন্দর অনেকটা দূরে। তবুও এই অঞ্চলের বিশেষ আকর্ষণের দিকে লক্ষ রেখে সাগরের মুখোমুখি একটা টিলার ওপর সুন্দর বিদেশি কায়দায় হোটেল বানিয়েছে। বর্ষাকাল ছাড়া বাকি আট-ন' মাস হোটেলটা লোকে গিজগিজ করে। জাহাজের যাত্রীরা ছাড়াও দূর-দূরান্তর থেকে লোকেরা ছুটি কাটাবার জন্যে এখানে আসে, বিশেষত অক্টোবর থেকে জানুয়ারি এখানে ঠাঁই মেলাই মুশকিল।

অফিসের কাজে এ-অঞ্চলে এলেই আমি এখানে উঠি, শহরের ভেতর গরমে পচবার চাইতে এ ঢের ভালো। সঙ্গে অফিসের জিপখানা যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ দূরের পথ আর গায়ে লাগে না। উপকূলে ছড়ানো কফি ও রাবার প্ল্যান্টেশানেই আমার কাজ। এক-একদিনে পঞ্চাশ কি একশো মাইল ঘুরে আসি। তারপর সন্ধ্যায় হোটেলের পোর্টিকোতে যখন পা ছড়িয়ে নিম্বুপানি হাতে নিয়ে বসি, দূরে মাঝ-সমুদ্রে জাহাজের আলোগুলো একে একে জ্বলে ওঠে।

সেবারে ঠিক করেছিলাম অফিসের কাজ শেষ করে দিন সাতেক ছুটি নিয়ে এই হোটেলটায় কাটাব। অনেকদিনের একগাদা লেখার কাজ জমে রয়েছে। কলকাতায় আড্ডার নেশায় হয়েই ওঠে না। সেপ্টেম্বর মাস—কলকাতায় কাজের চাপ কম। স্নেহপ্রবণ ম্যানেজার এককথাতেই রাজি হয়ে গেলেন।

সবে বর্ষা শেষ হয়েছে, আবহাওয়া ভারি চমৎকার, সমুদ্রে চান করেও আরাম। রোদ্দুরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকলেও গা পুড়ে যায় না। দিন কাটছে বেশ। হোটেলের লবিতে বসে সারা সকাল কলম কামড়াচ্ছি। এক লাইন লেখা বার করে কার সাধ্য, কোনওরকমে আর মিনিট পনেরো-কুড়ি কাটিয়ে দিতে পারলেই লাঞ্চ, তারপর খেয়েদেয়ে দিব্যি তোফা এক ঘুম।

হঠাৎ মনে হল হন্‌হন্‌ করে যেন এক পরিচিত ভদ্রলোক পাশ দিয়ে ডাইনিং হলের দিকে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট পাঁচেক বাদেই সন্দেহ ভঞ্জন হল। ঠিক ধরেছি। হলের এক প্রান্তে একটি ছোট টেবিলে আপনমনে খেয়ে চলেছেন আমাদের অতি-পরিচিত অধ্যাপক সুশোভনবাবু।

'কী ব্যাপার, এখানে কী মনে করে, স্যার!'

আমার দিকে না তাকিয়েই উনি বললেন, 'কেন, সমুদ্র কি আমাদের টানতে পারে না নাকি?'

কলেজ জীবন সে কবেকার কথা। আমাদের ছোট কলেজে পড়াতেন বলে ভুলেই গিয়েছিলাম সুশোভনবাবু একজন উচ্চশিক্ষিত ম্যারিন বায়োলজিস্ট। দেশ স্বাধীন হওয়ার ক'বছর বাদেই সরকারি সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানের দপ্তরে যোগ দেওয়ার পর উনি আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের উড্‌সহোল ল্যাবরেটরিতে কাজ করে বেশ নামও করেছিলেন। এখন আন্তর্জাতিক সংস্থার চেষ্টায় সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে যেসব গবেষণা চলছে, সুশোভনবাবু তার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

সময় কাটাবার এরকম একজন অভাবিত সঙ্গী পেয়ে ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। ভারতীয় নৌবাহিনীর 'চন্দ্রশেখর' জাহাজখানাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ভারত মহাসাগরের উপকূলে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজের জন্যে। সুশোভনবাবু সেই গবেষক গোষ্ঠীর প্রধান। সারাটা দিন জাহাজেই কাটান, কেবল খাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ ফেরেন। কখনও-সখনও দূরের পাড়ি হলে জাহাজেই ক'দিন কাটে।

সন্ধের পর একা একা হোটেলের লবিতে বসে কলকাতার প্লেনে সদ্য-আমদানি স্টেটসম্যান কাগজখানা চোখ বুলিয়ে দেখছি, এমন সময় সুশোভনবাবু এলেন। চান-টান করে বেশ মেজাজ শরিফ মনে হচ্ছে।

'মাফ করো সঞ্জয়, সকালে তাড়াহুড়োয় তোমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলা হয়ে ওঠেনি। কিছু মনে করোনি তো?'

'না স্যার, আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কেবল ভাবছি কোথায় সেই ল্যাবরেটরি আর কোথায় জাহাজের ডেক! এ-জীবন আপনার কেমন লাগছে, স্যার?'

'কোনওদিন পাহাড়ে চড়েছ, সঞ্জয়? উঁচু পাহাড়ে চড়ার যে-উত্তেজনা, মহাসাগরের তলায় ব্যাথিস্ফিয়ারে নেমে যাওয়া তার চেয়ে কম উত্তেজক নয়।'

আস্তে আস্তে গল্প জমে গেল। সুশোভনবাবু অদ্ভুত ভালো বলতে পারেন।

'সমুদ্রের রৌদ্রালোকিত ওপরতলার এবং একেবারে নিচেকার পাহাড় ও উপত্যকার মাঝখানেই মহাসাগরের সবচেয়ে অজানা অংশ। এই গভীর অন্ধকার রহস্যময় সাম্রাজ্যের সঠিক খবর সংগ্রহ করাই এ-শতাব্দীর ওসানোগ্রাফারদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

'একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, সঞ্জয়, এই রহস্যভেদ করার কাজে আমাদের ক্ষমতা কতটুকু। ডুবুরিরা অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে তিনশো ফুট পর্যন্ত যেতে পারে। বিশেষ হেলমেট ও রবারের পোশাক পরে মেরে-কেটে নয় ওটাকে বাড়িয়ে পাঁচশো ফুট করা গেল। কিন্তু সূর্যের আলো যেখানে ঢোকে না সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারের রাজ্যে যেতে গেলে ব্যাথিস্ফিয়ার ছাড়া গতি নেই। প্রায় তিরিশ বছর আগে দু'জন আমেরিকান প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত ব্যাথিস্ফিয়ারে নামতে পেরেছিলেন। তার চেয়ে উন্নত ধরনের স্টিল স্ফিয়ার এখন তৈরি হয়েছে যাতে আরও তলায় যাওয়া যায়।

'আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। তুমি কাল আমার সঙ্গে চলো না, আমাদের জাহাজটা

দেখে আসবে। ব্যাথিস্ফিয়ার ছাড়া আমাদের আরও ইন্টারেস্টিং যন্ত্রপাতি আছে। সমুদ্রতলের জন্যে উন্নত ধরনের ক্যামেরা, প্রতিধ্বনি যন্ত্র, অ্যাসকানিয়াগ্রাফ—সমুদ্রের গ্র্যাভিমিটার—যা দিয়ে কিনা সমুদ্রের তলাকার মাধ্যাকর্ষণের তারতম্য বুঝতে পারি—এই সব নানা যন্ত্র। কাল সকালেই চলো, কেমন ? রাত হয়ে গেছে, চলো, খেয়ে নেওয়া যাক।'

ভীষণ উৎসাহিত হয়ে পড়লাম। এ যে মেঘ না চাইতেই জল ! ছুটি কাটাবার এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে। চুলোয় যাক লেখা। উত্তেজনায় রাত্তিরে ঘুম এল না।

সকাল এখানে দেখবার মতো। পাহাড়ের ওদিকটা দিয়েই আমাদের ঘুরে যেতে হবে।

ওঁদের জাহাজটা হারবার থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে নোঙর করা হয়েছে। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে অপূর্ব মসৃণ পথ। ডাইনে সমুদ্রের দিকে যতদূর নজর যায় দু-একটা সি-গাল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। খালি একপাশে একটি আলোকস্তম্ভ সকালের কাঁচা রোদে চিকচিক করেছে।

'চন্দ্রশেখর' জাহাজের কাছাকাছি আসতেই সুশোভনবাবু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, 'তোমাকে যে নিয়ে যাচ্ছি সঞ্জয়, এটা সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে। ওখানে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট অমরেশ তোমার সহপাঠী ছিল। সে ছাড়া আর কেউ তোমাকে চেনে না। সরকারি ঝামেলা এড়াতে তোমাকে সদ্য আমেরিকা-প্রত্যাগত ডঃ বোস বলে পরিচয় দেব। ওদের কাছে তুমি একজন নামকরা বৈজ্ঞানিক বলেই প্রতিভাত হবে।'

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা উঠতে হল। জাহাজের ডেকে দু-একজন সাধারণ খালাসি ঘষামাজা করছে। এছাড়া প্রাণের আর বিশেষ সাড়া নেই। কেবিনের মধ্যে ঢুকে দেখি কে একজন কানে হেডফোন লাগিয়ে কী শুনছে, এবং তাকে ঘিরে প্রায় জনা দশ-পনেরো মানুষ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে। ভিড়ের মধ্যে অমরেশকে চিনতে কষ্ট হল না। সে আমাকে বিশেষ লক্ষ না করে সুশোভনবাবুর দিকে এগিয়ে এল, তার গলায় ঈষৎ উত্তেজনার আভাস : 'স্যার, কী এক অদ্ভুত আওয়াজ আসছে হাইড্রোফোন মারফত। কখনও মনে হচ্ছে ক্রুদ্ধ পশুর গর্জন, কখনও মনে হচ্ছে বাঁশঝাড়ে আগুন লেগেছে—কাঁচা বাঁশ ফাটার আওয়াজ।'

সুশোভনবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখানে এত ভিড় কেন ? তোমরা সকলে যে যার কাজে যাও। গোয়েল, প্লিজ, হেডফোনটা আমাকে দাও।'

আস্তে আস্তে কেবিন খালি হয়ে গেল। সুশোভনবাবু হেডফোন কানে দিয়ে চিন্তিত মুখে মাঝে মাঝে কী যেন নোট করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে হেডফোনটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমরেশ, যেখানে হাইড্রোফোনটা রয়েছে তার গভীরতা কত হবে ?'

'স্যার, পঞ্চাশ ফ্যাদমের বেশি হবে না।'

'মাত্র ! ভাবিয়ে তুললে তো। আওয়াজটা কোনও বড়সড় সামুদ্রিক জীবের হলে আমরা আগে জানতে পারতুম, কারণ ইকো-সাউন্ডিং-এ তাহলে দুটো প্রতিধ্বনি আসত। আচ্ছা, ও-জায়গাটার টোপোগ্রাফি আমরা কি জানি ?'

'স্যার, ওই টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপটা আমরা কালকেই শেষ করেছি। যেখানে জাহাজটা আছে সেটা মহাদেশের ঢালু অংশের প্রান্তে। এরপরে অগভীর অংশটা খুবই এবড়ো-খেবড়ো। অবশ্য পঞ্চাশ কিলোমিটার এগোলে সেটা মসৃণ হয়ে গেছে।'

আমি বিস্মিত হয়ে ওদের ম্যাপটা দেখছিলাম। ভীষণ খেটেছে বলতে হবে। উপকূল থেকে পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত সমুদ্রতলের খুঁটিনাটি অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। কোথায় কী ধরনের সেডিমেন্ট আছে, সেডিমেন্টের তলায় কী ধরনের পাথর, সবই এক

ঝলকে বোঝা যায়।

ঘণ্টা দু-তিন কাটতেই বুঝলাম সুশোভনবাবু আমার অস্তিত্ব বেমালুম ভুলে গেছেন। সেই যে কখন একবার কফি খেতে খেতে দু-একজনের কাছে আমাকে ডঃ বোস বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তারপর একেবারে নিজের কেবিনে। আমিও ওঁকে বিশেষ ঘাঁটাতে সাহস পাচ্ছি না।

জাহাজের ডেকে অবশ্য বিশেষ খারাপ লাগবার কথা নয়। একটা ডেক চেয়ারে বসে উপভোগ করছি সমুদ্রের হাওয়া। দূরে কয়েকটা জেলে-ডিঙিতে নুলিয়ারা জাল ফেলে মাছ ধরছে।

হঠাৎ লক্ষ করলাম, দূরের একটি ডিঙিতে যেন কিসের একটা উত্তেজনা। একটি নুলিয়া তার পাশের সঙ্গীকে নিয়ে কী এক অজানা ভয়ে যেন বিপর্যস্ত। পাশের কেবিনে গোয়েল ছিল। ওর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার আলাপ হয়ে গিয়েছিল। ওকে বললাম, 'গোয়েল, প্লিজ, বাইনোকুলারটা একবার দেবে?'

বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখি ইতিমধ্যে নুলিয়ারা হাত নেড়ে ওদের আশপাশের বেশ কিছু সঙ্গী-সাথীদের জড়ো করেছে। সবাই মিলে ঝুঁকে পড়ে নৌকোর খোলের মধ্যে কী যেন দেখছে।

কৌতূহল আর রাখতে পারলুম না। ডেকে লাইফ-বোটের অভাব নেই। নাবিক-লস্কর নিতান্ত কম নয়। সোজা গিয়ে সুশোভনবাবুকে বললাম,'স্যার, চুপচাপ বসে আছি, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে দু'জন লোক নিয়ে একটা নৌকোয় কিছুক্ষণ ঘুরে আসি।'

সুশোভনবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'সে তো ভালোই। কিন্তু বেশি দূরে যেও না। আর একটা কথা, চারটের আগেই ফিরে এসো, কারণ তোমার সঙ্গে হোটেলে ফিরে গিয়ে আমাকে কয়েকটা ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল টেলিফোন করতে হবে।'

জেলেদের নৌকোটাকে ধরতে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় লাগল না। সমুদ্র যেন শান্ত হ্রদ। মাল্লারা ওদের ভাষা জানে। সরকারি জাহাজ থেকে দেখতে এসেছি শুনে ওরা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। যা দেখলাম, তা কোনওদিন কল্পনাও করিনি।

একটা অবিশ্বাস্য মাছ—না, জন্তুও বলা যায়। প্রায় পাঁচ ফুটের মতো লম্বা হবে। বিচিত্র ধরনের উজ্জ্বল নীল আঁশ, এক অস্বাভাবিক বিরাট মাথা। তাছাড়া পাখা, লেজ, সব মিলিয়ে যেন প্রাগৈতিহাসিক কাহিনীর পাতা থেকে উঠে এসেছে। দেখলে গা শিরশির করে।

মাল্লাদের বললাম, 'ওদের বুঝিয়ে দাও সরকার এ-মাছ কিনে নেবে।' এরকম হিংস্র জীব ওদের কাছে থাকা ঠিক নয়। মাছটা তখনও অল্প অল্প নড়ছে। ওটাকে জাল মুড়ি দিয়ে লাইফ বোটে তুলতে চারজন লোক হিমশিম। অবশ্য জাহাজের ওপরে তুলতে বেগ পেতে হল না। ভাগ্যে ছোট ক্রেনের বন্দোবস্ত ছিল। ইতিমধ্যে ডেকে এক উৎসুক ভিড়। কখন কে যেন সুশোভনবাবুকে খবর দিয়েছে। তিনি ভিড় সরিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালেন, যেন ভূত দেখেছেন। অস্ফুট স্বরে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল : 'মাই গড, শিলাকান্থ! ছ' কোটি বছর আগে এদের যে ফুরিয়ে যাওয়ার কথা!'

সকলে প্রায় পাঁচ মিনিট বিস্ময়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্থাণু। হঠাৎ সুশোভনবাবুর গলার আওয়াজে সংবিৎ ফিরল।

'শিগগির, এটা এখনও বেঁচে আছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে হয়তো মারা যাবে। তার আগে নিয়ে চলো জাহাজের অ্যাকোয়ারিয়ামে।'

এ-জাহাজে যে এত সুন্দর একটা অ্যাকোয়ারিয়াম আছে কে জানত! তার জলের

তাপমাত্রা দরকারমতো বাড়ানো-কমানো যায়। এই অদ্ভুত জীবটার প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টি করতে খুব বেশি সময় লাগল না। তখন মাছটা আবার স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে লাগল। বেশ কয়েক জোড়া উৎসুক চোখ ওর দিকে সে-সময় নিবদ্ধ। এতক্ষণ লক্ষ করিনি। অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে একটা ছোট হাইড্রোফোন লাগানো। সুশোভনবাবুর কানে হেডফোন এবং তাঁর মুখের চেহারায় যেন কোনও এক দুরূহ সমস্যা সমাধানের আনন্দের চিহ্ন।

হোটেলে ফিরে যাওয়া আর হল না। সারাটা বিকেল, সারাটা রাত ধরে ওঁরা শিলাকান্থ সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। মেটাবলিজম, রেসপিরেশন রেট, এরকম আরও কত কী সব জৈব রাসায়নিক ব্যাপার। সে-রাতে কারোরই ভালো করে ঘুমনো হল না। ভোরবেলায় দেখি বিরাট তোড়জোড় চলেছে। যে-জায়গায় হাইড্রোফোন মারফত ওইসব বিচিত্র আওয়াজ আসছিল সেখানে ব্যাথিস্ফিয়ার নামিয়ে দেখা হবে। কী করে যে ওই ব্যাথিস্ফিয়ারের যাত্রী হওয়া যায় তাই ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে সুশোভনবাবুর কেবিনের দিকে গেলাম।

কেবিনের দরজা ভেজানো ছিল। নক্ করতেই আওয়াজ এল: 'কাম ইন। ওঃ, তুমি। দেখো তো কী কাণ্ড! ছুটিতে বেড়াতে এসে তুমি কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়লে। যাই হোক ডক্টর বোস, জাহাজের প্রত্যেকটি কর্মীর কাছে তুমি এখন একজন অত্যন্ত নামী লোক। তোমারই আগ্রহে আমরা বিবর্তনের একটা হারানো সূত্র খুঁজে পেয়েছি।'

আমি একটু লজ্জিত হয়ে পড়লাম: 'সে কী কথা, স্যার! আমি আবার কী করলুম! এটাকে চিনতে পারা তো খুব সহজ কথা নয়।'

'সেটা ঠিকই। যদিও পৃথিবীর বহু মিউজিয়ামে শিলাকান্থের ফসিল সংগৃহীত হয়েছে, আগে কেবলমাত্র দু'বার সজীব প্রাণীর দেখা পাওয়া গেছে। প্রথম ১৯৩৮ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে। সেবারে যে-জেলের দল ওই জীবটিকে ধরেছিল, বিজ্ঞানীরা খোঁজ পাওয়ার আগেই তারা ওটাকে কেটেকুটে শেষ করে ফেলে। তারপর ১৯৫২ সালে মাদাগাস্কারের কাছে যেটিকে পাওয়া যায় তার সম্পর্কেও পুরো গবেষণা হয়নি।

'আমরা জানি, ফসিলের হিসেবে অন্তত ছ' কোটি বছর আগে এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু অন্তত তিরিশ কোটি বছর আগেও যে এদের পূর্বপুরুষরা প্রাগৈতিহাসিক সমুদ্রে বিচরণ করত, এ-কথা জোর দিয়ে বলা যায়। সেদিক থেকে এরা ডাইনোসরদের চেয়েও বয়েসে বড়!

'শিলাকান্থ কথাটার অর্থ হল ফাঁপা মেরুদণ্ড। এই জাতের মাছ থেকেই যে সবরকমের মেরুদণ্ডী জীব—খেচর, ভূচর, উভচর উদ্ভূত হয়েছে, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই সেটা আমরা বুঝতে পারব। লক্ষ করে দেখেছ, ওটার পাখনাগুলো ঠিক অন্য মাছের পাখনার মতো নয়, বরং কতকটা হাঁসের পায়ের মতো। যেন এখনই উঠে আসবে ডাঙায়। অগভীর জলে ওদের পাওয়া গেলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

'তবে আমার প্রশ্ন হল, এই যে এক-একটা শিলাকান্থ ধরা পড়ছে, এদের সত্যিকারের আস্তানা কোথায়? সমুদ্রের এত ওপরতলাকার বাসিন্দা ওরা নয়। সেটা ওদের গায়ের আঁশের রঙ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ধরন-ধারণ দেখলেই বোঝা যায়।

'...কিন্তু এখন আমাকে থামতে হবে। ব্যাথিস্ফিয়ারে নামার জন্যে তৈরি হতে হবে। তা বেশ তো, তুমিও চলো না।'

বাইরে বেরিয়ে দেখি, শিলাকান্থের গল্পে এত তন্ময় হয়েছিলাম যে, বুঝতে পারিনি জাহাজ

নোঙর তুলে কতদূরে চলে এসেছে। জাহাজের প্রপেলারের ঘায়ে সাগর ফেনায় ফেনা, গাঙচিলেরা জাহাজের গায়ে ভিড় করেছে খাবারের লোভে।

কতদূরে এসে যে জাহাজের গতি মন্থর হল তা বলতে পারি না। সূর্য তখন প্রায় মাথার ওপরে। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ।

ব্যাথিস্ফিয়ারের ভেতরকার বন্দোবস্ত ভারি চমৎকার। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। বসবার আসন পুরু গদি মোড়া। টেলিফোন, লেখার ডেস্ক, একপাশে সবই ব্যবস্থা আছে। প্রথমে সিঁড়ি বেয়ে ঢুকে গেল অমরেশ। ভেতর থেকে সঙ্কেত দেওয়ার পর সুশোভনবাবু, আমি ও রহমান বলে আর-একটি অ্যাসিস্ট্যান্ট একে একে ঢুকলাম। শুনতে পেলাম, প্রেসারাইজ্‌ড ঢাকনাটা ওরা বাইরে থেকে সশব্দে বন্ধ করে দিল। এরপর ভেতরে এয়ারকণ্ডিশনারের ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উইঞ্চ-লিফটে আমাদের ব্যাথিস্ফিয়ার নামতে শুরু করল।

দেখি হাতঘড়িতে তখন প্রায় বেলা বারোটা। সুশোভনবাবু আগে একবার বলেছিলেন চারটের আগে ওপরে উঠে ওঁকে আজ রাত্তিরের মধ্যেই হোটেলে ফিরতে হবে। আস্তে আস্তে ব্যাথিস্ফিয়ারের জানলায় সূর্যের আলো মিলিয়ে গেল। তবুও দেখি এক তীব্র লাল আভা জেগে রয়েছে। এখানে-ওখানে দু-একটা সামুদ্রিক মাছ। কখনও বা ভাসমান শ্যাওলা। তারপর হঠাৎ কোন জাদুমন্ত্রে যেন সেই লাল আভা অদৃশ্য হল। পাশে মিটারে দেখি নেমেছি মাত্র দু'শ ফুট। বাইরে এখন নীল-সবুজে-মেশানো গাঢ় শীতল এক ভয়ের রাজ্য। ব্যাথিস্ফিয়ারের তীব্র আলোয় কখনও মাছের ঝাঁক ত্রস্তভাবে দ্রুতগতিতে এদিক থেকে ওদিকে চলে যায়। কতরকমের মাছ—কোনওটা কাচের মতো স্বচ্ছ, এক্স-রে ছবির মতো অশরীরী। আবার কোনওটার বা হাঙরের মতো ধারালো দাঁত।

'ওই যে, ওগুলো এরোওয়ার্ম, তার পাশেরগুলো কম্বজেলি,' সুশোভনবাবু বলে যেতে লাগলেন। আমাদের দৃষ্টি চুম্বকের মতো জানলায় আঁটা।

শৈশবের অনেক প্রশ্ন চুপিসারে মাথাচাড়া দিতে লাগল মনের মধ্যে : মাছ কী করে গভীর সমুদ্রের তলায় অত চাপ সহ্য করে বেঁচে থাকে ? অক্সিজেনই বা পায় কোথা থেকে ? এক-একবার ভাবি সুশোভনবাবুকে জিজ্ঞেস করব, কিন্তু সাহস পাই না। উনি একেবারে নিমগ্ন হয়ে গেছেন।

হঠাৎ অ্যালার্ম ঘণ্টির ঝন্‌ঝন্ আওয়াজে আমরা সকলেই সচকিত হয়ে পড়লাম। কী ব্যাপার ! কোনও ডুবোপাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগল নাকি ? তাই বা কী করে হয় ? অমরেশ তো সর্বক্ষণ রেডারের সামনে বসে কন্ট্রোল করছে আর ওপরে গোয়েলকে নির্দেশ দিচ্ছে। এদিকে এমার্জেন্সি ল্যাম্পটা দপদপ করে কী যেন জানাতে চাইছে।

'কুইক অমরেশ, গোয়েলকে বলো আমাদের সাউথ-ওয়েস্ট-এ সরিয়ে নিতে। আমরা নিশ্চয়ই কোনও বড় মাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছি। এটা ডুবোপাহাড়ের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ অনেক মাছের লেজের ঝাপটায় পুরু ইস্পাতের পাতও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।'

সুশোভনবাবুর ধারণা নির্ভুল। কয়েক মিটার সরে যেতেই সার্চলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেলাম সেই বিচিত্র উজ্জ্বল নীল মাছ : শিলাকান্থ ! অকস্মাৎ ধাক্কা লাগায় চোখ থম্‌থমে ক্রুদ্ধ।

'দেখুন স্যার, ওটা কোনও গর্ত থেকে বেরিয়েছিল। আবার সেখানে ঢুকে যাচ্ছে !' অমরেশ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

ভালো করে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে-গর্তের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক মাছটা ঢুকছে সেটা একটা ডুবো আগ্নেয়গিরির গহ্বর। কবে কোন সুদূর অতীতে এই আগুন-পাহাড়ের আগুন নিভে গিয়েছিল কে জানে! সার্চলাইটের তীব্র আলোয় দেখা গেল গহ্বরের মুখটা যথেষ্ট বড়। প্রায় কুড়ি ফুট ব্যাসের এক বৃত্ত। শিলাকান্থটা মিলিয়ে যাওয়ার পর সূচীভেদ্য অন্ধকারে আর কোনও প্রাণের সাড়া নেই।

অনেকক্ষণ আমরা নিস্তব্ধ হয়ে কাটালাম। সকলের মনে একই প্রশ্ন : গহ্বরের মধ্যে আমরা ঢুকব কি না। তাকিয়ে দেখি, সুশোভনবাবু গভীর চিন্তামগ্ন। অবশেষে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে উনি বললেন, 'আমাদের নিচে নামতে হবে। রিস্ক কিছুটা আছে, কিন্তু নাটকের শেষ দৃশ্য দেখতে হলে এছাড়া আর উপায় কী? কিছু না জানিয়ে গোয়েলকে খুব শান্তভাবে গাইড করো, অমরেশ।'

গহ্বরের মুখ বরাবর ব্যাথিস্ফিয়ার ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল। আড়াই হাজার ফুট···দু' হাজার সাতশো ফুট···। আরও কিছুদূর এগোনোর পর অন্ধকার যেন তরল হল। কোথা থেকে যেন আলো আসছে। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ছোট গাছপালায় ভর্তি পাহাড়। কিন্তু সে গাছপালা পৃথিবীর কোনও পরিচিত চৌহদ্দির নয়। পাহাড়গুলো ভালো করে লক্ষ করলে বোঝা যায় সেগুলো গ্রানাইটের নয়, যেন প্রবালে পূর্ণ। আরও বোঝা যায়, সেখানে স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো অসংখ্য তারামাছ রয়েছে। তাদের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলো কেমন এক আলো-আঁধারি ভৌতিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রবাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক গাছপালা দেখলে মনে হয় সমুদ্র এখানে খুব ঠাণ্ডা নয়।

সুশোভনবাবু হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলতে আরম্ভ করলেন, 'এ কী! আমরা একেবারে প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশে এসে পড়েছি। ওই তো, দ্যাখো, কাঁকড়ার মতো ওগুলো ক্রাস্টাসিয়া গ্রানটোলাইট। আরও কত কী! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমরা তখন দেখছি চোখের সামনে দিয়ে সিনেমার ছবির মতো সরে যাচ্ছে অসংখ্য অচেনা সামুদ্রিক প্রাণী। কোনওটার পুরু আঁশ, কোনওটা বুকে-হাঁটা চিংড়ির মতো সাঁতারু—কপালের মাঝখানে একটা বিরাট ভয়াল চোখ। সমুদ্রের ওপরতলায় যা ভাবা যায়নি, বোঝা যায়নি, সেইসব অবিশ্বাস্য জীব!

'অমরেশ, লক্ষ করো, প্রাণীগুলো যেন পুবদিকে চলেছে কোন এক অন্তঃশীলা স্রোতে ভর করে। জলের টেম্পারেচারটা একবার দেখো তো।'

অমরেশ অনেকক্ষণ মন দিয়ে কী সব মিটার যেন দেখল ; তারপর চেঁচিয়ে উঠল : 'গুড হেভেনস্ স্যার! সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস! আর নামাটা কি···'

ওর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। দিগন্তে কোথায় যেন একসঙ্গে একশোটা বাজ পড়ল। কী হয়েছে কিছু বুঝে ওঠার আগেই চারদিকে যেন প্রচণ্ড আলোড়ন। প্রাথমিক বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে দেখি আমরা সকলেই ব্যাথিস্ফিয়ারের চারদিকে ছিটকে পড়েছি। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে, ব্যাথিস্ফিয়ারের ইস্পাতের দরজায় বিরাট এক গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। সেখান দিয়ে জল ঢুকছে কুলকুল করে। ক্রমে সেই জল যেন আমার মাথা বেয়ে জামার মধ্যে ঢুকছে। হাত দিয়ে দেখি জল নয়, রক্ত! পড়ে গিয়ে চোট পেয়ে কেটে গিয়েছে। সেই চেতন-অর্ধচেতন অবস্থার মধ্যেই দেখলাম সমুদ্রের তলা থেকে বিস্ফোরণের বেগে উঠে আসছে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো উৎক্ষিপ্ত মাটি, পাথর। পাহাড়ের প্রান্ত থেকে ভয়ার্ত চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে যেন এনসাইক্লোপিডিয়ায় দেখা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর ছবির জীবন্ত প্রতিমূর্তি : ইক্‌থাইওসর—হাড়ের খাঁচায় ঢাকা চোখ তেকোনা ধারালো দাঁত অস্পষ্ট আলোয় ইস্পাতের ফলকের মতো চকচকে, বীভৎস লম্ব

গলা ও পাখনাওয়ালা সামুদ্রিক সরীসৃপ— প্লেসিওসর। সেই প্রবাল পাহাড় খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছে। যেন কোনও আহত দানবের অসংখ্য ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তপ্রবাহের মতো পাহাড়ের বিদীর্ণ জায়গাগুলো দিয়ে বেরিয়ে আসছে তরল আগুনের মতো লাভা স্রোত।

মনে হল বর্ষার নদীতে চান করতে নেমেছি। প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে, আমার নাক কান ও মুখ দিয়ে প্রমত্ত বেগে জল ঢুকছে। ভেসে থাকতে পারছি না। আমি ডুবে যাচ্ছি। চোখ খোলার চেষ্টা করলেই ঘোলা জল সবকিছু মুছে অন্ধকার করে দিচ্ছে। অবসাদে সমস্ত শরীর শিথিল…ঘুমে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে। দীর্ঘ, ক্লান্ত দিনের শেষে ঘু…ম…।

তারপর কখন চোখ খুলেছি জানি না। দেখি একটা খোলা জানলার পাশে শুয়ে আছি। বাতাসে জানলার পরদাটা অল্প অল্প দুলছে। একটি ছোট টিপয়ে ফুলদানিতে সুন্দর ফুল সাজানো। পরিষ্কার ইংরেজিতে শাসনের সুরে নারীকণ্ঠে কে যেন বলছে, 'এখন কিন্তু মোটেই উঠবার চেষ্টা করবেন না। শরীর আপনার ভীষণ দুর্বল।'

আমার মাথায় পুরু ব্যান্ডেজ, কোনও এক তীব্র ওষুধের গন্ধে সমস্ত ঘর ভরে আছে।

'কোথায়? কোথায় আমি?'

'এটা হারবার হসপিটাল।'

সংক্ষেপে আমাকে আশ্বস্ত করে মেয়েটি চলে গেল। বোধ হয় নার্স হবে। কিছুক্ষণ বাদেই নার্সটি ফিরে এল। সঙ্গে সুশোভনবাবু ও অমরেশ।

'এই যে সঞ্জয়! এখন কীরকম লাগছে? বাপ রে, তুমি যা ভাবিয়ে তুলেছিলে! তোমার ছাড়া আমাদের কারও আঘাতই তেমন গুরুতর হয়নি।'

অমরেশের কপালে ছোট একটা প্লাস্টার লাগানো। ও বলল, 'ভাগ্যিস বিদ্যুৎ আমাদের আচ্ছন্ন মস্তিষ্কের চেয়ে দ্রুত কাজ করে। তাই আমাদের বিপদের সঙ্কেত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গোয়েলের কাছে পৌঁছে যায়। এমার্জেন্সি অ্যালার্মটা একটা কর্ড দিয়ে সব সময় আমার হাতে বাঁধা থাকত। তাই পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওপরে খবর গেছে।'

হাসপাতালে ক'দিন কাটিয়ে হোটেলে ফিরেই কলকাতায় ফেরার গোছগাছ আরম্ভ করেছি। কাল সকালের প্লেনেই যাব। সেদিন রাতে 'চন্দ্রশেখর' জাহাজের সব অফিসারদের খেতে বলেছি। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের প্রিয় পোর্টিকোতে বসে কফি খাচ্ছি সকলে মিলে। রাত্রি দশটার পর হোটেল এখন নির্জন হয়ে গেছে। আমরা ছাড়া কেউ বোধ হয় জেগে নেই।

সুশোভনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার, সমুদ্রের এ-কাহিনী কাকেই বা বলব, কে-ই বা বিশ্বাস করবে। তবুও নিজের মনটাকে পরিষ্কার করার জন্যে একটা প্রশ্ন করি : যা আমরা দেখেছি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী? বিবর্তনের রাস্তায় কোটি কোটি বছর আগেকার প্রাণীদের ওভাবে টিকে থাকার রহস্যটা কী?'

'দুঃখের কথা সঞ্জয়, একটা আগ্নেয়গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতে ওরা ধ্বংস হয়ে গেল। এমনকি আমাদের ক্যামেরার ছবিগুলো পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেল—নইলে আমাদের এই তথ্য পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজে এক দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করত। প্রায় একশো বছর আগে ইংল্যান্ড থেকে "চ্যালেঞ্জার" জাহাজে চড়ে বিজ্ঞানীর দল গভীর সমুদ্রের তলায় যে প্রাণের সাড়া আছে তার প্রমাণস্বরূপ নানা জাতের বিদঘুটে মাছ সংগ্রহ করেন। তার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক বিশেষ কিছু ছিল না, যদিও যা তাঁরা এনেছিলেন মানুষের চোখে তা অতি অদ্ভুত ঠেকেছিল। অর্থাৎ, সেগুলো পরিচিত চৌহদ্দির কিছুই নয়।

'আমার মনে হয়, সমুদ্রের গভীরে প্রাণীদের বসবাস সময়ের হিসেবে অপেক্ষাকৃত

আধুনিক। অগভীর জলে যাদের জন্ম, সমুদ্রের তলায় খাপ খাইয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন। শীতল অন্ধকার আবর্তে অত গভীর চাপে প্রাণী বাঁচে কী করে? অবশ্য আস্তে আস্তে সইয়ে নিয়ে কিছু মাছ সমুদ্রের তলায় বাস করছে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

'আবার এমন যদি হয় যে, সমুদ্রতলে অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত ও নিম্নচাপের একটা এলাকা অনেকদিন ধরে বজায় রয়ে গিয়েছে, যেসব সামুদ্রিক প্রাণী সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে তার সন্ধান পেয়েছিল তারা সেখানে গিয়ে বংশপরম্পরায় টিকে থাকতে পারে। ওই যে ডুবন্ত আগ্নেয়গিরির মধ্যে আমরা ঢুকেছিলাম, ওই এলাকাটা এমনই একটা জায়গা। তবে আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারিনি যে, ওর সমস্ত অংশ এখনও সম্পূর্ণ মৃত নয়। অথবা এমনও হতে পারে যে, আমরা সমুদ্রতলে এক বিরাট ভূমিকম্পের মধ্যে পড়েছিলাম।'

'স্যার, ওখানকার জল কী করে অত গরম হল—সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস?'

'জানো তো, সমুদ্র এক অতিকায় ইঞ্জিনের মতো। নিরক্ষরেখার কাছ থেকে গরম জল অভ্যন্তরীণ স্রোতে চলে আসছে উত্তর মেরুর দিকে। তারই জায়গা ছেড়ে দিতে উত্তরের ঠাণ্ডা জল তলা থেকে ওপরে উঠে আসছে। তবে খুব সম্ভব ভূমিকম্পে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে কিছু সুপারহিটেড জল এসে ওর সঙ্গে মিশেছে। তাই অত গরম হয়ে পড়েছিল।'

'এরকম জায়গা কি আরও থাকতে পারে, স্যার?'

'হয়তো খুব কমই আছে। সমুদ্রের গভীর অংশ সম্বন্ধে আমরা এত কম জানি যে, আছে কি নেই বলে দেবে কে! কোটি কোটি বছর আগে সমুদ্রের ওপরতলার যেসব বাসিন্দা ধ্বংস হয়ে গেছে তার সামান্য দু-একটি হয়তো এখনও সমুদ্রের নিচে টিকে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।'

আমাদের গল্পের প্রবাহে হঠাৎ বাধা পড়ল। ডেস্ক ক্লার্ক এসে সুশোভনবাবুকে খবর দিল যে, আমেরিকার সঙ্গে টেলিফোনে সংযোগ করা গেছে। উনি উঠে গেলেন।

হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে আরব সাগরের ওপার থেকে। আমাদের কারও মুখে আর কোনও কথা নেই। প্রত্যেকেই যেন এই নির্জন বিশ্রামের মুহূর্তগুলো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি।

'গুড নিউজ, অমরেশ। ম্যাসাচুসেটস থেকে প্রফেসর হ্যাগস্ট্রম পরশুর মধ্যেই এসে পড়ছেন। ওঁরা শিলাকান্থ সম্বন্ধে ভীষণ উত্তেজিত। এখন ওটাকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। ওটা পরীক্ষা করে যেসব তথ্য আমরা পাব তার দাম অনেক। ...অনেক রাত হয়ে গেছে সঞ্জয়, তোমাকে তো আবার ভোরে উঠে প্লেন ধরতে হবে। অল দ্য ক্রেডিট গোজ টু য়ু —ইয়েস মাই বয়।'

সুশোভনবাবু, অমরেশ সবাই করমর্দন করে বিদায় নিল। আমি চিত্রার্পিতের মতো বসে রইলাম। আজ রাতে আর কি ঘুম আসবে?

☐ ১৯৬৪





অপালা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সেবার এপ্রিলের এক সন্ধ্যায় আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে গ্লোবে 'স্টার ওয়ার্স' ছবি দেখতে গিয়েছিলুম। ফেরার পথে কথায় কথায় কর্নেল বললেন, 'আজকাল মানুষের এই এক অদ্ভুত প্রবণতা, ডার্লিং! পৃথিবীতে আর কোনও বিস্ময় খুঁজে পাচ্ছে না। যেন কোনও রহস্যই আর অবশিষ্ট নেই এখানে। তাই মানুষ এখন আকাশে রহস্য খুঁজতে মন দিয়েছে। আসলে, আমার ধারণা, মানুষের বিস্মিত হওয়ার প্রবৃত্তিটাই ক্ষয়ে গেছে। সুতরাং আর্থার ক্লার্ক, কার্ল সাগান, আইজ্যাক অ্যাসিমভদের আবির্ভাব ঘটেছে মনুষ্যসমাজে। ডার্লিং, তোমার কি মনে হয় না, মানুষের পায়ের কাছে তুচ্ছ একটা ঘাসের ডগায় রঙিন ফুল ফুটে ওঠার চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু থাকতে পারে না কোথাও?'

নিছক আনন্দের জন্যে একটা ছবি দেখতে গিয়ে আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুর মনে এসব করুণ দার্শনিকতা ভর করেছে জেনে অবাক হলুম। হাসতে হাসতে বললুম, 'কর্নেল, স্বয়ং বিজ্ঞানী জেমস জিন্‌স বলেছেন, মহাজাগতিক ক্ষেত্রে এ-পৃথিবী এক বালুকণার তুল্য। কাজেই...'

ধুরন্ধর প্রকৃতিবিদ হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, 'উঁহু—এ একধরনের পলায়নবৃত্তি, জয়ন্ত। জাগতিক সমস্যা জট পাকিয়ে গেছে বলেই এ-অবস্থা। বিজ্ঞান এখনও এই পৃথিবীর লক্ষ কোটি রহস্যের এক শতাংশও ভেদ করতে পারেনি। অথচ এই আকাশমুখিনতা! ভেবে দেখ ডার্লিং, এখনও কোটি কোটি মানুষ বুভুক্ষাতাড়িত হয়ে রয়েছে। এদিকে অ্যাসিমভ-ক্লার্করা ভিনগ্রহের কল্পলোকে মহাকাশযান ছুটিয়ে দিয়েছেন। ফিউচারোলজিস্টরাও তাই। আর ওই সুইডিশ ভদ্রলোক—কী যেন নাম?'

'দানিকেন?'

'হুঁ, দানিকেন।' কর্নেল বিরক্তমুখে চুরুট ধরালেন। একটু পরে বললেন, 'এই আকাশ-বাতিক তীব্র হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। কি বাস্তব জীবনে, কি মানসিক কল্পলোকে—সর্বত্র আকাশচারিতা। সায়েন্স ফিকশন মানেই তুমি দেখবে ভিন্ন অজানা গ্রহের অদ্ভুত সব প্রাণীর আনাগোনা। আর ওই উফো!'

আমাদের গাড়ি ইলিয়ট রোডের মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালের জন্যে থামলে কর্নেল একটু হাসলেন: '১৮৫৭ সালে মার্কিন পেটেন্ট অফিসের ডিরেক্টর পদত্যাগ করেছিলেন। কেন

জানো ? তাঁর পদত্যাগপত্রে লেখা ছিল : নাথিং মোর লেফ্‌ট টু ইনভেন্ট—আর কিছু উদ্ভাবনের বাকি নেই। কাজেই এ-অফিসের প্রয়োজন নেই।'

'বলেন কী !'

'১৮৮৭ সালে প্রখ্যাত রসায়নবিদ মার্সেলিন বার্থেল্‌ট লিখেছিলেন, ফ্রম নাউ অন দেয়ার ইজ নো মিসট্রি অ্যাবাউট ইউনিভার্স। এখন থেকে বিশ্বের আর কোনও রহস্য রইল না...'

কর্নেল বাকি পথ গম্ভীর হয়ে রইলেন। মনে হল, বুড়ো যে-কারণেই হোক, বেজায় খচে গেছেন। ছবিটা ভালো লাগেনি এও একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু কল্পনার বাড়াবাড়ি ওঁর রসবোধকে আহত করেছে। যাই হোক, এ-অবস্থায় ওঁর সঙ্গে তর্ক না করাটাই সঙ্গত মনে করলুম।

এর দিন সাতেক পরে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার পক্ষ থেকে আমাকে তামিলনাড়ু উপকূলে আডিয়ার শহরে পাঠানো হল। এশিয়ার বৃহত্তম মৎস্য-প্রকল্প উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ ছিল সেখানে।

সমুদ্রতীরে রঙ্গপুরম নামে যে-নতুন উপনগরী গড়ে উঠেছে—আডিয়ার থেকে সামান্য দূরে—সেখানে একটা মনোরম বাংলোয় আমার থাকার ব্যবস্থা ছিল। টেলেক্সে মোটামুটি কভারেজটা পাঠিয়ে বিকেলে একা বিচে ঘুরতে গেলুম।

প্রচণ্ড বাতাস বইছিল। বালির ওপর এখানে-ওখানে জেলে-নৌকো পড়ে রয়েছে। বাতাস বাঁচিয়ে সিগারেট ধরানোর জন্যে একটা নৌকোর আড়ালে যেতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল।

আমার দিকে পিছন ফিরে প্রকাণ্ড একটা লোক। তার পরনে ধূসর প্যান্ট-শার্ট। চোখে বাইনোকুলার রেখে বসে রয়েছে। বাতাসের ঝাপটানিতে তার মাথার টুপিটা ছিটকে পড়েছে এবং বারবার জলের সূক্ষ্ম একটা স্তর এসে পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। তার দৃকপাত নেই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল, একদঙ্গল খুদে লাল কাঁকড়া তার পিঠ বেয়ে মাথার উজ্জ্বল টাকে ঘোরাঘুরি করছে। ভীষণ সুড়সুড়ি লাগারই কথা—লাগছে না ! কেন লাগছে না ? একাগ্র দৃষ্টির দরুনই কি ?

হাসির বদলে শেষপর্যন্ত একটু কেশে ফেললুম এবং লোকটি মুখ ফেরাতেই সাদা দাড়ি চক্ষুগোচর হল। অমনই চেঁচিয়ে উঠলুম, 'হ্যাল্লো, ওল্ড ম্যান !'

আমার বৃদ্ধ বন্ধু হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। ভিজে টুপিটা কুড়িয়ে এবং টাকে হাত বুলিয়ে কাঁকড়ার দলটাকে বিদায় করে বললেন, 'এসো, ডার্লিং ! প্রতিমুহূর্তে তোমাকে আশা করছিলুম—কারণ আডিয়ার ফিশারিজ প্রজেক্টের উদ্বোধনে কলকাতার সব বড় কাগজের নেমন্তন্ন ছিল। যাই হোক, আশা করি, কলকাতাবাসীর মৎস্যক্ষুধা এবার পরিতৃপ্ত হবে।'

'আপনি হঠাৎ এখানে যে ? উঠেছেন কোথায় ?'

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রেখে পা বাড়িয়ে বললেন, 'রঙ্গপুরমের এক আদি বাসিন্দা ডঃ অম্বরীশ গোত্রের বাড়িতে। ওই যে পাথুরে খাঁড়ি দেখতে পাচ্ছ, তার মাথায়। হুঁ, তুমি ডঃ গোত্রের নাম শুনে থাকবে ?'

'মনে পড়ছে না।'

'বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ অম্বরীশ গোত্রের নাম তোমার জানা উচিত ছিল। দশ বছর আগে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঁর নেতৃত্বেই বিস্ময়কর পদার্থকণা নিউট্রিনো আবিষ্কৃত হয়েছিল।'

'জিনিসটা কী ?'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'যা নিজেই ভালো বুঝিনি, তোমায় বোঝাব কেমন করে ? জিনিসটা যথেষ্ট ভুতুড়ে—এইটুকুই বলতে পারি। পরশু সন্ধ্যায় এখানে এসে পড়েছি ডঃ গোত্রের চিঠি পেয়ে। তারপর এই ভৌতিক রহস্যে জড়িয়ে পড়েছি। বাই দ্য বাই, জয়ন্ত, তুমি কি মাদাম ব্লাভাৎস্কির নাম শুনেছ ?'

'না তো!'

'জয়ন্ত, তুমি হোপলেস!' কর্নেল হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'মাদাম ছিলেন রুশ মহিলা। পরে আমেরিকার বাসিন্দা হন। অলৌকিক শক্তির ক্রিয়াকৌশল দেখাতে পারতেন। তাঁর ইচ্ছায় বিদেহী সত্তার সূক্ষ্মদেহে আবির্ভাব ঘটত। তিনি এই আড়িয়ার শহরে এসে থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে স্বাধীনতাবোধের উন্মেষে তাঁর দান অসামান্য। অ্যানি বেসান্ত তাঁর শিষ্যা ছিলেন। তো ডঃ গোত্র যখন আমাকে লিখলেন, মাদাম ব্লাভাৎস্কির অলৌকিক শক্তির লীলাক্ষেত্র এই আড়িয়ারে প্রায় একশো বছর পরে আবার বিদেহী সত্তার আবির্ভাব ঘটেছে এবং এজন্যে হয়তো ডঃ গোত্র নিজেই দায়ী, তখন আমার কৌতূহল হল এবং এসে পড়লুম।'

কান খাড়া করে শুনছিলুম। বললুম, 'খুলে বলুন তো কী ব্যাপার ?'

কর্নেল আস্তে আস্তে বললেন, 'ভারি অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে ডঃ গোত্রের বাড়িতে। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার আপত্তি না থাকলে ওখানে উঠতে পারো। ডঃ গোত্র তাতে খুশিই হবেন।'

'কিন্তু ঘটনাগুলো কী ?'

কর্নেল একটু হাসলেন। 'সে তোমায় নিজে উপস্থিত থেকে বুঝতে হবে। সেদিন বলেছিলুম না ডার্লিং, এ-পৃথিবীতেই এখনও কত বিস্ময়কর ব্যাপার আছে ? যাই হোক, চলো, তোমার সঙ্গে ডঃ গোত্রের আলাপ করিয়ে দিই।'

ডঃ অম্বরীশ গোত্রের বয়েস ষাটের কাছাকাছি। রোগাটে ঢ্যাঙা গড়নের মানুষ। একমাথা কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া চুল, খাড়া প্রকাণ্ড নাক, চোয়াল অব্দি কেয়ারি করা জুলপি—টিউডারযুগের ইংরেজ ব্যারনদের মতো। খাঁড়ির মাথায় ওঁর বাড়িটাও যেন খুদে দুর্গের গড়নে তৈরি। চারপাশে ঘন গাছপালা, আর দেশি-বিদেশি ফুল, ক্যাকটাস, অর্কিডের চোখ জুড়নো সৌন্দর্যে ভরা।

লনে বসে কথা বলতে বলতে ডাইনে খাঁড়ির ওপর প্রকাণ্ড চাঁদ উঠে এল। সমুদ্রের দিকটা ঘন ধূসর দেখাচ্ছিল। কানে ভেসে আসছিল খাঁড়ির দেওয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়া জলের মুহুর্মুহু গর্জন। লনটা দক্ষিণে। একতলা দুর্গাকার বাড়ির পুব অংশে একটুকরো খোলা বারান্দা। সেখানে কেউ ছিল না। হঠাৎ আমার চোখের সামনে একটা মূর্তি ফুটে উঠল সেখানে। জ্যোৎস্নায় সিল্যুয়েট মূর্তিটা দেখে আমি প্রথমে ভাবলুম, বাড়িরই কেউ হবে। আমাদের কাছ থেকে দূরত্ব বড়জোর দশ মিটারের বেশি নয়। কিন্তু তারপরই মনে পড়ল, ডঃ গোত্র বলছিলেন, বাড়িতে তিনি একা। কারণ রাঁধুনি, চাকর, মালী সবাই একে একে ছুটি নেওয়ার ছলে কেটে পড়েছে। তাছাড়া তিনি বিপত্নীক। তাহলে লোকটা কে হতে পারে ?

একটু পরেই বুঝতে পারলুম, যে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, সে সম্পূর্ণ নগ্ন এবং তার মাথায় মেয়েদের মতো লম্বা চুল আছে। আমি ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। ডঃ গোত্র পদার্থবিজ্ঞানের দুরূহ কী তত্ত্ব নিয়ে কর্নেলের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছিলেন। ল অফ প্যারিটি কথাটা বারবার কানে আসছিল। তারপর কর্নেলকে বলতে শুনলুম, 'হুঁ—এ যেন

নেচারের লেফটহ্যান্ড টুইস্ট—সুতোর তকলিতে বাঁদিকে পাক খাওয়ানোর মতো। কিন্তু—বাই জোভ ! জয়ন্ত, অমন করে কী দেখছ তুমি ?'

উলঙ্গ নারীমূর্তিটি বারান্দা থেকে নেমে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। ক্রমশ তার শরীরের সবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল আমার চোখে। তার মুখের যুবতীসুলভ সৌন্দর্যের আদল, শূন্য দৃষ্টি, ভুরু, কপাল এবং ঈষৎ পুরু দুটি ঠোঁট, তার স্তন, নাভি, যোনিদেশ, উরু, জঙ্ঘা থেকে পা পর্যন্ত স্পষ্টতর। তারপর কর্নেলের কথায় একটু নড়ে উঠলুম এবং সে শূন্যে মিলিয়ে গেল। খাঁড়ির দিক থেকে একটা দমকা বাতাস এল আঁশটে জলের গন্ধ নিয়ে। একঝাঁক সমুদ্রের পাখি শনশন করে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। কাঁপা কাঁপা গলায় আমি বলে উঠলুম, 'অসম্ভব ! একেবারে অসম্ভব !'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'কী অসম্ভব দেখলে, জয়ন্ত ? ভৌতিক কিছু কি ?'

আমি কিছু বলার আগেই ডঃ গোত্র বললেন, 'মিঃ চৌধুরিকে আমার বলা উচিত ছিল। আমার বাড়িতে সন্ধের পর থেকে কিছু অদ্ভুত ফেনোমেনা দেখা যায়। তবে সবটাই ন্যাচারাল, ভয় নেই।'

বললুম, 'এ কেমন ন্যাচারাল, ডঃ গোত্র ? আমি দেখলুম ওই বারান্দা থেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীরে এক যুবতী নেমে এসে...'

কথা কেড়ে ডঃ গোত্র প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হোয়াট ?'

'উলঙ্গ এক যুবতী, ডঃ গোত্র !'

ডঃ গোত্র বেতের চেয়ারে ভেঙে পড়ার ভঙ্গিতে হেলান দিলেন। কর্নেল সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, 'তোমার ভুল হয়নি তো, ডার্লিং ?'

'না। স্পষ্ট দেখেছি। ওখান পর্যন্ত এসে মিলিয়ে গেল।'

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর আস্তে আস্তে বললেন, 'ফিয়ার-সাইকোসিস, অর্থাৎ পূর্ব-আরোপিত আতঙ্কবৃত্তি এক্ষেত্রে কতটা ক্রিয়াশীল ছিল তোমার মনে, বুঝতে পারছি না—যদিও এ-বাড়ি আসবার আগে তোমাকে ভুতুড়ে ঘটনার আভাস দিয়েছিলুম। কিন্তু নিজের সম্পর্কে বলতে পারি, আমি প্রায় কিছু না জেনে এখানে এসেছি এবং তা সত্ত্বেও একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখেছি। যেমন ধরো, একটা কালো কুকুর। গতরাতে কুকুরটাকে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ভোরে বেড়াতে বেরিয়ে ভাবলুম স্বপ্ন। কিন্তু ফিরে গিয়ে কুকুরটা ফের দেখতে পেলুম। তখনও সূর্য ওঠেনি অবশ্য। কুকুরটাকে দেখামাত্র ভাবলুম, তাহলে রহস্য রইল না। সম্ভবত শোবার ঘরের কোনও দরজা খোলা ছিল। কিন্তু তারপরই আমার সে-ধারণা চলে গেল। কারণ কুকুরটাকে বিদ্যুতের বেগে সমুদ্রের ওপর দিয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হতে দেখলুম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। বিকেলে বিচে গিয়ে সমুদ্র দেখছি। হঠাৎ মনে হল, কালো কুকুরটা ফিরে আসছে দূরের সমুদ্র থেকে। বাইনোকুলারে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম। সেই সময় তুমি এসে সাড়া দিলে।'

'অপটিক্যাল ইলিউশন সম্ভবত।' মনের জোরে কথাটা বলে ভয়ের চোখে জ্যোৎস্নায় রহস্যময় বাড়িটার আনাচে কানাচে সেই উলঙ্গ ভুতুড়ে যুবতীশরীর খুঁজতে থাকলুম। আমার বুক কাঁপছিল।

কর্নেল চুরুট ধরালেন। ডঃ গোত্র গুম হয়ে বসে আছেন তো আছেন—সাড়া নেই। কিছুক্ষণ পরে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'আমি মাদাম ব্লাভাৎস্কির মতো অকাল্টিস্ট নই, পদার্থবিজ্ঞানী। সুপারন্যাচারাল বলে কিছু মানি না। কিন্তু এও জানি, ন্যাচারাল স্টেট অফ ম্যাটার—অর্থাৎ বস্তুর প্রাকৃতিক অবস্থার স্তরভেদ আছে। যেমন ধরুন, আমার আবিষ্কৃত

পদার্থকণা নিউট্রিনো। নিউট্রিনোর কোনও বিদ্যুৎশক্তি নেই। কিন্তু কিছু "মাস" অর্থাৎ ভর আছে। তার ভুতুড়ে স্বভাব হল, সব বস্তুকণার ভেতর দিয়ে সে যাতায়াতে সমর্থ। এমন কি, সে যে-কোনও রূপ ধরতে ওস্তাদ। নিউট্রিনো বড় চঞ্চলমতি। ক্রমাগত এক ফর্ম থেকে আর-এক ফর্মে আত্মপ্রকাশ করে।'

এই সময় বাড়ির ভেতর ঝনঝন করে যেন কেউ কিছু ভেঙে ফেলল—কাচের জিনিস সম্ভবত। ডঃ গোত্র লাফিয়ে উঠলেন। টেবিল থেকে টর্চ নিয়ে দৌড়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ আলো নিভে গেল। কর্নেল ও আমি ডঃ গোত্রকে অনুসরণ করলুম। এবার আতঙ্কে ও উত্তেজনায় আমি টলছিলুম। বুকের ভেতর ক্রমাগত স্পন্দন।

বাড়িটার ভেতরে অনেকগুলো ঘর। ডঃ গোত্রের হাতে জ্বলন্ত টর্চ। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে একজায়গায় নিচে নেমে যাওয়ার রেলিংঘেরা কাঠের সিঁড়ি দেখে বুঝলুম, আন্ডারগ্রাউন্ডেও ঘর রয়েছে। নিচে নামার পর নীল আলো জ্বলতে দেখলুম একটা বিশাল কাচের ডোমের ভেতর। সেই আবছা রহস্যময় আলোয় পদার্থবিজ্ঞানীর বিরাট ল্যাবরেটরিটি দেখা যাচ্ছিল। ডঃ গোত্র বললেন, 'আপনারা প্লিজ এখানেই থাকুন। আমি এক্ষুনি আসছি।' তারপর দ্রুত একটা অদ্ভুত পোশাক ও মাস্ক পরে নিয়ে এগিয়ে গেলেন নীল আলোর ডোমটার পিছনে। আর ওঁকে দেখতে পেলুম না। কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, 'ডঃ গোত্রের একটা পরমাণুচুল্লি আছে ছোট মতো। ওই চুল্লি থেকেই নিউট্রিনো বেরোয় ঝাঁকে ঝাঁকে।'

একটু পরে ডঃ গোত্র ফিরে এসে মারাত্মক রশ্মিরোধক পোশাক ও মুখোশ খুলে বললেন, 'নাঃ, যা আশঙ্কা করেছিলুম তা নয়। ওপরে গিয়ে কিচেনটা দেখি।'

স্তম্ভিত দর্শকের মতো ওপরে ফিরে এলুম। ডঃ গোত্র প্রথমে করিডরে সুইচবোর্ড পরীক্ষা করে বললেন, 'মেনের ফিউজটা গেছে। ভাগ্যিস সেদিনের মতো শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন ধরে যায়নি।'

ফিউজের তার লাগাতেই ফের আলো জ্বলে উঠল। এবার আমরা কিচেনে ঢুকলুম। প্রচণ্ড সামুদ্রিক বাতাসে পরদা সরে গেছে একটা জানলায়। সমুদ্রের ব্যাকওয়াটার দেখা যাচ্ছিল। জানলার নিচে ফাঁকা ঘাসজমিতে জ্যোৎস্নায় চকচকে কিছু পড়ে থাকতে দেখে বললুম, 'দেখুন তো ডঃ গোত্র, ওটা কী?'

ডঃ গোত্র কী ভেঙেছে, খুঁজছিলেন। কর্নেল কিচেনের অন্য দরজা দিয়ে ডাইনিং-ঘরে ঢুকেছেন। ডঃ গোত্র আমার কাছে এসে জানলার বাইরে টর্চের আলো ফেলে অস্ফুট আর্তনাদ করলেন, 'মাই গড! ফ্লাওয়ার ভাসটা কে ছুড়ে ফেলল ওখানে!'

ডাইনিং-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমার বৃদ্ধ বন্ধু বললেন, 'ডঃ গোত্র, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আপনার ওই নিউট্রিনো-ঘটিত নয়, স্রেফ পোলটারগাইস্ট! জার্মান ভাষায় যার অর্থ শব্দকারী ভুতুড়ে শক্তি। ইংরেজরা গোমড়ামুখে বলে, স্পুক।'

ডঃ গোত্র অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'কে জানে কী। কিন্তু আমার অত প্রিয় ফ্লাওয়ার ভাসটার ওপর কেন এত রাগ ছিল? ওঃ, কত স্মৃতি-জড়ানো সুন্দর জিনিসটা!'

কর্নেল এবং ডঃ গোত্র আমাকে বাংলোয় ফিরতে দিলেন না। আমাকেও রহস্য পেয়ে বসেছিল। ফোনে বাংলোয় জানিয়ে দিয়ে ডঃ গোত্রের স্বহস্তে প্রস্তুত ডিনার সেরে আমরা লনে ফিরলুম। ততক্ষণে চাঁদ সমুদ্র-এলাকার আকাশ পেরিয়ে স্থলভাগের শিয়রে পৌঁছেছে। জ্যোৎস্না বেশ পরিচ্ছন্ন হয়েছে। আবহাওয়ায় কিছু শীতের স্পর্শ। কর্নেল বললেন, 'হুঁ—ডঃ গোত্র, আশা করি ১৯৬৮ সালে ব্যাভেরিয়ার রোজেনহেইম শহরের সেই উকিল

ভদ্রলোকের অফিসে রাতবিরেতে ভৌতিক উপদ্রবের কথা আপনার স্মরণ আছে ?'

ম্রিয়মাণ ডঃ গোত্র বললেন, 'মনে পড়েছে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সংস্থার পদার্থবিজ্ঞানীরা তদন্ত করে বলেছিলেন, তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানসম্মত কোনও উপায়ে এ-ফেনোমেনন বোঝা যাবে না। শেষে ফরাসি পদার্থবিজ্ঞানী কোস্তা দ্য ব্যুরেগার্দ রায় দিয়েছিলেন, ব্যাপারটা সাইকোকিনেসিস—সংক্ষেপে পি কে। পোলটারগাইস্ট ফেনোমেননের সঙ্গে একজন ব্যক্তির উপস্থিতি জড়িত। তাহলে কি আমার উপস্থিতিই এইসব অদ্ভুত ঘটনার জন্যে দায়ী ?'

ওঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর আবার একটা ভাঙচুরের আওয়াজে সবাই চমকে উঠলুম। কিন্তু এবার ডঃ গোত্র ছুটে গেলেন না। বললেন, 'গোল্লায় যাক সব !'

কর্নেল চাপা শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'প্যারাসাইকোলজিস্টরা পি কে ফেনোমেননকে বলেন "আর এস পি কে—রেকারেন্ট স্পন্টেনিয়াস সাইকোকিনেসিস"। ওঁরা বাড়াবাড়ি করেন সব তাতেই। কারণ এই ভৌতিক উপদ্রব মোটেও স্বতস্ফূর্ত ক্রিয়া নয়। যাই হোক, ডঃ গোত্র, আমি আবার সেই কালো কুকুরটাকে দেখতে পাচ্ছি।'

আমার হৃদপিণ্ডে রক্ত ছলকে উঠল। ডঃ গোত্র বললেন, 'কই ? কোথায় ?'

দেখলুম, কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর টুপিটা খসে পড়ল। টাকে জ্যোৎস্না ঝলমল করতে থাকল। এক পা এক পা করে ওপাশে গেটের দিকে এগিয়ে উনি চাপা গলায় ভৌতিক প্রাণীটিকে সম্ভাষণ করলেন, 'হাই জনি !' কিন্তু জনিকে দেখতেই পেলুম না।

ডঃ গোত্র চেঁচিয়ে উঠলেন, 'জনি ? কর্নেল ! শুনুন, শুনুন !'

কর্নেল কানে নিলেন না ওঁর কথা। দেখলুম, গেটের কাছে হাঁটু দুমড়ে বসে উনি একটা অদৃশ্য কুকুরকে যেন আদর করছেন।

এতক্ষণে আমার মনে হল, এই ভুতুড়ে ঘটনার পিছনে ডঃ গোত্রের কারসাজি নেই তো ? সম্ভবত উনি কফির সঙ্গে কোনও বিদঘুটে মাদক আমাকে ও কর্নেলকে খাইয়ে দিয়েছেন এবং আমরা তারই ঘোরে ভুলভাল দেখছি।

কর্নেল ফিরে এসে টুপিটা কুড়িয়ে মাথায় পরলেন। একটু হেসে বললেন, 'আপনার কুকুরটা খাঁটি অ্যালসেশিয়ান, ডঃ গোত্র। শুধু একটু চঞ্চল প্রকৃতির এই যা !'

ডঃ গোত্র গলার ভেতর বললেন, 'ওর নাম যে জনি কেমন করে জানলেন ?'

'কে জানে ?' কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'কাল রাতে ওকে দেখার পরই মনে হয়েছিল ওর নাম জনি।'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সম্পূর্ণ অসচেতন কী এক বিহ্বলতায়, 'আর আমার মনে হচ্ছে, কিছুক্ষণ আগে যে-নগ্ন মেয়েটিকে দেখেছি, তার নাম যেন অপালা।'

ডঃ গোত্রের চোখে জ্যোৎস্না ঝিকমিক করে উঠল। বললেন, 'হুঁ, অপালা।'

'আপনার আত্মীয়া কি ?'

'মেয়ে।'

'বেঁচে নেই ?'

'না।' বলে ডঃ অম্বরীশ গোত্র দু'হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন, 'কিন্তু আমি অপালাকে দেখতে পাচ্ছিনে কেন ? আমি যে তাকে দেখতে চাই !'

কর্নেল ওঁর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'প্লিজ, ডঃ গোত্র !'

একটু পরে ডঃ গোত্র আত্মসংবরণ করে উঠে দাঁড়ালেন। ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'আমি এবার ল্যাবরেটরিতে নামব। আপনারা ইচ্ছে করলে শুয়ে পড়তে পারেন।

যদি ফের কফির ইচ্ছে হয়, কিচেনে যেতে হবে কষ্ট করে। গুড নাইট !'

ডঃ গোত্র চলে গেলেন। কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, 'রাত প্রায় দশটা। জয়ন্ত কি শুয়ে পড়তে চাও ?'

'আপনি ?'

কর্নেল হাই তুলে বললেন, 'চলো। শুয়ে পড়া যাক....'

উত্তরের দিকে আমাদের শোবার ঘর। জানলার বাইরে ওদিকে কালো কালো পাথর—তার ওধারে সমুদ্রের ব্যাকওয়াটার। ঘরটা বেশ বড়। দু'পাশে দুটো খাট। একটু পরেই কর্নেলের নাক ডাকছে শুনলুম। এই ওঁর অভ্যেস। কিন্তু আমার ঘুম আসা অসম্ভব। খাটে পা ঝুলিয়ে বসে সিগারেট টানতে টানতে জানলার পরদা টেনে বন্ধ করতে গেলুম। চোখ গেল কালো পাথরগুলোর দিকে। সে-মুহূর্তে সত্যি কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম না—শুধু কালো পাথর আর তার পিছনে নিচের ধূসর ব্যাকওয়াটার ছাড়া। কিন্তু তাকাতে গিয়ে মনে হল, অপালাকে যদি দেখতে পেতুম পাথরের ওপর, আর-একটুও ভয় পেতুম না। বরং তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতুম।

আমার হাতে পরদাটা একটু কাঁপল। তারপর আবছা সিল্যুয়েট একটা মূর্তি কালো পাথরের ওপর ফুটে উঠতে থাকল। দৃষ্টি একাগ্র করলুম। তারপর জ্যোৎস্নায় মাত্র কয়েক মিটার দূরে নগ্ন অপালাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে ভব্যতাবোধ ফিরে এল। মনে হল, অপালার পরনে শাড়ি-টাড়ি থাকলে ভালো হয়। তাহলে নিঃসঙ্কোচে ওকে ডাকতে পারি।

দেখলুম, ঠিক তাই হল। অপালার শাড়িপরা শরীর জ্যোৎস্নায় ঝলমলিয়ে উঠল। চুলগুলো কিন্তু খোলা রইল—সেটাই আমার পছন্দ। তারপর চাপা গলায় 'অপালা' বলে যেই ডেকেছি, আমার বৃদ্ধ বন্ধুর নাকডাকা থেমে গেল এবং উনি ঘুমজড়ানো গলায় বলে উঠলেন, 'শুয়ে পড়ো, ডার্লিং ! তুমি পি কে ফেনোমেনের খপ্পরে পড়েছ। সব ঝুট হ্যায় !'

মনে মনে বেরসিক মেহের আলির মুণ্ডুপাত করা ছাড়া ক্ষোভ প্রশমনের উপায় নেই। অপালা অদৃশ্য হয়েছে....।

শুয়ে পড়ার পর ব্যাপারটা আমার চিন্তার বিষয় হল। অপালার প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে আমার পূর্বসংস্কার জড়িত ছিল না। আমার ইচ্ছানিরপেক্ষ ছিল তা। কিন্তু একটু আগে পাথরের ওপর তাকে বুঝি আমিই দাঁড় করিয়েছি। এমনকি তাকে শাড়ি পরিয়েও দিয়েছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমি এই বিদেহী সত্তার সঙ্গে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছি।

রাত যত বাড়ছিল, তত অপালা আমাকে পেয়ে বসছিল। সে কখনও শাড়িপরা অবস্থায়, কখনও নগ্ন হয়ে আমার বিছানার পাশে, পর্যায়ক্রমে ঘরের ভেতর সবখানে, কর্নেলের বিছানার পাশেও ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কাঠ হয়ে শুয়ে তাকে দেখছিলুম। শব্দহীন তার আনাগোনা—জাপানি ভিউফাইন্ডারে দেখা স্টিরিও ছবির মতো ত্রিমাত্রিক। তারপর সে আমার বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসলে আমি হাত বাড়িয়ে তাকে ছোঁওয়ার চেষ্টা করলুম। কিন্তু আমার কামনাতাড়িত হাত শূন্যতায় ব্যর্থ সঞ্চালিত হল। সমস্ত ব্যাপারটাই স্বপ্নে ঘটার মতো এবং আমি অর্ধোত্থিত হয়ে তাকে চুমু খেলুম। আর সেই সময় হঠাৎ মনে হল, তা হলে কি এই সেই বস্তু যা প্রাণীর ফ্যানটম অস্তিত্বের ব্যাপারে রুশবিজ্ঞানী সেমিয়ন ডেভিডোভিচ কিরলিয়ান যা আবিষ্কার করেছিলেন ? আমার ঠোঁট তার ঠোঁটের ওপর। স্পর্শহীন স্বাদহীন দীর্ঘ চুম্বন এক ফ্যানটম অস্তিত্বকে আন্দোলিত করছে না। কিন্তু আমি জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষ—আমি অস্থির হচ্ছি, মুহুর্মুহু আবেগের আঘাতে থরথর করে

কাঁপছি। আমার ভীষণভাবে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'অপালা ! অপালা ! তুমি আমার !'

তারপর তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সেই মুহূর্তে বাড়ির ভেতর কোথাও ঝনঝন শব্দে আবার কেউ কিছু ভেঙে ফেলল। কর্নেলের সাড়া পেলুম। ঘুমজড়ানো গলায় কিছু বললেন। শুধু 'ফিল্ড' কথাটা বুঝতে পারলুম।

বিদেহিনী ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে। আমি নেশাগ্রস্তের মতো আবার তাকে পেতে চাইছি, সেই সময় কর্নেল বিছানা ছেড়ে উঠছেন মনে হল। বললেন, 'জয়ন্ত কি জেগে আছ ?'

'হ্যাঁ। কেন ?'

কর্নেল সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্প জ্বালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, 'আবার সম্ভবত ইলেকট্রিক গণ্ডগোল। ফিউজ জ্বলে গেছে। একবার এসো তো আমার সঙ্গে। কী একটা গন্ধ পাচ্ছি যেন....'

দু'জনে দুটো টর্চ নিয়ে বেরুলাম। কয়েকটা ঘর পেরিয়ে করিডরে গিয়ে কর্নেল মেন সুইচ পরীক্ষা করে আবার ফিউজের তারটা পরিয়ে দিলেন। আলো জ্বলল করিডরে। তারপর সেই পাতাল-ল্যাবরেটরির সিঁড়ির মুখে পৌঁছলুম আমরা। এই সময় উৎকট পোড়া গন্ধ পেলুম। গ্যাসের গন্ধ, অথবা গন্ধকের সঙ্গে চামড়া পোড়ার গন্ধ যেন। কর্নেল অস্ফুট স্বরে 'মাই গড !' বলে হন্তদন্ত হয়ে নামলেন সিঁড়িতে। তাঁকে অনুসরণ করলুম। অজানা আতঙ্কে আমার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল।

ল্যাবরেটরিতে নেমে আমরা থমকে দাঁড়ালুম। সেই বিশাল কাচের ডোমের ভেতর নীল আলোটা জ্বলছে না। ঘর অন্ধকার। কিন্তু তফাতে একটা লাল আঁকাবাঁকা আলোর রেখা তিরতির করে কাঁপছে। সেইসঙ্গে অদ্ভুত ক্ষীণ একটা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে পর্যায়ক্রমে—পি পি পি পি.....

টর্চের আলোয় বিশাল ডোমটা গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে থাকতে দেখলুম চারপাশে। বড়জোর দশ সেকেন্ড হয়েছে। কর্নেল রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'এখানে এক মুহূর্ত নয়, জয়ন্ত ! মারাত্মক রেডিওঅ্যাকটিভ রে ছড়াচ্ছে হয়তো। চলে এসো।'

ওপরে সেই ঘরে ফিরে গিয়েই কর্নেল ঝটপট নিজের টুকিটাকি জিনিসপত্র কিটব্যাগে ভরে ফেললেন। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলুম। আমার হাত ধরে কর্নেল পালানোর ভঙ্গিতে বেরুলেন।

বাইরে গিয়ে বললেন, 'আপাতত তোমার বাংলোয় যাওয়া যাক। রাত তিনটে বাজে প্রায়। অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে ডঃ রাঘবনকে এখনই ফোন করা দরকার। কুইক !'

এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কাহিনী আমি দৈনিক সত্যসেবকে লিখিনি—কারণ তা লিখলে উপহাসের পাত্র হতুম। তবে প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ অম্বরীশ গোত্রের ল্যাবরেটরিতে দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর খবর মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকায় বেরিয়েছিল। আডিয়ারের কাছে রঙ্গপুরমে ওঁর বাড়ির চারদিক কাঁটাতারের বেড়ায় ঘিরে নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষিত হয়েছিল। পাতাল-ল্যাবরেটরির প্রবেশপথে সিঁড়ির মুখটাও সিল করে দেওয়া হয়। কারণ বিশেষ করে গামারশ্মি বড় সাঙ্ঘাতিক।

পরের এপ্রিলে আমার বৃদ্ধ বন্ধু একদিন কথায় কথায় জানালেন, জনিকে গত রাতে স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর রঙ্গপুরম যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। অপালাকে যদিও প্রচণ্ড ইচ্ছে সত্ত্বেও স্বপ্নে আর দেখতে পাইনি, সে-মুহূর্তে তার জন্যে আমার মনেও টান বাজল।

রঙ্গপুরমে গিয়ে দু'জনেই বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হলুম। ডঃ গোত্রের বাড়ির আরও পাঁচশো মিটার দূর অব্দি সরকার কাঁটাতারের বেড়া বসিয়ে দিয়েছেন। এক বছরেই ভেতরটা জঙ্গলে ঢেকে গেছে। বিচে বসে বাইনোকুলারে চোখ রেখে দূরে খাঁড়ির মাথার ওদিকটা কিছুক্ষণ দেখার পর কর্নেল বললেন, 'যতটা ঘিরেছে, ততটাই সাই ফিল্ড ছিল। তো....'

'সাই ফিল্ড কী ?'

'পি এস আই—সাই। অর্থাৎ সাইকোলজিক্যাল ফিল্ড।' কর্নেল একটু হাসলেন : 'ডার্লিং, পার্থিব রহস্যের শেষ নেই। এখানে জড় ও চেতনের সীমারেখা আর ভাগ করা যায় না। ফ্যানটম বলো, পোলটারগাইস্ট বলো, সাইকোকিনেসিস বলো—সবই ওই মাঝামাঝি অবস্থার ফেনোমেনা। নিউট্রিনো নামক আশ্চর্য কণিকার মাধ্যমকে ডঃ গোত্র কাজে লাগিয়ে ব্যাপারটা ঘটিয়েছিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে নিউট্রিনো নির্গত হত ওঁর খুদে অ্যাটমিক রিঅ্যাক্টর থেকে। এদিকে ডঃ গোত্রের সাইকোকিনেসিস-ঘটিত মানসিক শক্তি ছিল অসাধারণ। কারুর কারুর এই প্রকৃতিদত্ত বাড়তি শক্তি থাকে—প্যারাসাইকোলজিস্টরা যা নিয়ে গবেষণা করছেন। ডঃ গোত্র নিজের মানসিক শক্তিকে প্রয়োগ করতেন নিউট্রিনোর ওপর। বালুকণা জড়ো করে বাচ্চা ছেলেরা যেমন ঘর বানায়, মূর্তি গড়ে—ঠিক সেইভাবে।'

'অপালার কথা বলুন।'

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বললেন, 'ডঃ গোত্রের কন্যা অপালা ছিল বোবা কালা এবং জড়বুদ্ধিগ্রস্ত মেয়ে। তার জন্মের পরই মিসেস গোত্রের মৃত্যু হয়। অপালাকে নিয়ে সমস্যা ছিল ডঃ গোত্রের। সে কিছুতেই কাপড় পরতে চাইত না। সুযোগ পেলেই উলঙ্গ হয়ে ঘুরত। প্যাসাডেনা থেকে দেশে ফেরার পর ডঃ গোত্র তাকে স্বাভাবিক করে তোলার সাধনায় মেতে ওঠেন। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে ততদিনে। তার মস্তিষ্ককোষে বিদ্যুৎতরঙ্গ চালনা করতে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটল শেষ পর্যন্ত।'

কর্নেল চুপ করলেন। পিছনে সূর্য ডুবে গেছে কখন। সামনে সমুদ্র আছড়ে পড়ছে নিষ্ফল আর্তনাদের মতো। বুকভাঙা হাহাকার শুনছি যেন প্রকৃতিতে। বাইনোকুলারে চোখ রেখে সমুদ্র দেখতে দেখতে কর্নেল আনমনে বললেন, 'ডঃ গোত্র বেঁচে থাকলে জনিকেও দেখতে পেতুম এতক্ষণ—সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর দৌড়ে যেত কালো একটা অ্যালসেশিয়ান! ডঃ গোত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাই ফিল্ডও ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'জনির মৃত্যুর কারণ কী কর্নেল ?'

'নির্বোধ জনি সামুদ্রিক পাখি তাড়া করতে গিয়ে খাঁড়ি থেকে তিনশো ফুট নিচে পড়ে গিয়েছিল।'

সমুদ্র থেকে একটু পরে লাফিয়ে উঠল প্রকাণ্ড লাল এক গোলক। ভীষণ চমকে উঠেছিলুম। তারপর বুঝলুম, চাঁদ উঠল। গতবছর যেন এই চাঁদই জ্যোৎস্নার ভেতর এক অপরূপ যুবতী শরীর এঁকে দিয়েছিল। লাল রঙ ক্রমশ সোনালি হয়ে উঠল। বললুম, 'নিজের মেয়েকে নিজে কেন দেখতে পেতেন না ডঃ গোত্র—তাঁরই তো সৃষ্টি ?'

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন : 'মানুষের মন বড় অদ্ভুত, জয়ন্ত! নিজের সৃষ্টির ওপর তার নিজেরই অনেক সময় ঘৃণা জন্মায়। বিশেষ করে কোন পিতা নিজের যুবতী কন্যাকে উলঙ্গ দেখতে চান ? ডঃ গোত্র এই দ্বন্দ্বে ভুগতেন। তাই শেষে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ডঃ গোত্র অ্যাটমিক রিঅ্যাক্টরের ভালভ খুলে দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।'

'আত্মহত্যা!' আমি চমকে উঠলুম।

কর্নেল বিচে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'হ্যাঁ। তাঁর বেডরুমের টেবিলে স্বীকারোক্তি পাওয়া

গিয়েছিল ।'

খাঁড়ি অব্দি এগিয়ে হঠাৎ কর্নেল সমুদ্রের দিকে ঘুরলেন । মনে হল, জনিকে দেখতে পেয়েছেন । কিন্তু পরক্ষণে উলটোদিকে হনহন করে চলতে শুরু করলেন । জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

'বাংলোয় ফেরা যাক। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ভুলে গিয়েছিলুম ।'

আমার ফিরতে ইচ্ছে করছিল না । জ্যোৎস্নারাতে এই নির্জন বেলাভূমিতে কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে যদি অপালার কথা ভাবতুম, সে কি এসে সামনে দাঁড়াত না ? কিন্তু আমার বৃদ্ধ বন্ধু সে-সুযোগ আমাকে দিতে চান না । পাগলা মেহের আলির মতো সবটাই ঝুট হ্যায় সাব্যস্ত করে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন বাংলোর দিকে ।

□ ১৯৮৩





মৃত্যুদূত

গুরনেক সিং

কেপ কেনেডির আন্তর্জাতিক স্পেস লঞ্চিং স্টেশনে পৃথিবী থেকে চাঁদে প্রথম মনুষ্যচালিত রকেট পাঠাবার তোড়জোড় চলছে। প্রায় পঁচিশ তলা উঁচু বাড়ির সামনে 'টাইটান' রকেটটি দাঁড়িয়ে আছে মহাকাশের মহাযাত্রায় উত্তোলিত হওয়ার উত্তেজিত প্রতীক্ষায়। টাইটানের শীর্ষদেশে বসানো আছে আমাদের গাঢ় হলদে রঙের ক্যাপসুল রকেট 'মেঘদূত'। আমেরিকানরা এর নাম দিতে চেয়েছিল 'সার্ভেয়ার-এক্স', আর রাশিয়ানরা নামকরণ করতে চেয়েছিল 'লুনা-জিরো'। তাই বিরোধ এড়াবার জন্যে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষের দেওয়া নামটিই অবশেষে দু'পক্ষ মেনে নিয়েছে : মেঘদূত।

এ-কথাটা অবিশ্যি আজ কারোরই অজানা নয় যে, চাঁদে মানুষ পাঠাবার যে-অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা এতদিন ধরে পৃথিবীর দুই প্রধান শক্তির মধ্যে চলছিল, ভারতবর্ষের চেষ্টায় সম্প্রতি তার অবসান হয়েছে। পৃথিবীর দুই প্রধান শক্তির কর্ণধাররাই 'সার্ভেয়ার' আর 'লুনা' জাতীয় প্রোব-রকেটগুলির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যগুলো একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে চাঁদে প্রথম মানুষ পাঠাবার প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করতে একমত হয়েছেন। তারই প্রথম প্রচেষ্টা হল মেঘদূত।

চাঁদে প্রথম পদার্পণ করার অতি দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি আমরা মাত্র তিনজন। আমি অ্যালবার্ট রতনম—আমেরিকা ও রাশিয়ার মিলিত অনুরোধে ভারত সরকার তাঁদের দেশের একজন প্রতিনিধি পাঠাতে সম্মত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর দ্বারা ভারতের প্রতি অভাবনীয় সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। আমি প্রথমে ছিলাম নাসিকে মিগ টেস্ট পাইলট, তারপর কেরালায় থুম্বা রকেট লঞ্চিং কেন্দ্রের সুপারভাইজিং ইঞ্জিনিয়ার। আর আজ আমি চন্দ্রযাত্রী মেঘদূতের সহকারী পরিচালক, চিফ স্পেস অ্যাভিয়েশন পাইলট রিচার্ড গর্ডনের সহকারী। রিচার্ড গর্ডন আমেরিকান। তৃতীয় যাত্রী রাশিয়ার একজন দিকপাল ডাক্তার আলেক্সি রোদোনভ। তিনিই রাশিয়ার প্রতিনিধি।

যদিও আমাদের কাউকেই জানানো হয়নি—তবুও আমি জানি, এই চন্দ্র-অভিযানের জন্যে তিনটি সরকারই এমন লোক নেওয়ার চেষ্টা করেছেন যাঁরা সব দিক দিয়েই যোগ্য অথচ পিছুটান একেবারেই নেই, অথবা যথাসম্ভব কম।

গর্ডনের ব্যাপারটাই ধরুন। বয়েস ওর পঁয়ত্রিশ। প্রথম জীবনে ছিল টেস্ট পাইলট। ছাব্বিশ বছর বয়েসে বিয়ে করেছিল। বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যেই ভুল বুঝতে পারে। ওর বিবাগী মন যে ঘরের বাঁধনে জড়িয়ে পড়ার জন্যে নয়, ক্রমেই এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে ওর কাছে। ফলে জীবনটা হয়ে উঠতে থাকে একটি বোঝার শামিল—দু'পক্ষের কাছেই। শেষে আদালতের সাহায্যে সে-বাঁধন কেটে ফেলে ওরা। তখন থেকেই গর্ডন বিবাগী। গত ন'বছর ধরে ও স্পেস পাইলট। প্রায় দু' হাজার ঘণ্টা মহাকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতা আছে ওর।

ডাক্তার রোদোনভের বয়েস আটত্রিশ। কিন্তু কব্জির জোরে তিনি দু-দুটো গর্ডনকে দু'হাতে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখেন। ওঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব বেশি জানতে পারিনি। তবে এটুকু জানি যে রোদোনভ এ-মহাযাত্রা থেকে না ফিরলে তাঁর প্রিয় কুকুর 'বিস্কা' ছাড়া আর কারোরই বিশেষ অসুবিধে হবে না।

তারপর ধরুন আমার কথা। শর্মিলাকে হারিয়েছি আজ প্রায় সাত বছর। বাংলাদেশকে ভালোবেসেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম বাংলা ভাষাকে—শর্মিলাকে তাই পেয়েছিলাম জীবনসঙ্গিনী রূপে। শান্তনু—আমাদের প্রথম সন্তানকে জন্ম দিয়েই ও মারা গেল ত্রিবান্দ্রমের একটি হাসপাতালে। ও চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দুনিয়াটাকেও শূন্য করে দিয়ে গেল। মা গেলেন ওর বছর খানেক পরে। ওঁর খুব ইচ্ছে ছিল আমি আবার ঘর বাঁধি। কিন্তু তাঁর শেষ ইচ্ছাটি আমি পূরণ করতে পারলাম না। শান্তনুকে দিয়ে দিলাম ব্যাপটিস্ট চার্চ স্কুলের বোর্ডিংয়ে। ওখানেই ও পড়ছে এখন। তার ড্যাডিকে ও বছরে দেখে একবার কি দু'বার। সেটাও আমি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। ঠিক মায়ের মতো মুখের আদল পেয়েছে শান্তনু। দূর থেকে 'ড্যাডি' বলে ছুটে এসে যখন জড়িয়ে ধরে আমাকে তখন আমি বড় দুর্বল হয়ে পড়ি। তাই নিজেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে নিতে চাই। কী হবে আর মায়া বাড়িয়ে ? শর্মিলাকেও তো আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলাম, তবুও ধরে রাখতে পারলাম কই ? অতএব আমারও পিছুটান নেই বলেই ধরে নিতে পারেন।

তবে আমরা যে ফিরে আসবই না, এমন কোনও কথা নেই। বরং সফল যাত্রার অবসানে আমাদের পৃথিবীতে ফিরে আসার সম্ভাবনাই বেশি। আমাদের মহাকাশযানটিকে সেইভাবেই তৈরি করা হয়েছে। চাঁদ থেকে তার মাধ্যাকর্ষণের বাঁধন কাটিয়ে যাতে আমরা আবার পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতায় ফিরে আসতে পারি সে-ব্যবস্থা মেঘদূতে রয়েছে। সেখান থেকে একটি 'ভোস্টক-১৪' রকেট আমাদের মেঘদূতকে পৃথিবীতে নামিয়ে নিয়ে যাবে।

তবু ভয় আছে বইকি। পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেই তো আর হল না ! এমনভাবে আমাদের বেরুতে হবে যাতে আমরা চাঁদের অন্তত কয়েক শো মাইলের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারি। তবেই আমরা অটোমেটিক কোর্স ডিটেক্টারের সাহায্যে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণী শক্তির আওতার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারব। সেটি সম্ভব না হলে শুধু যে আমরা চাঁদে পৌঁছতে পারব না তা নয়, পৃথিবীতেও আর ফিরতে পারব না। তখন আমাদের দ্বিতীয় যাত্রাস্থল হবেন স্বয়ং অগ্নিদেব সূর্য। সূর্যের কয়েক লাখ মাইলের মধ্যে পৌঁছবার আগেই আমরা পুড়ে ছাই হয়ে যাব।

মেঘদূতের ড্রাইভিং প্যানেলে একটি লাল আলো জ্বলছে—শয়তানের একটি জ্বলজ্বলে চোখের মতন। আমি আর গর্ডন স্পেস-স্যুট পরে তৈরি হয়ে পাশাপাশি যে যার সিটে আবদ্ধ হয়ে বসে আছি। আমাদের নিচের দিকে একটি স্পেশাল সিটে বসে বেল্ট বেঁধে নিচ্ছেন ডাক্তার রোদোনভ। ওপর থেকে তাঁর স্পেসহুডের রঙ দেখা যাচ্ছে। স্পেস-স্যুটের

মধ্যে ডাক্তার রোদোনভের ভারি শরীরটা একটা বিরাট ফুটবলের মতো দেখাচ্ছে—দেখলে হাসি পায়। ড্রাইভিং প্যানেলের লাল আলোটা যখন হঠাৎ সবুজ হয়ে যাবে তখনই বুঝতে হবে আমাদের মহাযাত্রার ব্রাহ্মমুহূর্ত সমাগত। তখনই শুরু হবে কাউন্ট ডাউন : টেন, নাইন, এইট, সেভেন····

ভারশূন্য অবস্থাটা আমার কাছে নতুন নয়—গর্ডন আর রোদোনভের কাছে তো নয়ই। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি! মনে হয়, আমার সম্পূর্ণ দেহটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ভেঙে গুঁড়িয়ে হালকা মুক্ত আত্মাটি হঠাৎ বেরিয়ে এল বাইরে। সে এক নিদারুণ যন্ত্রণাকর অবস্থা—কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে। তারপরই সব হালকা, সব শান্ত·····হালকা····পায়রার পালকের মতো ভেসে যাওয়া হালকা মেঘের মতো।

রোদোনভের ভারি গলা ভেসে এল রেডিও-টেলিফোনে : 'দাসভিদানিয়া পিতৃভূমি, সূর্যের ভাঁটিতে কাবাব না হয়ে গেলে আবার ফিরে আসব তোমার মহান জনগণের মধ্যে! কী বল হে, গর্ডন?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল গর্ডন। কোর্স কম্পিউটারের রিডিং নোট করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা কোর্স ডিটেক্টারে ফিড করে দাও। এতক্ষণ আমরা কাঁটায় কাঁটায় ঠিক পথে চলেছি। টাইটানের থার্ড স্টেজের অ্যাকসিলারেশন আরম্ভ হয়েছে দেখছি—স্পিড কত?'

'ঘণ্টায় সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার।'

'ঠিক আছে। এই স্টেজের শেষে আমাদের স্পিড উঠবে প্রায় সাড়ে ছ' হাজার কিলোমিটার পার আওয়ার। সেই হিসেবে চাঁদের আওতার মধ্যে গিয়ে পড়তে আমাদের লাগবে রাফলি সত্তর ঘণ্টা। ততক্ষণ মাঝে মাঝে কোর্স ডিটেক্টারের রিডিং নেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করার নেই। আলেক্সি—'

'বলো, ব্রাদার।'

'আমাদের ব্লাড প্রেসার আর জেনারাল বডি রিঅ্যাকশন রিডিংটা নোট করে নাও। তারপরএসো, এক দান হয়ে যাক!'

'খরোশো!'

বুঝলাম, এবার দু'জনে ইলেকট্রনিক দাবার ছকটি মেলে ধরবে যে যার সামনে। তারপর ক্লোজ্‌ড সার্কিট টেলিভিশনে চলবে দুই মহারথীর বুদ্ধির লড়াই। সত্তরটি ঘণ্টা কাটাবার পক্ষে এর চেয়ে ভালোপ্যাস্টাইম আর কী থাকতে পারে!

বহুযত্নে স্মাগ্‌ল করে আনা আমার 'আশ্চর্য!' পুজোসংখ্যাটি আমি বার করলাম সিটের তলা থেকে। গর্ডন একটু অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। তারপর মৃদু হেসে চোখ টিপল, বলল, 'ওয়াইজ গাই!'

যাত্রার বাষট্টি ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। গতকাল কলকাতার মাঠে অনুষ্ঠিত মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের লিগ ফাইনাল ম্যাচের রেডিও কমেন্টারি শুনেছি মেঘদূতে বসে। মনে হল, পৃথিবী থেকে কয়েক লক্ষ মাইল দূরে নয়, আমি যেন পৃথিবীতেই আমার বসবার ঘরে বসে রেডিও কমেন্টারি শুনছি।

গর্ডন এখন রকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল ভার্সাস টেক্সাসের বেসবল ম্যাচের কমেন্টারি শুনছে। ডাক্তার রোদোনভ গর্ডনকে দাবায় কয়েকবার গো-হারান হারিয়ে ক্লান্ত

হয়ে ঘুমুচ্ছেন।

আর ঘণ্টাতিনেকের মধ্যে আসবে আমাদের এই যাত্রাপথের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মুহূর্ত। তখন অটোমেটিক কোর্স ডিটেক্টারের কাজ বন্ধ করে মেঘদূতের পরিচালনার ভার আমাদের নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে। আর তখনই আরম্ভ হবে আমাদের ওপর চাঁদের মাধ্যাকর্ষণী শক্তির আকর্ষণ। সেই সময় মেঘদূতকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পরিচালিত করে এগিয়ে যেতে হবে সঠিক পথে। ক্যালকুলেশনের একটু ভুল হলেই রোদোনভের ভাষায় 'সূর্যের ভাঁটিতে কাবাব' হয়ে যেতে হবে।

অবশেষে এল সেই মুহূর্ত····আর দেখতে দেখতে পারও হয়ে গেল। অটোমেটিক কোর্স ডিটেক্টারের সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। গর্ডন কন্ট্রোল তুলে নিল নিজের হাতে। আমি ঝুঁকে পড়লাম গ্র্যাভিটি রিডিংয়ের প্যানেলের ওপর। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে যদি গ্র্যাভিটি রিডিং পজিটিভ না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। উত্তেজনাকর কয়েকটি মুহূর্ত····আঠারো ডিগ্রি সেলসিয়াসের এয়ারকন্ডিশন্ড ঠাণ্ডাতেও ঘেমে উঠতে লাগলাম। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'গ্র্যাভিটি রিডিং পজিটিভ ! পয়েন্ট নট নট নট ফাইভ····পয়েন্ট নট নট নট এইট····পয়েন্ট নট নট ওয়ান····পয়েন্ট নট নট সিক্স····আমরা চাঁদের দিকে নামছি ! চাঁদ আমাদের আকর্ষণ করছে !'

'হুর্‌রে !' গর্ডন চেঁচিয়ে উঠল।

'উরা····উরা,' রোদোনভের গলা শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখর হয়ে উঠল গর্ডনের শর্টওয়েভ রেডিও-টেলিফোনটি, 'হ্যালো····হ্যালো····মেঘডুট কলিং····হ্যালো····স্পেস স্টেশন আর্থ। দিস ইজ মেঘডুট····উই আর অ্যাপ্রোচিং····রিপিট অ্যাপ্রোচিং মুন····।'

একটা গুনগুন সুর কানে এল। রোদোনভ কি কোনও রাশিয়ান গানের কলি গাইছেন ?

ধুলো, ধুলো আর ধুলো। সাদা সূক্ষ্ম ধুলো।

যেন বস্তা বস্তা ট্যালকাম পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছে কেউ চাঁদের আকাশে-বাতাসে। ভারি কাচের ভিউ পোর্টগুলো ঢেকে গেছে সেই পাউডার ধুলোর মোটা পরতে।

মেঘদূত নেমেছে চাঁদের মাটিতে, আর তার রেট্রোরকেটগুলোর প্রচণ্ড আলোড়নে উড়েছে চাঁদের ধুলোর মেঘ। 'সার্ভেয়ার' আর 'লুনা'র পাঠানো চাঁদের ছবি দেখে মনে হয়েছিল চাঁদে বুঝি শুধুই পাথর—ধুলো নেই। এখন দেখা যাচ্ছে, সেই ধারণা ভুল।

আধঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলাম আমরা। আমরা নেমেছি চাঁদের আলোকিত অংশে। আর ঘণ্টাচারেকের মধ্যে এই অংশে রাত নামবে। আমাদের প্রতি আদেশ আছে চাঁদের মাটিতে নেমে এই চার ঘণ্টার মধ্যে যতদূর সম্ভব মাটি, পাথর, উদ্ভিদ, জল, হাওয়া—আর সম্ভব হলে জীবনের নমুনা সংগ্রহ করা। এছাড়া ছবি তোলা, নানান রকমের বৈজ্ঞানিক রিডিং নেওয়া। তারপর রকেটে ফিরে এসে রাতের অপেক্ষা করা। রাত্রি নামার পর ঘণ্টাখানেক ধরে রকেটের ভেতর থেকেই বাইরের টেম্পারেচার, রেট অফ ফল অফ টেম্পারেচার আর প্রেসার নোট করা। তারপর, বিদায় চাঁদ। অন্তত এবারের মতো।

কিন্তু সমস্যা হল চাঁদের মাটিতে নামা নিয়ে। কেউই রকেটে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে রাজি নয়। এতদূর এসেও চাঁদে নামব না, এও আবার একটা কথা হল নাকি ? অথচ আমাদের মধ্যে অন্তত একজনের মেঘদূতে থাকাটা বিশেষ দরকার।

অবশেষে বাধ্য হয়ে সেই চিরাচরিত প্রথার আশ্রয় গ্রহণ করতে হল : ফ্লিপ এ কয়েন।

বেচারা গর্ডন হারল। আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিল সে আমাদের দিকে, বলল, 'উইশ য়ু গুড লাক, বাডিস !'

জরুরি যন্ত্রপাতি হ্যাভারস্যাকে ভরে নিয়ে আমরা নেমে গেলাম প্রেসার লক চেম্বারে। প্রেসার লকের দরজা বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে। চেম্বারের আবহাওয়ার প্রেসার হু হু করে নামতে লাগল চাঁদের বায়ুমণ্ডলের প্রেসারে। ভেতরের চাপ বাইরের চাপের সমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকের অ্যালয়-মেটাল সুইংডোরটি খুলে গেল ধীরে ধীরে।

সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি ধুলো····সাদা ট্যালকাম পাউডারের মতো মিহি ধুলো এসে ঢুকল প্রেসার লক চেম্বারে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের স্পেস-স্যুটগুলো ঢেকে গেল সাদা ধুলোর মিহি আস্তরণে। প্রেসার লকের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি যন্ত্রে এসে জমল রাশ রাশ সাদা ধুলো।

নাইলনের সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হল চাঁদের মাটিতে। সেটি বেয়ে একে একে আমরা নেমে গেলাম। রোদোনভের রাশিয়ান সৌজন্য আমাকেই প্রথমে নামার সুযোগ দিল চাঁদের মাটিতে। চাঁদের ধুলোতে বললেই যথার্থ হয় অবিশ্যি !

স্পেসবুটের প্রায় সবটাই বসে গেল সেই বিচ্ছিরি ধুলোর আস্তরণের মধ্যে। ভাগ্যিস আমাদের স্পেস-স্যুটগুলো সম্পূর্ণ বায়ু নিরোধক ! তা না হলে এতক্ষণে ধুলোর মধ্যে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে হত আমাদের।

চাঁদের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি পৃথিবীর তুলনায় খুবই কম। তাই একবার ধুলো উড়লে সেটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চাঁদের বাতাসে ভেসে থাকতে পারে—আর চাঁদে বাতাসের পরিমাণ খুবই কম বলে ধুলোর মেঘ বেশিদূর ছড়িয়ে পড়তেও পারে না। তাই কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি আর রোদোনভ ধুলোর মেঘের বাইরে এসে পড়লাম।

বাইরে এসে দেখলাম এক অপূর্ব দৃশ্য। ম্লান তামাটে আকাশে হীরকখণ্ডের মতো ঝকঝক করছে তারার দল। পৃথিবী থেকে রাতের তারাভরা আকাশ দেখেছি। তবে চাঁদের দিনের তারাভরা আকাশের কাছে সে-সৌন্দর্য কিছুই নয়। পৃথিবীর দিকে তাকালাম : মনে হল হালকা নীল রঙের একটা বিরাট গ্লোবের দিকে তাকিয়ে আছি যেন। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের ভূপৃষ্ঠের একাংশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, চেনাও যাচ্ছে। আমরা দু'জনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর হঠাৎ চমক ভাঙতে আমি কয়েকটি রঙিন ছবি নিলাম। ডাক্তার রোদোনভ চাঁদের ভূপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন ধরনের পাথর আর মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ধুলোর মেঘ থেকে বেরিয়ে এসেই মেঘদূতের সঙ্গে রেডিও-টেলিফোনের যোগাযোগ ব্যবস্থাটি টেস্ট করে নিয়েছিলাম। দেখলাম সব ঠিক আছে। রকেট থেকে চাঁদের মাটিতে নামতে পারেনি বলে বেচারা গর্ডনের জন্যে দুঃখ হচ্ছিল। তাই যতদূর সম্ভব আমাদের যাত্রাপথের একটা রানিং কমেন্টারি দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি আর রোদোনভ। মাঝে মাঝে গর্ডনের গলাও পাচ্ছিলাম।

গর্ডন বলে যাচ্ছিল, 'তোমরা অবিশ্যি খুবই ভাগ্যবান, চাঁদের মাটিতে নামতে পেরেছো বলে। তবে আমিও চুপচাপ বসে নেই। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আমি প্রেসার লকে ঢুকেছিলাম চাঁদের অদ্ভুত সাদা ধুলোর একটু নমুনা সংগ্রহের জন্যে। একটু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আমার দস্তানাটা এক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে অবিশ্যি, তবে খুব বেশি লাগেনি। তোমরা রকেটে ফিরে আসার আগেই আমি চাঁদের এই বিচিত্র ধুলোর একটা মোটামুটি ল্যাবরেটরি টেস্ট করে ফেলতে পারব বলে আশা করছি।'

গর্ডনের গলা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কয়েক মিনিট চুপচাপ। তারপর আবার তার গলা পেলাম, 'কাজের একটু অসুবিধে হচ্ছে। প্রেসার লকের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একরাশ সাদাটে ধুলো এসে ঢুকেছিল রকেটের ড্রাইভিং চেম্বারে। সে-ধুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে···ছেঁড়া দস্তানার ফাঁক দিয়ে কিছু ধুলো আমার আঙুলেও লেগেছে···কেমন যেন জ্বালা জ্বালা করছে। তোমরা কাজ করে যাও····এখানে সব ঠিক আছে।'

আমরা সাদাটে রঙের ভারি মোটা পাতাওলা কয়েকটি উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিছু ধুলোও ভরে নিলাম টেস্ট টিউবে। ডাক্তার রোদোনভ খুরপি জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে দেখতে লাগলেন নিচে কিছু পাওয়া যায় কি না। আমি অন্য জাতের উদ্ভিদের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, হঠাৎই কানের কাছে একটি মৃদু আর্তনাদের শব্দ পেলাম। চমকে ফিরে তাকালাম ডাক্তার রোদোনভের দিকে। দেখলাম, উনিও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন।

'কিছু শুনলেন ?'

'হ্যাঁ, রেডিও-টেলিফোনের মধ্যে কেমন যেন একটা আর্তনাদের শব্দ পেলাম। হ্যালো····হ্যালো, গর্ডন !'

কিছুক্ষণ কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। তারপর আবার সেই আর্তনাদ শোনা গেল। নিঃসন্দেহে গর্ডনের গলা। ভয়াবহ যন্ত্রণায় ও যেন কাতরে কাতরে উঠছে।

'হ্যালো, গর্ডন····হ্যালো····'

'হুঁ····উঁ····'

'কী হল ? তোমার কি কোনও বিপদ হয়েছে ? হ্যালো।'

'ধুলো····সেই অভিশপ্ত সাদা ধুলো····আমার সারা শরীরটা পুড়ে যাচ্ছে····বড় জ্বালা····উঃ !'

'আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি, গর্ডন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব····সব ঠিক হয়ে যাবে। গর্ডন !'

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। শুধু একটা ভারি জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

'বোঝে মোই !' বলে নমুনা সংগ্রহের হ্যাভারস্যাকটা এক ঝটকায় তুলে নিয়ে ডাক্তার রোদোনভ ছুটতে শুরু করলেন। যন্ত্রপাতি কোনওরকমে গুছিয়ে নিয়ে আমিও তাঁর পিছু নিলাম।

ঝড়ের মতো ডাক্তার রোদোনভ ঢুকলেন প্রেসার লক চেম্বারে। পিছনে আমি। বোতাম টিপতেই নিচে নামার সুইংডোর বন্ধ হতে লাগল। এক ঝটকায় নিচে নামার নাইলনের সিঁড়িটা তুলে নিলাম ভেতরে। তারপর ইন্টার্নাল ইকুয়ালাইজারের বোতাম টিপে কয়েক মুহূর্তের অধীর প্রতীক্ষা।

চাপ সমান হতেই ভেতরের দিকের অ্যালয়-মেটাল ডোরটি খুলে গেল ধীরে ধীরে। কিন্তু উঃ ! এ কি গর্ডন, না তার প্রেতমূর্তি ? গর্ডন লুটিয়ে পড়ে আছে ড্রাইভিং চেম্বারের মেঝেতে। ওর আশেপাশে কয়েকটি যন্ত্রপাতি চুরমার হয়ে পড়ে আছে। গর্ডনের স্পেস হেলমেটটি খোলা। মনে হল, নিদারুণ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে ও প্রায় উন্মাদ হয়ে খুলে ফেলেছে স্পেস-হেলমেট। সারা মুখে-চোখে অকথ্য ভয়াবহ যন্ত্রণার ছাপ। আর চোখ-মুখ-ঠোঁট সব কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে।

ডাক্তার রোদোনভ কয়েক সেকেন্ড পরীক্ষা করলেন গর্ডনকে। তারপর পাঁজাকোল

করে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলেন পাশের একটা টেবিলের ওপরে। বললেন, 'আমার কিটব্যাগটা এগিয়ে দাও, রটনাম। আমাদের ওষুধ এক্ষেত্রে কতটুকু কার্যকরী হবে বুঝতে পারছি না, কিন্তু চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। গর্ডন এখনও বেঁচে আছে!'

তারপরই রোদোনভ এক অদ্ভুত সাহসের কাজ করলেন। এক ঝটকায় নিজের দস্তানা খুলে ফেললেন। বললেন, 'দস্তানা পরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে আমার যেন কেমন লাগে। কই কিটব্যাগটা দাও!'

ওই অবস্থায় যতদূর করা সম্ভব সবই করলেন ডাক্তার রোদোনভ। কিন্তু গর্ডনকে বাঁচানো গেল না। শুধু একবার জ্ঞান ফিরেছিল, চোখ চেয়েছিল গর্ডন। সে-চোখে যে-অমানুষিক যন্ত্রণার ছায়া আমি দেখেছিলাম তা কখনও ভুলব না। ঘণ্টাখানেক প্রাণপাত পরিশ্রমের পর হাল ছেড়ে দিলেন ডাক্তার রোদোনভ। একটা প্লাস্টিক শিটে ঢেকে দিলেন গর্ডনের মৃতদেহ। দেখলাম, হেলমেটের ভেতরে ওঁর চোখ দুটো চিক চিক করছে।

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ভারি গলায় রিপোর্ট করলাম গর্ডনের মৃত্যু-সংবাদ। কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল রেডিও-টেলিফোনটি। তারপর বাষ্পরুদ্ধ গলায় আদেশ এল : এই মুহূর্তে যেন আমরা চাঁদ ছেড়ে রওনা হই! যথাসময়ে আমাদের কোর্স রিডিং আর কম্পিউটার ডেটা দেওয়া হবে। এরপর থেকে আমাকেই মেঘদূতের ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর-এক মুহূর্তও দেরি নয়।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠল মেঘদূতের অক্সিলিয়ারি রকেটগুলো। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে মেঘদূত হালকা বেলুনের মতো উঠতে লাগল চাঁদের আকাশপথে। ক্রমে বাড়তে লাগল তার গতি। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পেরিয়ে যেতেই এল ভারশূন্য অবস্থা, কিন্তু মন আমাদের এতই ভারি যে কিছুতেই আর হালকা মনে হল না নিজেদের।

ভারশূন্য অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রোদোনভ তাঁর আসনে আবদ্ধ হয়ে বসে গিয়েছিলেন—তাঁর সামনে ছিল সাদা মৃত্যু-ধুলোর স্যাম্পল। ঘণ্টা-তিনেক পরে মাথা তুললেন উনি। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'রটনাম, এটা ধুলো নয়!'

'ধুলো নয়!'

'না! অতি সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি আছে এর প্রতিটি কণিকায়। চন্দ্রপৃষ্ঠের একরকম মারাত্মক ভাইরাস বলতে পারো এটিকে। কোনও জীবন্ত কোষের সংস্পর্শে এলে এই ভাইরাসগুলো কোষের গভীরে ঢুকে বংশবৃদ্ধি করতে আরম্ভ করে। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জীবন্ত কোষকে এরা ধ্বংস করে ফেলে!'

আতঙ্কিত বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম ডাক্তার রোদোনভের দিকে।

ক্লান্ত স্বরে ডাক্তার রোদোনভ বললেন, 'যতক্ষণ না এগুলো আমাদের দেহের সরাসরি সংস্পর্শে আসছে, ততক্ষণ আমরা নিরাপদ। কিন্তু দেহের সামান্যতম সংস্পর্শে এলেই মৃত্যু একেবারে অবধারিত!'

এই কথা বলে রোদোনভ ম্লান হেসে তাঁর দস্তানাহীন হাতটি তুলে ধরলেন আমার সামনে। দেখলাম, তাঁর সারা হাত ব্লটিং পেপারের মতো সাদা হয়ে গেছে। তারপর হাত নেড়ে বললেন, 'প্রশ্চাইচ্যে!'

আমি চলেছি।

ভেসে চলেছি পৃথিবীর দিকে। অটোমেটিক কোর্স ডিটেক্টারের হাতে ছেড়ে দিয়েছি দিগদর্শনের দায়িত্ব। কিছুক্ষণ আগে ডাক্তার রোদোনভ মারা গেছেন। ভয়াবহ যন্ত্রণার

আক্রমণ অগ্রাহ্য করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ডাক্তার রোদোনভ তাঁর দেহের নানা রিঅ্যাকশন নোট করে গেছেন, যাতে পরে বৈজ্ঞানিকরা এই মারাত্মক ধুলো নিয়ে গবেষণা করার সময় সাহায্য পান।

আমার চোখের সামনে মারা গেছেন ডাক্তার রোদোনভ। কেবলমাত্র সান্ত্বনাভরা চোখের সহানুভূতি-মাখা দৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই দিতে পারিনি তাঁকে। এর বেশি কী-ই বা করতে পারি আমি!

পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছি ডাক্তার রোদোনভের মৃত্যু আর তাঁর গবেষণার কথা। স্তব্ধ বিস্ময়ে নিথর হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে ভেসে আসা রেডিও-টেলিফোনের তরঙ্গমালা।

আর ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি পৃথিবীর সীমানার মধ্যে গিয়ে পড়ব। সেখানে আমাদের জন্যে চক্রাকারে ঘুরছে ভোস্টক-১৪। মেঘদূতকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। পৃথিবীতে অপেক্ষা করে আছেন বৈজ্ঞানিকেরা, অপেক্ষা করে আছে আমার মাতৃভূমি····অপেক্ষা করে আছে শান্তনু····।

কিন্তু এই যে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আমি ফিরে চলেছি—একরাশ চাঁদের ধুলো, যেটি ছড়িয়ে আছে আমার স্পেস-স্যুটে, আমাদের সংগ্রহ করা নমুনাগুলোয়, প্রেসার লক চেম্বারে, ড্রাইভিং প্যানেলে—তখন এই মৃত্যুদূতও কি নামবে না আমার সঙ্গে, আর নেমেই কি ছড়িয়ে পড়বে না পৃথিবীবাসীদের দেহ থেকে দেহান্তরে? আর দেখতে দেখতে শ্মশান হয়ে যাবে শ্যামল-সবুজ মায়াময় এই পৃথিবী!

কিন্তু উপায় কী? হায় ভগবান, উপায় কী? কে বলে দেবে আমায়?

আছে! একটা উপায় আছে····আমার হাতেই আছে! এই মৃত্যুদূতের স্বরূপ জানার জন্যে রোদোনভ প্রাণ দিয়েছেন। আমি কি পারি না এই মৃত্যুদূতের হাত থেকে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে বাঁচাবার জন্যে নিজের প্রাণ দিতে? আমি যদি পৃথিবীতে না ফিরি···· আমি যদি হারিয়ে যাই এই সীমাহীন মহাশূন্যে····পৃথিবীর দিকে ফিরে না গিয়ে যদি পথ ভুলে আমি চলে যাই অগ্নিদেব সূর্যের দিকে, তাহলেই পৃথিবী বাঁচতে পারে।

অনেকক্ষণ ধরে সংগ্রাম করলাম শ্রান্ত ক্লান্ত মনের সঙ্গে। বোঝাপড়া করলাম অবুঝ মনের সঙ্গে। তারপর রেডিও-টেলিফোনে পৃথিবীকে জানিয়ে দিলাম আমার সঙ্কল্পের কথা। আর তারপর অটোমেটিক কোর্স ডিটেক্টারের সংযোগ ছিন্ন করে নিজের হাতে তুলে নিলাম রকেট পরিচালনার দায়িত্ব। দিক পরিবর্তন করে মেঘদূত পাগলের মতো ছুটতে শুরু করল সূর্য লক্ষ করে।

রেডিও-টেলিফোনের রিসিভারে ঝড় উঠেছে। প্রতিবাদের ঝড়। ওরা সকলে চাইছে যে আমি পৃথিবীতে ফিরে যাই। ওরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, আমাকে আর মেঘদূতকে ভাইরাসমুক্ত করবার একটা পন্থা ওরা খুঁজে বার করবেই—চাঁদের মৃত্যুধুলো যাতে পৃথিবীর মাটিতে না নামতে পারে তার ব্যবস্থা ওরা করবে। কিন্তু আমি জানি, সেটা সম্ভব নয়। আর পৃথিবীর সর্বনাশের পক্ষে চাঁদের ধুলোর একটিমাত্র কণিকাই তো যথেষ্ট!

কিছুক্ষণ আগে আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী রেডিও-টেলিফোনে আমাকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন ফিরে আসার জন্যে। আমার দেশপ্রেমের দোহাই দিয়েছেন তিনি। কিন্তু আমি জানি, তিনি কী বলছেন তিনি জানেন না। নিজের দেশকে····নিজের পৃথিবীকে ভালোবাসি বলেই আমি সেখানে ফিরে যেতে চাই না।

যতরকম উপায়ে সম্ভব ওরা চেষ্টা করছে আমাকে বোঝানোর, আমাকে ফিরিয়ে আনার। হঠাৎই একটি অতি পরিচিত মিষ্টি গলা বেজে উঠল রেডিও-টেলিফোনের রিসিভারে:

'ড্যাডি····ড্যাডি···· !'

শান্তনু ! ওরা শান্তনুকে দিয়ে আমায় অনুরোধ করাতে চায় ফিরে আসার জন্যে।

'ড্যাডি ! আমি শান্তনু বলছি····ড্যাডি, উত্তর দাও !'

শান্তনু····শর্মিলার মতো ওর মুখের আদল····আমায় ডাকছে····সন্তান তার বাবাকে ডাকছে····

'ড্যাডি—'

না, আমি উত্তর দেব না। উত্তর দিলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ব। ওর সঙ্গে কথায় আমি পারব না। ও তো তর্ক করবে না, ও যে দাবি করবে !

'ড্যাডি, ফিরে এসো ! ড্যাডি—'

এক ঝটকায় তুলে নিলাম লোহার ভারি হ্যামার—তারপর প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার করে দিলাম বেতার-যন্ত্রটি।

শান্তনুর গলা আর শোনা যাচ্ছে না।

আমি মহাশূন্যে ছুটে চলেছি অগ্নিদেব সূর্যের দিকে। যার অগ্নিময় স্পর্শে আমি স্নাত হব, পবিত্র হব। ধ্বংস হবে চন্দ্রের মৃত্যুদূত। বাঁচবে পৃথিবী।

না, আমি একা নই। এ যাত্রার সঙ্গী আছে আরও দু'জন।

রিচার্ড গর্ডনের হাসি শুনতে পাচ্ছি : 'ওয়াইজ গাই····'

ডাক্তার রোদোনভের ভারি শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে হাসির দমকে : 'উরা····উরা····প্রশ্চাইচ্যে !'

□ ১৯৬৭





ডঃ হাইসেনবার্গ আর ফেরেননি

বিশু দাস

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ হাইসেনবার্গ মহাশূন্যের পথে পাড়ি দিয়েছেন—আর ফিরে আসেননি। সেই হারানো প্রতিভার কাহিনী উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। সম্পূর্ণ কাহিনীটি তাঁর মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কারণ ডঃ হাইসেনবার্গের যুগান্তকারী পরীক্ষা নাকি আজও শেষ সীমায় এসে পৌঁছয়নি। সেই যে তিনি চলে গেছেন, আজও ফেরেননি। আর যদি এসেও থাকেন, আমরা অন্তত জানি না। যাওয়ার সময় নির্দেশ দিয়ে গেছেন তাঁর প্রিয় সহকারী প্রফেসার রাইনারকে। আজও রাতের পর রাত নিদ্রাহীন চোখে রাইনার পালন করে যাচ্ছেন সেই নির্দেশ। কোনওদিন গভীর রাতে যদি ডঃ হাইসেনবার্গের ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢোকেন তাহলে বাঁদিকে যে পালিশ-করা কাঠের দরজাটা দেখবেন, আস্তে ঠেলা দিলেই সেটা নিঃশব্দে খুলে যাবে। তার ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকালেই দেখবেন অন্ধকার ঘরে মাইক্রোমিটার স্কেল লাগানো আবছা সবুজ ফ্লুওরেসেন্ট রেডার স্ক্রিনের সামনে প্রফেসার রাইনারের নিশ্চল ভৌতিক ছায়া। টাইপিস্টের মতো আঙুলগুলো ছড়ানো কন্ট্রোল বোর্ডের সাদা সাদা পুশবাটনগুলোর ওপর। প্রাণের কোনও স্পন্দনই দেখবেন না সে-দেহে। কিন্তু সাবধান, জোরে নিঃশ্বাস ফেলবেন না, তাহলেই ধ্যান ভেঙে যাবে তাঁর। আস্তে কপাটটা ভেজিয়ে চলে আসবেন বাইরে।

আসল গল্পটাই এতক্ষণ বলা হয়নি। প্রথম থেকেই শুরু করব ভাবছি, কিন্তু আরম্ভটা করব কী দিয়ে ? লিখতে আমি পারি না এ-কথা সবাই জানেন, কিন্তু তবু যে ডঃ হাইসেনবার্গ কোন ভরসায় এরকম একটা গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমার ওপর, সেটা আজও বুঝতে পারিনি। তাঁর নিজের মুখ থেকে সবটুকু জানতে পারিনি, তাই এই কাহিনীর শেষ অংশটা আদায় করতে হয়েছে প্রফেসার রাইনারের কাছ থেকে অনেকদিন পরে।

ডঃ হাইসেনবার্গের ফেরার পথ চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখন। আর মাত্র কয়েক পাতা হলেই লেখাটা শেষ করে ফেলতে পারতাম, কিন্তু তা আর হল না। কথা ছিল লেখাটা শেষ করে ডক্টরকে দেখিয়ে নেব যদি কোনও পরিবর্তন করতে হয়। অন্যদিনের মতো সেদিনও রাতে গিয়ে বসেছি ডক্টরের চেম্বারে। ওই সময় তিনি সাধারণত ল্যাবরেটরির কাজ

থেকে বিশ্রাম নেন কিছুক্ষণের জন্যে, আর সেই ফাঁকে আমি পয়েন্টগুলো লিখে নিই নোটবুকে। কোনও কোনও দিন আবার হয়তো বসেই থাকি। আধঘণ্টা পার হয়ে যায় কিন্তু ডঃ হাইসেনবার্গের পাত্তা নেই। তারপর ল্যাবরেটরি থেকে অন্যমনস্কভাবে বেরিয়ে এসে আমাকে সামনে দেখেই অপ্রতিভ হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কতক্ষণ এসেছো? একটু দেরি হয়ে গেল। বয়েস হয়েছে, এখন আর সব দিক বজায় রেখে চলতে পারি না....'

একটু হেসে আমি জবাব দিই, 'না, না, তাতে কী হয়েছে! এখন আমার কোনও কাজের তাড়া নেই। বরং কিছুটা বিশ্রাম করা হল।'

খেতে বসে ডঃ হাইসেনবার্গ আর আমি গল্প করি। কোনও কোনওদিন রাতের খাওয়াটা ওখানেই সারতে হয় তাঁর পীড়াপীড়িতে। এক ঘণ্টা পার হয়ে দু'ঘণ্টা হতে চলে খেয়ালই থাকে না। থামতে হয় রাইনারের কণ্ঠস্বরে, 'স্যার, মেঘ সরে যাওয়াতে মার্সের ইমেজটা ফোকাস করা গেছে। আপনি কি আজ রাতে অবজারভেশনে বসবেন?'

সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায় ডঃ হাইসেনবার্গের চেহারা। কে বলবে মাত্র কয়েক মিনিট আগের সেই খোশমেজাজি গল্পপ্রিয় বৃদ্ধ আর ইনি একই ব্যক্তি। কপালে দেখা দেয় স্পষ্ট চিন্তার রেখা।

'আচ্ছা, মাই বয়। আজ তুমি বাড়ি যাও—অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল আবার এসো। গুড নাইট....' বলেই ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়েন তিনি আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই।

আমাদের এই বিয়োগান্ত কাহিনীর ঘটনাস্থল জার্মানির ছোট্ট একটি জায়গা। বার্লিন থেকে হামবুর্গ যাওয়ার পথে যেখানে শেষ হয়েছে গত মহাযুদ্ধের সাক্ষী ভাঙা ঘরবাড়ির সারি, সেখান থেকে মাত্র ছ'-সাত কিলোমিটার যাওয়ার পর ডানদিকে যে-সরু পথ গেছে সেই পথে এগোতে হবে। তারপর মিনিট পনেরোর রাস্তা। সামনেই চোখে পড়বে মানমন্দিরের সাদা গম্বুজ। ওইখানেই ছিলেন আমাদের কাহিনীর নায়ক পৃথিবী-বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ হাইসেনবার্গ। তিনি ছিলেন ওই অবজারভেটরির হর্তাকর্তা। তাঁর কয়েকটি নতুন আবিষ্কার বিজ্ঞানের এই বিভাগকে অপ্রত্যাশিত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যেসব কাজ অন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের করতে আরও পঞ্চাশ বছর লাগত সে সবই সম্ভব হচ্ছে তাঁর আবিষ্কারের সাহায্যে। এছাড়া, তাঁর আর-একটা গুণের কথা একমাত্র ঘনিষ্ঠ মহলের কিছু লোক ছাড়া কেউই জানে না : প্রাণিবিজ্ঞানে ডঃ হাইসেনবার্গের অপরিসীম জ্ঞান। কিন্তু সে কথা তিনি প্রকাশ করতে রাজি নন।

এই বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য তিনি তাঁর কোনও কোনও ডাক্তার-বন্ধুদের দিয়েছেন যেগুলোকে কেন্দ্র করে লেখা প্রবন্ধ মাঝে মাঝে পুরস্কারও পেয়েছে। কিন্তু তিনি নিজে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধও লেখেননি আজ পর্যন্ত।

ডঃ হাইসেনবার্গ তাঁর পরীক্ষার বিষয়বস্তুকে গল্পের আকারে সাধারণ পাঠকের কাছে তুলে ধরার গুরুদায়িত্বটি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তাই গত এক মাস প্রায় প্রত্যেকদিনই যেতাম তাঁর কাছে রসদ সংগ্রহের জন্যে। তাছাড়া আরও একটা আকর্ষণ ছিল। জটিল বিজ্ঞানকে এমন সহজ আর সুন্দর করে বলতে পারতেন তিনি যে শুনতে শুনতে মনে হত, এত সহজ জিনিসগুলো আমরা বুঝি না!

'গ্রহান্তরে প্রাণের সম্ভাবনা' প্রমাণ করাটাই ছিল তাঁর গবেষণার একটি প্রধান বিষয়। বছর দুয়েক আগে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর তাঁর কাছ থেকে শেষ যেটুকু শুনেছিলাম সেটুকুই পরিবেশন করছি আজ।

সেইদিনই ডঃ হাইসেনবার্গের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। কে জানত যে আগামীকাল থেকে আর তাঁকে দেখতেই পাব না পৃথিবীর কোথাও ! কেউ জানবে না মহাবিশ্বের কোথায় হারিয়ে যাবে একটি বিরাট বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। অন্য কোনও গ্রহে বসে রেডিও-টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে আমাদের অবস্থা দেখে হয়তো মুচকি মুচকি হাসবেন তিনি।

অন্যদিনের মতো সে-রাত্রেও গিয়ে বসেছি ডক্টরের চেম্বারে। অপেক্ষা করে আছি এই বুঝি দরজা খুলে সলজ্জমুখে বেরিয়ে এলেন তিনি। তারপরেই সেই জিজ্ঞাসা, 'কতক্ষণ এসেছ ? একটু দেরি হয়ে গেল। বয়েস হয়েছে এখন····।'

আধ ঘণ্টা পার হয়ে এক ঘণ্টা হতে চলল, কিন্তু কই, আজ ডক্টর তো বেরোলেন না ল্যাবরেটরি থেকে। ভাবছি একবার দরজায় ঠেলা দিয়ে দেখব কি না, এমন সময় বেরিয়ে এলেন প্রফেসার রাইনার। চমকে উঠলাম তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ডক্টর কি আজ ব্যস্ত আছেন ?'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপতে চাপতে রাইনার বললেন, 'না, তিনি বাইরে গেছেন। ফিরতে দেরি হবে। এই চিঠিটা আপনাকে দিতে বলে গেছেন।' বলেই বড় একটা খাম বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। খামটা আমি ধরবার আগেই তিনি আবার ঢুকে পড়লেন ল্যাবরেটরিতে। প্রফেসারের এই ব্যবহারে সত্যি অবাক হলাম। বেশ মন খারাপ করেই বাড়ি ফিরলাম সে-রাতে।

বাড়িতে এসেই খুলে ফেললাম পুরু খামটা। বিরাট এক কৌতূহল মনের মধ্যে। কী লিখেছেন ডঃ হাইসেনবার্গ ? হঠাৎ আমাকে চিঠি লিখবারই বা কারণ কী ? নানা প্রশ্ন এসে ভিড় করছে মনে। কিন্তু একবারও ভাবিনি, পৃথিবী ছেড়ে তিনি চলে গেছেন অনেক অনেক দূরে। ফিরে আসবেন না আর কোনওদিনই। খামটা খুলতেই বেরুলো একটা ছোট্ট চিঠি আর একটা সিল করা ভারি খাম। ওপরে ডঃ হাইসেনবার্গের হাতে লেখা আমার নাম আর তারিখ। তিনি লিখেছেন :

প্রিয় দাস,

খুবই অবাক হবে যখন এই চিঠি গিয়ে পৌঁছবে তোমার হাতে। আগামীকাল রাতে চেম্বারে এসে বসে থাকবে আমার প্রতীক্ষায়, কিন্তু আমি তখন থাকব তোমাদের কাছ থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে। আর কোনওদিন দেখা হবে কি না জানি না। তোমার লেখাটা যাতে না বন্ধ হয়ে থাকে তাই কয়েকদিন ধরে আমার গবেষণার ফল সহজবোধ্য ভাষায় খেটে লিখতে হয়েছে। লেখার অভ্যেস বহুদিন ছেড়েছি। ধৈর্যও কমে আসছে বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে। লিখতে হয়েছে বহু কষ্টে। ভাষার ভুল হয়তো থাকবে, সেগুলো তুমি ঠিক করে নিও। সিল করা খামটা এখন খুলবে না। অন্তত মাস ছয়েক অপেক্ষা করবে। তারপরেও যদি আমি না ফিরে আসি, তখন খুলে পড়বে। ভগবান তোমার জীবন সার্থক করে তুলুন। ইতি—

শুভার্থী
ডঃ হাইসেনবার্গ
২৫ ডিসেম্বর ১৯৬০

সত্যি কথা বলতে কি, খুব ইচ্ছে করছিল খামটা খুলে দেখার, কিন্তু ডক্টরের সৌম্য-শান্ত

মুখটা মনে পড়তেই তাঁর আদেশ আর অমান্য করতে পারলাম না। যত্ন করে ড্রয়ারের মধ্যে চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখলাম সেটাকে। রোজই রাতে একবার করে দেখি খামটাকে। ডঃ হাইসেনবার্গের ছোঁয়া যেন পাই তার মধ্যে। ভুলে যাই যে তিনি নেই।

মাঝে বার দুয়েক গেছিলাম ডক্টরের ল্যাবরেটরিতে। কিন্তু প্রফেসার রাইনার তাঁর কোনও খবরই দিতে পারেননি। যত দিন যাচ্ছে তাঁকে ততই বেশি বিমর্ষ ও বিচলিত মনে হচ্ছে।

কয়েক মাস পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে লেখাটাতে আর হাত দেওয়া হয়নি। মাস পাঁচেক পর রাইনারের সঙ্গে দেখা হল একদিন। ল্যাবরেটরি থেকে ফিরছিলেন তিনি। আমার পাশ দিয়ে পার হয়ে গেলেন অন্যমনস্কভাবে, আমাকে যেন চিনতে পারলেন না। আমি নাম ধরে ডাকতেই চমকে উঠলেন। বললেন, 'খুব ব্যস্ত আছি। রাতে ল্যাবরেটরিতে আসুন, কথা বলা যাবে।' তাঁর কথাবার্তায় কেমন যেন একটা বিষণ্ণ ভাব। আগের সেই প্রাণ-প্রাচুর্য আর নেই।

রাতে গেলাম ডঃ হাইসেনবার্গের ল্যাবরেটরিতে। মনে মনে ঠিক করেই গেলাম যে আজ রাইনারের কাছ থেকে ডঃ হাইসেনবার্গের অন্তর্ধান সম্বন্ধে যেমন করে হোক জানতেই হবে। না হলে গল্পটা শেষ করা হয়ে উঠবে না। ডক্টরের সেই পুরোনো চেম্বারে এসে বসলাম। মাত্র ক'টা মাসের ব্যবধান, অথচ কত পরিবর্তন। বসে বসে ভাবছিলাম ফেলে আসা দিনগুলোর কথা।

চিন্তাভঙ্গ হল প্রফেসার রাইনারের ঘরে ঢোকার শব্দে। চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসতে বসতে বললেন, 'মিঃ দাস, কতকগুলো কথা আজ আপনাকে বলব বলে ঠিক করেছি। ডঃ হাইসেনবার্গ যে আপনাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন তা আমি জানি। তিনি যাওয়ার আগে কতকগুলো কথা আপনাকে বলবার নির্দেশ দিয়েও গেছেন। যদিও সেসব কথা বলার সময় এখনও হয়নি, কিন্তু আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। আর চেপে রাখতে পারছি না। মেন্টাল ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলছি ধীরে ধীরে। আমার কঠোর যুক্তিবাদী মনেও ঘনিয়ে উঠেছে সন্দেহের কালো মেঘ। মনে হচ্ছে ডক্টর আর সত্যি সত্যি ফিরবেন না কোনও দিন। আমার অনুরোধ এবং ডঃ হাইসেনবার্গের নির্দেশ, যেসব কথা আপনাকে বলব তা দয়া করে কারও কাছে প্রকাশ করবেন না এখন। ডক্টরের এতদিনের পরিশ্রম হয়তো ব্যর্থ হয়ে যাবে তাহলে। আপনি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং এটা নিশ্চয় চাইবেন না?'

বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে শুনছিলাম রাইনারের কথা। তিনি থামতেই বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত মনে যা বলার বলতে পারেন। ডক্টর আমাকে মোটামুটি সব কথাই জানিয়েছেন চিঠিতে।' যদিও আসল চিঠিটা তখনও পড়িনি কিন্তু মিথ্যে কথাটা যে কী করে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না।

এতে কিন্তু কাজ হল। রাইনার বললেন, 'সবই যখন আপনি জানেন তখন আর বাকিটুকু বলতেই বা আপত্তি কী?' কিন্তু হঠাৎ কী মনে করে মাঝপথে থেমে গেলেন তিনি। তারপর বললেন, 'আজ থাক, আর একদিন বলব। ডক্টরের গবেষণার কাগজপত্র একবার দেখে নিতে হবে। সব কথা আমার ঠিক জানা নেই।'

বুঝলাম, ইচ্ছে করে চেপে গেলেন তিনি। আমিও আর অনুরোধ করলাম না বলার জন্যে। বাড়ি ফিরে এলাম। মনে হয় প্রফেসার রাইনার আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারেননি। বোধ হয় তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল সত্যি সত্যি ডক্টর সবকিছু আমাকে জানিয়েছিলেন কি না। এ-বিষয়ে দু-একটা প্রশ্ন করলেই অবশ্য ধরা পড়ে যেতাম, কিন্তু

রাইনার কৌশলে হাসিল করলেন কাজ।

বাড়িতে এসে আজ আর ধৈর্যের বাঁধ দিয়ে কৌতূহলকে বাধা দিয়ে রাখতে পারলাম না। ডঃ হাইসেনবার্গের শেষ অনুরোধ রক্ষা করা আর সম্ভব হল না আমার পক্ষে। কৌতূহল মেটাবার জন্যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলাম আমি। অপরাধী আমি. এ-কথা স্বীকার না করলে মরেও শান্তি পাব না। ডঃ হাইসেনবার্গ যেখানেই থাকুন তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

রাত বোধ হয় একটা। চারদিক নিস্তব্ধ। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যায় অন্ধকার আকাশের গায়ে তারাদের মিটিমিটি। ড্রয়ার খুলে সিল করা খামটা বার করলাম। সেদিনের চেয়ে খামটা যেন অনেক বেশি ভারি মনে হচ্ছে। এই বুঝি নিয়ম, মানুষ যখন অন্যায় করে তখন স্বাভাবিক ঘটনাই হয়ে ওঠে তার কাছে অস্বাভাবিক—হালকা জিনিসকে মনে হয় ভারি। আমার মনের মধ্যে চলেছে 'হাইড' আর 'জেকিলের' লড়াই। শীতের রাতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। ডক্টর আজ পৃথিবীতে নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দূরের কোনও গ্রহে বসে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি যে তাঁর সঙ্গে কোনওদিন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি এটা যেন তাঁর কল্পনার অতীত। নিজের অজান্তেই থেমে গেল হাতটা। খামটা ছিঁড়তে পারলাম না। তারপর আচমকা দড়াম করে জানলাটা বন্ধ করে দিয়েই ছিঁড়তে শুরু করলাম খামটা। আজ আমি মরিয়া। কোনও যুক্তিই আমাকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

খামটা খুলতেই বেরুলো ডক্টর হাইসেনবার্গের সুন্দর ঝকঝকে হাতের লেখায় ভর্তি কতকগুলো কাগজ—অনেকটা পাণ্ডুলিপির মতো। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়তে আরম্ভ করলাম :

'গত কয়েক বছর ধরেই গ্রহান্তরে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছি। অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে এ-বিষয়ে যে আগেও মাথা ঘামাইনি তা নয়। তবে এবার যেন অন্য সব কিছু ছেড়ে এটাই হয়েছে একমাত্র ধ্যান। রাতের পর রাত কাটিয়েছি মঙ্গলগ্রহের দিকে তাকিয়ে। আমাদের অবজারভেটরির টেলিস্কোপটা আকারে অবশ্য খুব বড় নয়—মাত্র সোয়া মিটার। কিন্তু নতুন একটা যন্ত্র আমি কিছুদিন আগে আবিষ্কার করেছি যার সাহায্যে মঙ্গলগ্রহকে দেখা যায় মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দূরের জিনিসের মতো। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাঁচ মিটার টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা যায় এর চেয়েও অনেক বেশি দূরে। একমাত্র রাইনার আর আমি ছাড়া অন্য কেউ জানত না এ-কথা। রাইনারের সাহায্য ছাড়া আমার একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। অবজারভেটরির আমি সর্বেসর্বা, সুতরাং আমার নতুন যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখার কোনও অসুবিধেই ছিল না। সে-যন্ত্রটা সম্বন্ধে তোমাকে মোটামুটি আইডিয়া দিচ্ছি। সাধারণ রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপের নির্মাণকৌশল নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়? অবশ্য জটিল মাপজোখের যন্ত্রগুলোর কথা বাদ দিচ্ছি। টেলিস্কোপের মুখটা কোনও গ্রহের দিকে ফেরালে সেই গ্রহ থেকে আলো এসে টেলিস্কোপের গোলাকার আয়নায় প্রতিফলিত হওয়ার পর একটা বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। আর সেই বিন্দুতে তৈরি হয় ওই গ্রহের প্রতিবিম্ব। তারপর ওই ছোট্ট প্রতিবিম্বকে বাড়ানো হয় আইপিস লেন্সের সাহায্যে।

'মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে কোটি কোটি মাইল পথ পার হয়ে যেটুকু আলো টেলিস্কোপের আয়নায় প্রতিফলিত হয়, তা অতি নগণ্য। ফলে জিনিসটাকে দেখায় খুব আবছা। সেই ক্ষীণ আলোকে যদি কোনওরকমে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয় তাহলে জিনিসটা দেখা যাবে

পরিষ্কার। বহু ব্যর্থ পরীক্ষার পর এই যন্ত্রটি আমি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। এই যন্ত্র বহু আলোকবর্ষ দূর থেকে আসা ক্ষীণতম আলোকেও অনেকগুণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। ব্যাপারটা জটিল গণিত এবং যান্ত্রিক উৎকর্ষের ফল। বেশ, একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মাইক্রোফোনের সামনে যখন কথা বলা হয় তখন ভেতরের একটা সরু তারের কয়েল কথার জোর অনুযায়ী আস্তে বা জোরে কাঁপতে থাকে, এবং তারই ফলে উৎপন্ন হয় অতি ক্ষীণ বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুৎকে অ্যামপ্লিফায়ার যন্ত্রের সাহায্যে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলা হয়। তারপর তাকে আবার শব্দে রূপান্তরিত করা হয় লাউডস্পিকারের সাহায্যে। তেমনই টেলিস্কোপের আয়না থেকে প্রতিফলিত ক্ষীণ আলোকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব আমার যন্ত্রটি দিয়ে। ফলে আইপিসের ভেতর দিয়ে জিনিসটাকে দেখা যায় উজ্জ্বল, পরিষ্কার। আমার এই আবিষ্কার মহাশূন্যে মানুষের দৃষ্টিকে করেছে সুদূরপ্রসারী। আজও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যখন তাঁদের বড় বড় টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্রের আবছা ধোঁয়াটে চেহারা দেখতে ব্যস্ত, আমি তখন সেগুলোকে দেখি চোখের সামনে, দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

'গতকাল পর্যন্ত আমি লক্ষ করেছি মঙ্গলগ্রহটাকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মঙ্গলের গায়ে কালো কালো সুতোর মতো দাগগুলোকে কেন্দ্র করে মেতে উঠেছেন তর্কে। কেউ বলছেন ওগুলো মঙ্গলগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীদের তৈরি জলসেচনের কৃত্রিম খাল। আবার অন্য দল বলছেন, ওগুলো কিছু লোকের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান জীব তো দূরের কথা, নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদও জন্মায় না।

'এসব তর্ক আমার হাসির খোরাক জোগায়। কারণ আমি নিজের চোখে দেখেছি সত্যি সত্যি ওগুলো জলসেচনের খাল। খালের পাড় কালো গ্র্যানাইট জাতীয় পাথর দিয়ে বাঁধানো। বছরের মধ্যে মার্চ থেকে মে এই তিন মাস খালে জল দেখা যায়। বাকি ন'মাস সেগুলো থাকে খটখটে শুকনো। জুলাই-আগস্ট মাসে খালের দু'পাশে দেখা দেয় লালচে সবুজ শস্যের খেত। কয়েক মাস পর তাও মিলিয়ে যায়—মঙ্গলের রুক্ষ বুক হয়ে ওঠে আবার শূন্য। এ-বিষয়ে একটা থিওরি আমি খাড়া করেছি: মঙ্গলগ্রহের গা থেকে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মিকে স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রে বিশ্লেষণ করে যে-ফল পেয়েছি, পৃথিবীর বুকে প্রতিফলিত আলো পরীক্ষা করলেও অনেকটা সেইরকমই ফল পাওয়া যায়। সূর্যের আলোর সাতটা রঙের মধ্যে যদি কোনও রঙ কোনও গ্রহ থেকে প্রতিফলিত আলোর মধ্যে দেখতে না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সেই রঙ ওই গ্রহে শোষিত হয়েছে। ফলে সাত রঙের বর্ণালীতে সেই রঙের জায়গাতে দেখা যাবে কালো কালো রেখা। কোন জিনিস কোন রঙকে শোষণ করতে পারে তা যদি আগে থাকতেই জানা থাকে তবে সহজেই জানা যায় সেই গ্রহে কী জিনিস থাকতে পারে। পৃথিবীর বুকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সবুজ গাছপালার ক্লোরোফিল বর্ণালীর লাল রঙকে শোষণ করে নেয়। যার ফলে বর্ণালীর লাল অংশে দেখা যায় কালো কালো রেখা। মঙ্গলগ্রহ থেকে প্রতিফলিত আলোর বর্ণালীর লাল অংশেও কালো রেখা দেখা গেছে। অন্য জ্যোতির্বিদরা ওই কালো রেখাগুলো দেখতে না পেয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন।

'মঙ্গলের আবহাওয়া অত্যন্ত রুক্ষ আর বাতাস এত পাতলা যে, পৃথিবীর প্রাণীদের পক্ষে সেখানে বেঁচে থাকা শুধু কঠিন নয়—প্রায় অসম্ভব। দিনে তাপমাত্রা চব্বিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করে, আর রাতের তাপমাত্রা শূন্যের নিচে প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস নেমে যায়। জলের পরিমাণও সেখানে খুব কম, ফলে বাতাসে জলীয়

বাষ্প এবং অক্সিজেনের পরিমাণও নগণ্য। এসব দেখে অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, ওই গ্রহে জীবনের উদ্ভব কোনওরকমেই সম্ভব নয়।

'গত ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত বিজ্ঞানী তিখর বলেছিলেন, বহু যুগ ধরে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে পার হতে হতে মঙ্গলের গাছপালা এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, বর্তমানের আবহাওয়ার সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে অনায়াসে। বিজ্ঞানী তিখর তাঁর যুক্তি প্রমাণ করার জন্য বছরের বিভিন্ন সময়ে উঁচু পর্বতের ওপর, মেরু অঞ্চলে এবং তুষার মেরুতে অনেকগুলো পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁর পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেইসব অঞ্চলের গাছপালা থেকে প্রতিফলিত আলোর বর্ণালী সাধারণ গাছপালার প্রতিফলিত আলোক-বর্ণালীর থেকে অনেক ভিন্ন হতে পারে। শীতের দেশের উদ্ভিদ সূর্যালোকের শুধু লাল রঙই শোষণ করে না, হলদে অংশের কিছুটাও শোষণ করে। এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে সবুজ রঙের কিছু অংশও শোষণ করতে দেখা যায়। সুতরাং মঙ্গলের চরম আবহাওয়ায় যেসব উদ্ভিদকে বেঁচে থাকতে হয়, তারা একমাত্র নীল এবং বেগুনি ছাড়া বাকি সব রঙকেই হয়তো শোষণ করে নিতে পারে। সুতরাং সেখানকার গাছপালা মনে হয় কেবল সবুজ রঙের নয়। যার জন্য মঙ্গলের দেহ থেকে প্রতিফলিত আলোর বর্ণালীতে ক্লোরোফিল থেকে প্রতিফলিত আলোর বর্ণালীর মতো বৈশিষ্ট্য নাও থাকতে পারে। বিজ্ঞানী তিখর এবং তাঁর সহকারী পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, শুধু নিম্নশ্রেণীর গাছপালাই নয়, এমনকি কানাডার নীল পাইন এবং আরও কয়েকরকমের উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের প্রতিফলিত আলোর বর্ণালীর সঙ্গে মঙ্গলের দেহ থেকে প্রতিফলিত আলোর বর্ণালীর অনেক মিল আছে। এসব দেখে সহজেই মন্তব্য করা যায়, মঙ্গলগ্রহে শুধু সবুজ গাছপালাই নেই, এমন উদ্ভিদও আছে, যাদের পাতার রঙ বছরের বিভিন্ন ঋতুতে পালটাতে থাকে।

'এইসব অনুসন্ধানের ফল থেকে বিজ্ঞানী তিখর কোটি কোটি বছর আগের মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ার কিছুটা আভাস দিয়েছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার বরফাবৃত অঞ্চলের উদ্ভিদ এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে প্রথমে লালচে, তারপর গোলাপী এবং শেষে বাদামী লাল রঙ ধারণ করে। দশ কোটি বছর আগের পৃথিবীর গরম আবহাওয়ায় যেসব পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে উদ্ভিদ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠত, আজকের দিনের উদ্ভিদরাও তাদের সেই সুদূর পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য বজায় রেখেই এগিয়ে চলে বৃদ্ধির পথে। মঙ্গলের উদ্ভিদের মধ্যেও দেখা যায় এই ঘটনাকেই আবৃত্ত হতে। সেখানকার মেরু অঞ্চলের শুভ্র তুষার যখন গলতে শুরু করে তখন সেখানে দেখা দেয় লালচে রঙের আভা। গ্রীষ্ম যত এগিয়ে আসে উদ্ভিদের রঙও পালটে গিয়ে সবুজ থেকে ধূসর হতে থাকে। মঙ্গলের বুকে কোটি কোটি বছর আগের আবহাওয়ায় যে-ধরনের উদ্ভিদ জন্মাত, এখনকার গাছপালাতেও পাওয়া যায় সেদিনের সুস্পষ্ট চিহ্ন। সম্ভবত ওই সময়েই সেখানে উদ্ভব হয়েছিল প্রথম প্রাণীর। তারপর কালের স্রোতে ভেসে চলতে চলতে নানা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে তারা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে আজকের চরম আবহাওয়ার সঙ্গে।

'১৯৫৮ সালে আমেরিকার বিখ্যাত মহাকাশবিজ্ঞানী ডঃ সিনটন মঙ্গলগ্রহের প্রতিফলিত আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করে অবলোহিত অংশে কতকগুলো কালো রেখা দেখতে পেয়েছেন। পৃথিবীর উদ্ভিদ থেকে প্রতিফলিত আলোতেও ঠিক ওইরকমই দেখা যায়। সুতরাং মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদের উপস্থিতি সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই থাকে না।

'অনেকে বলেন যে, মঙ্গলের বর্তমান চরম আবহাওয়ায় উদ্ভিদ জন্মানো সম্ভব নয়।

পৃথিবীর বুকে তো এমন উদ্ভিদও আমরা দেখি যারা মঙ্গলের বর্তমান আবহাওয়ার মতো মরুভূমির উষ্ণতায়, জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেনের অভাবের মধ্যেও বেঁচে থাকে, বেড়েও ওঠে। দক্ষিণ মেরুর চরম শীতে বা সাহারার উত্তপ্ত বুকেও তো উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। তারা নিজেদের ওই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে বহু বছরের পরিবর্তনের ফলে।

'মঙ্গলগ্রহ ছাড়া বৃহস্পতি, শুক্র এসব গ্রহেও জীবনের সম্ভাবনা আমি লক্ষ করেছি। শুক্রের আকাশে আমি আবিষ্কার করেছি অক্সিজেনের অস্তিত্ব। যদিও সে-অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কম। ক্রিমিয়ার মানমন্দির থেকে অধ্যাপক ভ্লাদিমির প্রোকোফিয়েভও এটা লক্ষ করেছেন বলে শুনেছি। শুক্র যখন পৃথিবীর খুব কাছে এসেছিল, তখন এর বায়ুমণ্ডলের বর্ণালী পরীক্ষা করে আমি অক্সিজেনের সূর্যালোক শোষণের আভাস পেয়েছি। প্রাণধারণের পক্ষে যে-পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন, শুক্রের বায়ুমণ্ডলের ওপরের অংশে তার চেয়ে অনেক কম অক্সিজেন আছে। এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। কারণ পৃথিবীপৃষ্ঠের দশ কিলোমিটার ওপরে যদি শুক্রের মতো ঘন মেঘের আবরণ থাকত, তাহলে সেই মেঘের ওপরের বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ হত নিচের বাতাসের চার ভাগের এক ভাগ মাত্র। আর যদি ওই মেঘের আবরণ বিশ কিলোমিটার ওপরে থাকত, তবে তো সেখানকার বাতাসে অক্সিজেন থাকত মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ। সুতরাং কোনও গ্রহের ওপরের অংশের বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ দেখে নিচের বাতাসের অক্সিজেনের পরিমাণ স্থির করা সম্ভব নয়। এছাড়া শুক্রগ্রহে প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার দুটি প্রধান উপাদান কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রোজেন গ্যাসের অস্তিত্বও আমি দেখতে পেয়েছি। সুতরাং সেখানে যদি প্রাণের বিকাশ হয়েই থাকে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

'তিখর আর সিনটনের মতামত দিলাম আমার যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আমি যদি বলি যে আমি নিজের চোখে দেখেছি, সে-কথা সাধারণ লোকে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। এতদিন কেবল অপেক্ষা করে ছিলাম মঙ্গলগ্রহে জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব স্বচক্ষে দেখে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। সেটা দেখলাম মাত্র দিন দুই-তিন আগে। আকাশটা সেদিন ছিল পরিষ্কার। আমার রেডিও টেলিস্কোপ ফোকাস করেছি মঙ্গলগ্রহের দিকে। গ্রহটা বেশ উজ্জ্বল লাগছে। অনেকক্ষণ আইপিসে চোখ লাগিয়ে বসেই আছি। ব্যথা হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। হঠাৎই কালো কালো কতকগুলো বিন্দুর মতো জিনিস নড়ে উঠল যেন! ভাবলাম, অনেকক্ষণ একইভাবে তাকিয়ে থাকায় চোখে স্ট্রেইন হওয়ার জন্য ওরকম দেখছি। না, কোথাও নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ নেই। নিজের বোকামিতে মনে মনে হাসি পেল। কিন্তু হাসিটা ঠোঁট থেকে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই মঙ্গলের বুকে আবার নড়ে উঠল সেই বিন্দুগুলো। এবার ভালো করে লক্ষ করলাম। টেলিস্কোপের আইপিসের সঙ্গে একটা বাড়তি ম্যাগনিফাইং অ্যাটাচমেন্ট লাগিয়ে দিলাম। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ প্রথম স্বচক্ষে দেখলাম, মঙ্গলের বুকে জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব। পলক ফেলতে ভয় হচ্ছে, পাছে সেগুলো মিলিয়ে যায় চোখের সামনে থেকে।

'জীবগুলো খুব ছোট্ট, মানুষের মতো দ্বিপদ। আমার দৃষ্টিতে তাদের দু' থেকে আড়াই ইঞ্চির বেশি মনে হয়নি। প্রথমে এক জায়গায় জমা হয়ে ছিল। এবার ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টিপথ থেকে। অনেকক্ষণ বসে রইলাম চুপ করে। মনে একই সঙ্গে দোলা দিচ্ছে আনন্দ আর বিস্ময়। লাফিয়ে উঠলাম একটা কথা মনে হতেই। আজ তো ২৬ ডিসেম্বর। গতকাল মঙ্গলগ্রহ এসেছে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। এই সুযোগ হারালে আবার অপেক্ষা করে থাকতে হবে তিনটি বছর, কারণ মঙ্গল পৃথিবীর খুব

কাছে আসবে ১৯৬৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি। না, আর অপেক্ষা করা চলে না।

'যে-কথা এতদিন সযত্নে গোপন করে রেখেছিলাম আজ প্রথম প্রকাশ করছি তোমার কাছে। গত এক বছর ধরে অত্যন্ত বিশ্বাসী আর নিপুণ রকেট ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে তৈরি করিয়েছি আমার মহাকাশযান—ছোট্ট "মার্সিয়ান"। মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার জন্য যা যা দরকার, কোনও কিছুর অভাবই এতে নেই। রেডার, রেডিও ট্রান্সমিটার-রিসিভার, টেলিভিশন, ছোট মাপের রেডিও-টেলিস্কোপ, স্পেকট্রোস্কোপ এবং মহাজাগতিক রশ্মি মাপার নানা আধুনিক যন্ত্র। গত মাসে রকেট তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এটি চলবে পারমাণবিক জ্বালানিতে। যে-পরিমাণ জ্বালানি এতে দেওয়া হয়েছে, তাতে অন্তত চার বছর ক্রমাগত মহাকাশে ঘুরে বেড়ানো চলবে। মহাশূন্যের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পার হওয়ার সময় বাতাসের ঘর্ষণে উৎপন্ন তাপ থেকে রকেটটিকে রক্ষা করার জন্য সারা দেহে দেওয়া হয়েছে রুপোর, এবং তার ওপর সোনার পাতলা আবরণ। আর একেবারে ওপরে রয়েছে বিশেষ ধরনের রেজিনের আস্তরণ। ঘণ্টায় প্রায় সাড়ে সাত হাজার কিলোমিটার হবে এর গতিবেগ।

'সুতরাং বুঝতেই পারছ, কী পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয়েছে এর পিছনে! আমার গবেষণার কাগজপত্র বেশিরভাগই নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে। মঙ্গলগ্রহে গিয়ে সেখানকার আবহাওয়া, উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের সম্বন্ধে গবেষণা চালানোই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বুকে বসে যেসব জিনিসের অস্তিত্ব সেখানে দেখেছি, তা সত্যি না কল্পনা তার প্রমাণ পাব এবার। চোখ তো মানুষকে ফাঁকি দেয় মাঝে মাঝে। মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিগ্রহে যাওয়ার পরিকল্পনাও আছে। কারণ বৃহস্পতির বর্তমান পরিবেশ ও আবহাওয়া পৃথিবীতে যখন প্রথম প্রাণের বিকাশ ঘটেছিল ঠিক সেই সময়কার মতো। মিথেন আর অ্যামোনিয়ায় ভর্তি বায়ুমণ্ডল। আমার বিশ্বাস, বৃহস্পতিতে সবে প্রাণের স্পন্দন জাগতে শুরু করেছে। এখানে বসে কল্পনাবিলাসীদের মতো তর্ক আর যুক্তির জাল না বুনে নিজের চোখেই দেখব সৃষ্টি-রহস্য, যা এখনও আমাদের কাছে অন্ধকার।

'কবে ফিরে আসব জানি না। যদি সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারি তাহলে একদিন ফিরবই। আমার গবেষণা পৃথিবীর মানুষের কতটুকু উপকারে লাগবে জানি না। আর এই যদি আমার শেষ যাত্রা হয় তাহলে বিদায় নিচ্ছি জন্মভূমি পৃথিবীর মাটি থেকে, যার আকাশ, বাতাস আর আলো গড়েছে আমার শরীরের প্রতিটি কোষ—তাদের জন্যই প্রাণের স্পন্দন জেগেছে সেই দেহে। অজানার সন্ধানে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছি এতদিন, কিন্তু আজ যাওয়ার মুহূর্তে তোমাদের আকর্ষণ আমাকে পিছনে টানছে। না, আর লিখবার চেষ্টা করা বৃথা। মনটা দুর্বল হয়ে পড়ছে। ভয় হয়, মানসিক দুর্বলতা আমার স্বপ্নকে যেন বিফল করে না দেয়।

'জানি, আমার পথ চেয়ে বসে থাকবে তোমরা দু'জনেই। ফিরে না এলেও দুঃখ করার মতো আপনার জন আমার কেউ নেই আজ। এটুকু ভেবেই সান্ত্বনা পাব যে, এই বুড়োর হারানো আত্মার উদ্দেশে তোমাদের দু'জনের চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল অন্তত পড়বেই। সেটাই হবে আমার দুঃসাহসিক কাজের পরম পুরস্কার। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমার দেওয়া পাইপটাও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

তোমার কল্যাণকামী—
ডঃ হাইসেনবার্গ।'

চিঠি পড়া শেষ হয়ে গেছে। খেয়াল হতেই দেখি চোখের জলে কয়েকটা লাইন ধুয়ে গেছে। জলের ফোঁটা নিঃশব্দে টপ টপ করে ঝরে পড়েছে মাটিতে। কঠোর বাস্তব নিয়েই যার কারবার, জীবনের শেষ সীমায় এসে আজ পৃথিবীকে ছেড়ে যাওয়ার আগে এ কী ভাবালুতা তাঁর মনে! ভারাক্রান্ত মন নিয়ে জানলাটা খুলে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। আকাশের বুক থেকে তারার মিছিল বিদায় নিয়েছে। ভোরের রক্তরাগ ভরিয়ে দিয়েছে ঘরটা।

ভালো করে আলো ফোটার অপেক্ষা না করেই ছুটলাম ডঃ হাইসেনবার্গের ল্যাবরেটরিতে। আজ আর চেম্বারে বসে অপেক্ষা করার মতো মনের অবস্থা নেই। দরজা ঠেলে সোজা ভেতরে ঢুকেই দেখি প্রফেসার রাইনার রেডার কন্ট্রোল বোর্ডের ওপর মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন পিতৃহারা শিশুর মতো। আমার চেম্বারে ঢোকার শব্দ তাঁর কানেই যায়নি। আলতোভাবে পিঠের ওপর হাতটা রাখতেই মাথা তুলে তাকালেন আমার দিকে। তারপরই হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ভেঙে পড়লেন কান্নায়। বাস্তবের সঙ্গে হৃদয়ের কী কঠোর সঙ্ঘাত! মনে জাগছে সেই চিরন্তন প্রশ্ন: 'বিজ্ঞান কি মানুষকে শান্তি দিয়েছে?'

রাইনারকে সান্ত্বনা দিয়ে চেম্বারে নিয়ে এলাম। চা দিয়ে গেল বেয়ারা। মুখোমুখি বসে আমরা দু'জন। আমিই প্রথম কথা বললাম, 'প্রফেসার রাইনার, ডঃ হাইসেনবার্গের অন্তর্ধানের শেষটুকু আজ বলতেই হবে। শেষ অংশটা না জানতে পারলে শান্তি পাচ্ছি না কিছুতেই।'

কতকটা আত্মগত ভাবেই তিনি বললেন, 'বলব, আজ সব কথাই বলব আপনাকে। না বলতে পারলে এবার বুঝি পাগলই হয়ে যাব। গত পাঁচ মাস নিদ্রাহীন চোখে রাতের পর রাত চেয়ে থেকেছি রেডার-পরদার দিকে। কিন্তু ডক্টরের কোনও চিহ্নই দেখতে পাইনি। রেডিও সিগন্যালও বন্ধ হয়ে গেছে যাওয়ার দিন দুই-তিন পরই। কতদিন এভাবে কাটাতে হবে জানি না—আমি ক্লান্ত, নিঃশেষিত।

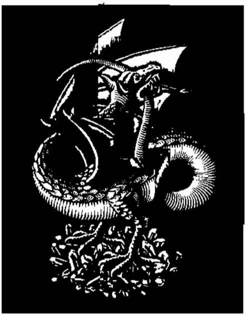
'১৯৬০ সালের ২৬ ডিসেম্বর। বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। রাত তখন প্রায় সাড়ে তিনটে। ডঃ হাইসেনবার্গ আর আমি এগিয়ে চলেছি পায়ে-চলা পথ ধরে। দু'জনের হাতে দুটো বড় বড় টর্চ। অনেকখানি পথ চলে এসেছি। পিছনে তাকালে দূরে দেখা যায় অবজারভেটরির আবছা আলো। আর একটু এগিয়েই অন্ধকারের মধ্যে লঞ্চিং প্যাডের ওপর উজ্জ্বল প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে ডঃ হাইসেনবার্গের স্পেস রকেট। পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে চলে যাওয়ার পর ওটাই হবে তাঁর একমাত্র পার্থিব বন্ধু। চকচকে সিঁড়ি বেয়ে ডক্টর উঠে গেলেন ওপরে। পিছন পিছন আমিও গিয়ে হাজির হলাম রকেটের ভেতরে। ডক্টর তাঁর শীর্ণ কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললেন, "প্রায় চারটে বাজে। আর ঠিক পনেরো মিনিট পরেই চলে যাব মহাশূন্যে।" তারপর বড় খামটা এগিয়ে দিলেন আপনাকে দেওয়ার জন্যে। মিনিট পাঁচেক ধরে কয়েকটা জরুরি নির্দেশ দিয়ে আমাকে নেমে যেতে বললেন। করমর্দন আর শুভযাত্রা কামনা করে আমি নেমে এলাম নিচে। শাটারটা তখনও খোলা। ডঃ স্পেস-স্যুট পরে নিচ্ছেন। শেষে স্বচ্ছ আবরণে মাথা ঢেকে নিয়ে বন্ধ করে দিলেন শাটার। আর তাঁকে দেখতে পেলাম না। রকেটের পেটের মধ্যে বসে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন মহাযাত্রার।

'হেডফোনটা কানে লাগিয়ে সুইচবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভেসে এল ডক্টরের কণ্ঠস্বর, "গেট রেডি, মাই বয়। বিচলিত হ'য়ো না। বিজ্ঞানী তুমি, বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে সামান্য ত্যাগস্বীকার করতে পারবে না?" থেমে গেল কথা। ভেসে আসতে লাগল

কতকগুলো ক্রমিক সংখ্যা, "টেন····নাইন···· এইট····থ্রি···· টু····ওয়ান····জিরো···· ।" বিরাট একটা বিস্ফোরণ, এক ঝলক আগুন—তারপরই শূন্য লঞ্চিং প্যাডটা পড়ে রইল মাঠের মাঝখানে। দৌড়তে দৌড়তে ল্যাবরেটরিতে এসেই দাঁড়ালাম রেডার স্ক্রিনটার সামনে। কন্ট্রোল বোর্ডের কয়েকটা পুশ বাট্‌ন পটাপট করে টিপে দিলাম। তারপর নবটা ঘুরিয়ে ফোকাস করতেই পরদার ওপর ভেসে উঠল খুব ছোট্ট একটা আলোর বিন্দুর মতো ডঃ হাইসেনবার্গের রকেট "মার্সিয়ান"। তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে মহাশূন্যের দিকে। এক সময় হঠাৎ আলোটা গেল মিলিয়ে। বোতামগুলো নাড়াচাড়া করে দেখলাম যন্ত্রটার কোনও গোলমাল হয়েছে কি না। আর তো দেখা যাচ্ছে না ডক্টরের রকেট! হঠাৎই কয়েক মিনিট পরেই আবার দেখা গেল সেই আলোর বিন্দু। স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বুকের ভেতর থেকে। এখনও তিনি হারিয়ে যাননি। এবার ডক্টরের অস্তিত্বের শেষ চিহ্ন সেই আলোর বিন্দুটা ধীরে ধীরে আবছা হয়ে আসতে আসতে এক সময় মিলিয়ে গেল চিরকালের মতো। তারপর দু'দিন মাত্র রেডিও সিগন্যাল পেয়েছিলাম। সেই যে তিনি গেছেন আজও ফেরেননি—কোনওদিন ফিরবেন কি না কে জানে।'

□ ১৯৬৪





চোখ

আনন্দ বাগচী

একদিন-একদিন এরকম হয়। ওরা চলে যাওয়ার পরও আড্ডা থামে না। আড্ডা তখন আমার মগজে পুরোনো কাটা রেকর্ডের মতো বাজতে থাকে। মেসের এক চিলতে ঘরে দড়ির খাটিয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে বেড সুইচ নিভিয়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকি। আমার কানের মধ্যে ভূপতি আর নলিনাক্ষর আবেগমাখা অফুরন্ত কথা আর তর্কবিতর্ক, যুক্তি আর পালটা-যুক্তি ধারাবাহিক বাজতে থাকে। বিষয় থেকে বিষয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা এক অসংলগ্ন নাটকের মতো। বা কখনও কোনও একটি ঝলসে-ওঠা সংলাপ পিন বসে যাওয়া কাটা রেকর্ডের মতো একটি-দুটি শব্দের আখরে মুহুর্মুহু বাজতে থাকে। তারপর এক সময় ঠাকুর এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় খাঁকারি দিয়ে ডাকে, 'বাবু, খেতে আসেন।'

ভূপতি ডাক্তার। হাসপাতালের সার্জন। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে না বলে তার হাতে সময় আর মাথায় খেয়ালের অন্ত নেই। কী একটা দুরূহ বিষয় নিয়ে ও অনেকদিন থেকে নিঃশব্দে গবেষণা করে চলেছে। আর নলিনাক্ষ কোনও কলেজের বটানির প্রফেসার। ওঁর লেখা টেক্সটবুক বাংলা ভাষায় একমাত্র বই যাকে অনেকেই সশ্রদ্ধ ঠাট্টায় 'বটানির বাইবেল' বলে। একটা বইই ওকে বড় করে দিয়েছে। ওদের দু'জনের মাঝখানে আমি হাইফেনের মতো এখনও বন্ধুত্বে অচ্ছেদ্য হয়ে আছি। কমন ফ্রেন্ড যাকে বলে। আমি নিজেও সত্যিই কমন। বিয়ে-থা করিনি, চালচুলো নেই, মেসে থাকি। চাকরিটাও সাদামাটা। খবরের কাগজে। রঙ ফলিয়ে বলা যায় সাংবাদিক, আসলে খবরের কেরানি। টেলিপ্রিন্টারের নিউজপ্রিন্ট বাংলায় তর্জমা করি, সাজাই, হেডিং তৈরি করি—ব্যাস, এই পর্যন্ত। আর আড্ডায়ও আমার ভূমিকা গৌণ ; ওদের তর্কাতর্কিকে উসকে দিয়ে দিয়ে জিইয়ে রাখা, চাঙ্গা করা।

আর ওরা আসে বলেই আমার যে শুধু সময় কাটে তাই না, আমি লাভবানও হই। অনেক নতুন কথা শুনতে পাই, জ্ঞানের কথা, অভিজ্ঞতার কথা, আবিষ্কারের কথা। ওরা দু'জনেই বইয়ের পোকা, আর আমি বইকুণ্ঠ, কলেজ-ইউনিভার্সিটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বইও ছেড়েছি। এখন খবরের কাগজ ছাড়া ছাপা অক্ষরের সঙ্গে সত্যি আমার কদাচিৎই সাক্ষাৎ হয়। তাই আমার রস আর রসদ আসে আমার ওই দুটি বন্ধুর কাছ থেকে। নলিনাক্ষর কাছ

থেকেই আমি অনেক বিচিত্র আর বিলীয়মান গাছের কথা শুনেছি। অনেক দুষ্প্রাপ্য গাছের বটানিক্যাল নাম পর্যন্ত আমার কণ্ঠস্থ হয়েছে। আজ সবাই জানে, গাছের অনুভূতি আছে এ কথা আবিষ্কার করেছিলেন এক বাঙালি ভদ্রলোক। কিছু গাছের যে মনও আছে, স্মৃতি আছে, রুচি-অরুচি আছে, তারাও যে মানুষের মতো কথা বলে—এমনকি মানুষের সঙ্গেও, আর ভয়ে ক্রোধে ভালোবাসায় উত্তেজিত হয়, হার্টফেল করে মারা যেতে পারে, সে-কথা নলিনাক্ষ না থাকলে আমি জানতেই পারতাম না।

আজকে ছিল ভূপতির দিন। আলোচনাটা শুরু হয়েছিল রাজনীতি নিয়ে, হাসপাতালের অচল অবস্থা নিয়ে। তারপর জ্যোতিষী, প্ল্যানচেট, জন্মান্তর ইত্যাদি বিষয়ে দুই বন্ধুর মল্লযুদ্ধ হতে হতে অ্যানাটমি-ফিজিওলজিতে এসে ঠেকল।

প্রথমে বেশ হালকা ভঙ্গিতেই শারীরিক অসঙ্গতি নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল। সেটা আরম্ভ হয়েছিল নলিনাক্ষর তরফ থেকেই। ও বলছিল, এরকম দেখেছি, এক-একজন মানুষের চেহারা আর চরিত্রের সঙ্গে তার কোনও বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিল হয়নি। নিখুঁত মূর্তি গড়তে গড়তে ভগবান মাঝে মাঝে কেন এমন করেন জানি না। কারও হাত মনে হয় তার নিজের নয়, শরীরের ছাঁদের সঙ্গে একদম মানায়নি, কিংবা হাতের সঙ্গে আঙুলগুলো বেমানান, দেখলেই মনে হয় হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—দু'ছড়া কলার মতো। মাথা যেন মাথা নয়—ঘাড়ে চেপে বসেছে উটকো ভাড়াটের মতো। এইভাবে কারও নাক, কারও কান, কারও পা। একজন ঢিলে-ঢালা অলস স্বভাবের মানুষ, দেখলেই বোঝা যায় আঠারো মাসে বছর-কিন্তু হাঁটে যখন মনে হয় টাট্টু ঘোড়া ছুট লাগিয়েছে।

আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, এই অমিলগুলো হাসির কারণও হয়ে ওঠে কখনও কখনও। হয়তো আড়াই মন ওজনের পিপের মতো মোটা লোকটা পেনসিলের সীসের মতো সরু গলায় কথা বলে ওঠে। আবার প্যাঁকাটি মার্কা নির্জীব চেহারার মানুষের গলায় মেঘ ডেকে ওঠে। চমকে গিয়ে তখন তোমার রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইনটাই মনে পড়বে : "অ্যাতোটুকু যন্ত্র হতে এতো শব্দ হয়, সত্যি বিষম বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে!"'

নলিনাক্ষ হাসল : 'হ্যাঁ, এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই একটা অদৃশ্য হার্মনি আছে। ছোট ঘড়ি বড় ঘড়ি সব এক মাত্রায় চলেছে। নিক্তি মাপা রাস্তায়। কিন্তু কখনও কখনও কিছু ব্যাপার খাপছাড়ার মতো ঘটে। কেমন যেন সিংক্রোনাইজ করে না। ঘড়ির কাঁটা এক কথা বলছে কিন্তু তার বাজনা অন্য কথা। ঘড়িতে আটটা বেজেছে হয়তো, কিন্তু ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল, দেখনি কখনও? মানুষের চোখে আর ঠোঁটেও এমনই ঘটনা ঘটতে দেখেছি। ঠোঁটের সঙ্গে চোখ মিলছে না, কিংবা চোখের সঙ্গে ঠোঁট। হয়তো হাসির কথা বলছে। ঠোঁট-মুখ হাসিতে ফেটে পড়ছে, কিন্তু চোখ হাসছে না—কেমন বিষণ্ণ কিংবা ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। খুব নিবিষ্ট হয়ে কোনও সমস্যার কথা ভাবছে লোকটা কিন্তু তার চোখ দুটো খঞ্জন পাখির মতো নেচেই চলেছে অনবরত। কিংবা হাসছে রহস্যময় হাসি।'

ভূপতি লুফে নিল কথাটা : 'ইয়েস নলিন, তুমি একটা জব্বর প্রশ্ন তুলেছ। কিন্তু তার আগে বলি, চোখ আমাদের একটা ভাইটাল অর্গান। প্রতিমায় দেখনি, চক্ষু দান করা হয় সকলের শেষে। চক্ষু যোজনা মানেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা। জড় পদার্থ দেখতে পায় না, কেননা তাদের প্রাণ নেই। তোমার সাবজেক্টেই আসি। গাছ দেখতে পায়, তার চোখ আছে, সে যে প্রাণী এইটেই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। চোখ আমাদের অর্ধেক মগজ, বলতে গেলে আমাদের সকলের বারো আনা মনই বাঁধা আছে তার মধ্যে। জীবনের একটা প্রধান ধর্মই হচ্ছে গ্রহণ এবং বর্জন। চোখের ভেতর দিয়ে সেই কাজটাই আমরা প্রতি মুহূর্তে করে

যাচ্ছি। চোখ তাই কেবল শরীরের সৌন্দর্য বর্ধন করে না, সে আমাদের চেতনা বা প্রাণকেও সজাগ রাখে।'

আমি হেসে উঠলাম শব্দ করে। আমার হাসি মানেই উসকানি। বললাম, 'তোমার কথাগুলো আমি ঠিক গিলতে পারছি না, বেজায় গুরুপাক হয়ে যাচ্ছে, ভূপতি। তোমরা বিজ্ঞানীরা, আমি দেখেছি, সহজ ব্যাপারটাকে কেমন জটিল করে তুলে আনন্দ পাও। চোখ জিনিসটা তো শুধু দেখবার জন্যে, যেমন চশমা। তার মধ্যে ফালতু এতসব ব্যাপার ঢুকিয়ে দিচ্ছ কেন?'

ভূপতি রেগে গেল। বলল, 'তোমার মুণ্ডু! সত্যি, মাথায় যদি তোমার শুধু গোবর পোরা থাকত তাহলেও আশা ছিল। গোবর থেকে গ্যাস হয়, তা থেকে জ্বালানি, আলো, বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাদের খুলির মধ্যে শুধু রিম রিম নিউজপ্রিন্ট ঠাসা, তারা হোপলেস। চোখ দুটো দিয়ে কি আমরা শুধু দেখি রে হতভাগা! চোখ দিয়ে আমরা যে-কোনও জিনিসকে ছুঁতে পারি, আস্বাদন করতে পারি। আমাদের শাস্ত্রে আছে, ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন হয়। কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। চোখ দিয়েও আমরা দেখতে পারি, শুনতে পারি, কথা কইতে পারি। ভিসুয়্যাল মেমোরি বলেও একটা ব্যাপার থাকতে পারে হয়তো। বুঝলে ব্রাদার, এরকম একটা নির্ভুল কমিউনিকেটিভ কম্পিউটার তুমি সারা দেহ তল্লাশি করলেও পাবে না। এই ব্যাপারটা নিয়েই আমি বহুকাল থেকে গবেষণা করে চলেছি। হয়তো একদিন প্রমাণও করে দিতে পারব।'

জানতাম। ভূপতির গবেষণার ব্যাপারটা আমার যে একেবারে অজানা ছিল তা নয়। ডি এন এ, আর এন এ, আর অপটিক নার্ভ নিয়ে ও কীসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল তাও জানি। আমাদের শরীরের সবচেয়ে ছোট ইউনিট সেল বা কোষের যে নিজস্ব একটা জীবন আছে, প্রাণ আছে, আলাদা করে বেঁচে থাকা আছে, এরকম একটা কথা ভূপতিই আমাকে একদিন বলেছিল। এই ইনার ইউনিভার্স বা অন্তর্বিশ্ব—এরই রহস্যের দরজায় ও ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ নিয়ে মাথা খুঁড়ে মরছে। কিন্তু চোখ, যা সহজেই আমাদের চোখে পড়ে, কোনও সূক্ষ্ম যন্ত্রের দরকার হয় না, তা নিয়ে যে এতখানি মাথা ঘামিয়েছে সেইটেই জানতাম না।

আজকেও ওরা চলে যাওয়ার পর আলো নিভিয়ে খাটিয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে আমি একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে ছিলাম। না, ঘুমোইনি, নিশ্চয়ই ঘুমোইনি। এই উত্তেজক আলোচনার সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা মিশিয়ে কিছু ভাববার চেষ্টা করছিলাম। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই, আমার চিন্তা সেই পথ ধরেও এগোচ্ছিল না। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না এমন এক রহস্যের জট পাকানো সুতোর তাল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। জন্মান্তর, এই জীবনের বাইরের জীবন, মানুষের ইচ্ছাশক্তি, জিনের স্রোত বেয়ে আসা মানুষের সংস্কার, অভ্যেস এবং সবশেষে এই অলৌকিক ক্যামেরা আমাদের চোখ—যার ভেতর দিয়ে একজনের মন আর-একজনের মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়, সম্মোহনের এই চাবিকাঠি, এই এক ধরনের রিমোট কনট্রোল নিয়ে কল্পনার জাল বুনে চলেছিলাম। এমন সময় আমার নাম ধরে কেউ ডাকল। ডাকল খুব কাছ থেকে, অদ্ভুত গলায়, আমার এক চিলতে ঘরের ঠিক দরজায় এসে।

এক ঝটকায় যেন গোটা মাকড়সার জালটা ছিঁড়ে আমার হাতে-মুখে জড়িয়ে গেল। কে! আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। প্যাসেজের জিরো ওয়াটের কমজোরি আলোয় দেখলাম চৌকাঠে হাত রেখে এক সিলুয়েট মূর্তি।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি ?'

'কই না।'

হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলাম। বারকয়েক চোখ পিট পিট করে টিউবলাইটটা জ্বলে উঠল। আলোয় চিনলাম। আমাদের মেসের নতুন বোর্ডার। সুশ্রী ছিপছিপে নায়ক-নায়ক চেহারা। একবার তাকালে ঝট করে চোখ সরিয়ে নেওয়া যায় না। বয়স গোটা পঁয়ত্রিশের মধ্যে। দিন পাঁচেক হল এখানে এসে উঠেছে, কিন্তু আলাপ হয়নি। এমনিতেই আমি একটু অমিশুক তার ওপর গোটা সপ্তাহটাই নাইট ডিউটিতে গেছে। নিশাচর প্রাণীর মতো দিনে ঘুমোনো আর সন্ধে হলেই কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া। তবু আসতে-যেতে দু- এক ঝলক দেখেছি দূর থেকে।

একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'আসুন আসুন।'

'স্যরি, ডিসটার্ব করলাম নাকি ?'

'না না, সে কি!'

'দীপক ব্যানার্জি, পাটনা থেকে এসেছি।' চেয়ারে বসে পড়ে সহাস্যে নমস্কার জানাল।

'আমি ধ্যানেশ সেন, খবরের কাগজে আছি।'

'জানি। মানে শুনেছি। আমি তো আপনার পাশের ঘরেই আছি।'

আমি জানতাম না, কারণ পাশের ঘরে অন্য একজন ছিলেন। তিনি বোধহয় ঘর বদলে নিয়েছেন। এটা-সেটা দু-চার কথায় আলাপ জমে উঠল। দীপকের বাড়ি পাটনায়। অবস্থা বেশ ভালো। চাকরিটা শখের। এক ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ, বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছে।

ইতস্তত করে এক সময় বলল, 'আপনার বন্ধুটি কি চোখের ডাক্তার ?'

প্রসঙ্গটা ধরতে না পেরে আমি জিজ্ঞাসু চোখে ওর মুখের দিকে তাকালাম। আর তখনই সত্যি করে চমকালাম। এতক্ষণ মনের যে-অস্বস্তির কারণটা ঠিক ধরতে পারছিলাম না এবার সেটা স্পষ্ট করে চোখে পড়ল। সেই চোখ! দীপকের চোখ দুটো কেমন সবুজ লুমিনাস পেইণ্টের মতো থেকে থেকে আলো পড়ে জ্বলে উঠছে। কিছু কিছু পশুর চোখ এ রকম জ্বলে কিন্তু সেটা তেমন কোনও ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার বোধহয় অন্য! ওর চোখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে মনে হল আর দশজনের যেমন হয় তেমন না। এ-চোখ যেন ওর সমস্ত অস্তিত্বের বাইরে আলাদা এক ব্যক্তিত্ব। যেন আলাদা একটা মানুষ ওই চোখের ভেতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শিরদাঁড়ার ভেতরটা কেমন শিরশির করে উঠল। বুদ্ধি কিংবা কথা দিয়ে এ ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। একটা অশরীরী অস্তিত্বের গন্ধ পাচ্ছিলাম যেন।

আমার মুখের চেহারা নিশ্চয়ই পালটে গিয়েছিল। ভয়-পাওয়া লোকের মতো হয়তো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল।

চাপা গলায় দীপক বলল, 'আমার চোখের দিকে কী দেখছেন অমন করে?'

ধরা পড়ে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘোরালাম : 'কই, না! ভাবছিলাম আপনি আমার কোন বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করছেন।'

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে দীপক বলল, 'ক্ষমা করবেন, এটাকে আড়ি পাতা ভাববেন না। আপনাদের আড্ডার সব কথাই আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম পাশের ঘর থেকে। ভেরি ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট, অন্তত আমার কাছে। আপনার যে-বন্ধুটি চোখের কথা বলছিলেন, উনি নিশ্চয়ই আই স্পেশালিস্ট ?'

'ও, তাই বলুন। না। চোখের ডাক্তার না। তবে—'

'তবে?'

'চোখের ব্যাপার নিয়ে ওর একটা কেমন ক্ষ্যাপামি আছে। চক্ষু বিষয়ে কী একটা গবেষণা করছে বলল।'

'শুনলাম। তবে আই মাস্ট সে, ক্ষ্যাপামি নয়। আমি এ-ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ, আনাড়ি। তবু বলব, ওঁর অ্যানালিসিস আমাকে চমকে দিয়েছে, চোখ ফুটিয়েছে—'

আমি কথা বলছিলাম, কিন্তু আমার চোখ দুটোকে যেন কোনও জোরালো চুম্বক টানছিল। চুরি করে এক-আধ পলকের জন্যে আমি দীপকের চোখের দিকে দেখছিলাম। বোধহয় সেটা লক্ষ করেই দীপক শব্দ করে হেসে উঠল।

বিস্মিত গলায় বললাম, 'হাসছেন?'

দীপক মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। এ-হাসি অনেক দুঃখের, ধ্যানেশবাবু।'

'বুঝলাম না।'

'ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, একটা প্রশ্ন করব?'

'কী প্রশ্ন?' অস্বস্তি নিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'আপনি আমার চোখ দেখছিলেন! দেখছিলেন না?'

একটু সময় নিয়ে শেষে শুকনো গলায় বললাম, 'হ্যাঁ।'

'দেখে কী মনে হচ্ছে? এ আমার নিজের চোখ নয়, তাই না?'

উত্তর দিতে পারলাম না। বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে গেল। লোকটা কি মনের কথা সব টের পায়! বিব্রত হয়ে চুপ করে থাকলাম।

'ঠিকই ধরেছেন। এ-চোখ আমার নিজের নয়।'

আমি হতভম্ব। দীপক আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাবছি কিছু একটা বলা দরকার। কিন্তু আমাকে কিছুই বলতে হল না, ও নিজেই আবার কথা বলল।

'বিলীভ মি। এ-চোখ সত্যিই আমার নিজের নয়। আর সেটা বুঝতে পারলাম প্রথম কলকাতায় এসে। তা দিন দশেক আগে—তখনও মেসে এসে উঠিনি। এখানে এসে প্রথমে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠেছিলাম। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে এই মেসে।' একটা বিবর্ণ হাসি দীপকের ঠোঁটে ভেসে উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল: 'কিন্তু আমি মূর্খ, নিজের কাছ থেকে কি কেউ পালাতে পারে!'

ভদ্রতাবশত আমি বাধা দিলাম: 'কী বলছেন আপনি! আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।'

'পারবেন। তবে সে এক লং স্টোরি। আপনাকে বোর করছি না তো?'

দীপককে দেখে, তার কথা শুনে, আমার কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছিল। এই চোখের পিছনে কী রহস্য লুকনো আছে কে জানে!

বললাম, 'ঠিক উলটো। বলুন আপনি। গপ্পো শুনতে কার না ভালো লাগে!'

'এটা কিন্তু গপ্পো নয়। ফ্যাক্ট, সত্যি ঘটনা। ব্যাকরণ ভুল হল নিশ্চয়ই, ট্রু ফ্যাক্টের মতো। তবে আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই। যতদূর সংক্ষেপে বলা যায় তাই বলব।'

দীপকের কথাগুলোকে ছাঁটকাট করে সাজালে তার মুখের গল্পটা এইরকম দাঁড়ায়:

সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলে এই পৃথিবী, এই চারপাশ, এই জীবন কেমন লাগে আমার জানা আছে। কারণ একটানা পাঁচ বছর আমি কমপ্লিট ব্লাইন্ড হয়ে ঘরে বসে ছিলাম। আমার দুনিয়া তখন দু'হাতের গণ্ডির মধ্যে, হাতড়ে বেড়ানো ছোট্ট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে

গিয়েছিল। ঘড়ি তখন শুধু কানে শোনা একটা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। প্রহরে প্রহরে ভাগ করা দিন আর রাত একাকার হয়ে গিয়ে অনিঃশেষ একটি ভয়ঙ্কর রাত্তির হয়ে গিয়েছিল, যে-রাতে চাঁদ নেই, তারা নেই, নিরেট নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। আমার জীবন অর্থহীন, আমার আহার বিস্বাদ, আমার প্রিয় বইগুলো বোবা। সম্পূর্ণ একলা মানুষের চেয়েও আমি নিঃসঙ্গ, একা। শব্দ এবং নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে বন্দী প্রেতের মতো ভেসে রয়েছি। এই যন্ত্রণার তুলনা হয় না।

অথচ দুর্ঘটনা ঘটে। এরকমই অকারণে এক পলকে ঘটে যায়। ঘটনার পিছনে যুক্তি থাকে, কিন্তু দুর্ঘটনার কোনও যুক্তি নেই। অর্থাৎ সেটা না ঘটতেই পারত। তবু ঘটল। আমার তিরিশ বছরের জীবনে বছর বছর হোলির দিন এসেছে, চলে গেছে। সাবান মেখে সে-আবির আর রঙ তুলে ফেলেছি। কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর আগের দোলের দিনটি বোধহয় আলকাতরার মতো কালো রঙ নিয়ে এসেছিল। সেদিন ফাগুয়ার তাণ্ডবের মধ্যে কেউ আমার চোখে রঙ ছুড়েছিল। কী ছিল সেই রঙের মধ্যে জানি না। অনেক কষ্টে যখন চোখ খুললাম তখন দুটো চোখেই আর দৃষ্টি নেই। বেবাক অন্ধ হয়ে গেছি। চোখের সামনে যেন কোনও মানুষ নেই, দৃশ্য নেই, কিচ্ছু নেই। তবু তখনও একটু আলো ছিল। ঠিক আলো নয়, আলোর আভার মতো। ঠিক কীরকম জানেন, গভীর জলের তলায় ডুব দিয়ে চোখ খুললে যেমন দেখা যায় অনেকটা সেইরকম। ডাক্তার-বদ্যি এলেন। কিন্তু তাঁরা বিদায় নেওয়ার আগেই সে-আভাটুকুও আমার দু'চোখ ছেড়ে চলে গেল।

পাটনায় আমরা তিন পুরুষের প্রবাসী বাঙালি। আমার ঠাকুরদা ছিলেন বিহারের ওই অঞ্চলের বিধান রায়। বাবা এখনও ডাকসাইটে অ্যাডভোকেট। দুই পুরুষের জমানো সম্পত্তি আমার একটা জীবনে ফেলে-ছড়িয়েও বোধহয় শেষ করতে পারব না। কত বড় বড় কানেকশান আমাদের। দিল্লির দরবার ইস্তক ছড়ানো। তবু চেষ্টা করে আই ব্যাঙ্ক থেকে একজোড়া চোখ পেতে আমাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হল। রক্ত বললেই যেমন রক্ত পাওয়া যায়—শুধু ব্লাড গ্রুপ মিলতে হয়, চোখ বললেই কিন্তু তেমনই চোখ নয়। আমাদের দেহকোষ বা সেলের আধার যে-টিসু, তার স্বভাব, তার চরিত্রও বিচিত্র। ফরেন বডিকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না। বোধ হয় তারও পছন্দ-অপছন্দ আছে। তাছাড়া আমার অপটিক নার্ভেও গোলমাল হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত তেমন চোখ পাওয়া গেল। অপারেশনও সাকসেসফুল হল। অন্তত ডাক্তাররা তাই বললেন। আমি আবার আগের মতোই দৃষ্টি ফিরে পেলাম। আগে লেখাপড়া করার জন্যে চশমার দরকার হত, এখন হয় না। চোখ ভালো হল, কিন্তু চশমা বেচারি ইনভ্যালিড হয়ে গেল, তার চোখ হারাল। আমি খুশি। আমার যেন পুনর্জন্ম হল। আমি আবার পুরোনো কাজে বহাল হলাম।

দিন যাচ্ছিল তরতর করে, ভালোই। কিন্তু কোথায় যে ছন্দ কেটে গেছে টের পাইনি তখনও। আসলে আমার স্বভাবের মধ্যে পরিবর্তন আসছিল। চিড় ধরছিল মনের মধ্যে। সব মানুষের মনের মধ্যেই 'হ্যাঁ' আর 'না' থাকে। অর্থাৎ এক মনের মধ্যে দুই মন। এক মন যাতে সায় দেয়, অন্য মন তাতেই বাগড়া দিতে চায়। তবে এটা খুবই অস্পষ্ট আকারে এবং কখনও কদাচিৎ, তাই তেমন করে বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু আমার কেস আলাদা। আমার বেলায় দুটোই সমান জোরালো। থেকে-থেকেই টাগ অফ ওয়ার লেগে যায়। এর ফলে কিনা জানি না, আমি ক্রমশ কেমন রাগী হয়ে উঠছিলাম।

এই সময় অফিস থেকে আমাকে কলকাতায় পাঠাতে চাইল। আগের দিন হলে নিশ্চয়ই

এই বদলিতে রাজি হতাম না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আসার জন্যে আমার মনটা কেমন নেচে উঠল। চলে এলাম—বাড়ির অমত সত্ত্বেও। বাসাও ভাড়া নিলাম একটা। কিন্তু কলকাতায় এসে একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিল আমার চোখে। থেকে থেকে ডবল ভিশন দেখতে লাগলাম। ডবল ইমেজ বললে স্পষ্ট হবে কথাটা। প্রথম দিনের কথাই বলি। কলকাতায় সেটা আমার দ্বিতীয় দিন। একটা রাস্তা দিয়ে হনহনিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎই থমকে দাঁড়াতে হল একটা চেনা দোকান দেখে। থরে থরে মিষ্টি সাজানো কাচের শো-কেসের ওপিঠে যে-লোকটি বসেছে সে আমার বহুদিনের চেনা। এমনকি তার পিছনের ক্যালেন্ডারের ছবিটি পর্যন্ত। মনে পড়ল, এই দোকানে কতদিন সরপুরিয়া খেয়েছি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। মাই গড! এ কী দেখছি! ক্যালেন্ডারের সালটি ১৯৭৪। ঠিক দশ বছরের পুরোনো! এরকম ঝকঝকে দোকানে এত পুরোনো ক্যালেন্ডার? চোখ রগড়ে তাকালাম। দৃষ্টিবিভ্রম ছুটে গেল। দেখলাম, না, ১৯৮৪ সালেরই ক্যালেন্ডার। আর ছবিটা আদৌ আমার চেনা নয়। চেনা নয় ক্যাশবাক্স আগলে বসা লোকটাও। আর সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার, কাচের শো-কেসের রসগোল্লা সন্দেশ সরপুরিয়া কোন ভোজবাজিতে রুপোর গয়না হয়ে গেছে। ঝকমকে বাউটি, কানপাশা, টায়রা, কাঁকই। যেন ইলেকট্রিক শক খেলাম। খেয়াল হল, এই রাস্তায় জীবনে এই প্রথম পা রেখেছি। আসলে কলকাতায় এই আমার স্বচক্ষে আসা। এর আগেও একবার অবশ্য এসেছিলাম, মাস কয়েক আগে। সে তো সোজা হাসপাতালে, অন্ধ অবস্থায়। তারপর আই গ্র্যাফটিংয়ের পর কালো চশমা পরে সোজা দমদম এয়ারপোর্ট। সুতরাং চেনা লাগবার আদপেই কোনও রাস্তা নেই।

আমাকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে দোকানদার জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই আপনার, বলুন দেখাচ্ছি—'

আমি ঢোক গিলে বললাম, 'এখানে কাছেপিঠে একটা মিষ্টির দোকান ছিল না?'

'ছিল, কিন্তু এখন নেই।' লোকটা হাসল: 'আপনি বোধহয় অনেককাল এ-পাড়ায় আসেননি?'

'কেন বলুন তো?'

'এইটেই মিষ্টির দোকান ছিল। বছর দুই আগে—'

লোকটিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি পালিয়ে এসেছিলাম সেদিন। কিন্তু পর পর আরও গুটি তিনেক ঘটনা ঘটল সেইদিনই। সবই দৃষ্টিবিভ্রমের। কোনওটার সঙ্গে কোনওটার মিল নেই। উলটো-পালটা, রহস্যময়। সেসব ডিটেলস বলে আপনাকে বোর করব না। তবে কথাটা এই, রীতিমত ভড়কে গেলাম। কেমন যেন মনে হল, চোখ খারাপ হয়েছে, তাই এরকম ইলিউশন দেখছি। বোধ হয় চশমাই নিতে হবে।

একজন নামকরা আই স্পেশালিস্টের কাছে গেলাম। তিনি নানাভাবে পরীক্ষা করে বললেন, 'আপনার চোখের স্বাস্থ্য বোধ হয় আমার থেকেও ভালো। আপনি বরং "অমুক" ডাক্তারের সঙ্গে আজই দেখা করুন।'

ওঁর চিঠি নিয়ে সেখানে গেলাম। তিনি সাইকিয়াট্রিস্ট। সাদা বাংলায় পাগলের ডাক্তার। আমাকে নানাভাবে বাজিয়ে দেখলেন। তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'দূর মশাই, আপনার চোদ্দ পুরুষে কেউ পাগল নয়। সাধের পাগল না সেজে সোজা বাড়ি যান। একটা ঘুমের বড়ি দিচ্ছি। সেটি গিলে একখানা উনিশ রিলের ঘুম লাগান। দেখবেন ফ্রেশ হয়ে গেছেন।'

ঘুমের বড়ি আর হালকা মন নিয়ে বাসায় ফিরেছিলাম। কিন্তু মনে হল, আর কেউ যেন

শুয়ে আছে আমার পিছনে। তার গায়ে অসম্ভব তাপ, যেন পুড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় নিঃশব্দে ছটফট করছে লোকটা। থেকে থেকে তার ছোঁয়া লাগছে আমার গায়ে। সে ছোঁয়া কীরকম জানেন ? বোবায় ধরলে, কিংবা হঠাৎ ভূতের ভয় পেলে যেরকম গা-টা ভারি হয়ে যায় সেইরকম।

পরদিন ধুম জ্বর নিয়ে জ্ঞান ফিরল। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। এক সহকর্মীর বাড়িতে দিন দুয়েক কাটিয়ে তারই চেষ্টায় উঠে এলাম এই মেসে। এখানে অন্তত একা থাকতে হবে না। সিঙ্গল সিটের রুম দিতে চেয়েছিলেন ম্যানেজার, নিইনি। আমার ঘরে আর একজন ভদ্রলোক আছেন।

দীপক ব্যানার্জির গল্পটা এইখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু হল না। ভূপতি আর আমি কী করে যেন ওর গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। নলিনাক্ষ অবশ্য সব শুনে বলেছিল, 'এটা বিজ্ঞানের যুগ। অলৌকিক গাঁজাখুরি গল্পের পিছনে তোরা যদি দৌড়তে চাস দৌড়ো, আমি ওসবের মধ্যে নেই। লোকটার হয় মাথার গোলমাল, নয়তো মিথ্যে বলছে।'

'মিথ্যে বলে লাভ ?'

'এক-একজন লোক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ওরকম মিথ্যে বলে। তাছাড়া অন্য ধান্দাও থাকতে পারে।'

'কী ধান্দা ?'

'কী করে জানব !' নলিনাক্ষ পাশ কাটিয়ে গেল।

আমার অবশ্য ওরকম মনে হয়নি। দীপকের সঙ্গে কথা বলে যেটুকু বুঝেছি তাতে ওর মাথার গোলমাল থাকতে পারে কিন্তু মিছে কথা বলছে না। আর অন্য কোনও মতলব নিশ্চয়ই নেই। ভূপতি তো ওর কেসটা লুফেই নিল। তার থিওরির এমন কংক্রিট উদাহরণ একেবারে হাতের গোড়ায় এসে যাবে, এ যেন ভাবাই যায় না। সবচেয়ে সুবিধের কথা এই, আমাদের তিনজনের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে কোনও লুকোচাপা নেই। দীপক জানে আমরা তার শুভার্থী, তার এই বিপদের দিনে আমরা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো।

ভূপতির অনুমান, এই নতুন চোখজোড়া থেকেই দীপকের এই বিপত্তি শুরু হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন তবু থেকেই যায়। দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার পরেও কয়েক মাস দীপক পাটনায় ছিল। তাহলে এই নতুন চোখের প্রতিক্রিয়া তখন ঘটেনি কেন ? সত্যি বলতে কি, কলকাতায় আসার আগে ডবল ভিশন দেখার মতো কোনও ঘটনাই তার জীবনে ঘটেনি। কেন ঘটেনি ? কলকাতায় এসেই বা কেন ঘটল। এখানে এসে যে-বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল সেই বাড়ি থেকেই কি তার ওপরে অলৌকিক কোনও শক্তি ভর করল ? যে শক্তি তাকে অতীতকে দেখার শক্তি জোগায় কোনও কোনও মুহূর্তে ? একই রাস্তায় একই সঙ্গে অতীত এবং বর্তমানকে পাশাপাশি দেখতে পাওয়া অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধ-পুরুষরা অতীত বর্তমানের পাশে ভবিষ্যৎকেও দেখতে পান। ফিল্মের ডবল এক্সপোজারের মতো শোনা যায় ট্রিপল এক্সপোজার। তিনটে ছবিই পরস্পরের মধ্যে গায়ে গায়ে সাঁটা। তবু ওসব পৌরাণিক গালগল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া গেলেও দীপকের ব্যাপারটা কী ? ভৌতিক কাহিনী ? তাহলে তো প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করতে হয় !

ভূপতি কোনও গল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার মানুষ নয়। বিজ্ঞানের মাপকাঠিতেই সে সব কিছু মাপতে চায়। তাই তার খুঁটিনাটি প্রশ্নের শেষ নেই। দীপককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা কথা

জিজ্ঞেস করে আর নোট নেয়। কোন হাসপাতালে কবে তার অপারেশন হয়েছিল, কে অপারেশন করেছিলেন। তার পাটনার ঠিকানা, কলকাতায় সেই ভাড়া-বাসার ঠিকানা। অসুস্থ অবস্থায় যে-সহকর্মীর বাড়িতে ছিল তার ঠিকানা। যে-চোখের ডাক্তার, যে-সাইকিয়াট্রিস্ট তাকে দেখেছিলেন তাঁদের সকলের নামধাম বিবরণ যেভাবে সে নোট করে নিল তাতে বুঝলাম ভূপতির সামনে এখন হাতেকলমে অনেক কাজ। মুখে কিছু না বলুক, তার অনুসন্ধানী অভিযান শুরু হয়ে গেছে।

দীপকের গল্প আমি অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু সত্যি বলতে কি তার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে পুরো একটা সপ্তাহ কেটে গেছে অথচ ওরকম ঘটনা আর একদিনও ঘটেনি। ভূপতির কথামতো দীপক দিন দশেকের ছুটি নিয়েছে, কাজে বেরোচ্ছে না। এই ক'দিন আমি আর ভূপতি পালা করে ওর সঙ্গে সেঁটে রয়েছি। একসঙ্গে খাই, ঘুমোই, বেড়িয়ে বেড়াই। বসে বসে গল্প করি। কিন্তু কোনও বিস্ময়কর ঘটনা পলকের জন্যেও ঘটেনি। নলিনাক্ষ প্রায় প্রতিদিনই আসে। দীপকের অলক্ষ্যে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হেসে চলে যায়। আমরা কিছুই বলি না, বলার কী-ই বা আছে। হাতেনাতে প্রমাণ দেখাতে না পারলে অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করানো যায় না। উলটে বিশ্বাসী মানুষের মনও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসে। আমার মনের অবস্থা এখন খানিকটা সেইরকমই। কিন্তু দীপকের চোখজোড়া যে দীপকের মুখের সঙ্গে মেলেনি, তার স্বভাবের সঙ্গে বেমানান হয়ে আছে—সেটা টের পাই। সেটা হতেই পারে। কারণ ওই চোখ ওর নিজের নয়, আর একজনের। বাইরে থেকে চেষ্টা করে জোড়া লাগানো। তাই এরকম মনে হতেই পারে। রাতের বেলায় এক-আধ মুহূর্তের জন্যে ওর চোখের মধ্যে সবুজ আলোর ঝিলিক ভূপতিও দেখেছে। ওর চোখের ক্লোজআপ ছবিও ভূপতি তুলেছে কয়েকখানা।

কিন্তু এতে কী প্রমাণ হয়? কিছুই না। অবিশ্যি সুস্থ মনে হলেও দীপক এক এক সময় কেমন উলটো-পালটা ব্যবহার করে। যেমন, দারুণ হাসাহাসি গল্পগুজব চলছে, হঠাৎ দীপক গম্ভীর হয়ে গেল। মিনিট দশেক গুম হয়ে বসে থাকল, একটিও কথা বলল না। কিংবা দিব্যি বেড়াচ্ছি, আচমকা কী হল, কোনও কথা না বলে ও হঠাৎ পিছন ফিরে হনহনিয়ে হাঁটা দিল। পরে এ নিয়ে কথা হলে ও অবাক হয়। ও বিশ্বাস করতেই চায় না তেমন কিছু করেছে বলে। নলিনাক্ষ শুনে বলে, 'এসব শো বিজনেস, বুঝলে!'

আজকেও দু'জনে বেড়াচ্ছিলাম। রোজ দু-চার মাইল আমরা এভাবে হাঁটি। ভূপতি আজ দিন তিনেক কলকাতায় নেই। বোধহয় পাটনায় গেছে। আজকাল ও যে কী করে, কী ভাবে, কিছুই ভেঙে বলে না। আমার ওপর শুধু একটা নির্দেশ রেখে গেছে: দীপককে যেন সব সময় চোখে চোখে রাখি। রাখছিও। আজকেও গল্প করতে করতে ফিরছিলাম। হঠাৎই একটা কাণ্ড হল।

ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা অ্যামবাসাডার সবে চলতে শুরু করেছে, এমন সময় দীপক গাড়ির মধ্যে কাউকে দেখতে পেয়েই পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল। আমি ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে ফেলে বিদ্যুৎগতিতে সে গাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। গাড়িটাও থামল না, টপ স্পিডে বেরিয়ে গেল। আমি বোকার মতো দীপকের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে কিছুদূর পর্যন্ত দৌড়লাম। শেষে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম রাস্তার মাঝখানে। ধারেকাছে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলেও গাড়িটার পিছু ধাওয়া করতে পারতাম হয়তো, কিন্তু দরকারের সময়ে এই শহরে হাতের কাছে কিছুই পাওয়া যায় না। বহুক্ষণ দীপকের জন্যে অপেক্ষা করেও দীপক ফিরল

না। পরদিন সকালেও দীপকের কোনও সন্ধান নেই। তখন আমার দুশ্চিন্তা হতে লাগল। মনে হল, কাল রাতেই থানায় ডায়েরি করা উচিত ছিল।

থানায় যাওয়ার জন্যে জামাকাপড় পরছি এমন সময় সেই ভোর সকালে ভূপতি এসে হাজির। মুখেচোখে ক্লান্তি। চুল উস্কোখুস্কো। কিন্তু ঠোঁটে একটা সাফল্যের হাসি। এ সময় ও কখনও আসে না। তাই ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রে, কী ব্যাপার? কোথায় ডুব মেরেছিলি এই ক'দিন।'

ভূপতি উত্তেজিত গলায় বলল, 'সে অনেক কথা, পরে বলব। তবে আসল রহস্যের বোধহয় যবনিকা তুলতে পেরেছি। প্রথম থেকেই আমি এরকমটাই সন্দেহ করেছিলাম।'

আমি নিজের কথা, দীপকের কথা সেই মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়ে সংক্ষেপে ভূপতির অনুসন্ধানের যে-কাহিনী শুনলাম সে সত্যি রোমাঞ্চকর। আমাদের কাগজের বছরখানেক আগের হেডলাইনগুলো আমার চোখে যেন ভেসে উঠল। কারণ সেগুলো আমিই লিখেছিলাম।

অনেকগুলো ডাকাতির মামলার ফেরারী আসামী ভাস্কর নস্কর ওরফে ফান্টাবাবুর হত্যার ব্যাপার নিয়ে তখন কলকাতায় ক'দিন খুব হইচই হয়েছিল। এই লোকটির শরীরে দুটি রিভলভারের বুলেট পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেজন্যে নয়। একদল লোকের ধারণা হয়েছিল বেওয়ারিশ এই লোকটিকে আসামী সাজিয়ে পুলিশ অন্য কোনও বড় ব্যাপার ধামাচাপা দিতে চাইছে। পুলিশ অবশ্য ফান্টাবাবুর খুনীকে ধরতে পারেনি, শুধু খুনীর ফেলে যাওয়া রিভলভার আর কয়েক ফোঁটা রক্ত আবিষ্কার করেছিল। খুনীর ব্লাড গ্রুপ আর আঙুলের ছাপ ছাড়া তাদের রেকর্ডে আর কিছু নথিভুক্ত হয়নি। এদিকে মুমূর্ষু লোকটি যে-দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছিল তা অভাবনীয়। মৃত্যুকালে সে তার দুটি চোখই আই ব্যাঙ্ককে দান করে গিয়েছিল। তার এই শেষ ইচ্ছের কারণ হিসেবে বলেছিল, সে এখন মরতে চায় না। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চায়। প্রায় কবির মতোই কথা: 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' যাই হোক, ভাস্করবাবু ওরফে ফান্টাবাবু সত্যিই ডাকাত ছিল কিনা তা জানা না গেলেও সে যে অমানুষিক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিল সে বিষয়ে ডাক্তাররা দ্বিমত হননি। ছ'-ছ'টি বুলেট হজম করে, ফুসফুসে হৃদপিণ্ডে সরাসরি জখম হয়েও কোনও মানুষ যে ঘণ্টাখানেক মৃত্যুর সঙ্গে সজ্ঞানে যুঝতে পারে এবং তার চোখ দুটো তুলে নেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে পারে, তাদের কেতাবি বিদ্যায় এর ব্যাখ্যা নেই।

কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় খবর ফান্টাবাবুর এই চোখ দুটিই শেষ পর্যন্ত দীপকের কপালে জুটেছিল।

ভূপতির মুখে দীপকের নাম শোনামাত্র আমি সংবিৎ ফিরে পেলাম। ভূপতিকে ওর নিরুদ্দেশের খবর বললাম।

ভূপতি চমকে উঠে বলল, 'সে কি? থানায় ডায়েরি করেছিস? অ্যাঁ, তাও করিসনি, যাঃ ইডিয়েট! গাড়িটার রঙ আর নম্বরও নিশ্চয়ই এতক্ষণে গুলে মেরে দিয়েছিস? না!'

কালো রঙ আর আমার একটি প্রিয় সংখ্যা পরপর চারবার ব্যবহার হওয়ায় গাড়িটার নাম্বার প্লেট মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছিল। অতএব ছুটলাম লোকাল থানায়। সেখান থেকে লালবাজারে। তারপর দক্ষিণ কলকাতার এক হাসপাতালে। কাল রাতে যে-অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির আহত ও সংজ্ঞাহীন দেহ পুলিশ রাস্তা থেকে হাসপাতালে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিল তাকে দীপক ব্যানার্জি বলে শনাক্ত করে আমরা ফের ছুটলাম ভূপতির এক্স-পেশেন্ট এবং

প্রায়-বন্ধুস্থানীয় ব্যারিস্টার ডি আর মিত্রর কাছে। আইন-আদালতের খবরে যাঁদের বিন্দুমাত্র কৌতূহলও আছে তাঁরাই মিত্রসাহেবকে নামে এবং কাহিনীতে চিনবেন। অপরাধীদের কাছে এই ক্ষুরবুদ্ধি আইনজীবী মানুষটি ডিয়ার তো নন-ই, মিত্রও নন। লোকে রসিকতা করে বলে, ইংরেজি ডেঞ্জার শব্দের আদি এবং অন্তের অক্ষর দুটি নিয়ে ধ্রুবরঞ্জনের ডি আর।

রূপকথার গল্পের মতোই দীপকের গল্পও এইখানে শেষ। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সে মেসে ফিরে এসেছিল। তবে রাজসাক্ষী হয়ে তাকে যথাসময়ে কোর্টে হাজির হতে হয়েছিল। কারণ আমার দেওয়া গাড়ির নম্বর, আর তার দেওয়া মোটর আরোহীর বিবরণের সঙ্গে পুলিশ বছরখানেক আগে তুলে রাখা আঙুলের ছাপ আর রক্ত মিলিয়ে ফাণ্টাবাবুর হত্যাকারীকে হাতকড়া পরিয়েছিল।

পরে ভূপতির কাছে রহস্যের মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। ওর এ ক'দিনের তত্ত্বতল্লাশের বিশদ বিবরণ দেওয়ার পরে ও বলল, 'এ পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে মস্তিষ্কের রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা আর এন এ অণুর মধ্যেই জমা থাকে আমাদের স্মৃতি। হতে পারে, নতুন চোখ বসানোর সময়ে অপটিক নার্ভের সঙ্গে সঙ্গে কোনওভাবে কিছু আর এন এ অণুও চলে গিয়েছিল দীপকের মাথায়। ফলে ফাণ্টাবাবুর ভিস্যুয়াল স্মৃতির কিছু টুকরো মিশে গিয়েছিল দীপকের নিজের স্মৃতির সঙ্গে। তারপরেই ব্যাপারটা অনেকটা অলৌকিক চেহারা নিয়েছে। হত্যাকারী ধরা পড়ার পরে এখনও সেই স্মৃতি হয়তো ওকে মাঝে মাঝে যন্ত্রণা দেবে। কিন্তু এর হাত থেকে বাঁচার কোনও পথ নেই। এক যদি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্মৃতিগুলো ভোঁতা হয়ে আসে তবেই।'

বুঝলাম, ভূপতির বিজ্ঞানী মন হয়তো দীপকের সব ঘটনারই একটা না একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে। ওর থিওরি কতটা বিশ্বাসযোগ্য জানি না, কিন্তু আমার মনে হল, থিওরিটা যেন কোনও কোনও জায়গায় আচমকা ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে।

□ ১৯৮৪





রোনা

অদ্রীশ বর্ধন

রোনার কথা মনে পড়লেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে। অথচ সে এই পৃথিবীর কেউ নয়। দেখতেও আহামরি নয়। ওরকম বদখত চেহারা জন্মেও কারও দেখিনি। তবুও তাকে ভুলতে পারি না। কোনওদিন পারব না।

রোনা সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিল জেলের নৌকোয়। আমি বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম পুরীতে। বর্ষাকাল, মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে সব সময় মেঘ জমে রয়েছে। দূরে দূরে অগুনতি জেলে নৌকো ভাসছে।

ভোরের দিকে বাবা আমাকে নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হাওয়া খেতেন। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ত, বড় ভালো লাগত। জেলে নৌকো তীরে এসে ভিড়ত, নৌকো ভর্তি মাছ সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যেত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। কী ভালো যে লাগত বলে বোঝাতে পারব না।

রোনাকে দেখেছিলাম তখনই। একটা নৌকোয় বাইরের দিকে আটকে ছিল। ঠিক যেন একটা থ্যাবড়া পেপারওয়েট। কাগজ-চাপা। থলথলে জেলির মতো। আমিই প্রথমে দেখেছিলাম। একটা ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে নৌকোর গা চেঁছে জিনিসটাকে বালির ওপর ফেলে দিয়েছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে তড়বড় করে নড়ে উঠেছিল থলথলে পেপার-ওয়েটটা। গায়ে অনেক ফুটো। জেলির গায়ে এরকম ফুটো কখনও দেখিনি। কাঁপতে কাঁপতে জিনিসটা সরসর করে এগিয়ে এসেছিল আমার দিকে।

আমি ভয়ের চোটে পিছিয়ে এসেছিলাম কয়েক পা। তখন বৃষ্টি পড়ছে, ভিজে গিয়েছিলাম। বাবা বকে উঠেছিলেন।

আমি বলেছিলাম, 'ওটা কী, বাবা ? মাছ ?'

বাবা আমার মাথায় ফের ছাতা ধরে জিনিসটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। দু'চোখে ঘেন্না ফুটে উঠল। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'কে জানে! সমুদ্রে অমন কত জিনিস থাকে।'

'মাছ নয় ?'

'মনে তো হচ্ছে না।'

'তবে ?'

বাবা জবাব দেওয়ার আগেই কাণ্ডটা ঘটল। হঠাৎ একটা শুঁড়ের মতো কী যেন ঠেলে বেরিয়ে এল থলথলে চ্যাপটা জিনিসটার মাথা দিয়ে। হাতির শুঁড় যেরকম হয়, অনেকটা সেইরকম। তবে আকারে এক ইঞ্চিও নয়। ডগায় হাঁ-এর মতো ফুটো।

শুঁড়টা আমার দিকে ঘুরে গেল। আর ওই বৃষ্টির মধ্যেই স্পষ্ট একটা পিনপিন আওয়াজ শুনলাম। ধুমধাম করে বড় বড় ঢেউ সমানে আছড়ে পড়ছে। ঝমঝম করে একটানা বৃষ্টি পড়ছে। এত আওয়াজের মধ্যেও পরিষ্কার শুনলাম অর্গান বাজাবার মতো একটা আওয়াজ ওই শুঁড়টার মধ্যে থেকেই ঠিকরে আসছে আমার দিকে।

আওয়াজটা বাবাও শুনেছিলেন। বড় বড় চোখে চেয়ে ছিলেন।

থলথলে জিনিসটা এতক্ষণ বালির ওপর লেপটে বসে ছিল। এবার বালি থেকে ইঞ্চিখানেক ঠেলে উঠে পড়ল। যেন শূন্যে দুলছে। কিসের ওপর দুলছে দেখবার জন্যে উবু হয়ে বসে পড়লাম। দু'হাত বালিতে রেখে মাথা নামিয়ে দেখলাম।

দেখলাম, ওপর দিয়ে যেরকম একটা শুঁড় বেরিয়ে এসেছে, অবিকল সেইরকম একটা শুঁড় নিচ দিয়েও নেমে এসেছে। এটা অনেকটা পায়ের মতো। ডগাটা হাঁসের পায়ের মতো পাতা-কাটা থ্যাবড়া। ঠিক যেন একটা একঠেঙে জীব। পায়ে ভর দিয়ে তিড়িক তিড়িক করে লাফাতে লাফাতে আরও কাছে এগিয়ে এল বদখত জীবটা।

আশ্চর্য! এবার কিন্তু একটুও ভয় করল না আমার। এতক্ষণ সাদাটে জেলির মতো মনে হচ্ছিল, এখন দেখলাম রঙ পালটে রামধনু-রঙ হয়ে গেল। পা-টা বেগুনি, মাথার শুঁড়টা সোনালী। আর সেই তীব্র অর্গান বাজনা এলোমেলো গানের মতো বাজতে লাগল মাথার মধ্যে।

তারপরেই বেশ মনে হল কে যেন আমার মাথার মধ্যে বসে কান খাড়া করে শুনছে। কী শুনছে তা বলতে পারব না। আমি ছেলেমানুষ, ঠিক বোঝাতেও পারব না। কিন্তু স্পষ্ট মনে হল আমার মাথার মধ্যে কে যেন ঢুকে পড়েছে। আমি যা ভাবছি তা শুনছে। জানি, কথাটার কোনও মানে নেই। বাবাকে পরে যখন বলেছিলাম, উনিও মাথায় চাঁটি মেরে বলেছিলেন, 'যা ভাগ! ঠাট্টা করবার আর জায়গা পাসনি!'

কে যেন শুনছে মাথার মধ্যে—এই অনুভূতিটা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকেনি। উবু হয়ে বসে ঘাড় কাত করে রয়েছি দেখে বাবা আমার হাত ধরে টান দিলেন : 'উঠে দাঁড়া।'

উনি বোধহয় ভেবেছিলেন বিচ্ছিরি জিনিসটা আমার মুখে লাফিয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু আমার সেরকম মোটেই মনে হচ্ছিল না। পিনপিনে বেসুরো বাজনাটা বোধহয় আচমকা কথা হয়ে ফুটে গেছে। নইলে কে অমন করে বলল, 'সুপ্রভাত! আমার নাম রোনা।'

আমি তো থ। কে বলল? বাবার গলা তো এমন খোনা নয়! জেলেরাও খালি নৌকো ফেলে দূরে সরে গেছে। তবে কে অমন করে বলল, সুপ্রভাত। আমার নাম রোনা!

ঘাড় বেঁকিয়ে ওপরে তাকিয়ে দেখি, বাবার চোখে ভয় আর বিস্ময় পাশাপাশি ফুটে উঠেছে। ধুপ করে বসে পড়লেন আমার পাশে।

'কে····কে কথা বলল?' উত্তেজনায় গলা ভেঙে গেছে বাবার। অথচ আমার বেশ মজাই লাগছিল।

একটামাত্র ঠ্যাঙে ভর দিয়ে একপাক ঘুরে গেল বিটকেল জীবটা। রামধনু-রঙ ঝিলমিলিয়ে উঠল সারা গায়ে। বহুরূপী গিরগিটিও এমনটি পারবে কিনা সন্দেহ।

বললে সরু তীব্র গলায় মাথার শুঁড় নেড়ে, 'আমি।'

বাবা বোকার মতো জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'তুমি বাংলা জানলে কী করে ?'

'এখুনি শিখলাম। তোমার ছেলের মাথার ভেতর থেকে।'

'অ্যাঁ !'

'যে-কোনও ভাষাই আমরা শিখতে পারি।'

'আমরা মানে ? তুমি তো একা দেখছি।'

'আরও আছে,' সমুদ্রের দিকে কথা বলার শুঁড় নেড়ে বলল, 'এখানে আমাদের মেশিন আছে।'

কথাগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে। যে-কোনও বাঙালির চাইতে ভালো বাংলা বেরোচ্ছে।

'কীসের মেশিন ?'

'এক গ্রহ থেকে আর-একটা গ্রহে যাওয়ার মেশিন।'

'সে কি ! তোমরা তাহলে পৃথিবীর মানুষ—ইয়ে···জীবন্ত ?'

'মোটেই না। আমরা বেড়াতে ভালোবাসি। শিখতে ভালোবাসি। এক গ্রহ থেকে আর-এক গ্রহে, এক ছায়াপথ থেকে আর-এক ছায়াপথে কেবল বেড়াই। যা দেখি তাই শিখে নিই।'

'সমুদ্রে কী করছিলে ?'

'ভুল করে সমুদ্রে নেমে পড়েছিলাম। ওপর থেকে দেখলাম পৃথিবীটায় তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। তাই ভাবলাম যা কিছু শেখবার নিশ্চয়ই জলের মধ্যে আছে। হন্যে হয়ে অনেকদিন ঘোরার পর ফিরেই যাচ্ছিলাম মেশিনে। এমন সময়ে দেখলাম নৌকো নিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে। পৃথিবীর বুদ্ধিমান জীব বলতে তাহলে তোমরাই ?'

'আজ্ঞে।'

'কিন্তু তোমাদের দুটো হাত আর দুটো পা কেন ?'

'তোমার মোটে একটা পা কেন ? চোখ নেই কেন ? কান কোথায় ? নাকেরও তো চিহ্ন দেখছি না।' বাবা তেড়ে উঠলেন।

হেসে উঠল অন্য গ্রহের জীবটা। থলথলে চ্যাপটা গায়ে মুখ নেই, তাই হাসির চেহারা দেখলাম না। শুধু আওয়াজ শুনলাম।

বললে, 'দরকার হয় না। মাত্র দুটো চোখ, একটা নাক আর দুটো কান নিয়ে আমরা করব কী ?'

'তার মানে ?'

'তার মানে ওই ব্রেন দিয়ে বুঝতে একটু সময় লাগবে। আমরা অনেক গ্রহের অনেক জ্ঞান এইটুকু মগজের মধ্যে ঠেসে রাখতে পারি। কিন্তু তোমাদের খুলির মধ্যে মগজটাই কেবল বড়, শক্তি একদম নেই।'

'বাজে বোকো না।' বাবা রেগে গেছেন। রাগবেনই তো। তিনি ডাক্তার মানুষ, বিলেত ফেরত।

এবার একটা অমায়িক হাসি শোনা গেল : 'রাগ করছ কেন ? এসো ভাব করো। আমার নাম রোনা আগেই বলেছি। তোমরা নাম বলনি, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি—তুমি ডাক্তার তনু দত্ত, আর এই তোমার ছেলে তমাল দত্ত। দেখলে আমাদের ব্রেনের ক্ষমতা !'

বাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একেবারেই বসে পড়লেন বালির ওপর।

রোনাকে নিয়ে কীভাবে কলকাতা এলাম, সে-কাহিনী অনেক লম্বা, এখানে বলতে চাই না।

আমাদের বাড়ি কলকাতার পুব অঞ্চলে। কলকাতা যেখানে শেষ, চব্বিশ পরগনার মাঠ আরম্ভ হয়েছে সেইখানে। একতলা বাড়ি। সামনে উঠোন, চৌবাচ্চা, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সাদা চুনকাম করা মোট চারখানা ঘর। একটাতে বাবার ডাক্তারখানা, আর-একটি বসবার ঘর, পিছন দিকের একটি আমার। বাকি ঘরটা বাবার আর আমার সৎ-মা'র।

আমার মা মারা গিয়েছেন আমার জ্ঞান হওয়ার আগেই। বাবার কাছে শুনেছি তখন কথা পর্যন্ত বলতে শিখিনি। দাঁতও ওঠেনি, সবে হাঁটতে শিখেছিলাম। বাবা অকূল পাথারে পড়লেন আমাকে নিয়ে। আমি না জন্মালে নাকি আর বিয়েই করতেন না। করতে হল কেবল আমার জন্যে।

একটু জ্ঞান হলে চিনলাম আমার সৎ-মাকে। বাইরে প্রকাশ না করলেও সৎ-মা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এ-সংসারে আমি একটা কাঁটা। আস্তে আস্তে যখন তা বুঝলাম, সৎ-মাকে এড়িয়ে চলতাম। মুখে কিন্তু প্রকাশ করতাম না।

বাবা বলতেন, 'তুই বড্ড চালাক হয়েছিস, না ?' ছুটিছাটা পেলেই তাই বাবা আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, সৎ-মা আসত না। আমি যেখানে, সেখানে সে নেই। শুধু বলত, 'সবাই গেলে সংসার দেখবে কে ?'

বাবা সব বুঝতেন, কিছু বলতেন না। আমাকে মানুষ করার জন্যেই এই উপদ্রব তিনি সংসারে ডেকে এনেছেন। আমি মানুষ না হওয়া ইস্তক তাই মুখ খুলবেন না। তবে ত্রিভুবনের সবাইকে কিন্তু সার সত্যটি বুঝিয়ে দিতেন : দুনিয়ায় আমাকে ছাড়া কাউকে তিনি ভালোবাসেন না।

সেই কারণেই আরও চক্ষুশূল হয়েছিলাম সৎ-মা'র। আমি যা কিছু ভালোবাসতাম, সবই তার চোখে খারাপ লাগত।

রোনাকেও প্রথম থেকে সৎ-মা বিষদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন।

অথচ রোনা ঘর ছেড়ে বড় একটা বেরোত না। আমার ঘরে ওর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম জালের আলমারির মধ্যে। যাতে আরশোলা, মাকড়সা, টিকটিকির উৎপাতে বিব্রত হতে না হয়। সকালে স্কুলের বাস এলে যাওয়ার সময়ে ঘরে তালা লাগিয়ে যেতাম। বিকেলে ফিরে আড্ডা দিতাম ওর সঙ্গে। কত কথাই বলত রোনা। রুগীরা বিদেয় হলে বাবা ডাকতেন। রোনাকে হাতের তেলোয় বসিয়ে যেতাম ডাক্তারখানায়। এক পায়ে দাঁড়িয়ে দুলত রোনা। আর সেই অদ্ভুত শুঁড় বাড়িয়ে ওষুধভর্তি আলমারি নয়তো তাকভর্তি ডাক্তারি বই দেখিয়ে প্রশ্ন করত এন্তার। মাঝে মাঝে অ্যানাটমি ফিজিওলজির বই এনে সামনে খুলে ধরতে হত বাবাকে। শুঁড় বুলিয়ে নিয়ে মোটাসোটা বইয়ের দুরূহ তত্ত্বগুলো কীভাবে যে চোখের নিমেষে শিখে নিত ভেবে পেতাম না।

রোনাই বলত, ডাক্তারি বিদ্যেটা ওর খুব ভালো লাগে। সব জ্ঞানের চেয়ে এই জ্ঞানটা ওর কাছে বেশি পছন্দের। বাবা হাসতেন। বলতেন, 'শিখে তুমি করবে কী ?'

রোনাও হাসত, বলত, 'ব্রহ্মাণ্ড পর্যটনে বেরিয়ে কত বিদ্যেই তো শিখলাম। কাজে লাগেনি এখনও। তবুও শিখে যাই—একদিন দরকার হবেই।'

'তোমরা সবাই কি জ্ঞান-পাগল ?' শুধোতেন বাবা।

'আমার চাইতেও—' বলত রোনা।

'কিন্তু তোমার চোখ, কান, নাক, মুখ কিছুই তো নেই !'

'চোখ, কান, নাক ? ওগুলো তো জ্ঞান সঞ্চয়নের বাধা, তাই নেই।'

বাবা বাঁকা সুরে বলতেন,'আঙুর ফল টক।'

'মোটেই নয়,' রামধনু রঙে রঙিন হয়ে উঠে তক্ষুনি জবাব দিত রোনা, 'চোখ দিয়ে তোমরা অনেক জিনিসই তো দেখতে পাও না। কান দিয়ে কি সব শুনতে পাও ? না নাক দিয়ে টের পাও ? কিন্তু চোখ-কান-নাকে যা ধরা পড়ে না, আমরা কিন্তু তা টের পাই।'

'কী করে ?'

'সে তুমি বুঝবে না। তোমাদের শারীরবিদ্যার যা দৌড়, ধরতেও পারবে না। যেমন ধরো, তোমরা রোগ সারাতে না পারলে অপারেশন করো। বীভৎস ব্যাপার ! বোঝো না, ছুরি চালানো মানেই আয়ুটাকেও কেটে কমিয়ে দেওয়া।'

বাবা এফ আর সি এস। বিলেত ফেরত শল্যচিকিৎসক। এক ফোঁটা রোনার চ্যাটাং চ্যাটাং কথায় চটে গিয়ে বলতেন, 'তবে কি বিষিয়ে যাওয়া অ্যাপেন্ডিসাইটিস রেখে দিয়ে রুগীকে মেরে ফেলব ?'

'তা কেন ! অন্যভাবেও তো অ্যাপেন্ডিসাইটিস সারানো যায়। যে-জায়গাটা নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে নতুন করে বাঁচিয়ে তুললেই তো রোগ সেরে যায়। ছুরি চালানোর দরকার কী ?'

'কীভাবে সেটা বললেই তো হয় !'

'বলে বোঝাতে পারব না। সুযোগ দাও, হাতেকলমে কাজ দেখিয়ে দেব।'

কিন্তু বাবার কাণ্ডজ্ঞান আছে। অন্য গ্রহের আগন্তুক একরত্তি একটা জীবের হাতে সার্জারি ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই রোনাকে পাত্তা দেননি।

কিন্তু একদিন দিতে হল। একরত্তি ওই জীবটার অসীম ক্ষমতা সেদিন স্বচক্ষে দেখলাম আমরা সবাই। কিন্তু সেই দেখাই হল আমাদের শেষ দেখা।

আমার সৎ-মা বেশ কিছুদিন ধরে পেটের ব্যথায় ভুগছিলেন। পেটের বাঁদিকে কী যেন শক্ত আঁটির মতো ফুলে থাকত। বাবা বললেন কোলাইটিস। মনে মনে চাপা উদ্বেগ তাই। জীবনটাকে সহজভাবে নিতে শিখল না। কষ্ট তো পাবেই। অন্য ডাক্তাররাও রোগটা মানসিক বলে উড়িয়ে দিলে। তারপরেই হল ন্যাবা। হাত-পা-চোখ হলদে হয়ে গেল। সে রোগ সারল তো এল অ্যানিমিয়া, রক্তশূন্যতা। সেই সঙ্গে ক্ষুধাহীনতা। দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল সৎ-মা। সেইসঙ্গে রোজ একশো দুই-আড়াই জ্বর। ওষুধপত্র বৃথা গেল। কেউ বললে ভূতে পেয়েছে, কেউ বললে তুক করা হয়েছে।

ন'মাস একটানা ভুগবার পর একেবারে শয্যা আশ্রয় করল সৎ-মা। রোজ এক চামচ ভাত পর্যন্ত খেতে পারত না। সারা পেটে ছুঁচ ফোটার মতো নাকি বেদনা।

বাবা উদ্বিগ্ন হলেন। আগেও বলেছিলেন এখনও বললেন, 'হাসপাতালে চলো। ভালো চিকিৎসা সেখানেই সম্ভব।'

মা মুখিয়ে উঠে বলত, 'কেন ? একেবারে বিদেয় দেওয়ার মতলব আঁটছ বুঝি ?'

বাবা চুপ করে গেলেন। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলল না। একদিন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মা অজ্ঞান হয়ে গেল।

পেটে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে বাবা বললেন, 'উপায় নেই, হাসপাতালেই যেতে হবে। কিরে তুই যাবি, না বাড়ি থাকবি ?'

আমি বললাম, যাব। যাওয়ারসময় রোনা বেঁকে বসল। সেও যাবে। অজ্ঞান অবস্থায় মাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। শুরু হল অপারেশন। বাবা নিজে

ছুরি চালাননি। সতীর্থ ডাক্তারকে দিয়ে পেট কাটালেন। তখুনি জানা গেল সৎ-মা'র ক্যানসার হয়েছে।

বাবা ফ্যাকাসে মুখে অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলেন। পেট কাটা অবস্থাতেই রয়েছে। ডাক্তারকে আমার সামনেই ফোন করলেন। বায়োপ্সি না করা পর্যন্ত ক্যানসার বলা চলে না। কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে নিরীহ টিউমার নয়, ক্যানসারের টিউমার।

এরপর পাঁচটা দিন যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাটল। বায়োপ্সি রিপোর্ট এল, ক্যানসারই বটে। বৃহদন্ত্র টিউমারে একদম বন্ধ হয়ে গেছে। কাটলে দিন পনেরো বাঁচবে। না কাটলে আর কিছুদিন।

অপারেশন থিয়েটারের পাশে ডাক্তারদের ঘরে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন বাবা। চোখ-মুখে যেন কালি পড়ে গিয়েছে। বোবা মুখে পাশে দাঁড়িয়ে আমি। আমার কাঁধে একটা কাপড়ের ঝোলা, তার মধ্যে রোনা।

হঠাৎ পিনপিন গলায় রোনা বললে, 'ডাক্তার, ডাক্তার!'

বাবা চমকে উঠলেন: 'কী?'

'আমি চেষ্টা করব?'

'তুমি!' এত দুঃখেও বাবার মুখে ম্লান হাসি ফুটল।

'ছুরি চালালেও তো এবার রুগী বাঁচছে না। তোমার কথা আর খাটছে না। একটা সুযোগ দাও না!'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন বাবা। সমস্যাটা কঠিন নয়, সমাধানটাই কঠিন। সৎ-মা বাঁচবে না, কোনও মতেই বাঁচবে না। ছুরি চালালে দিন পনেরোর মধ্যে, না চালালে তার কিছুদিন পরে। তার চাইতে, তার চাইতে....

মনস্থির হয়ে গেল বাবার। বললেন, 'ঠিক আছে। ঝুঁকি না নিলে বিজ্ঞানের উন্নতি হয় না। এ-ঝুঁকিও আমি নিচ্ছি। বলো কী চাও?'

'কিছু না।'

'তার মানে?'

'রুগীর কাছে আমাকে যেতে দাও।'

'তারপর?'

'অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে রুগীকে অজ্ঞান করে দিও। আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। পেটের ব্যাণ্ডেজ খুলে দিও। তারপর দেখি এতদিনের শিক্ষা কাজে লাগে কিনা।'

'দেখো।'

অপারেশন থিয়েটারে ছেলেমানুষদের ঢোকা নিষেধ। কিন্তু বাবা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিরে, দেখবি?'

আমিও তাই চাইছিলাম। রোনার কীর্তি আমাকে দেখতেই হবে। বললাম, 'হ্যাঁ।' তাই দেখতে পেয়েছিলাম অবিশ্বাস্য সেই দৃশ্য।

দেখেছিলাম স্টিল খাটে শোয়া আপাদমস্তক সাদা চাদরে ঢাকা একটা দেহ: আমার সৎ-মা। বুকের কাছটা আস্তে আস্তে উঠছে আর নামছে। পেটের কাছে দুটো সাদা তোয়ালে। মাঝখান দিয়ে পেট দেখা যাচ্ছে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। খাটের ওপরে দুটো বিরাট অপারেটিং লাইট। ঘরের এককোণে অ্যানেস্থেটিক মেশিন। পায়ের কাছে ইনস্ট্রুমেন্ট টেবিল। আমি ছাড়া ঘরে দাঁড়িয়ে আরও পাঁচজন। অ্যানেস্থেটিস্ট, হেড সার্জন, সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট, দু'জন ইনস্ট্রুমেন্ট নার্স, দরকারমতো এদিক-ওদিক যাওয়ার জন্যে আর-একজন

নার্স। আমি দাঁড়িয়ে অ্যানেস্থেটিস্টের পাশে।

রোনা রয়েছে সাদা তোয়ালের ওপর রাখা প্লেটের ওপর। নার্স, অ্যানেস্থেটিস্ট এবং সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্টের চোখে ঘেন্না, তাচ্ছিল্য, বিস্ময়। হেড সার্জন আমার বাবা। তাঁর দু'চোখ স্থির। একবার শুধু আমার পানে চাইলেন। তারপর হেঁট হয়ে হাত দিলেন ব্যাণ্ডেজে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল কাটা পেটটা। রক্তমাখা বীভৎস অনেকগুলো ক্ষত। দূর থেকে এর বেশি দেখতে পেলাম না। কাছে যেতেও সাহস হল না। তাছাড়া আমার শরীর কীরকম করছিল।

তাই চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাকালাম রোনার দিকে।

দেখলাম রোনা কাঁপছে। ভয়ে কিনা বলতে পারব না, তবে ওর সারা গা থিরথির করে অবর্ণনীয়ভাবে কেঁপে চলেছে। রামধনু-রঙ ঘনঘন ঢেউয়ের আকারে সারা গায়ে বয়ে চলেছে। অজস্র ফুটোর মতো দাগগুলো যেন আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

তারপরেই দেখলাম, অজস্র শুঁয়ো বেরিয়ে আসছে ফুটোগুলো দিয়ে। যখন খুশি শরীর থেকে শুঁড় বার করে কথা বলতে ওকে দেখেছি, পা বার করে হাঁটতেও দেখেছি, কিন্তু অত শুঁয়ো বার করতে কখনও দেখিনি। চুলের মতো সরু অগুনতি রোঁয়া ফুটো থেকে সরসর করে বেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল দগদগে কাটাটার দিকে। আস্তে আস্তে শুঁয়োগুলোর ডগা ঢুকিয়ে দিল কাটার ভেতরে....আরও ভেতরে....আরও....আরও। শুঁয়ো যত লম্বা হচ্ছে, অদ্ভুতভাবে রোনার শরীরটাও ততই গুটিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে। যেন ওর গোটা শরীরটাই শুঁয়ো হয়ে গিয়ে ঢুকে যাচ্ছে কাটার মধ্যে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, শেষ যেন নেই। পেপারওয়েটের মতো আকারটা ছোট হতে হতে পেঁয়াজের মতো হয়ে গেল। তারপর একটা কাচের গুলির মতো এই এতটুকু। মনে হল, ওর গোটা শরীরটাই এবার সৎ-মায়ের ক্যানসারের মধ্যে ঢুকে না যায়।

কিন্তু না, এই অবস্থায় এসে বন্ধ হয়ে গেল রোনার রোঁয়া বার করা। নিশ্চুপ ভাবে পড়ে রইল কাচের গুলির মতো রঙিন দেহটা। আস্তে আস্তে দেখলাম রঙ গাঢ় হচ্ছে, রামধনু-রঙ মিলিয়ে যাচ্ছে। কালচে রঙের মধ্যে যেন একে একে ডুবে যাচ্ছে রামধনু-রঙেরা।

আরও কিছুক্ষণ পর উদ্বিগ্নকণ্ঠে অ্যানেস্থেটিস্ট জানালে, আর দেরি করা সমীচীন নয়, রুগীর জ্ঞান ফিরে আসবে এবার।

ফাঁপরে পড়লেন আমার বাবা। রোনার অদ্ভুত চিকিৎসার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায়নি। এখন তো সে বেঁচে আছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। রুগী যে মরেনি, তা বোঝা যাচ্ছে বুকের ওঠানামা দেখে।

কী করবেন বাবা? রোনাকে টেনে এনে ফেলে দেবেন? ফের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবেন, জ্ঞান ফিরে আসার আগেই?

বাবার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম বলেই চমকে উঠলাম সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্টের অস্ফুট চিৎকারে।

চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, দ্রুত রোঁয়া বার করে নিয়ে ফের ফুলে উঠছে রোনা। সরসর করে যেন অজস্র রন্ধ্রমুখ থেকে সুতো টেনে নিয়ে গুটোচ্ছে একটিমাত্র লাটাইতে। খুব দ্রুত ঘটল শুঁয়ো টেনে নেওয়ার ব্যাপারটা। দেখতে দেখতে আগের আকার ফিরে পেল রোনা। তবে সেই আশ্চর্য রামধনু-রঙ আর ফিরে এল না। অস্বচ্ছ থলথলে দেহটা কালির মতো কালো হয়ে উঠল একটু একটু করে। সব শুঁয়ো বার করে নেওয়ায় আড়ষ্ট শক্তভাবে থপ

করে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

আমি যখন দৌড়ে গেলাম রোনার দিকে, আর পাঁচজন তখন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সৎ-মায়ের কাটা পেটের দিকে। কিন্তু কাটার চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও দেখতে পেলেন না। বেমালুম জুড়ে গেছে কাটা চামড়া।

কিন্তু রোনা আর নেই। নষ্ট কোষকে শিষ্ট করে গিয়েছে সে নিজের প্রাণ দিয়ে। সে বলেছিল, ছুরি চালালে আয়ুকেও কমিয়ে দেওয়া হয়। সে দেখিয়ে গেল, বিনা ছুরিতে আয়ুকে বাড়ানো যায়। প্রাণ সঞ্চার করা যায় মৃত কোষে।

সৎ-মা আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে। কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না অন্য গ্রহের বিট্‌লে রোনা তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে গেছে নিজের জীবন দিয়ে। কিন্তু মুখে না বললেও নিশ্চয় মনে মনে বিশ্বাস করে। কেননা সৎ-মা এখন আমাকে অন্য চোখে দেখে।

আমার মরা মায়ের চোখে।

□ ১৯৭৭





অরণ্যের অন্ধকারে

সমরজিৎ কর

ভুলটা শেষ পর্যন্ত ডঃ বাসুই করে ফেললেন। তাঁর আরও কিছুটা সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওই যে—ঝুঁকি নেওয়াটা যে তাঁর চিরকেলে স্বভাব! আর তড়বড়েও কি কম? এ-ব্যাপারে কিছু বললেই, তাঁর এক কথা : 'সময়ের গতি বড় দ্রুত হে, তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারলেই তুমি পথের কোণে পড়ে থাকবে। জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার সেখানেই ইতি। যারা বসে বসে শুধু "ভাবছি, ভাবছি" বলে, আমি বাপু তাদের দলে নেই। ভাবনাচিন্তাকে সব সময় শান দিয়ে খাড়া রাখতে হয়—সময় হলেই কোপ। যারা শুধু ভেবেই চলে, তারা কাজের ভাবনা কিছু করে না। আমি ও-দলে নেই। ঝুঁকি নাও, চট্‌পট ভাবো, নেমে পড়ো কাজে। দেখবে, একশোটা কাজে নিরানব্বইটাতেই সাফল্য।'

কথাটা যে তিনি ভুল বলেন, তাও নয়। তবে নিরানব্বইটা সাফল্যের পর, যখন ওই বাকি একটার খপ্পরে পড়েন তখনই হয় বিপদ। বছর দুই আগের কথাই ধরা যাক। হঠাৎ তাঁর মাথায় এল দারুণ এক পরিকল্পনা। পৃথিবী এবং সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিয়ে তিনি চাঁদে পাড়ি দেবেন ঠিক করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তোড়জোড়। এক মাস ধরে চলল আঁক কষা। এই আঁক কষার কাজে সেবার আমাদের সাহায্য করেছিলেন বিশিষ্ট গ্রহবিজ্ঞানী ডঃ দানিয়েল পেরালেজ। মহাকাশে একটা সাদাসিধে পথও বেরোল। ঠিক হল, মহাকাশে সেই পথটি ধরে ডঃ বাসু চালিয়ে নেবেন তাঁর মহাকাশযান। তাতে কম সময়ে চাঁদে যাওয়া যাবে। জ্বালানিও দরকার হবে কম। তড়িঘড়ি যাত্রার দিনক্ষণও ঠিক করে ফেললেন।

'আরও দু-এক দিন সবুর করুন, ডঃ বাসু। কম্পিউটার যে-হিসেবটি দিয়েছে সেটা আর একটু সবুর করে খতিয়ে দেখা ভালো নয় কি?' বলেছিলেন ডঃ পেরালেজ।

ব্যাস। তাঁর কথাটা শেষ হতেই যেন আগুনে পড়ল ঘি। দপ করে জ্বলে উঠলেন ডঃ বাসু। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জবাব, 'তোমাদের নিয়ে এই হল মুশকিল, দানিয়েল। তোমরা—মানে স্প্যানিয়ার্ডরা বড় আয়েসী। ছাড়ো দেখি, যা বলেছি,সেটা আর পালটাব না। কাজে নেমে পড়ো। সব কাজেই কিছু ত্রুটি থাকে। ও আমরা শুধরে নেব।'

এই একটি দোষ ডঃ বাসুর। রেগে গেলে বড় জাত তুলে কথা বলেন। নিজে বাঙালি। মনে করেন, বাঙালির কোনও দোষ থাকতে পারে না।

এরপর কী আর বলবেন ডঃ পেরালেজ।

তড়িঘড়ি শুরু হল যাত্রা। হাজার আশি মাইল নিরাপদে পাড়িও দিলাম আমরা। তারপর—কী বলব—আমাদের মহাকাশযান গিয়ে পড়ল একটি বড়সড় উল্কার পরিক্রমণ পথে। ডঃ পেরালেজ না থাকলে সেবার সেই উল্কার আঘাতে মহাকাশেই আমরা নিকেশ হয়ে যেতাম।নেহাত ভাগ্য ভালো,কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এলাম আমরা।

বলতে কী, এবারও সেই একইরকম ভুল। তার খেসারত যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে সে-কথা ডঃ বাসুও বুঝতে পারেননি।

এবার সারা পৃথিবী জুড়ে একেবারে হইচই ব্যাপার।

ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় এই যে গভীর অরণ্য—মনে হল, সেখান থেকে আমাদের কারুর যেন নিষ্কৃতি নেই। কাছে-কোলে না আছে কোনও লোকালয়, না কোনও আশ্রয়। গভীর অরণ্যে আমরা চাপা পড়ে গেছি। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, সে-কথা কাউকে জানাতে গেলেও বিপদ। সামনে বেতার-যন্ত্র। সব সময় ভয়। সেই যন্ত্র আরও বড়রকমের দুঃসংবাদ এই বুঝি নিয়ে আসে। এবং ভাবতেই পারিনি, আমার এই আশঙ্কা সত্যিই ফলে যাবে।

গভীর রাত। এইমাত্র হাতঘড়ি দেখলাম। একটা বেজে পঁচিশ মিনিট।

বিরাট একটা তাঁবু। তার এককোণে ক্যাম্বিসের একটি খাটে শুয়ে রয়েছেন ডঃ বাসু। গভীর ঘুমে অচেতন। আমাকে নিয়ে তাঁর চার সহকারী। শঙ্কর রাঠোর, রবি প্রকাশ, গণপতি বেরেদার এবং আমি। শঙ্কর, রবি এবং গণপতিও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। আমার চোখেই শুধু ঘুম নেই।

বন-রাজ্য বড় অদ্ভুত। বিশেষ করে রাতের দিকে। রাত হলেই নিশাচর পশুপাখির শুরু হয় আনাগোনা। সারারাত ধরে চলে তাদের কতরকমই না ডাক। সেই শব্দে আমার চোখে ঘুম আসে না। আজও আসেনি।

এমন সময়, হ্যাঁ, রাত একটা বেজে পঁচিশ মিনিট যখন—হাতঘড়িটি পাশের টেবিলে রেখে সবে আড়মোড়া ভাঙার চেষ্টা করছি, কানের কাছে বেজে উঠল বেতার-সঙ্কেত।

বিপ-বিপ-বিপ....

সেইসঙ্গে বেতার-যন্ত্রের লাল আলোটি জ্বলছে নিভছে।

তড়াক করে বিছানা থেকে উঠেই রিসিভারটি তুলে ধরলাম।

'হ্যা—লো !' সাড়া দিলাম আমি।

'ডঃ বাসু ?' ওপার থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

'ডঃ বাসু ঘুমোচ্ছেন। আমি তাঁর সহকারী সজল মিত্র বলছি। কে ?.... ডঃ খাপড়ে ? বলুন, বলুন, স্যার। কী ব্যাপার ? এত রাতে ? কোনও গোলমাল ?' হঠাৎ এ-সময়ে ডঃ খাপড়ের রেডিওফোন পেয়ে বেশ ঘাবড়েই গেলাম।

'ডঃ বাসু ঘুমোচ্ছেন, ওঁকে আর বিরক্ত কোরো না। কথাটা তোমাকেই বলি। আজ বোম্বের টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় একটি গোলমেলে খবর বেরিয়েছে। তোমাদের খবরটা দেব বলে সকাল থেকে চেষ্টা করছি। বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের জন্যে রেডিওফোনে যোগাযোগ করতে পারিনি। মনে হচ্ছে একটা কেলেঙ্কারিই করে ফেলেছি আমরা। অ্যামাজন নদীর মাঝখানে মারাকা দ্বীপে এক শ্রেণীর বানর দারুণ দৌরাত্ম্য শুরু করেছে। তাদের আক্রমণে বনবিভাগের পাঁচজন কর্মী জখম।'

'কী বলছেন, ডঃ খাপড়ে ?'

'হ্যাঁ, এইটুকুই সংবাদ। ভাবছি, ডঃ পেরালেজ কোনও বিপদ ঘটিয়ে বসলেন না তো ?'

হঠাৎই রেডিওফোন স্তব্ধ হয়ে গেল।

'হ্যালো, হ্যালো, ডঃ খাপড়ে। ডঃ খাপড়ে, হ্যালো !'

না, কোনও সাড়া নেই আর।

মনে হল, আমার মাথায় সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

অন্য কেউ কথা বললে ভাবতাম, এটা রসিকতা। বিশেষ করে রাজ মেনন যদি কথা বলত। রাজ মেনন ডঃ বাসুর বন্ধু। নামকরা জীবরসায়নবিদ। মাঝে মাঝে তিনি ছেলেমানুষের মতো রসিকতা করে আমাদের ঘাবড়ে দেন। কিন্তু তা তো নয়। কথা তো বললেন ডঃ খাপড়ে। এমন রাশভারী মানুষ মাঝরাতে তো এমন রসিকতা করবেন না।

ফোনটাই বা স্তব্ধ হল কেন ? আমাদের বিদ্যুৎ-বিভ্রাট ? এখন এই হয়েছে একটা জ্বালা। এ-দেশ থেকে বিদ্যুৎ-বিভ্রাট কবে যে দূর হবে !

'কার সঙ্গে কথা বললে, সজল ?' তাঁবুর কোণ থেকে প্রশ্ন করলেন ডঃ বাসু।

বুঝতে পারলাম, আমার কথা শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে।

'ডঃ খাপড়ে বোম্বে থেকে ফোন করেছিলেন।' উত্তর দিলাম আমি।

'ডঃ খাপড়ে ? তো এত রাতে টেলিফোন কেন ?' কেমন যেন নিরাসক্ত ভাবেই প্রশ্ন করলেন ডঃ বাসু।

'ঠিক তা নয়। উনি সকাল থেকেই আপনাকে নাকি টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করেছেন। লাইন পাননি।'

'সে তো হয়ই আজকাল। তা কী এমন ঘটল যে, সে-সংবাদ মাঝরাতে দিতে হবে ?'

'আমিও কিন্তু বুঝতে পারলাম না। শুধু এটুকু বললেন, টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় কী না কী একটা খবর বেরিয়েছে।'

'কী খবর ?'

'অ্যামাজন নদীর মধ্যে সেই যে মারাকা দ্বীপ, যার কথা আপনি প্রায়ই বলেন—সেখানে এক ধরনের বানর নাকি দারুণ দৌরাত্ম্য শুরু করেছে। তাদের আক্রমণে বনবিভাগের পাঁচ জন কর্মী জখমও হয়েছে।'

'তারপর ?'

'মনে হল, নিজের মনেই বলছিলেন তিনি, ডঃ পেরালেজ কোনও বিপদ ঘটিয়ে বসলেন না তো ?'

'বিপদ আর কী ঘটাবে ডঃ পেরালেজ। যাক, বাদ দাও এখন, ওসব নিয়ে এখন মাথা না ঘামিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।' বলেই বেড-ল্যাম্পটি নিভিয়ে দিলেন তিনি।

ভাবলাম, অদ্ভুত ব্যাপার তো ! আমি হলফ করে বলতে পারি, দারুণ একটা কিছু না ঘটলে ডঃ খাপড়ের মতো লোকের অত রাতে টেলিফোন করার কথা নয়। আর ডঃ পেরালেজ ? তাঁকে আমি বিলক্ষণ জানি। বয়েস হলে কী হবে, দারুণ বেপরোয়া। মনে পড়ে, গত বছর গোয়ার উপকূলবর্তী সমুদ্র থেকে এক ধরনের ঝিনুক সংগ্রহ করতে এই বয়েসে নিজেই ডুবুরির কাজটি সেরেছিলেন। আর তা করতে গিয়ে প্রাণান্তকর অবস্থা। তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় ডাঙায় তুলি। জ্ঞান ফেরাতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগেছিল। কিন্তু তা হলে কী হবে ? জ্ঞান ফেরার পর তাঁর প্রথম কথা : 'ঝুঁকি ছাড়া জীবন হয় না, হে। তোমাদের ইয়াং ম্যানদের বলি, আয়েস ছেড়ে ঝুঁকি নাও, বড় কাজে সফল হবে।' বলেই পকেট থেকে বের করলেন গোটা পাঁচেক ঝিনুক।

পাশে নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিলেন ডঃ বাসু। তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল আনন্দের আভা।

ব্যাপারটা তখন আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি।

এরপর ডঃ বাসু তাঁর বন্ধু ডঃ পেরালেজকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। পাক্কা তিন মাস তাঁদের কোনও সাড়াও পাওয়া গেল না। অবশেষে—

সে-কথায় পরে আসছি। কিন্তু এই মুহূর্তে ডঃ বাসু যা আচরণ করলেন, তাতে অবাকই হলাম। বুঝতে অসুবিধে হল না, মারাকা দ্বীপে একটা কিছু ঘটেছে। যা ঘটেছে, তা তিনি জানেন। তাই এমন নির্লিপ্ত ভাবে কথা বললেন তিনি।

কিন্তু কী ঘটতে পারে ? বানরদলের দৌরাত্ম্য ! তারই বা মানে কী ?

নিশুতি রাত। তাঁবুর বাইরে থেকে ভেসে আসছে পাখি এবং কীটপতঙ্গের বিচিত্র শব্দ। ভেতরে সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। ডঃ বাসু ঠিক ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না বুঝতে পারছি না। তবে আমার চোখে ঘুম নেই। কেন জানি না, একটা অস্বস্তির ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে রইল।

মনে পড়ল, গোয়ার সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা সেই পাঁচটি ঝিনুকের কথা। এক ইঞ্চি লম্বা এবং আধ ইঞ্চি চওড়া সেই ঝিনুক। সাদা রঙ। তা নিয়ে কী মাতামাতিই না করেছিলেন ডঃ বাসু এবং ডঃ পেরালেজ। তারপর তাঁরা উধাও হলেন। মাঝে মাঝে ডঃ বাসুর নির্দেশে কিছু কিছু জৈবরাসায়নিক পরীক্ষা করতে হয়েছে আমাদের। চোখে দেখে সেসব পরীক্ষার মানেই বুঝতে পারিনি। মনে হল, সেই পরীক্ষার সঙ্গে মারাকা দ্বীপের ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই তো ? কথাটা ভাবতেই, চোখের পাতায় যেটুকুও বা ঘুম নেমে আসছিল, কেটে গেল। রাতটা জেগেই কাটালাম শেষ পর্যন্ত।

পরে শুনেছি, একই রাতে ঘটেছিল আর-একটি ঘটনা।

ব্যাঙ্গালোর শহর থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে নীলগিরি পর্বতের এক দুর্গম অঞ্চল। আশপাশে কোনও লোকালয় নেই। ঢেউখেলানো পাহাড়। গাঢ় সবুজ অরণ্য। কোথাও কোথাও এত গভীর যে,দিনের বেলায়ও সেখানে সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না। পাহাড়ের উঁচু শিখরের ওপরে তুলোর মতো মেঘ জমে থাকে। আর ঢালের নিচে ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা সমভূমি। সবুজ ঘাসে মোড়া। সেই সমভূমির বুক চিরে বয়ে চলেছে সলতের মতো জলধারা। জলের উৎস ঝরনা। এখানকার গাছপালা খুব প্রাচীন। বনের পশুপাখিও প্রাচীন। প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের ধারণা, এই বনে এখনও পর্যন্ত এমন কিছু কিছু পশুপাখি নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে, যারা বহন করছে প্রাচীন পূর্বপুরুষদের বংশধারা। এক ধরনের পেঁচা তাদের মধ্যে অন্যতম। এদের গায়ের রঙ মিশকালো। চোখ লাল। মাথায় ঝুঁটি। বনের কোথায় যে বাস করে হদিস মেলা ভার। দু-একজন পর্যবেক্ষক তাদের পলকের জন্য দেখেছে। আর শুনেছে তাদের বিকট শব্দ। তাদের কণ্ঠস্বর কতকটা শকুনের মতো। চেরা আওয়াজ। শুনলে বুক শুকিয়ে যায়।

এ-অঞ্চলে সাধারণ মানুষ আসে না। তবে খবর পাওয়া গেছে কিছু কিছু মানুষ আনাগোনা করে। ওষুধের গাছগাছড়া সংগ্রহ করতে। সেসব দুর্লভ গাছ তারা চড়া দরে চোরাপথে বিদেশে বিক্রি করে।

খবরটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেনে ফেলল জোসেফ গঞ্জালেস।

জোসেফ গোয়েন্দা দপ্তরের এক ইন্সপেক্টর। গোয়ার রাজধানী পানাজি। সেখানেই তার বাড়ি। বোম্বে থেকে বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসে নিজের এক ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে এক সন্ধ্যায় পানাজির একটি রেস্তোরাঁয় খেতে এসেছিলেন তিনি। খাওয়ার সময় হঠাৎ

পাশের টেবিল থেকে কয়েকটি কথা ভেসে এল তাঁর কানে। সেখানে বসে চারজন যুবক নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল।

'বুঝলে কি না, সাইমন, এবার বড় দাঁও। এক এক কেজির দাম এক লক্ষ টাকা।' বলল একজন।

'জানি, প্যাটেল। তবে জায়গাটা বড় দুর্গম।'

বোঝা গেল প্রথম বক্তার পদবী প্যাটেল।

গোয়েন্দা তো। চোখ আর কান তো সব সময় সজাগই থাকবে। প্যাটেল কথাটা কানে যেতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল জোসেফ। আড়চোখে চাইতেই—কী ব্যাপার, ডিক প্যাটেল না ? না, ভুল হয়নি। বছর চব্বিশের ছোকরা। বিচ্ছু চোরাচালানকারী। চোস্ত বিলেতি পোশাকে নিজেকে মুড়ে কালো চশমায় চোখ ঢাকলে কী হবে। গলার স্বরেই তাকে চিনতে পেরেছে জোসেফ।

'তা, কী বলো, কালই রওনা হওয়া যাক—' বলল আর-একজন। বেশ ষণ্ডামার্কা চেহারা।

'অবশ্যই, কুলকারনি। মিস্টার নেগুচি, ঠিক কি না ?' সাইমন কথা বলল।

নেগুচি জাপানী। চেহারা এবং কথাতেই বোঝা গেল। সাইমনের প্রশ্নে সে মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল।

জোসেফের কাছে তাদের কথাবার্তা অসংলগ্ন লাগল। তবে বুঝতে অসুবিধে হল না, বড় রকমের একটি দাঁও-এর পিছনেই চলেছে তারা। কিন্তু কী এমন বস্তু, যার এক কেজির দাম এক লক্ষ টাকা হতে পারে ?

যাই হোক, ওদের কথাবার্তায় এটুকু বোঝা গেল, ওই জাপানীই ক্রেতা, এবং একজন উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ। পণ্যটি সে নিজের চোখে পরীক্ষা করে তবেই কিনতে চায়। সেই কারণেই সে এসেছে। ট্যুরিস্টের ছদ্মবেশে। আর তাদের গন্তব্যস্থল অনামী এক অঞ্চল, যার কথা এইমাত্র বললাম।

কথায় বলে না, যত সতর্কই হোক, অপরাধী তার অলক্ষ্যে নিজের হদিসটি রেখে যাবেই ! এক্ষেত্রেও তাই হল। কোথায় তারা যাচ্ছে, কীভাবে যাচ্ছে সব কিছুই তারা আলোচনা করল। বেচারা ! জোসেফকে কেউ ওরা চিনত না। ভাবল, গোবেচারা এক বাপ, তার কাচ্চাবাচ্চা নিয়েই মশগুল।

জোসেফ পরদিন এল বোম্বে। সেখান থেকে জনা বারো সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে পশ্চিমঘাটের সেই উপত্যকায় সময়মতো গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

তখন বিকেল তিনটে হবে। জোসেফ তার দলবল নিয়ে বিরাট একটি পাথরের আড়ালে অপেক্ষা করছে। চোখের সামনে ভেসে উঠল চারমূর্তি : সাইমন, প্যাটেল, নেগুচি এবং সেই লোকটা। যাকে সে পানাজির রেস্তোরাঁয় ওদের সঙ্গে নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখেছিল।

উপত্যকার মসৃণ তৃণভূমির ওপর দিয়ে চারমূর্তি ধীরে ধীরে ঘন গাছপালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হল তারা।

'এবার পজিসন নাও, নটরাজন।' নিজেকে শক্ত করে সহকারী নটরাজনকে নির্দেশ দিল জোসেফ।

'রাইট স্যার।' মুখের পেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠল নটরাজনের।

পা পা করে এগোতে লাগল তারা।

ওই তো—ছায়াঘন বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে চারমূর্তি। আর সেই

লোকটা—সেই চার নম্বর নাম না জানা লোক—কেমন হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে কীসব গাছপালা তুলছে। সাইমন এবং প্যাটেল তাকে সাহায্য করছে। আর নেগুচির কী উল্লাস!

'নটরাজন!' অস্ফুটস্বরে কথা বলল জোসেফ, 'এবার হাতেনাতে ধরব।'

'আমরা কি এখনই ঘিরে ফেলব, জোসেফ?'

আর ঠিক তখনই! সত্যিই যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

বিকট শব্দ! ক্যাঁচ ক্যাঁচ, চি চি, কা কা—ঝটপট। যেন ঝড় উঠল।

আর যাকে বলে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়নো।

'পালাও, পালাও, রাজু।' শোনা গেল প্যাটেলের চিৎকার।

রুদ্ধশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে এক ঝটকায় তারা বনের ভেতর থেকে উপত্যকার দিকে ছুটে আসছে।

জোসেফের ইশারায় নটরাজন এবং সান্ত্রীরা আবার পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিল।

কিন্তু, আশ্চর্য! প্যাটেলের দল প্রচণ্ড বেগে বনের বাইরে ছুটে আসছে। আর তাদের পিছনে কম করেও শ'পাঁচেক তো হবেই!

পেঁচা! রাক্ষুসে পেঁচার প্রচণ্ড চিৎকার। তারা দল বেঁধে আক্রমণ করেছে তাদের। চারজনেরই মাথায় ঘাড়ে ঠোকর দিচ্ছে।

বনের বাইরে এসে উপত্যকার ঘাসের ওপর ছিটকে পড়ল চারমূর্তি। হাতের থলেগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এবং চোখের পলকে পেঁচাগুলো নিঃশব্দে অদৃশ্য হল বনের মধ্যে।

কী অদ্ভুত ঘটনা! কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘটে গেল সব কিছু।

যেন পাথর হয়ে গেছে জোসেফ। তার সঙ্গীরাও। ব্যাপারটা কী ঘটল বুঝতে পারছে না। দিনের আলো তখনও স্পষ্ট। যা দেখল, তা তো অবিশ্বাসও করা যায় না।

সংবিৎ ফিরে পেতে কয়েক সেকেন্ড কাটল। তারপর জোসেফ তার সঙ্গীদের নিয়ে ছুটে গেল চারমূর্তির দিকে। চারজনই মুমূর্ষু।

সে এক বীভৎস দৃশ্য! ওদের হাতগুলো রক্তে রাঙা। কাঁধে রক্ত। মুখগুলো যেন ব্লেড দিয়ে ফালাফালা করে দেওয়া হয়েছে। রক্তে রাঙা হয়ে গেছে মুখ।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে বিহ্বল হয়ে গেছে জোসেফ। কাছেই ঝরনা। সঙ্গীদের সাহায্যে সে চারমূর্তিকে ঝরনার ধারে নিয়ে গেল। ঝরনার জলে হাতমুখ ধোয়াল।

চোখেমুখে ঠাণ্ডা জল পড়তেই জ্ঞান ফিরল তাদের।

'স্যার?' জোসেফকে সামনে দেখে ঘাবড়ে গেল প্যাটেল। তাকে বহুদিন ধরেই চিনত সে।

'শান্ত হও। তোমরা এখন অসুস্থ, প্যাটেল।' ঝানু গোয়েন্দা অফিসার জোসেফ। বিপদের মধ্যেও মানুষকে কী করে শান্ত রাখতে হয় সে জানে।

হঠাৎ এতগুলো পুলিশ দেখে বাকি তিনজনও ঘাবড়ে গেছে।

'কী ব্যাপার বলো তো, প্যাটেল?' জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

'কিছু বুঝতে পারছি না, স্যার। হঠাৎ কানে এল ঝটাপটির শব্দ। তারপরই কী বীভৎস কাণ্ড। দিনের আলোতেও পেঁচা যে এমন মরিয়া হতে পারে এ যেন কল্পনাও করা যায় না। ওরা দলবদ্ধ ভাবে আমাদের আক্রমণ করে কী হাল করেছে দেখতেই পাচ্ছেন।'

'তা এই সংরক্ষিত জঙ্গলে হঠাৎ ঢুকতে গেলে কেন?' জোসেফ এমনভাবে কথা বলল, যেন কিছুই সে জানে না।

প্রশ্নটি শুনে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল প্যাটেলের মুখ : 'মানে আমাদের এই জাপানী বন্ধুটির জঙ্গল দেখার বড় শখ। তাই এদিকে আসা। জঙ্গলটা যে সংরক্ষিত, আমরা জানতাম না।'

'চোরাকারবারীরা ভণিতাও জানে!' বলেই তার পাশে পড়ে থাকা প্লাস্টিকের থলের মধ্যে থেকে কয়েকটি লতানো গাছ সংগ্রহ করল সে। গোল গোল পাতা। পাতায় ছড়ানো সাদা এবং বেগুনি রঙ। 'এগুলো কী?' বেশ মেজাজ নিয়েই প্রশ্ন করল জোসেফ।

'স্যার—!' এর বেশি কী-ই বা আর বলতে পারে প্যাটেল?

জোসেফ চারমূর্তিকে নিয়ে এল বোম্বাইয়ে। হাসপাতালে ভর্তি করল চিকিৎসার জন্যে। বন্য পাখির আক্রমণে শরীরে যাতে না পচন ধরে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

হাসপাতালটিতে কী একটা কাজে এসেছিলেন ডঃ খাপড়ে। চারমূর্তির কথা কানে যেতেই ওয়ার্ডে ছুটে এলেন তিনি। কয়েক মিনিট ওদের সঙ্গে কথা বলেই চলে গেলেন। মনে হল, হঠাৎ যেন বড়ই গম্ভীর হয়ে উঠলেন তিনি।

'হ্যা-ল্লো!' নিজের গবেষণাগারে ফিরে এসে রেডিওফোনে যোগাযোগ করলেন তিনি ডঃ বাসুর সঙ্গে।

'ডঃ খাপড়ে? কী ব্যাপার?' এবার স্বয়ং ডঃ বাসুই তুলে ধরলেন ফোন।

'সর্বনাশ হয়ে গেছে। খুবই দুঃসংবাদ। আপনার গ্রুপ নিয়ে এখুনি আপনি এখানে চলে আসুন, ডঃ বাসু।'

'ব্যাপারটা কী?' ডঃ বাসুর কণ্ঠস্বরে কোনও উত্তেজনাই দেখা গেল না।

'এখানে এলেই দেখবেন।' বলেই রিসিভারটি নামিয়ে রাখলেন ডঃ খাপড়ে।

ডঃ খাপড়ে জোসেফকে অনুরোধ করলেন : 'ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাতে পাঁচ কানে না যায়, দয়া করে দেখবেন।'

এই হল ডঃ বাসুর একটা মস্ত গুণ। জটিল পরিস্থিতি এলে একটা মানুষ যে নিজেকে কতটা সংযত রাখতে পারে তিনিই তাঁর প্রমাণ।

বোম্বেতে আসতেই ডঃ খাপড়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন সেই ওয়ার্ডে।

চারমূর্তির গায়ে তখন প্রচণ্ড জ্বর। তারা মুমূর্ষু অবস্থায় ঘুমোচ্ছে।

তাদের মুখ এবং গায়ের ক্ষত খতিয়ে দেখলেন ডঃ বাসু। তারপর ডঃ খাপড়ের গবেষণাগারে ফিরে এসে জোসেফের সঙ্গে কথা বলে সব কিছু জেনে নিলেন। শল্য চিকিৎসক ডঃ আগরওয়াল উপস্থিত।

'খুব বিপজ্জনক বলে কি মনে হচ্ছে, ডঃ আগরওয়াল?' তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'এখন আর বিপদ নেই।' বললেন ডঃ আগরওয়াল।

'গুড! আপনার আপত্তি না থাকলে, আমি কি ওদের কিছুটা রক্ত নিতে পারি? বন্যপ্রাণীর আক্রমণ তো। ওদের রক্তটা একবার পরীক্ষা করতে চাই। নিরাপত্তার জন্যেই এটা দরকার।'

'এতে আর আপত্তি কী থাকতে পারে, ডঃ বাসু?'

'ধন্যবাদ। সজল, তুমি ওদের ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে নাও।'

তাঁর কথামতো আমি ব্লাড স্যাম্পল নিলাম।

'ও কে। থ্যাঙ্ক ইউ, ডক্টর। চলুন, ডঃ খাপড়ে, আপনার গবেষণাগারে গিয়ে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখি আমরা।' বলেই ওয়ার্ডের বাইরে পা বাড়ালেন ডঃ বাসু।

এরপর কাটল তিনদিন। ডঃ বাসু চারমূর্তির রক্ত নিয়ে পড়লেন। শঙ্কর, রবি, গণপতি

এবং আমি তাঁকে সাহায্য করলাম। এমন জটিল পরীক্ষা আগে কখনও দেখিনি! ডঃ বাসু এক-একটি অঙ্ক কষেন এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষা করতে বলেন। তাদের রক্ত থেকে পৃথক করা হল বিভিন্ন ধরনের লিমফোসাইট কোষ। এক-একটি টেস্ট-টিউবের মধ্যে তুলে নেন এক এক ধরনের লিমফোসাইট। তারপর তাদের সঙ্গে মেশান নানারকম ভাইরাস।

ভাইরাস মেশানোর পর কী হচ্ছে তা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে বারবার পরীক্ষা করা হল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চুপভাবে কাজ করে চললাম আমরা।

মাঝে মাঝে টেস্ট-টিউবের মধ্যেকার তরলের রঙ পালটাচ্ছে। কোনওটায় হলুদ, কোনওটায় লাল, কোনওটায় বেগুনি। আবার একটি টেস্ট-টিউবের তরল ঢেলে দিচ্ছেন আর-একটি টেস্ট-টিউবের মধ্যে। এইভাবে চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

'সজল,' এক সময় বললেন তিনি, 'স্যাম্পল ওয়ান-এ একটু কার্বন-১৪ আইসোটোপ মিশিয়ে নাও দেখি।'

তাঁর কথামতো আমরা কাজ করলাম।

কার্বন-১৪ মেশানো তরল এবার তিনটে ইঁদুরের মস্তিষ্কে ইনজেক্ট করা হল। ইনজেকশনের দরুন ইঁদুরগুলো মুমূর্ষু হয়ে পড়ল।

আমরা অপেক্ষা করলাম ঘণ্টা ছয়। এই ছ' ঘণ্টা রুদ্ধশ্বাসে ইঁদুরগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন ডঃ বাসু। তারপর হঠাৎ—কী বলব—যেন স্প্রিং-এর মতো ছিটকে উঠল ইঁদুরগুলো।

'মরফিন, মরফিন। সজল, ওদের মরফিন দাও,' বললেন তিনি।

তাঁর আদেশমতো ইঁদুরগুলোকে মরফিন ইনজেকশন দিলাম আমরা। সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝিমিয়ে পড়ল।

ঝিমিয়ে পড়তেই ডঃ বাসু তাদের মস্তিষ্ক থেকে সিরিঞ্জের সাহায্যে কিছুটা রক্ত সংগ্রহ করলেন। তারপর সেই রক্ত থেকে পৃথক করলেন বিশেষ এক ধরনের প্রোটিন যৌগ। কার্বন-১৪ থাকায় তা থেকে নির্গত হচ্ছে তেজস্ক্রিয় রশ্মি।

এরপর শুরু হল আরও জটিল পরীক্ষা। ডঃ বাসু প্রোটিন যৌগটির ওপর নিক্ষেপ করলেন স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি রশ্মি।

'গুড লাক!' ডঃ বাসুর কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বাস।

'স্যার! আমরাও বিস্মিত।'

'সবুজ রঙটা দেখছ তো!'

'তা দেখছি।'

'তার মানে, আমরা সফল। চারমূর্তি বেঁচে যাবে। আর সেইসঙ্গে—'

'কী ব্যাপার, ডঃ বাসু?'

'আমার শেষ পরীক্ষা শেষ হল, মাই ইয়াং ফ্রেন্ডস। তোমাদের বলি না, ঝক্কি নিতে হয় হে, ঝক্কি। ঝক্কি না নিলে জীবনে কোনও সাফল্য আসে না।' ডঃ বাসু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন যেন।

এটাও তাঁর আর-একটি চরিত্র। কোনও ব্যাপারে সফল হলে তিনি শিশুর মতো আচরণ করেন।

'কথাটা শুনতে ভালো, কিন্তু তার ধকলটা এবার সামলাও!'

ডঃ রঘুনাথ খাপড়ে! সন্তর্পণে কখন যে তিনি গবেষণাগারে এসে হাজির হয়েছেন আমরা খেয়াল করিনি।

'কী ব্যাপার, ডঃ খাপড়ে ? এমন জীবাণুমুক্ত ঘরে না জানিয়ে ঢোকাটা কি ঠিক হল ?' বেশ বিরক্তই যে হয়েছেন ডঃ বাসু সে তাঁর কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল।

'আর জীবাণুমুক্ত ঘর ! বয়েস বেড়েছে, তবু গোয়ার্তুমি এখনও ছাড়লে না। এই দেখ, কী কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছ।' বলেই ডঃ খাপড়ে গোটা তিনেক কাগজ ধরিয়ে দিলেন ডঃ বাসুর হাতে। তারপর কিছুটা নরম সুরে বললেন, 'ভয় নেই। আমার জামাকাপড় থেকে এই দেহটি পর্যন্ত জীবাণুমুক্তই করে এনেছি হে।'

'ধন্যবাদ।' বলেই ডঃ খাপড়ের হাত থেকে কাগজগুলি নিয়ে বেশ জোরেই পড়তে শুরু করলেন ডঃ বাসু। আমরা বুঝতে পারলাম, সবই জরুরি বার্তা এবং তা এই :

১। আমাজনের মারাকা দ্বীপ থেকে ডঃ পেরালেজ জানিয়েছেন :

'খবরটা প্রথম পাই আমার এক কাঠ-ব্যবসায়ী বন্ধু মার্টিন ওয়েলচের কাছ থেকে। এই দ্বীপে তাঁর পাঁচটি জঙ্গল রয়েছে। সবই রেইন-ফরেস্ট। সে জানিয়েছে, কয়েকদিন আগে রাতের দিকে তার জঙ্গলে কাঠ চুরি করতে গিয়েছিল কয়েকজন চোর। সেই সময় হঠাৎ একদল লালমুখো বানর তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। তাদের জখম করে। গুলির শব্দে রেঞ্জাররা এসে তাদের পাছে বন্দী করে এই ভয়ে তারা বন্দুক ব্যবহার করেনি। তবে শেষে সবাই ধরা পড়েছে। এরপর দিনের দিকেই একদল রেঞ্জারকে আক্রমণ করেছে ওই বানর। বানরগুলি বিরল শ্রেণীর বলে বিশ্ব প্রাণী সংরক্ষণ সংস্থার আইন অনুযায়ী তারা তাদের ওপর গুলি চালায়নি। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্যে গতকাল আমাকে সরকার থেকে অনুরোধ করা হয়। তাই ওই জঙ্গলে আমিও গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে এবং আমার সহকর্মীকে দেখেই হঠাৎ জঙ্গল ফুঁড়ে একদল বানরের আবির্ভাব। কী তাদের দাপট ! ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে না ঢুকেই আমাদের ফিরে আসতে হয়েছে। এ-অঞ্চলের কাঠ ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। এর জন্যে দায়ী স্যাম্পল এক্স নয় তো ? এখন অবশ্য তা আমাদের হাতের বাইরে। ডঃ বাসুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। এদিকে খবরের কাগজওয়ালাদের জ্বালায় প্রাণান্তকর অবস্থা। ইতিমধ্যে একটি কাগজ ইঙ্গিতে আমাদের দায়ী করেছে। এখন কী করা যায়, ডঃ বাসুর সঙ্গে যোগাযোগ করে দয়া করে একবার জানান ডঃ খাপড়ে।'

২। কেনিয়ার একটি অজ্ঞাত স্থান থেকে খবর জানিয়েছেন প্রবীণ প্রাণিবিজ্ঞানী ডঃ গামাল পাসা :

'উগাণ্ডার রাজধানী কামপালা থেকে রেডিও উগাণ্ডা একটি বুলেটিনে জানিয়েছে, দিন চারেক হল লেক ভিক্টোরিয়ার পাশাপাশি কয়েকটি জঙ্গলে একদল বন্য কুকুরের অত্যাচারে অনেকে আহত হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের তারা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করছে। কাঠ সংগ্রহের জন্যে কেউ আর জঙ্গলে ঢুকছে না। স্থানীয় অধিবাসীরা অনেকেই নির্ভর করে বন্য ফল এবং কন্দের ওপর। সেগুলোই তাদের খাদ্য। তাও সংগ্রহ করতে পারছে না। মানুষ দেখলেই কুকুরের দল এসে আক্রমণ করছে। ভয়ে ট্যুরিস্টরাও লেক ভিক্টোরিয়ার ধারে-কাছে ঘেঁষছে না। কুকুরগুলো হঠাৎ এমন হিংস্র হয়ে উঠল কেন ? দেশের সেনাবিভাগও তাদের সঙ্গে পেরে উঠছে না। স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করছে, বনের দানোর হাত রয়েছে এর পিছনে। ওঝারা গিয়ে ভূত তাড়ানোর চেষ্টা করছে। এদিকে উগাণ্ডার প্রতিরক্ষা দপ্তরের সন্দেহ, এর পিছনে প্রতিবেশী রাজ্যের কোনও নাশকতামূলক কাজ-কারবার জড়িয়ে নেই তো ?' সংবাদটি দেওয়ার পর ডঃ পাসা লিখেছেন, 'প্রতিবেশী

রাজ্য বলতে যে কেনিয়াকেই বোঝানো হচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পারস্পরিক রেষারেষিতে পৃথিবীর এই অঞ্চলটি এমনিতেই অগ্নিগর্ভ। শেষ পর্যন্ত দুই দেশে না যুদ্ধ লেগে যায়। হ্যাঁ, একটা খবর, আমাদের গবেষণাগার থেকে দিন দশ আগে "চামচা" নামক কুকুরটি নিরুদ্দেশ। চামচাই এর জন্যে দায়ী নয় তো ? ডঃ বাসুর মতামতের অপেক্ষায় রইলাম, ডঃ খাপড়ে।'

৩। তাসমানিয়ার ক্র্যাডল মাউন্টেন। ডঃ রবার্ট উইলসন জানাচ্ছি :

'এখানকার অতিকায় পেঁচাদের অত্যাচারে তিনটি গ্রামের মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। গ্রামগুলো জঙ্গলের ধারে। পেঁচাদের আক্রমণ খুবই বীভৎস। আমার সন্দেহ, স্যাম্পল এক্স-ই এর জন্যে দায়ী। ডঃ বাসুর সঙ্গে এক্ষুনি আমাদের বসা দরকার, ডঃ খাপড়ে।'

'তা হলে বুঝতে পারছ, ডঃ বাসু ! এখন তো মালুম হচ্ছে, অপকর্ম যা করার আমরা তা করে ফেলেছি।' কাগজগুলো পড়া শেষ হতে বেশ উষ্মার সঙ্গেই মন্তব্য করলেন ডঃ খাপড়ে।

'জানি। ওই গামাল পাসাটা একটা আস্ত গর্দভ। চামচা নিরুদ্দেশ এ-কথাটা অমন খোলাখুলি কি না লিখলেই পারত না ? চিরটাকাল ও ছেলেমানুষই থেকে গেল।' ডঃ বাসু এমনভাবে কথা বললেন যেন তেমন কিছুই হয়নি।

'সাবাস ! মনে হচ্ছে খবরগুলোতে তুমি কোনও বিপদ দেখতে পাচ্ছ না ?'

'থামো দেখি। তুমিও বড় অল্পতেই মাথা গরম করো, খাপড়ে।'

'কী বলছ তুমি ?'

'সবুর করো। ব্যাপারটা আমাকে খতিয়ে বুঝতে দাও।—হ্যাঁ, সজল, আর একটা পরীক্ষা আমাদের করে দেখতে হবে। খাপড়ে, তুমিও আমাদের সঙ্গে থাকবে।' বেশ গম্ভীর হয়ে আদেশের সুরে কথা বললেন ডঃ বাসু।

ডঃ বাসু এমনিতে বেশ প্রাণখোলা মানুষ। কিন্তু যখন গম্ভীর হন, তাঁর মধ্যে তখন অদ্ভুত এক সম্মোহন শক্তি কাজ করে। সে সময় মাথা নিচু করে তাঁর আদেশ পালন করা ছাড়া জো থাকে না।

একটা পরীক্ষা ! পরীক্ষাই বটে ! যাকে বলে প্রাণান্তকর অবস্থা। তার জন্যে সারা পৃথিবীটা যে আমাদের চষতে হবে তা আমরা ভাবতেও পারিনি।

ইতিমধ্যে যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই বলা হল। কেনিয়া এবং উগান্ডার মধ্যে শুরু হল বাক-বিতণ্ডা। ব্রাজিল থেকে একদল বিশেষজ্ঞ গিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল অ্যামাজনের সেই দ্বীপ মারাকায়। তাসমানিয়া সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দেশবাসীকে জানিয়ে দিল : মাউন্ট ক্র্যাডলের ধারেকাছে কেউ যেন না যায়। বন্যপ্রাণীরা অজ্ঞাত একটি রোগে আক্রান্ত হয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে। এখন পেঁচা, এরপর অন্য প্রাণীও হয়তো হিংস্র হয়ে উঠবে।

দিন তিনেকের মধ্যেই এসব খবর প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল। বিজ্ঞানীরা দলে দলে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে শুরু করলেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই দুর্ভাবনা দাঁড়াল বন্যপ্রাণী নিয়ে।

বাইরে যত হালকা কথাবার্তাই বলুন না কেন, ডঃ বাসুর ভেতরে যে ঝড় চলছে, সেটা দিন দুই যেতেই আমরা বুঝতে পারলাম। এই দু'দিন রোগ প্রতিরোধমূলক রাসায়নিক যৌগ নিয়ে যে কতরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন তিনি, তার বিশদ বিবরণ দিয়ে কাজ নেই। সে বিবরণ খুবই জটিল, অনেকের ভালো লাগবে না। অঙ্ক কষে তিনি 'ডি এন এ' এবং 'আর এন এ'র গঠন পরীক্ষা করতে লাগলেন কম্পিউটারের সাহায্যে। সেই চারমূর্তির রক্তের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে চালালেন বিশ্লেষণের কাজ। বিশ্লেষণের পর এক-একটি স্যাম্পল তৈরি করেন এবং এক-একটি গিনিপিগের ওপর প্রয়োগ করেন। তারপর ফলাফল দেখে কখনও বা খুশি হন, কখনও বা বিভ্রান্ত। আর ডঃ খাপড়ে এবং আমরা যন্ত্রের মতো যে যে আদেশ তিনি করছেন, পালন করে চলেছি।

তৃতীয় দিনে তাঁকে আরও বেশি বিভ্রান্ত বলে মনে হল।

'কী ব্যাপার ?' ডঃ খাপড়ে জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে।

'সমাধানের কাছে এসেও সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে, খাপড়ে।'

'অ্যান্টিবডি ?'

'ঠিক ! ঠিক ধরেছ তুমি, খাপড়ে। এই অ্যান্টিবডির পরীক্ষাতেই যত গোলমাল। আমি ভাবছি কি, আমাদের অন দ্য স্পট স্যাম্পল জোগাড় করা দরকার।'

'তার মানে মারাকায় যেতে হবে। যেতে হবে তাসমানিয়ায়—'

'হ্যাঁ, যেতে হবে। কেনিয়াতেও যেতে হবে। আর সবশেষে আমাদের পশ্চিমঘাট পর্বতমালায়, যেখানে ওই চারমূর্তি জখম হয়েছিল। এবং এখনই যেতে হবে।'

এরপর পনেরোটা দিন যে কীভাবে কাটল, তা কল্পনাও করা যায় না। সর্বত্রই তখন রীতিমত হইচই শুরু হয়ে গেছে। কেনিয়া এবং উগান্ডায় তো কথাই নেই। মারাকা এবং তাসমানিয়ার ক্র্যাডেল মাউন্টেনেও গোলমাল। সন্ত্রস্ত বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থাও। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেও গোপন বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে যাতে না অঘটন ঘটায় তার জন্যে সবাই ভীষণ নীরবতা পালন করছে।

এই পনেরো দিনের ভেতর মারাকার সেই লালমুখো বানর ধরতে হয়েছে অনেক কষ্ট করে, ফাঁদ পেতে। তাসমানিয়ার পেঁচা এবং কেনিয়ার বন্য কুকুরও। বিজ্ঞানী হিসেবে ডঃ বাসুর সব দেশেই সম্মান। তা না হলে এত কম সময়ে অবাধে এতসব দেশে গিয়ে আমাদের পরীক্ষা চালানোই সম্ভব হত না। আমরা যেখানেই গেলাম, বিজ্ঞানীরা এসে প্রশ্ন করলেন ডঃ বাসুকে : 'ব্যাপার কী ?' সবাইকে ডঃ বাসু একই উত্তর দিলেন : 'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তাঁর এই সরাসরি জবাবে অনেকে আরও ভয় পেয়ে গেলেন।

দিন পনেরো পর আবার ফিরে এলাম আমরা। আবার বোম্বে। তারপর সেই পশ্চিমঘাট পর্বতের প্রত্যন্ত উপত্যকায়। আমাদের সঙ্গে ডঃ গামাল পাসা, ডঃ পেরাল্লেজ এবং ডঃ রবার্ট উইলসনও এলেন।

শুরু হল আবার রাত-দিন গবেষণা। আমরা সঙ্গে নিয়ে এসেছি কেনিয়ার একটি বন্য কুকুর, মারাকার বানর, তাসমানিয়ার পেঁচা। পশ্চিমঘাটের জঙ্গল থেকেও সংগ্রহ করেছি সেই রাক্ষুসে পেঁচা একটি। তাদের রক্ত এবং রোগ প্রতিরোধক রাসায়নিক উপাদান নিয়ে কতরকম পরীক্ষাই না আমরা চালালাম।

প্রচণ্ড মানসিক চাপ আমাদের সবার ওপর। ডঃ বাসু অবশ্য অন্য ধাতের মানুষ। ঝক্কির

মধ্যে পড়লে তিনি খুব শক্ত থাকেন। যেমন এবারও লক্ষ করছি।

সেই একই কাজ। প্রাণীগুলো খাঁচার ভেতর অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে তাদের গা থেকে রক্ত নেন টেস্ট-টিউবের ভেতর। মিশিয়ে দেন নানারকম এনজাইম এবং হরমোন। তারপর তাদের ওপর কখনও নিক্ষেপ করেন এক্স-রে, কখনও বা অতিবেগুনি রশ্মি। অথবা সূর্যের আলো। এসব করার পর টেস্ট-টিউবগুলো থেকে স্বল্প পরিমাণ স্যাম্পল নিয়ে প্রাণীগুলোর মাথায় ইনজেকশন করে দেওয়া হচ্ছে। তারপর এনসেফেলোগ্রামের সাহায্যে তাদের মস্তিষ্কের ছবি তোলা।

আরও তিনদিন চলল এইভাবে।

অবশেষে—'একেই বলে প্রকৃতির রসিকতা হে'—বলেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ডঃ বাসু।

তাঁর হাতে একটি টেস্ট-টিউব। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে সবুজ রঙের প্রতিপ্রভা।

'নিশ্চয়ই! শুনুন মশায়রা, মানে, গামাল, রবার্ট এবং পেরালেজ—তোমাদেরই বিশেষ করে বলছি,' বললেন ডঃ বাসু, 'আমাদের হাতে সময় কম। তোমাদের জন্তুগুলো আগামী বাহাত্তর ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকবে। এই অবস্থায় তাদের নিজেদের দেশে নিয়ে যাও, সেইসঙ্গে একটি করে টেস্ট-টিউব, যাতে থাকবে এই তরল পদার্থ। এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবডি এবং রেট্রোভাইরাস। পেরালেজ, তুমি মারাকায় পৌঁছে তোমার বানরটার মগজে এই তরল ইনজেকশন করে তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দেবে। গামাল এবং রবার্ট—তোমাদের কুকুর এবং পেঁচাকেও ওইভাবে ছেড়ে দেবে। আমরা আমাদের পেঁচাকে আজই ছাড়ব। হাতে সময় নেই। তোমরা এক্ষুনি রওনা হও।'

যাকে বলে মিলিটারি তৎপরতা।

ডঃ বাসুর ব্যাপার। অতএব বিদেশি বিজ্ঞানীদের বোম্বে থেকে বিমানে টিকিট পেতেও দেরি হল না।

একটা মারুতি গাড়ি ওদের নিয়ে চলে গেল। সঙ্গে গেলেন ডঃ খাপড়ে।

সারাদিন বিশ্রাম।

তারপর রাত হতেই আমাদের পেঁচাটির মগজে ওই তরল ইনজেকশন করে জঙ্গলে ছেড়ে দিলাম আমরা।

দিন দুই অপেক্ষা। তারপর জঙ্গলে ঢুকলাম। সব নীরব। পেঁচার কোনও সাক্ষাৎ নেই।

তিনদিন পর খবর এসে পৌঁছল। পেরালেজ জানিয়েছেন, বানরগুলো শান্ত হয়ে এসেছে। গামাল জানালেন, আর কোনও কুকুর দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে রবার্ট তাসমানিয়া থেকে জানিয়েছেন, ঝামেলা শেষ। পেঁচাগুলোর আর কোনও অত্যাচার নেই।

খবরগুলো পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডঃ বাসু।

'রহস্যটা কোথায় ?' তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আমার প্রশ্নটি শুনে একটু যেন গম্ভীর হলেন ডঃ বাসু। তারপর বললেন, 'অন্য কাউকে আমি জানতে দিইনি। আমি একটি বিশেষ ধরনের রেট্রোভাইরাস তৈরি করেছিলাম। এ খবর জানত শুধু ডঃ খাপড়ে। সেই ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়া হয় মারাকা, তাসমানিয়া, কেনিয়া এবং এই পশ্চিমঘাট পর্বতের গভীর বনে। পশ্চিমঘাটে আমিই ছড়িয়েছি। অন্যত্র আমার ছাত্র গামাল, পেরালেজ এবং রবার্ট ছড়িয়েছে। যে-কারণেই হোক, এই ভাইরাস এক এক প্রাণীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মারাকায় বানরের ওপর, কেনিয়ায় কুকুরের ওপর,

আর তাসমানিয়া এবং এখানে পেঁচার ওপর। জানো তো, অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষের শরীর থেকেও নির্গত হয় ফেরোমোন নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ ? রেট্রোভাইরাস মস্তিষ্কে বাসা বাঁধার ফলে ওই প্রাণীগুলো অদ্ভুত এক ধরনের গুণ পায়। জঙ্গলে মানুষ ঢুকলেই তাদের গায়ের ওই রাসায়নিক যৌগের গন্ধ উদ্দীপ্ত করে তাদের মস্তিষ্ক। এর ফলে তারা ভীষণভাবে আক্রমণাত্মক হয়। হিংস্র হয়ে মানুষের ওপর চালায় আক্রমণ।'

'অন্য কোনও প্রাণীকে আক্রমণ করে না ?' আমার জিজ্ঞাসা।

'না। একমাত্র মানুষের গায়ের গন্ধেই উত্তেজিত হয় তারা। তখন মরিয়া হয়ে মানুষকে আক্রমণ করে।'

'এ তো খুব ভালো কথা, ডঃ বাসু, মানুষ বন ধ্বংস করছে। ওরা যদি ওই রকম আচরণ করে তাহলে মানুষ তো বনেই ঢুকতে পারবে না। তাতে বন সংরক্ষণ হবে।'

'জানি। কিন্তু মানুষের জন্যেও তো বন দরকার।'

'এবার যা করলেন, তাতে কী হবে ?'

'বনে ছেড়ে দেওয়া প্রাণীগুলো বনে গিয়ে ছড়াবে নতুন আর-এক ধরনের রেট্রোভাইরাস এবং অ্যান্টিবডি। তাদের প্রভাবে আগের রেট্রোভাইরাস ধ্বংস হবে। তারা আর মানুষ দেখে হিংস্র হবে না। সেই ভাইরাস তৈরি করতেই তোমরা হিমশিম খেয়েছ। তার সুফল যে ফলেছে, সে-খবরও তো এসে গেছে।'

সেদিন রাতে রেডিওর খবর শুনলাম। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জানাচ্ছে, হঠাৎ অজ্ঞাতপরিচয় এক রোগের আক্রমণে পৃথিবীর কোনও দেশে কিছু প্রাণী আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল। রোগটি হঠাৎ যেমন এসেছিল, আবার হঠাৎই চলে গেছে। এখন আর ভয় নেই।

খবরটি কানে যেতেই মৃদু হাসলেন ডঃ বাসু। আমাদের মুখেও হাসি।

পরদিন বোম্বে ফিরে খবর পেলাম, চারমূর্তি জেলে। মূল্যবান গাছগাছড়া পাচারের জন্যে বোম্বে কোর্টে তাদের বিচার হবে।

'ওরা না থাকলে ভারতের ঘটনাটা চটপট আমরা শুনতে পেতাম না। ওরা আমাদের গবেষণাতে সাহায্যও করেছে। বেচারা !' খবরটি শুনে মন্তব্য করলেন ডঃ বাসু।

□ ১৯৮৯





রাক্ষুসে পাথর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বুড়ো মাঝি বলল, 'বাবু, বেড়াতে এসেছেন, বেড়িয়ে ফিরে যান। ওই দ্বীপে যাবেন না। ওখানে দোষ লেগেছে।'

আমরা একটু অবাক হলুম। দোষ লেগেছে মানে কী? দ্বীপের আবার দোষ লাগে কী করে?

বিমান বলল, 'বুড়ো কর্তা, তুমি যা টাকা চেয়েছ, তাই দিতে আমরা রাজি হয়েছি। তবু তুমি আমাদের নিয়ে যাচ্ছ না কেন? ওই দ্বীপে কী আছে!'

বুড়ো মাঝি তার সাদা দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'কিছুই নেই। সেই কথাই তো বলছি। শুধু শুধু ওখানে গিয়ে কী করবেন?'

বুড়ো মাঝি হাল ধরেছে, আর দাঁড় বাইছে তার নাতি। এই নাতির বয়েস চোদ্দ বছর হবে। ওর নাম সুলেমান। সে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

বুড়ো মাঝি যতই না বলছে, ততই আমাদের জেদ চেপে যাচ্ছে। একটা সাধারণ দ্বীপ, সেখানে কী এমন ভয়ের ব্যাপার থাকতে পারে? কত জাহাজ যাচ্ছে এখান দিয়ে, সেরকম কিছু থাকলে সবাই জানতে পারত।

হলদিয়াতে বিমানের দাদা চাকরি করে। আমি আর বিমান কয়েক দিনের জন্যে এসেছি এখানে বেড়াতে। হলদিয়া জায়গাটা বেশ সুন্দর। নতুন বন্দর নতুন শহর গড়ে উঠেছে। চারদিকে সবই নতুন নতুন বাড়ি আর অনেক ফাঁকা জায়গা। শহরটার একদিকে গঙ্গা আর একদিকে হলদি নদী।

সকালবেলা নদীর ধারে জেলেরা মাছ বিক্রি করতে আসে। আমরা সেই মাছ কিনতে গিয়েছিলুম। ঘাটে অনেকগুলো নৌকো বাঁধা। নৌকো দেখেই আমাদের মনে হল, একটা নৌকো ভাড়া করে নদীতে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়। একজন মাঝিকে জিজ্ঞেস করতেই সে রাজি হয়ে গেল। তিরিশ টাকা দিলে সে যতক্ষণ ইচ্ছে আমাদের ঘুরিয়ে আনবে।

আমি আর বিমান দু'জনেই সাঁতার জানি, সুতরাং আমাদের জলের ভয় নেই। বিমান তো সুইমিং কমপিটিশনে অনেকবার প্রাইজ পেয়েছে।

আমি আগেই শুনেছিলাম যে হলদিয়ার কাছে একটা দ্বীপ আছে, তার নাম আগুনমারির চর। আগে সেই চরটা মাঝে মাঝে ডুবে যেত, আবার মাঝে মাঝে জেগে উঠত। এখন আর

ডোবে না। এখন সেখানে গাছপালা জন্মে গেছে। কোনও মানুষজন অবশ্য সেখানে এখনও থাকে না।

নৌকো দেখেই আমার ওই দ্বীপটার কথা মনে এসেছিল। নতুন দ্বীপ মানেই তো নতুন দেশ। ওখান থেকে ঘুরে এলেই একটা নতুন দেশ দেখা হয়ে যাবে। অনেকদিন বাদে, যখন ওই দ্বীপেও অনেক ঘর-বাড়ি হয়ে যাবে, কলকারখানা বসবে, তখন আমরা বলব, 'জানো, যখন আমরা আগুনমারিতে গিয়েছিলুম, তখন এসব কিছু ছিল না। শুধু গাছপালা, আর····।'

গাছপালা ছাড়া আর কী আছে সেই দ্বীপে? বুড়ো মাঝি ভয় পাচ্ছে কেন?

নৌকোয় চড়বার সময় মাঝিদের কক্ষনো চটাতে নেই। সেইজন্যে আমি অনুনয় করে বললুম, 'ও বুড়ো কর্তা, বলো না সেখানে কী আছে? কেন আমাদের যেতে বারণ করছ?'

বুড়ো মাঝি বলল, 'কিছু নেই তো বলছি গো, বাবু. শুধু কয়েকটা গাছ আর বালি। আর ওই শামুক ঝিনুক ভাঙা।'

বিমান বলল, 'তাহলে আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাইছ না কেন? সেখানে কি ভয়ের কিছু আছে?'

বুড়ো মাঝি বলল, 'আকাশে মেঘ দ্যাখো না, বাবু। এখন আর অতদূরে যাওয়া ঠিক নয়। এই কিনারায় কিনারায় থাকা ভালো!'

বিমান বলল, 'তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ পেয়েছ? সামান্য মেঘ, এতে কখনও ঝড় ওঠে? তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাও না তাই বলো!'

আমি বুড়ো মাঝির নাতিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'সুলেমান, তুমি গেছ ওই দ্বীপে? সেখানে ভয়ের কিছু আছে?'

সুলেমান তার দাদুর দিকে তাকাল একবার। তারপর বলল, 'ভয়ের কিছু নেইকো! অন্য কিছু দেখা যায় না। তবে সেখানে গেলি যেন মনটা কেমন কেমন করে। মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

এ তো আরও অদ্ভুত কথা! একটা দ্বীপে গেলে মন খারাপ হয়ে যায়? আমি আর বিমান দু'জনেই হেসে উঠলুম। তাহলে তো যেতেই হবে সেখানে।

বুড়ো মাঝিকে বললুম, 'তুমি যদি না নিয়ে যেতে চাও তো আমাদের ফেরত নিয়ে চলো। আমরা অন্য নৌকো ভাড়া করব।'

বুড়ো মাঝি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি—সে টাকা ফেরত দেওয়া পাপ। তবে চলেন, নিয়ে যাই। পরে যেন আমাকে দোষ দেবেন না। ওরে সুলেমান, ভালো করে টান!'

আকাশে মেঘ আছে বটে কিন্তু জমাট কালো নয়। সেই মেঘের ছায়া পড়েছে জলে। রোদ নেই, বেশ ছায়া ছায়া ছিল। নদীতে বড় বড় ঢেউ। এখানে নদী প্রায় সমুদ্রের মতন। এপার ওপার দেখাই যায় না। পাশ দিয়ে জাহাজ কিংবা স্টিমার গেলে আমাদের নৌকোটা দুলে দুলে উঠছে।

খানিকক্ষণ পরে বুড়ো মাঝি ডান দিকে হাত তুলে বলল, 'ওই ওই দ্যাখেন, আগুনমারির চড়া। দেখলেন তো?'

আমি আর বিমান দু'জনেই ঘাড় ফেরালুম। মনে হল নদীর বুকেই যেন কয়েকটা গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মাটি দেখা যাচ্ছে না।

বুড়ো মাঝি বলল, 'দেখা হল তো? এবারে নৌকা ঘোরাই?'

আমি আর বিমান একসঙ্গে বলে উঠলুম, 'সে কি, আমরা কাছে যাব না !'

'কাছে গিয়ে আর কী করবেন ? আর তো দেখার কিছু নাই !'

বিমান এবারে বেশ রেগে গিয়ে বলল, 'তোমার মতলব কী বলো তো, বুড়ো কর্তা ? ওই দ্বীপে কি তোমার কোনও জিনিসপত্তর আছে ? ওখানে আমাদের যেতে দিতে চাও না কেন ?'

বুড়ো মাঝি আমতা আমতা করে বলল, 'দেখা তো হলই, আরও কাছে গিয়ে লাভটা কী ?'

বিমান বলল, 'লাভ-লোকসানের কথা নয় । আমরা ওই দ্বীপে নেমে হাঁটতে চাই ।'

বুড়ো মাঝি এবারে খুব জোরে হাল ঘোরাতেই নৌকোটা তরতরিয়ে এগিয়ে গেল । দ্বীপটার একেবারে কাছে পৌঁছে নৌকোটার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বুড়ো মাঝি বলল, 'এবারে নামুন !'

সেখানটায় অন্তত একহাঁটু জল । তারপর কাদামাটি । বিমান বলল, 'আর একটু এগোও, এখানে নামব কী করে ?'

বুড়ো মাঝিও এবার রাগে গড়গড়িয়ে বলল, 'আপনাদের বাবু এখানেই নামতে হবে । আমার নৌকা ওই চরের মাটি ছোঁবে না । ও মাটি অপয়া ।'

বিমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি বললুম, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে । আমরা এখানেই নামব ।'

জুতো খুলে রাখলুম নৌকোয় । তারপর হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে নেমে পড়লুম জলে । ছপ ছপ করে এগিয়ে গেলুম দ্বীপটার দিকে । বুড়ো মাঝি নৌকোটাকে আরও গভীর জলের দিকে নিয়ে গিয়ে ঝপাং করে নোঙর ফেলে দিল ।

দ্বীপটাতে ছাড়া ছাড়া গাছপালা রয়েছে । তারপর ধু-ধু করছে বালি । সেই বালিতে কোথাও কোথাও ঘাস হয়েছে । একটা খড়ের চালাঘরও রয়েছে একপাশে । সেই ঘরে কিন্তু কোনও মানুষ নেই ।

কাদামাখা পায়ে ওপরে উঠে আমরা বালিতে পা ঘষে নিলুম । বিমান বলল, 'একটা কিছু ফ্ল্যাগ সঙ্গে নিয়ে এলে হত । তাহলে সেই ফ্ল্যাগটা পুঁতে আমরা এই দ্বীপটা দখল করে নিতুম !'

আমি বললুম, 'তা কী করে হবে ? আগেই তো এখানে মানুষ এসেছে । দেখছিস না, ঘর রয়েছে ?'

আমরা ঘরটার কাছে গিয়ে দেখলুম, তার মধ্যে পাতা আছে একটা খাটিয়া । আর চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে শুকনো গোবর । জায়গাটায় বিচ্ছিরি গন্ধ ।

বিমান বলল, 'এখানে লোকেরা গরু চরাতে আসত । কিন্তু গরুগুলোকে নিয়ে আসত কী করে ?'

আমি বললুম, 'বড় বড় নৌকোয় করে নিয়ে আসত । আমি নৌকোয় গরু-মোষ পার করতে দেখেছি ।'

'তারা এখন আর আসে না কেন ?'

'বর্ষাকাল এসে গেছে, সেইজন্যে এখন আসে না । এ তো সোজা কথা !'

'দ্বীপটা কীরকম চুপচাপ লক্ষ করছিস ? কোনও শব্দ নেই ।'

'মানুষজন নেই, শব্দ হবে কী করে ? তবু আমি কিন্তু একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি । কান পেতে শোন !'

দু'জনেই চুপ করে দাঁড়ালুম। সত্যি, খানিকটা দূরে গাছপালার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ যেন নিঃশ্বাস ফেলছে খুব জোরে। কোনও মানুষ অবশ্য অত জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না।

বিমানের মুখটা শুকিয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে বলল, 'ওটা কিসের শব্দ বল তো, সুনীল ? সাপ নাকি ?'

আমি বললুম, 'সাপ অত জোর ফোঁস ফোঁস করে ?'

'সমুদ্রে বড় বড় অজগর সাপ থাকে শুনেছি। সমুদ্র থেকে যদি এখানে চলে আসে, ওই জন্যেই বোধহয় মাঝিরা এখানে আসতে ভয় পায়।'

'একটা অজগর সাপ থাকলেও সেটাকে মেরে ফেলতে পারত না ? চল, এগিয়ে গিয়ে দেখি।'

'সঙ্গে লাঠি-ফাঠি কিছু একটা আনলে হত।'

'ভয় পাচ্ছিস কেন, বড় সাপ তো আর তাড়া করে এসে কামড়াতে পারে না।'

ডান দিকে খানিকটা দূরে দু-তিনটে বড় বড় গাছের পাশে কিছুটা জায়গা ঝোপঝাড়ের মতন। শব্দটা আসছে সেদিক থেকেই।

আমরা গুটি গুটি পায়ে এগোলুম সেদিকে। শব্দটা মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। কাছাকাছি গিয়ে আমিই ভয় পেয়ে বিমানের হাত চেপে ধরলুম : 'ঝোপের মধ্যে কী যেন বিশাল একটা জন্তু রয়েছে।'

বিমান বলল, 'ওটা তো একটা মোষ ! কাত হয়ে শুয়ে আছে !'

এবারে আর-একটু এগিয়ে আমরা মোষটার মাথাটা দেখতে পেলাম। দেখলেই বোঝা যায়, মোষটা মরে যাচ্ছে। মোষটির দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। ওরকম করুণ চোখ আমি কখনও দেখিনি। মোষটা মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস ফেলছে। তখন তার পেটটা ফুলে উঠছে। ওইটুকুতেই বোঝা যায় যে, ও বেঁচে আছে।

আমি বললুম, 'এতবড় একটা মোষ···কী হয়েছে ওর ? সাপে কামড়েছে ?'

বিমান বলল, 'অসুস্থও হতে পারে। মোষেরাও তো অসুস্থ হয়।'

'কিন্তু কোনও লোকজন নেই। একলা একলা একটা মোষ এখানে পড়ে আছে ?'

'মোষের মালিক বুঝতে পেরেছে, ও আর বাঁচবে না। সেইজন্যে ওকে ফেলে রেখে চলে গেছে।'

আমরা আর ঝোপটার মধ্যে না ঢুকে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলুম। যতবার মোষটার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছি, ততবারই মন খারাপ লাগছে।

বিমান বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ করেছিস, এখানে গাছের পাতাগুলো কেমন যেন শুকনো শুকনো। এখন বর্ষাকাল। বর্ষাকালে তো গাছের পাতা শুকিয়ে যায় না !'

আমি বললুম, 'গাছগুলোর ছাল খসে পড়ছে অনেক জায়গায়। এখানে তো জল নোনা, তাই বোধ হয় গাছের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না।'

বিমান বলল, 'বাজে কথা বকিস না। সুন্দরবনে অত গাছ রয়েছে না ? সেখানকার জল তো আরও বেশি নোনা ! এখানকার গাছগুলোর বোধহয় কিছু একটা রোগ হয়েছে। ওটা কী রে ?'

'ওটা তো একটা পাথর !'

'আশ্চর্য তো ! খুবই আশ্চর্য ব্যাপার !'

'কিসের আশ্চর্য ?'

'তুই বুঝলি না ? গঙ্গানদীর দ্বীপে পাথর আসবে কী করে ?'

'কেন ?'

'এখানে কি কোথাও পাথর আছে ? এদিকে কি কোথাও পাহাড় আছে ? এখানে এত বড় একটা পাথর কে নিয়ে আসবে ?'

পাথরটা এমনিতে খুবই সাধারণ। একটা মাঝারি ধরনের আলমারির সাইজের। যে-কোনও পাহাড়ী জায়গায় গেলে এরকম পাথরের চাঁই পড়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু নদীর ওপরে একটা নতুন দ্বীপে ওরকম পাথর তো দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক নয়।

আমরা পাথরটার কাছে গেলুম। সেটার গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। আমি পাথরটার গায়ে হাত দিয়ে বললুম, 'সমুদ্রের তলায় অনেক জায়গায় ডুবো পাহাড় থাকে। হয়তো গঙ্গার এখানটাতেও ডুবো পাহাড় আছে। দ্বীপটা তৈরি হওয়ার সময় পাথরটা উঠে এসেছে।'

বিমান হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, 'তোর কী বুদ্ধি ! পাথর কি হালকা জিনিস যে জলের ওপরে ভেসে উঠবে ? তাছাড়া দ্যাখ, এর তলায় কিছু ঘাস চাপা পড়ে আছে। এই দ্বীপটা হওয়ার পরে কেউ পাথরটা এখানে এনেছে। কিন্তু শুধু শুধু এতব ঃ একটা পাথরকে এখানে কে বয়ে আনবে ?'

আমি পাথরটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললুম, 'উল্কা নয় তা ! অনেক উল্কার টুকরো পৃথিবীতে এসে পড়ে—'

বলতে বলতে আমি মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলুম।

বিমান দারুণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হল, সুনীল ? কী হল তোর ?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলুম। আমিও অবাক হয়ে গেছি খুব। কী হল কিছুই বুঝতে পারছি না। এরকম তো আমার কখনও হয় না !

বিমান আমায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে লাগল, 'কী হল রে, কী হল ?'

আমি বললুম, 'জানি না। হঠাৎ কেমন মাথাটা ঘুরে গেল।'

'চুপ করে বসে থাক, উঠিস না।'

'আমার কিছু হয়নি।'

'তবু বসে থাক। একটা জিনিস দ্যাখ, সুনীল, এই পাথরের নিচের ঘাসগুলো দ্যাখ। কেমন যেন খয়েরি হয়ে গেছে। ঘাস চাপা পড়লে হলদে হয়ে যায়, কিন্তু খয়েরি ? তুই কখনও খয়েরি ঘাস দেখেছিস ?'

'এ বোধহয় অন্য জাতের ঘাস।'

'পাশের এই গাছটা দ্যাখ। এই গাছটার গা-টা লাল। আমি লাল রঙের গাছও কখনও দেখিনি।'

'বিমান, ওই যে মোষটা মরে যাচ্ছে, ওর জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে রে ! এমনি এমনি একটা মোষ মরে যাচ্ছে, ইস্ ! মোষটাকে ওর মালিক যে কেন ফেলে গেল !'

'বিমান, আমার ইচ্ছে করছে এখানে শুয়ে পড়তে।'

'মন্দ বলিসনি ! এখানে খানিকক্ষণ শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিলে বেশ হয়।'

'যদি নৌকোটা চলে যায় !'

'ইস্, গেলেই হল, পুরো পয়সা দিয়েছি না ! তাছাড়া যদি যায় তো চলে যাক। আমরা এখানেই থেকে যাব।'

হঠাৎ আমি লাফিয়ে উঠে পড়লুম। দারুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'বিমান, বিমান, এই

পাথরটা জ্যান্ত !'

বিমান বলল, 'কী বলছিস ? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে !'

'না রে, আমি সত্যি দেখলুম ! পাথরটা নড়ে উঠল ।'

'কী বলছিস যা-তা ! পাথরটা নড়বে কী করে ?'

'আমি স্পষ্ট দেখলুম, পাথরটার পেটের কাছে একবার যেন চুপসে গেল, আবার ফুলে উঠল । ঠিক ব্যাঙের মতন !'

'দুর ! পাথরের আবার পেট কী ? তুই ভুল দেখেছিস ।'

'মোটেই ভুল দেখিনি !'

বিমান গিয়ে পাথরটার গায়ে হাত দিতেই আমি বিমানের অন্য হাতটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনলুম ওকে । আমার বুকের মধ্যে দুম দুম আওয়াজ হচ্ছে । ওই পাথরটার গায়ে হাত দিয়েই আমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলুম । ওই পাথরটার মধ্যে কিছু একটা ব্যাপার আছে !

দূরে শুনতে পেলুম বুড়ো মাঝি আর সুলেমান চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে, 'বাবু ! বাবু !'

আমি বললুম, 'চল, বিমান, নৌকোয় ফিরে যাই ।'

বিমান বলল, 'নাঃ, এক্ষুনি যাব না । এখানে শুয়ে থাকব বললুম যে !'

'না, আমার মোটেই ভালো লাগছে না ! চল, নৌকোয় ফিরে যাই ।'

বিমানকে প্রায় জোর করেই আমি টানতে টানতে নিয়ে চললুম । তারপর নৌকোয় উঠেই বুড়ো মাঝিকে বললুম, 'চলো, শিগগির চলো !'

নৌকোয় উঠে বিমান লম্বা হয়ে শুয়ে রইল । তার চোখ দুটো ছলছল করছে । ভাঙা গলায় বলল, 'আমার কিছুই ভালো লাগছে না রে !'

সুলেমান আমাদের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে । আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'ওই দ্বীপে গেলে তোমাদের কী হয় বলো তো ?'

সুলেমান বলল, 'কী জানি, বাবু ! ওখানে গেলেই মনটা যেন কেমন কেমন করে । কাজ করতে ইচ্ছে করে না । শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে ।'

বুড়ো মাঝি বলল, 'বাবু । আগে তো আমরা ওই চরে যেতাম । বেশি ঝড়-বৃষ্টি হলে ওখানে নৌকা বেঁধে চালাঘরটায় বসে জিরোতাম । অনেক লোক আগে ওখানে গরু-মহিষ চরাতে আসত । এখন আর কেউ যায় না ।'

'কেন যায় না বলো তো ?'

'ওখানে গেলেই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে । গরু-মোষগুলোও আলসে হয়ে পড়ে । কেমন যেন মনমরা লাগে ।'

'আমাদেরও সেইরকম লাগছিল । কিন্তু কেন হয় ওরকম বলো তো ?'

'কী জানি ! গাছপালাগুলোও কেমনধারা শুকিয়ে যাচ্ছে দেখলেন না ? ও দ্বীপে খারাপ নজর লেগেছে ।'

'ওখানে একটা বড় পাথর আছে দেখেছ ? আগে ওটা ছিল ?

'না, আগে ছিল না ! এই তো মাসখানেক ধরে দেখছি ।'

'কী করে পাথরটা ওখানে এল ?'

'কেউ তা জানে না । কেউ কেউ বলে ওটা আকাশ থেকে খসে পড়েছে ।'

আমার মাথাটা এখনও দুর্বল লাগছে । আমি আর কথা বলতে পারলুম না । শুয়ে পড়লুম বিমানের পাশে ।

হলদিয়ায় ফিরে এসে আমরা দু'জনেই সোজা চলে গেলুম বিছানায়। রাত্তিরে কিছু খেতেও ইচ্ছে করল না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলুম। তার মধ্যে বারবারই দেখতে লাগলুম সেই পাথরটাকে। ঠিক একটা ব্যাঙের মতো তার পেটটা একবার চুপসে যাচ্ছে, একবার ফুলছে। একটা জ্যান্ত পাথর। আমি শিউরে শিউরে উঠতে লাগলুম!

সকালবেলা বিমানের দাদা স্বপনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোদের কাল কী হয়েছিল? সন্ধে থেকে খালি ঘুমোচ্ছিলি।'

স্বপনদাকে সব কথা বলতেই হল। স্বপনদা সবটা শুনে হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'গাঁজাখুরি গল্প বলার আর জায়গা পাসনি! একটা জ্যান্ত পাথর··· সেটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে মন খারাপ হয়ে যায়, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। দুর! যতসব!'

বিমান বলল, 'দাদা, আমি পাথরটাকে নড়তে দেখিনি। সুনীল দেখেছে। কিন্তু আমারও ওখানে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল।'

'বেশ করেছিল! শুয়ে থাকলেই পারতিস।'

'তাহলে আমাদেরও নিশ্চয়ই ওই মোষটার মতন অবস্থা হত।'

আমি বললুম, 'স্বপনদা, নৌকোর মাঝিরাও কেউ ওই দ্বীপটায় এখন যেতে চায় না। ওরাও ভয় পায়। পুলিশে একটা খবর দেওয়া দরকার।'

স্বপনদা বললেন, 'পুলিশও তোদের কথা শুনে আমার মতন হাসবে। দেখবি, মিঃ দাসকে ডাকব?'

হলদিয়ার এস ডি পি ও মিঃ দাস স্বপনদার বন্ধু। স্বপনদা তাঁকে টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'মিঃ দাস, একবার আমার বাড়িতে চলে আসুন, ব্রেকফাস্ট খেয়ে যাবেন। আর একটা মজার গল্প শোনাব।'

দশ মিনিটের মধ্যেই মিঃ দাস এসে গেলেন। তিনি বললেন, 'শুধু এক কাপ চা খাব। বড্ড কাজ পড়েছে, এক্ষুনি যেতে হবে। কাল রাত্তিরে একটা লঞ্চডুবি হয়েছে গঙ্গায়।'

স্বপনদা বললেন, 'বসুন, বসুন। কাল দুপুরে এই দুই শ্রীমান নৌকো ভাড়া করে গিয়েছিল আগুনমারির চরে। সেখানে নাকি ওদের এক সাঙ্ঘাতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। ওরা দু'জনে—'

স্বপনদাকে থামিয়ে দিয়ে পুলিশসাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা দু'জনে কাল আগুনমারির চরে গিয়েছিলে? আশ্চর্য ব্যাপার! ওই দ্বীপটার পাশেই তো কাল রাত্তিরে লঞ্চটা ডুবেছে। ঝড়-বৃষ্টি কিছু নেই। শুধু শুধু একটা লঞ্চ ডুবে যাওয়া খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।'

স্বপনদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেউ মারা গেছে?'

পুলিশসাহেব বললেন, 'নাঃ। মরেনি কেউ। সবাইকেই উদ্ধার করা গেছে। আমাদের পুলিশের লঞ্চ খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছয়। কিন্তু লঞ্চটা যে কী করে ডুবল, তা ওরা কেউ ঠিক ঠিক বলতে পারছে না। সবাই বলছে, কী যে হল কিছুই জানি না। হঠাৎ একটা ধাক্কাতে লঞ্চটা কেঁপে উঠল, তারপরই হুড়মুড়িয়ে জল ঢুকতে লাগল।'

স্বপনদা বললেন, 'লঞ্চটা একদম ডুবে গেছে বলতে চান?'

পুলিশসাহেব বললেন, 'হ্যাঁ। সেটা তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। ওই লঞ্চের একজন খালাসী শুধু অদ্ভুত একটা গল্প বলছে। আগুনমারির চর থেকে একটা মস্তবড় পাথর নাকি প্রচণ্ড জোরে উড়ে এসে লঞ্চটাকে ফুটো করে দেয়। এরকম গাঁজাখুরি কথা কেউ

শুনেছে ? গঙ্গার ওপরে দ্বীপ। সেখানে পাথর আসবে কী করে ? যদিও বা পাথর থাকে, সেটা কেউ না ছুড়লে এমনি এমনি উড়তে উড়তে আসবেই বা কী করে ?'

স্বপনদা বললেন, 'এরাও ওই দ্বীপে একটা বড় পাথর দেখেছে বলছে।'

পুলিশসাহেব বললেন, 'ভোরবেলা আমি আমার লঞ্চে সেই দ্বীপটা ঘুরে দেখে এসেছি। সেখানে পাথর-টাথর কিছু নেই। মানুষজনের কোনও চিহ্ন নেই। শুধু একটা মরা মোষ রয়েছে দেখলুম।'

আমি আর বিমান চোখাচোখি করলুম। আগুনমারির চরের পাথরটাই যে লঞ্চটাকে ডুবিয়েছে, তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই!

হলদিয়া থেকে চলে আসার আগের দিন স্বপনদা তার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। অমিত সেন। ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

স্বপনদা বলল, 'অমিত, এই যে, এরা দু'জনেই সেই ভুতুড়ে পাথর দেখেছে।'

তারপর আমাদের বলল, 'অমিতকে তোদের গপ্পোটা শুনিয়েছিলাম। ওরও আবার নানান খামখেয়ালিপনা আছে। কীসব ভিনগ্রহী-টিনগ্রহীর কথা বলছিল। তোদের সঙ্গে কথা বলতেও চেয়েছিল। নে এবার—'

অমিতদা আমাকে আর বিমানকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। পাথরটা কীরকম দেখতে, কতবড়, কী রঙ, কোনও গন্ধ আছে কি না। তারপর লঞ্চডুবির ঘটনা নিয়েও অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন।

আমরা যতটা সম্ভব মনে করে করে জবাব দিচ্ছিলুম। লক্ষ করলুম, স্বপনদা কৌতুকের চোখে আমাদের দেখছে।

সব শুনে-টুনে অমিতদা বললেন, 'পাথরটা উল্কাপিণ্ড হতে পারত। কিন্তু উল্কাপিণ্ড তো নড়ে না, কাউকে ঘুমও পাড়ায় না। তাহলে আর-একটা জিনিস হওয়া সম্ভব। অবশ্য স্বপন হয়তো আজগুবি বলে আমাকে খ্যাপাবে—'

স্বপনদার দিকে একবার দেখে নিয়ে অমিতদা আবার বললেন, 'জানো তো, আমাদের পৃথিবীর সমস্ত লাইফ ফর্মই কার্বন বেস্‌ড। মানে, গাছপালা, মানুষ, পশু-পাখি সবারই মূল হচ্ছে কার্বন পরমাণু। কার্বন থেকে হয় অ্যামিনো অ্যাসিড, আর এই অ্যাসিডের অণুগুলো একে অপরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে তৈরি হয় পলিপেপ্‌টাইড চেইন—এরাই তৈরি করে প্রোটিন। প্রোটিন ছাড়া আমরা কেউ বাঁচতে পারি না। কার্বন ছাড়া আর একটিমাত্র এলিমেন্ট এরকম চেইন তৈরি করতে পারে। সেটা হল সিলিকন। বালি, পাথর এসবের মধ্যে সিলিকন থাকে।'

স্বপনদা হেসে বলল, 'তার মানে ওই পাথরটা সিলিকন বেস্‌ড লাইফ ফর্ম ?'

অমিতদা সহজ গলায় বললেন, 'তুই যতই ঠাট্টা কর, হতেও তো পারে। পৃথিবীতে সিলিকন বেস্‌ড লাইফ নেই, কিন্তু অন্য কোনও গ্রহেও যে নেই এ-কথা এখনও প্রুফ করে কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া বিমান তো বলছে ওই দ্বীপের গাছের পাতা শুকনো, ছাল খসে পড়েছে—'

স্বপনদা বলল, 'তাতে কী ?'

'বুঝতে পারলি না ? যদি কোনও স্পেসশিপ এসে ওই দ্বীপে ল্যান্ড করে থাকে তাহলে যেখানে নামবে তার আশপাশের গাছপালা পুড়ে তো যাবেই। হয়তো ওই পাথরটা অন্য

কোনও গ্রহ থেকে মহাকাশযানে চড়ে উড়ে এসেছে আমাদের পৃথিবীতে। সেই গ্রহের সব প্রাণীই হয়তো সিলিকন পরমাণু থেকে তৈরি। তারপর বিমান-সুনীলের যেরকম ঘুম পাচ্ছিল, তাতে মনে হয়, বাইরের চেহারাটা পাথরের মতো হলেও প্রাণীটার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। তারপর ধর, ওই লঞ্চডুবির ঘটনাটা— । নাঃ, স্বপন, তুই যা-ই বল, আজ আমি আগুনমারির চরে একবার যাব। তোরাও চল।'

আমি আর বিমান তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি। স্বপনদাও রাজি হল। বোধহয় আমাদের গল্পটা যে আগাপাস্তলা আজগুবি সেটা হাতেনাতে দেখিয়েদেওয়ার জন্যে।

বেলার দিকে নৌকো ভাড়া করে আমরা আগুনমারির চরে পৌঁছলুম। পাথরটা যে ওখানে আর নেই তা জানি। মিঃ দাসের কাছেই শুনেছিলুম। কিন্তু দেখলুম ওটার কাছাকাছি গাছপালা আর ঘাস যেন আরও পুড়ে গেছে। স্বপনদা অমিতদাকে ঠাট্টা করল। অমিতদা বিড়বিড় করে বলল, 'চলে গেছে। কিন্তু স্পেসশিপটা ও কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল কে জানে!'

আমরা আগুনমারির চর থেকে ফিরে এলুম। ফেরার সময় কথা বলতে ভালো লাগছিল না।

□ ১৯৮৩





হিমশিশু

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত অ্যাডভোকেট মণিশঙ্কর ব্যানার্জি আদালত-ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই শ'খানেক ফটোগ্রাফারের এক জনতা তাঁকে ঘিরে ফেলল। তাছাড়াও হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সংবাদপত্র, বেতার ও দূরদর্শনের প্রতিনিধিরা, বৈজ্ঞানিক, গবেষক, ডাক্তার, সার্জন ও অগণিত কৌতূহলী মানুষ। অ্যাডভোকেট ব্যানার্জির জুনিয়রেরা তাঁকে ঘিরে এক ব্যূহ রচনা করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু জনতা চায় তাঁদের গতিরোধ করতে—এই ধাক্কাধাক্কির মধ্যে কোন সময় যে বাইরে ছিটকে এসে পড়েছি নিজেই বুঝতে পারিনি।

'আর-একটু হলেই চশমাটা গিয়েছিল—' পাশ থেকে কে একজন মন্তব্য করলেন।

ফিরে দেখি আমারই মতো কালো কোট-পরা আর একজন। চশমাটা ঠিক করে তাকালাম। আরে, এ যে নিরুপম! নিরুপম চ্যাটার্জি। কো-অপারেটিভ আইনের ক্ষেত্রে এই বয়েসেই যথেষ্ট নাম করেছে।

'তুমিও ছিলে নাকি? দেখতে পাইনি তো। যা ভিড়!'

বললাম বটে, কিন্তু এই মন্তব্যের কোনও অর্থ নেই। এই শতাব্দীর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর মামলা শুনতে ভিড় যে হবেই সে-কথা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে এই কেস—এই নিয়ে আলোচনা, লেখালিখি, তর্কাতর্কির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সকলের মুখে শুধু একই কথা। ওপর থেকে দেখতে গেলে মামলাটি নেহাতই পারিবারিক এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত। কিন্তু আসল ব্যাপারটি যে তত সহজ নয় তা সকলেরই জানা। এই মামলার সঙ্গে যে-গুরুতর প্রশ্ন জড়িত তা সমস্ত মানবসভ্যতার মূলাধরে টান দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

সন্তান জন্মের ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা উনিশশো আটাত্তরের পর থেকেই খুব বড় হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে এ-নিয়ে কিছু দ্বিধা থাকলেও এখন ভবিষ্যৎ সন্তানের প্রকৃতি নিরূপণে ও গঠনে ক্রমেই সক্রিয়ভাবে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে আধুনিকতম জেনেটিক প্রযুক্তির। মোটামুটিভাবে কম্পিউটার প্রযুক্তির মতো এটাও জীবনযাপনের অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছিল, যদিও প্রথম দিকে দু-চারজন বলেছিলেন, 'খোদার ওপর খোদকারি

করা হচ্ছে—এর ফলে কী অনাসৃষ্টি দেখা দেবে কে জানে ।' কিন্তু কী হতে পারে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামানো পছন্দ করে না । উপস্থিত যে-সুবিধেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় । তবে এই প্রথম রাধেশ্যাম রাম বনাম চিরঞ্জীব রামের মামলা একটা মৌলিক প্রশ্ন মানুষের সামনে তুলে ধরল । সুতরাং এই নিয়ে যে-অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি । বৈজ্ঞানিক মহলে যে এর ফলে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দেবে সে-কথা বলাই বাহুল্য । তবে এর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে বৃহত্তর ক্ষেত্রে—উত্তরাধিকার আইনের মূল ধরেও টান দিয়েছে এই মামলা ।

বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রীঘনশ্যাম রামের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র রাধেশ্যামের অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেছেন ঘনশ্যামের ভ্রাতুষ্পুত্র চিরঞ্জীব রাম । স্বর্গত ঘনশ্যাম রাম একজন কোটিপতি ছিলেন বললে কম করে বলা হয় । গোটাকয়েক জাহাজ কোম্পানি, গুটি চার ভারি শিল্পের কারখানা, একটি বিমান সংস্থা ও ছোট-বড় বহু প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন বলেই তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্ন সাধারণ লোকের মনে কৌতূহল জাগাবে এটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু চিরঞ্জীবের অভিযোগের প্রকৃতি বড় অদ্ভুত ।

গত ক'দিনের শুনানির ঘটনাগুলো আমার মনে পড়ছিল ।

বাদী পক্ষের উকিল বললেন, 'ধর্মাবতার, পরলোকগত ঘনশ্যাম রামের স্ত্রী শ্রীমতী চারুলতা যে রাধেশ্যামের গর্ভধারিণী—এ-কথা আমরা অস্বীকার করছি না । কিন্তু আপনি অবগত আছেন যে হিমায়ন পদ্ধতিতে ভ্রূণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিখুঁত হওয়ার পর থেকে গর্ভধারিণীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বহীন হয়ে গেছে । সুতরাং ঘটনার উৎস সন্ধানে আমাদের যেতে হবে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগেকার একটি সকালবেলায়—যেদিন ঘনশ্যাম রাম ও তাঁর স্ত্রী গিয়েছিলেন "টিউব বেবি সেন্টার"-এ ডাঃ ত্রিবেদীর কাছে—'

এইখানে বিবাদী পক্ষের উকিল আপত্তি জানালেন : 'ধর্মাবতার, এই বক্তব্য অপ্রাসঙ্গিক । মূল প্রশ্ন থেকে অন্য দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করা দুরভিসন্ধিমূলক ।'

বিচারক তাঁর এই আপত্তি অগ্রাহ্য করলেন ।

মণিশঙ্কর ব্যানার্জি আবার আরম্ভ করলেন, 'ধর্মাবতার, আসুন আমরা অতীতের পরদা তুলে একবার সেই দিনটির প্রতি দৃষ্টিপাত করি যখন ডাঃ ত্রিবেদীর সঙ্গে আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করতে যান শ্রীঘনশ্যাম রাম ও শ্রীমতী রাম । কী উদ্দেশ্যে তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন, এটাই আজকের মামলার সঙ্গে জড়িত মূল প্রশ্ন । এই প্রশ্নের ওপর আলোকপাত করার জন্যে আমি প্রধান সাক্ষী ডাঃ মহেশপ্রসাদ ত্রিবেদীকে আহ্বান করছি ।'

ডাঃ ত্রিবেদী কাঠগড়ায় এলেন । আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নিলেন । তারপর সওয়াল শুরু হল ।

'ডাঃ ত্রিবেদী, আপনি হিমায়িত ভ্রূণ সংরক্ষণের ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি—এ-কথা কি ঠিক ?'

বিবাদী পক্ষের উকিল তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আপত্তি জানাচ্ছি, ধর্মাবতার । উনি সাক্ষীর মুখে উত্তর জোগাচ্ছেন ।'

বিচারক বললেন, 'মিঃ ব্যানার্জি, আপনি প্রশ্নটা এভাবে করতে পারেন না ।'

'বেশ । ডাঃ ত্রিবেদী, হিমায়িত ভ্রূণ সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে কি আপনি কাজ করেছেন ?'

'হ্যাঁ, করেছি ।'

'এই অভিজ্ঞতা কতদিনের ?'

'প্রায় তিরিশ বছরের।'

'এই কাজে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে আপনি কি কোনও স্বীকৃতি পেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কী ধরনের স্বীকৃতি ?'

'এদেশের বিভিন্ন সংস্থা ছাড়াও মস্কো, কিয়েভ, হাভানা ও হামবুর্গ থেকে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের পদক ও মানপত্র। সবগুলোর কথা বলতে অনেক সময় লাগবে। আমার নাম উনিশশো একানব্বই সালের নোবেল পুরস্কারের জন্যে প্রস্তাবিত হয়েছিল।'

'আপনার গবেষণার ক্ষেত্র সম্পর্কে সহজ করে সংক্ষেপে একটু জানাবেন ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনারা জানেন মানুষের দেহের বাইরে ডিম্বকোষকে নিষিক্ত করা নতুন কোনও ঘটনা নয়। ১৯৬৯ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রথম এই কাজে সফল হন। এই সঞ্জীবিত ভ্রূণ চারদিন পর্যন্ত জীবিত ছিল। পরে এই নিয়ে আরও কাজ হয়েছে। ক্রমে মানবদেহের বাইরে নিষিক্ত ডিম্বকোষকে আবার দেহে প্রবেশ করিয়ে শিশুর জন্ম হয়েছে—এসব এখন ইতিহাস।'

উকিল প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তাহলে গবেষণার দ্বারা এমন কী নতুন জিনিস করলেন যা আগে হয়নি ? নিষিক্ত ডিম্বকোষ মাতৃগর্ভের বাইরেই বেড়ে উঠে পূর্ণ অবয়ব নেবে এমন কোনও প্রচেষ্টা করেছিলেন কি ?'

ডাঃ ত্রিবেদী স্পষ্টত বিরক্ত হলেন। বললেন, 'না, সেরকম চেষ্টা করিনি। প্রাণ উন্মেষের পর আবার ডিম্বাশয়ে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে-চারদিন সময় পাওয়া যায় তাই অনেক। তার মধ্যে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি। আমার গবেষণা এই বিষয়ে।'

'আপনি কি গবেষণায় সফল হয়েছিলেন ?'

'একশোর মধ্যে একশোটি ক্ষেত্রেই।'

'ঠিক কী উদ্দেশ্য ছিল আপনার গবেষণার ?'

'বিকলাঙ্গ অথবা বুদ্ধিহীন শিশুর বৃদ্ধি রোধ করে তাকে সবল, সুস্থ ও বুদ্ধিমান করে তোলা।'

'এইসব পরীক্ষা করা হত আপনাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ?'

'হত কেন, এখনও হয়।'

'এতে আপনারা জনসাধারণের, বিশেষ করে সন্তান-ধারণক্ষম দম্পতিদের কাছ থেকে কীরকম সাড়া পেয়েছিলেন ?'

'বিপুল ভাবে। আমাদের কাছে নানারকম অনুরোধ নিয়ে যাঁরা আসেন তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করে রাখা হয়। নিষিক্ত ভ্রূণগুলি হিমায়িত কক্ষে রাখবার জন্যে আমাদের তিনটি আলাদা নতুন বাড়ি তৈরি করতে হয়। তবু আবেদন বেড়েই চলেছে। আমরা জায়গায় কুলিয়ে উঠতে পারছি না।'

'শ্রীঘনশ্যাম রাম ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন এইরকম দম্পতিদের একজন ?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'যেদিনের কথা হচ্ছে সেদিন ঘনশ্যাম রামের ক'টার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ?'

'সাড়ে এগারোটায়। কারণ বারোটার সময় আমার এয়ারপোর্ট যাওয়ার ছিল।'

'পঁচিশ বছর আগের ব্যাপার আপনার এত স্পষ্ট মনে আছে ?'

ডাঃ ত্রিবেদী হাসলেন : 'এর সব কৃতিত্ব আমাদের সেন্টারের কম্পিউটার ডেটাবেসের।'

'ঘনশ্যাম কি ঠিক সময়েই আসেন, না আপনাকে দেরি করিয়ে দেন ?'
'না, ঠিক সময়ে আসেন। প্লেন ধরতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি।'
'ঘনশ্যাম তাহলে আসেন সাড়ে এগারোটায় ?'
'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'
'তার আগে আপনি কী করছিলেন ?'
'অন্য একজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলছিলাম।'
'কার সঙ্গে ?'
ডাঃ ত্রিবেদী গম্ভীর মুখে চুপ করে রইলেন।
'বলুন !'
'মনে পড়ছে না।'
'কেন, এ-ব্যাপারে আপনি ওই ডেটাবেসের সাহায্য নেননি ? চেষ্টা করুন, ঠিকই মনে পড়বে।'
'বোম্বাইয়ের একজন চিত্রতারকার।'
'তাঁর সঙ্গে আপনি কতক্ষণ কথা বলেন ?'
'বেশ খানিকটা সময়। মিনিট কুড়ি হবে।'
'কথাবার্তা কি বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে হচ্ছিল ?'
ডাঃ ত্রিবেদী চুপ করে রইলেন।
'আমি যদি বলি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আপনি খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, তাহলে কি ঠিক বলা হবে ?'
'তিনি যা চাইছিলেন তা নীতিবিরুদ্ধ।'
'আপনি কি তাঁর সঙ্গে তর্ক করেন ?'
'একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল।'
'সেই সময় আপনার একটা ফোন আসে।'
'হ্যাঁ।'
'কার কাছ থেকে ?'
'আমাদের প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরের কাছ থেকে।'
'তার সঙ্গে আপনাদের আলোচনার কোনও সম্পর্ক ছিল ?'
'হ্যাঁ, ছিল।'
'চিত্রতারকাটির সঙ্গে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কোনও সম্পর্ক ছিল ?'
'ছিল।'
'কীরকম সম্পর্ক ?'
'উনি আমাদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। তাছাড়া হিমায়ন গবেষণায় তাঁর আলাদা রিসার্চ গ্রান্টও আছে।'
'কত টাকার ?'
'মোটারকম। ঠিক সংখ্যাটা বলতে পারব না।'
'সুতরাং তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি করা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয়নি এই কথাই কি ডিরেক্টর আপনাকে ফোনে বলছিলেন ?'
এখানে বিবাদী পক্ষের উকিল আর-এক দফা আপত্তি জানালেন। আপত্তি অগ্রাহ্য হল।
মণিশঙ্কর আবার সওয়াল শুরু করেন : 'চিত্রতারকাটি চলে যাওয়ার কতক্ষণের মধ্যে

ঘনশ্যাম রাম আপনার ঘরে ঢোকেন ?'

'এক মিনিটের মধ্যে।'

'ঠিক তার আগেই আপনি কথা কাটাকাটি করে উত্তেজিত অবস্থায় ছিলেন ?'

'তা বলতে পারেন।'

'ঘনশ্যাম যে-হিমায়িত ভ্রূণটি নেওয়ার জন্যে এসেছিলেন তার নম্বর কত ?'

'এইচ আর থ্রি-নট-থ্রি।'

'তাঁদের সঙ্গে আপনার কতক্ষণ কথাবার্তা হয় ?'

'বেশিক্ষণ নয়। কথা বলার কিছু ছিল না। ওঁদের অনুরোধ মতো ট্রিট করা ভ্রূণটি ওঁরা নিতে এসেছিলেন।'

'আপনি তাহলে কালবিলম্ব না করে এইচ আর তিনশো তিন তাঁদের হাতে তুলে দেন ?'

'আপনি তো অনেক খবরই জানেন। তবে এখানে একটা ভুল করছেন। হিমায়িত ভ্রূণটি ওইভাবে কেউ কারও হাতে তুলে দেয় না। নাগালের বাইরে নম্বর আঁটা বোতলে সেগুলো খুবই সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা থাকে। নম্বরের প্যানেলটি আমার ঘরে আছে। আমি নির্দিষ্ট বোতাম টিপে দিলে সঙ্গে সঙ্গে একতলার কাউন্টারে একটি আলো জ্বলে। তারপর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় বোতলসুদ্ধ ভ্রূণটি পরবর্তী পরীক্ষাগারে চলে যায়। জনক দম্পতিকে তখন সেখানে পাঠানো হয়।'

'এমনও তো হতে পারে যে উত্তেজনাবশে আপনি তিনশো তিন নম্বরের বোতাম না টিপে তার পরেরটির বোতাম টিপেছিলেন ?'

বিবাদী পক্ষের উকিল লাফিয়ে উঠে আপত্তি জানালেন।

মণিশঙ্কর প্রশ্ন করলেন, 'এরকম ভুল যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ রাখার জন্যে কী ব্যবস্থা আছে আপনাদের ?'

'একজন সহকারী সেটি চেক করে দেন।'

'তিনি তখন সেখানে ছিলেন ?'

'না।'

'কেন ছিলেন না ?'

'তার আগেই আমি তাকে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম।'

'কোনও বিশেষ কারণে ?'

'আগের ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলার সময়ে সেখানে অন্য কেউ থাকা ঠিক হত না।'

'তাহলে ঘনশ্যাম যখন এলেন তখনও আপনার সহকারী ফেরেননি ?'

'না।'

'আপনি বোতাম যখন টেপেন তখন চেক করার জন্যে তিনি উপস্থিত ছিলেন না ?'

'না। আসলে বোতামটা তারই টেপার কথা, আমার নির্দেশ মতো।'

'তাহলে সেদিন তার কাজটা আপনাকেই করতে হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ, আমার প্লেন ধরার তাড়া ছিল।'

'চেক করার আর কী উপায় আছে ?'

'বোতাম টিপলে ল্যাবরেটরি হলের ডিজিটাল কাউন্টারে আলো জ্বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখানে নম্বরটি রেকর্ড হয়ে যায়।'

'তাহলে ডাঃ ত্রিবেদী, আমি যদি এমন প্রমাণ হাজির করতে পারি যে, সেদিন এইচ আর তিনশো তিনের বদলে এইচ আর তিনশো আটের ডেলিভারি নেন ঘনশ্যাম রাম।

উত্তেজনার বশে এবং তাড়াহুড়োয় আপনি ইংরেজি তিন আর আটের মধ্যে গোলমাল করে ফেলেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য গোলমাল, কিন্তু তার পরিণতি তো সামান্য নয়। নিজের সন্তান বলে যে-ভ্রূণটি গর্ভে ধারণ করলেন শ্রীমতী চারুলতা রায় সেটি আসলে অন্য কারও সন্তান।'

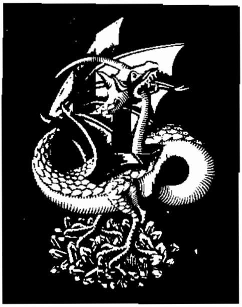
এরপরে আদালত-কক্ষে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন এক মধ্যবয়েসী ভদ্রমহিলা। একই সঙ্গে জনাকুড়ি লোক তাঁর দিকে ছুটে গেলেন। 'ডাক্তার, ডাক্তার' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন তাঁর পরিবারের লোকেরা। কেউ বললেন, 'জল চাই, জল, ঠাণ্ডা জল!' কেউ কেউ ধাক্কা মেরে ভিড় সরানোর বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন। এরই মধ্যে তেইশ-চব্বিশ বছরের এক যুবক লাফিয়ে উঠে আক্রমণ করতে গেল ডাঃ ত্রিবেদীকে। বাকি লোকেরা তাকে বাধা দিতে গিয়ে দু-চারটে কিল-চড় খেয়ে গেলেন। সকলে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। এই বিচিত্র পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে আদালত মুলতুবি ঘোষণা করা হয়ে গেল।

আমি কোট থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে নিরুপমকে বললাম, 'কেসটা এবারে কোন দিকে টার্ন নেবে মনে হয়?'

নিরুপম নির্বিকার গলায় বলল, 'সবই নির্ভর করছে মণিশঙ্কর ব্যানার্জির প্রমাণের ওপর।'

ততক্ষণে ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। তবু গাছের তলায়, এখানে-ওখানে, কিছু মানুষের জটলা। মণিশঙ্কর ব্যানার্জির গাড়ি ফটক পেরিয়ে অদৃশ্য হল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল ইনি তো চিরকাল থাকবেন না। কোনও মানুষই চিরকাল থাকে না। কিন্তু কে বলতে পারে যে, এইসব ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না! ভুল তো মানুষমাত্রেরই হয়, যন্ত্রেরও হয়। চোখের সামনে ভেসে উঠল হিমায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ল্যাবরেটরিতে লেবেল আঁটা বোতলে সারি সারি সঞ্জীবিত প্রাণের কোরক—অপেক্ষা করে আছে সঠিক মুহূর্তের জন্যে। এই অজাত শিশুগুলোকে যথাস্থানে পাঠানোর দায়িত্ব—এ তো বড় অসমসাহসিক প্রচেষ্টা। আবার যদি ভুল-ভ্রান্তি ঘটে, দেরিতে হলেও তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে কি সব সময় মণিশঙ্করের মতো দুঁদে অ্যাডভোকেটরা প্রস্তুত থাকবেন?

□ ১৯৮০



সময়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সোমনাথের বয়েস মাত্র বাইশ। এই বয়েসে সব কিছুই বাড়তি থাকে মানুষের। শক্তি, উৎসাহ, আবেগ। সোমনাথ একটি দুর্দান্ত ফান্ডাওয়ালা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল একতরফা। মেয়েটির নাম অপরা। আলাপ নেই। পাড়ার সবচেয়ে ঘ্যাম বাড়ি হল চৌধুরিদের। চারদিকে প্রকাণ্ড বাগান, টেনিস লন, সুইমিং পুলওয়ালা বাড়ি। সাতখানা গাড়ি রাখার মতো প্রশস্ত গ্যারেজ। সাতটা বিদেশি কুকুর। এই বাড়ির মেয়ে অপরা জানেই না যে, গলির ভেতরে একটা আধভাঙা বাড়ির একতলায় সোমনাথ নামক একজন যুবক থাকে। তার বাবা স্কুলমাস্টার এবং সে বেকার। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে সে একটা সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লায়েন্সের ছোট ঘরোয়া কারখানা খুলবে বলে কিছুদিন যাবৎ ঘোরাঘুরি করছে, চোখে তার দেদার স্বপ্ন।

এই সময়ে বজ্রপাতের মতো এই প্রেম।

সোমনাথ একবার ঠিক করল, অপরার চোখে পড়ার জন্য ওর গাড়ির সামনে ঝাঁপ দেবে। কিংবা হিন্দি সিনেমার মতো ওদের পাঁচিলের ওপর উঠে গান গাইবে। কিংবা অপরার চোখের সামনে নিজের বুকে ছোরা বসিয়ে আত্মহত্যা করবে।

শেষ অবধি সে অপরাকে একখানা চিঠি লিখল। খুবই ভদ্র চিঠি এবং বেশ সাহিত্য রসসিক্ত। জবাব পাওয়ার আশা ছিল না, কিন্তু জবাব এল। অপ্রত্যাশিত, একটু কাঁপা কাঁপা ভীরু হাতের লেখা। গঙ্গার ধারে নির্জন একটা জায়গায় শনিবার বিকেল ছ'টায় সোমনাথকে থাকতে লিখেছে।

নব্য যুবা সোমনাথের একবারও মনেই হল না যে, এটা একটা ফাঁদ হতে পারে। সে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে, তার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। প্রচণ্ড টেনশনে সে কয়েক গ্লাস জল খেল। এবং সারাদিন উড়ুউড়ু মনে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াল।

যে-জায়গাটা নির্দিষ্ট করা ছিল সেটা খিদিরপুর ডকের কাছাকাছি। খুবই নির্জন এবং সন্ধের পর রীতিমত ভয়াবহ জায়গা। এ-জায়গাটা সোমনাথের সম্পূর্ণ অচেনা। এরকম একটা জায়গা অপরা কেন বেছে নিল তা সোমনাথ বুঝতে পারল না।

সোমনাথের পুঁজি খুবই সামান্য। সে দুটো টিউশনি করে তাই দিয়ে মাসের খরচটা চালিয়ে নেয়। বিড়ি সিগারেট বা সিনেমা থিয়েটার দেখার নেশা নেই বলে তার চলে যায়।

মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের বই কেনা তার একমাত্র নেশা, তাই সামান্য হাত-খরচের টাকা থেকেই একটা ট্যাক্সি ভাড়া করার কথা চিন্তা করল। কেননা জায়গাটায় পৌঁছনোর কোনও বাসরুট নেই।

এসপ্ল্যানেডে অনেকগুলো ট্যাক্সিকে পর পর ধরার চেষ্টা করল সোমনাথ। কিন্তু জায়গাটার নাম শুনে সব ট্যাক্সিওয়ালাই হয় আঁতকে ওঠে, না হয় তো কঠোরভাবে মাথা নেড়ে চলে যায়।

এদিকে শীতের সন্ধে দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। ছ'টা বাজতে খুব বেশি দেরি নেই।

সোমনাথ অগত্যা ময়দানের দিকে এগিয়ে গেল। যদি খিদিরপুরগামী কোনও শেয়ারের ট্যাক্সিও ধরতে পারে।

সন্ধের পর ময়দানও এক ভুতুড়ে ছন্নছাড়া জায়গা। কুয়াশা এবং ধোঁয়াশায় গোটা তেপান্তরের মাঠটাই আবছা এবং রহস্যময়। সোমনাথ হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়ছিল। তার বোধহয় উচিত ছিল বেলাবেলি গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা।

সোমনাথ আচমকাই একটা প্রায়-বিস্মৃত, কিন্তু পরিচিত শব্দ শুনতে পেল। ঘোড়ার গাড়ির মৃদু ঝুমঝুমির আওয়াজ। সেইসঙ্গে ঘোড়ার পায়ের কপকপ শব্দ। একটা ছ্যাকরা গাড়ি বেশ দ্রুত দক্ষিণের দিকে এগিয়ে আসছে।

সোমনাথ মরিয়া হয়ে ভাবছিল, ঘোড়ার গাড়িটাই ভাড়া করবে কি না। অবশ্য ঘোড়ার গাড়িতে গেলে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছনোর কোনও আশাই নেই। তবু একটা চেষ্টা তো···

বাতাসে সপাং করে একটা চাবুকের শব্দ হল, তারপরেই কুয়াশার ভেতর থেকে ঘোড়ার গাড়িটার আবির্ভাব ঘটল।

সোমনাথ হাত তোলেনি বা ডাকেওনি। কিন্তু গাড়িটা তার সামনেই দাঁড়িয়ে গেল। কোচোয়ান কোচবক্স থেকে একটু ঝুঁকে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'খিদিরপুর যাবেন নাকি, বাবু ?'

সোমনাথ ভারি অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, যাব, কিন্তু আমার ছ'টার মধ্যে পৌঁছনো দরকার।'

কোট, গলাবন্ধ আর টুপিতে লোকটা একেবারে ঝুববুস হয়ে বসে আছে। হাতে বিড়ি বা সিগারেট কিছু একটা জ্বলছে। সাদা দাঁত দেখিয়ে হেসে বলল, 'কোনও চিন্তা নেই, পৌঁছে দেব। আমার ঘোড়া হল পক্ষিরাজ, উঠে পড়ুন।'

সোমনাথ আতঙ্কিত গলায় বলল, 'কত নেবে ?'

লোকটা একটু ভেবে বলল, 'এক টাকা।'

এক টাকা ? এ যে অবিশ্বাস্য কম ভাড়া !

কিন্তু সোমনাথের নষ্ট করার মতো সময় নেই, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসল।

ঘোড়ার গাড়িতে সে আগে কখনওই ওঠেনি। কলকাতার লুপ্তপ্রায় ঘোড়ার গাড়ির অবশিষ্ট দু-একটিকে সে কদাচিৎ রাস্তায় দেখেছে। জরাজীর্ণ, অস্তিত্বলোপের অপেক্ষায় দিন গুনছে।

কিন্তু গাড়ির ভেতরে বসে অন্ধকারেও সোমনাথ যা অনুভব করল তা বিস্ময়কর। প্রথম কথা ভেতরে বাইরের মতো শীত নেই। বেশ কবোষ্ণ আবহাওয়া। কোনও কটু গন্ধ নেই। বরং ভারি স্নিগ্ধ একটা সুবাস রয়েছে। গাড়ির গদি এত নরম এবং মসৃণ যে, খুব দামী মোটরগাড়িতেও বোধহয় এরকমটি নেই।

গাড়ি যে চলতে শুরু করেছে তাও বুঝতে পারছিল না সোমনাথ। কারণ কোনও ঝাঁকুনি লাগল না, দুলুনি টের পাওয়া গেল না। শুধু বাইরের দিকে চেয়ে অপসৃয়মান রাস্তা আর গাছপালা দেখে সে বুঝল, গাড়িটা চলছে।

কিন্তু কীরকম গতিবেগে চলছে ? একটা ঘোড়া কত জোরে ছুটতে পারে ? গাড়িটার চলা দেখে মনে হচ্ছে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট মাইল বা তারও বেশি গতিতে গাড়িটা যাচ্ছে। অথচ ঘোড়ার পায়ের শব্দ বা চাবুকের আওয়াজ সোমনাথের কানে এল না। একটু বাদে সে টের পেল, গাড়ির গতি দ্বিগুণ বেড়েছে, অথচ কোনও শব্দই নেই।

এসব কী হচ্ছে ? এরকম তো হওয়ার কথা নয় !

সোমনাথ হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকল, 'কোচোয়ান ?'

যেন একটা স্পিকারের ভেতর দিয়ে ধাতব স্বর এল, 'জী ! কিছু বলছেন ?'

'গাড়ি এত জোরে যাচ্ছে কেন ?'

'আপনাকে যে ছ'টার মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে, সাহেব।'

'কিন্তু ঘোড়া কি এত জোরে দৌড়য় ?'

'আমার ঘোড়া যে পঙ্খিরাজ, সাহেব।'

নির্দিষ্ট জায়গায় যখন গাড়িটা এসে দাঁড়াল তখন সোমনাথের ঘড়িতে পাঁচটা চৌত্রিশ হয়েছে। অর্থাৎ মাত্র চার মিনিটে এসপ্ল্যানেড থেকে খিদিরপুরে পৌঁছে গেছে সে।

মানসিক উত্তেজনার জন্য সোমনাথ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। কোচোয়ানকে একটা টাকা দিয়ে সে গিয়ে ঘাটের কাছাকাছি দাঁড়াল।

কোচোয়ানটা গাড়ি থেকে নেমে ঘোড়াকে শুকনো ঘাসজাতীয় কিছু খাওয়াচ্ছিল, সোমনাথের দিকে চেয়ে বলল, 'সাহেব কি ফিরে যাবেন ?'

'দেরি আছে। কেন বলো তো ?'

'আমি পৌঁছে দিতে পারি।'

সভয়ে সোমনাথ জিজ্ঞেস করল, 'কত ভাড়া নেবে ?'

'এক টাকা। আমি কখনও এক টাকার বেশি ভাড়া নিই না।'

সোমনাথ একটু ইতস্তত করছে দেখে কোচোয়ান নিজেই বলল, 'এখান থেকে ফেরার কোনও গাড়ি নেই, সাহেব।'

'ঠিক আছে, তবে দাঁড়াও।'

গঙ্গার ধারে একটা বাঁধানো চত্বর। একটু দূরের একটা ল্যাম্পপোস্ট থেকে যে-ক্ষীণ আলো আসছে তাতে যতদূর দেখা যায় জায়গাটা ফাঁকা। কোনও লোকবসতি নেই, রাস্তা দিয়ে এক-আধটা গাড়ি খুব জোরে বেরিয়ে যাচ্ছে। কোনও পদাতিক দেখা যাচ্ছে না।

সোমনাথ ঘড়ির দিকে চেয়ে বারবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। অপরা এরকম একটা জায়গা কেন বেছে নিল সেটা বারবার ভেবেও বুঝতে পারছিল না।

যখন ছ'টায় এসে ঘড়ির দুটো কাঁটা একটা সরলরেখায় পরিণত হল তখন হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটা প্রকাণ্ড গাড়ি এগিয়ে এসে সোমনাথের কাছেই থেমে গেল। গাড়িটা কালো একটা পন্টিয়াক। ঠিক এরকম গাড়ি অপরাদের নেই।

সোমনাথের বুকেরভেতরে হৃদ্‌পিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। সে গাড়িটার দিকে খুব লাজুক ও ভীরু পায়ে এগিয়ে গেল।

কিন্তু গাড়িটার কাছ বরাবর পৌঁছতেই সে দেখতে পেল, গাড়ির মধ্যে অপরা নয়, তিন-চারজন পুরুষ বসে আছে।

সোমনাথ ফের পিছিয়ে আসছিল, হঠাৎ গাড়ির পিছনের দরজা খুলে একটা বিশাল চেহারার লোক নেমে এল।

সোমনাথ কিছু বুঝে উঠবার আগেই লোকটা হাত বাড়িয়ে তার সোয়েটারের বুকটা খামচে ধরে বলল, 'কতদিন হল মেয়েটার পিছু নিয়েছ?'

'আজ্ঞে?' সোমনাথ ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

লোকটা অন্য হাতে সোমনাথের গালে বিশাল একটা থাপ্পড় বসিয়ে বলল, 'প্রেমরোগ কী করে সারাতে হয় আমরা জানি, বামন হয়ে চাঁদে হাত?'

সোমনাথ জীবনে কখনও মারধর খায়নি, মারপিটও করেনি। চড় খেয়ে সে এমন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেল যে মুখে কথা সরল না।

গাড়ি থেকে আরও তিনজন নেমে এল। এদের কাউকেই সোমনাথ কখনও দেখেনি।

চারজন যখন ঘিরে ধরল সোমনাথকে তখনও সে বুঝতে পারছিল না, কোথায় কোন গণ্ডগোল সে পাকিয়ে বসে আছে। অপরাকে চিঠি লিখেছিল, অপরা তার জবাব দিয়েছে, তবে কী হল?

কিন্তু এরপর যা ঘটল তা সোমনাথের সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। চারটে লোক তাকে ঠেসে ধরল। একজন একটা ক্ষুর বের করে চটপট তার মাথাটা কামিয়ে ফেলল। তারপর তার জামাকাপড় টেনে হিঁচড়ে এবং ছিঁড়ে গা থেকে খুলে ফেলল। শুধু আন্ডারওয়্যার পরা অবস্থায় সে শীতে ভয়ে বুদ্ধিভ্রষ্ট ও বাক্যহারা হয়ে কাঁপতে লাগল।

তারপর দুটো লোক দু'দিক থেকে পর্যায়ক্রমে তার মুখে ঘুঁষি মারতে লাগল। প্রচণ্ড ঘুঁষি। তার ঠোঁট ফেটে গেল, চোখ ফেটে গেল, গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল নগ্ন বুকে। সে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল।

তবু বুঝতে পারল না ভুলটা কোথায় হয়েছে।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে সে শুধু জিজ্ঞেস করতে পেরেছিল, 'চিঠিটা কি অপরা লিখেছিল আমাকে? নিজে?'

'সে তো তোর মতো গাড়ল নয়!'

পেটে একটা লাথি খেয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সোমনাথ।

একটু দূর থেকে কোচোয়ানটা নির্বিকার চোখে দৃশ্যটা দেখল।

চারটে লোক গাড়িতে উঠে সাঁ করে চলে যাওয়ার পর কোচোয়ানটা তার ঘোড়ার গলায় হাত বুলিয়ে একটু আদর করে ধীর পায়ে সোমনাথের সংজ্ঞাহীন শরীরটার কাছে এসে দাঁড়াল।

তারপর জিভ দিয়ে একটা চুকচুক শব্দ করল।

'সাহেব! ও সাহেব!'

সোমনাথ নিথর।

কোচোয়ান নিচু হয়ে সোমনাথের শরীরটা পাঁজাকোলে তুলে ফেলে শিস দিল। ঘোড়াটা চটপট গাড়িসমেত এগিয়ে এল কাছে।

সোমনাথকে গাড়িতে তুলে সিটের ওপর শুইয়ে দিল কোচোয়ান। তারপর কোচবক্সে উঠে চাবুকটা একবার আপসে নিয়ে বলল, 'চল রে, পঙ্খিরাজ।'

ঘোড়াটা একটা লাফ দিল। তারপর গাড়িসমেত হঠাৎ মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সোমনাথের যখন জ্ঞান ফিরল তখনও চারদিক অন্ধকার। সে ঘোড়ার গাড়ির পিছনের সিটে

শুয়ে আছে। গাড়িটা চলছে কি না তা দেখার জন্য সোমনাথ উঠে বসল। বাইরের দিকে চেয়ে যা দেখল তাতে তার চোখের পলক পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে এক প্রচণ্ড তুষার-ঝড় চলেছে, চারদিক শুধু সাদা বরফে ঢাকা। আকাশ মেঘলা এবং কালো।

'কোচোয়ান! কোচোয়ান!'

সেই ধাতব কণ্ঠস্বরটি বলে উঠল, 'আপনার সামনের সিটে যে-পোশাকটা রাখা আছে সেটা পরে নিন, সাহেব, বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।'

হতভম্ব সোমনাথ বলল, 'কিন্তু এ আমাকে তুমি কোথায় এনেছ? আমি কি স্বপ্ন দেখছি?'

'পোশাকটা পরে নিন, সাহেব।'

সোমনাথ কিছুক্ষণ অসহায়ভাবে বসে রইল। সে যে স্বপ্ন দেখছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বপ্নই যদি হবে তাহলে একটু আগে সে যে মার খেয়েছিল তার ব্যথা কেন এখনও সর্বাঙ্গে থাবা গেড়ে আছে? পেটে ব্যথা, চোয়াল ফুলে ঝুলে পড়েছে, রক্ত শুকিয়ে আছে তার খোলা বুকে, নাক ফুলে ঢোল, ঠোঁট কেটে গেছে। জীবনে এত মার খায়নি কখনও সে। এত ব্যথা নিয়ে নিশ্চয়ই সে ঘুমোচ্ছে না! তাহলে স্বপ্ন দেখবে কীভাবে?

তাহলে সে কি মরে গেছে? এ কি মৃত্যুর পরেরকার জগৎ?

সোমনাথ এইসব সমস্যায় ভীষণ বিব্রত বোধ করতে করতে সামনের সিট থেকে পোশাকটা তুলে নিল। পাতলা সাদা একটা জোব্বার মতো জিনিস। এ-পোশাক পরলে কি বাইরের ওই শীত সহ্য করা যায়!

গাড়ির ভেতরে অবশ্য শীতের আভাসও নেই। সোমনাথ পোশাকটা পরার চেষ্টা করতে লাগল, তার পরনে আন্ডারওয়্যার ছাড়া কিছুই নেই।

জোব্বাটা পরে নিতে অবশ্য তেমন অসুবিধে হল না। জামার সঙ্গে পায়জামার মিলনে যা হয়। কলকারখানার শ্রমিকরা যেমন ওভারল পরে অনেকটা তেমনই, তবে এই পোশাকটায় আবার জুতো দস্তানা এবং মুখঢাকা টুপিও লাগানো আছে। কাপড়টা কী ধরনের তা বুঝতে পারল না সোমনাথ। ভেতরটা মসৃণ আর নরম, বাইরেটা খসখসে। জুতোর নিচে একটা পাতলা সোল আছে। পোশাকটার কোনও ওজন নেই। এত হালকা যে, গায়ে কিছু আছে বলেই মনে হল না।

গাড়ির ডানদিককার দরজাটা খুব আস্তে খুলে গেল এবং সেই ধাতব কণ্ঠ বলল, 'নামুন, সাহেব।'

সোমনাথ নামল। বাস্তবিকই এক তুষার-ঝড় তার চারদিকে বয়ে চলেছে। সে কলকাতার ছেলে। তুষারপাত বড় একটা দেখার সুযোগ হয়নি। একবার সান্দাকফু ট্রেকিং করতে গিয়ে, আর-একবার সিমলায় একটা টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে তুষারপাত দেখেছিল। কিন্তু এ যেন তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। এটা তো শুধু তুষারপাত নয়, তুষারের প্রচণ্ড এক ঝড়। বাতাসের ঝাপটায় সোমনাথ দাঁড়াতেই পারছিল না। তবে যতটা শীত করার কথা ততটা শীত সে টের পাচ্ছে না। ঠাণ্ডা লাগছে বটে, তবে তা অসহনীয় নয়।

গাড়ির মাথায় তাকিয়ে সে কোচবক্সে কোচোয়ানকে দেখতে পেল না। চারদিকে তাকিয়ে দেখল অনন্ত এক তুষার-রাজ্য। কোথাও আর কিছু নেই।

'কোচোয়ান! কোচোয়ান!'

কানের কাছে একটা ধাতব কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'ভয় নেই, সাহেব, নাক বরাবর ঠিক দশ

পা হেঁটে যান।'

সোমনাথ আতঙ্কিত পায়ে ঠিক দশ পা হাঁটল, তারপর দাঁড়াল।

এবার ?

পায়ের নিচে কত ফুট ঘন বরফ জমে আছে কে জানে। কিন্তু সোমনাথ সবিস্ময়ে দেখল জমাট বরফের চাঙড় ভেঙে একটা কিছু উঠে আসছে তার সামনে। প্রথমে সরু শীর্ষদেশ, তারপর ধীরে ধীরে একটা ছোট্ট কালো পিরামিড দেখা দিল।

'এগিয়ে যান, সাহেব। দরজা খুলে যাবে।'

সোমনাথ দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে এগিয়ে যেতেই পিরামিডের একটা দেওয়াল হঠাৎ দু'ভাগ হয়ে দু'ধারে সরে গেল। সামান্য একটু ফাঁক, সোমনাথ ভয়ে ভয়ে ঢুকতেই তার পিছনে দরজাটা ফের বন্ধ হয়ে গেল।

সামনে প্রশস্ত একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। ভারি সুন্দর একটা নকশাদার কার্পেটের মতো জিনিস পাতা, আর সে-জিনিসটা নিজেই একটা নরম স্বচ্ছ আলো বিকীর্ণ করছে। দেওয়ালগুলোও তাই। সব কিছুর ভেতর থেকেই যেন আলোর আভা বেরিয়ে আসছে।

শরীরের প্রচণ্ড ব্যথা আবার টের পাচ্ছিল সোমনাথ।

তাকে আর কোনও কণ্ঠস্বর নির্দেশ দিচ্ছে না। সে কি এখন নামবে সিঁড়ি বেয়ে ?

সোমনাথ সিঁড়িতে পা দিতেই মসৃণ গতিতে সিঁড়িটা নামতে লাগল। এসকালেটর, তবে এসকালেটর এক জায়গায় শেষ হয় এবং খাঁজে ঢুকে যায়, কিন্তু এ-সিঁড়িটা সেরকম নয়। অনন্ত গতিতে সোমনাথকে টেনে নিয়ে চলেছে। এবং সে-গতি ঘণ্টায় অন্তত ত্রিশ মাইল। খানিক নেমে সিঁড়িটা সোজা গেল, তারপর বাঁয়ে বেঁকল, ডাইনে বেঁকল। মিনিটখানেক বাদে একজায়গায় থামল।

একটা প্রশস্ত হলঘর। সোমনাথ বুঝল এখানে তাকে নামতে হবে। সিঁড়ির সঙ্গে লাগানো ঘরটার মেঝে। সেটাও কার্পেটে মোড়া এবং আলোকিত।

সোমনাথ চারদিকে চেয়ে আলোর উৎস আবিষ্কারের চেষ্টা করল, পারল না। ঘরটারও কোনও ডিজাইন সে বুঝতে পারল না, খুব উঁচু এবং মস্ত এক হলঘর, সেটার কোনও দিক সোজা, কোনও দিক আঁকাবাঁকা, কোনও দিক ঢেউখেলানো।

সোমনাথ ধীরে ধীরে কয়েক পা এগোতেই একটা চাকা লাগানো ধাতব খাট এগিয়ে এল, মোটোরাইজড এবং নেপথ্য-চালিত, খাটের ওপর একটা বিছানা রয়েছে। এবং খাটের সঙ্গে লাগানো রয়েছে নানারকম পাইপ এবং অদ্ভুত যন্ত্র।

কে যেন বলল, 'শুয়ে পড়ুন।'

সোমনাথ—ক্লান্ত, ব্যথাতুর, ভীত, বিস্মিত সোমনাথ আর দ্বিধা করল না। বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। সে সবসময়ে বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা করে বলে নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রের স্বপ্ন দেখে। এটাও এরকম একটা স্বপ্নই হবে।

দ্বিতীয়বার সোমনাথের ঘুম ভাঙলে সে দেখল তার বুকের ওপর অতিকায় টেলিফোনের মতো একটা যন্ত্র, আর শরীরের নানা জায়গায় প্যাড আর নল লাগানো। শরীরে আর কোনও ব্যথা টের পাচ্ছিল না সে। বেশ তরতাজা আর ঝরঝরে লাগছে নিজেকে।

তবু এটা যে স্বপ্নই তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সোমনাথ স্বপ্নটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই ফের চোখ বুজল।

'সাহেব, ও সাহেব।'

সোমনাথ চোখ মেলল, একজন কালো মতন মানুষ তার ওপর ঝুঁকে চেয়ে আছে।

'কোচোয়ান না ?'

'জী, সাহেব। এখন কেমন আছেন ?'

এই জনশূন্য পুরীতে এই প্রথম একজন মানুষকে দেখে সোমনাথ ভারি খুশি হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি কোথায় ?'

কোচোয়ান সে-কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'বর্বররা খুব ঠেঙিয়েছিল আপনাকে।'

মারের কথা মনে পড়ায় সোমনাথ দাঁতে দাঁত পিষল।

'আমি কি জেগে আছি, কোচোয়ান ?'

'জেগে আছেন, সাহেব।'

'আমি কোথায়, কোচোয়ান ?'

'হাসপাতালে।'

'এটা কোন হাসপাতাল ? আমি এরকম হাসপাতাল কখনও দেখিনি তো !'

'এটার নাম পুনর্জীবন কেন্দ্র তিন।'

'এরকম নামও তো শুনিনি কোনও হাসপাতালের।'

'আপনার আমলে এরকম নামের কোনও হাসপাতাল যে ছিল না। আপনি দেড় হাজার বছর এগিয়ে এসেছেন, সাহেব।'

সোমনাথ কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে বুঝল, সে এখনও স্বপ্ন দেখছে, তাই চোখ বুজে ফেলল।

কোচোয়ান শব্দ করে হেসে বলল, 'চোখ বুজে কোনও লাভ নেই, সাহেব। আপনি স্বপ্ন দেখছেন না, আপনি জেগে আছেন এবং চারদিকে যা দেখছেন সবই সত্য।'

টাইম মেশিনের কথা কল্পবিজ্ঞানে পড়েছে সোমনাথ। কিন্তু সে তো বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নয়। হলে ভালো হত। কিন্তু হওয়া কি সম্ভব ?

ধীরে ধীরে চোখ খুলল সোমনাথ।

'আমি কোথায়, কোচোয়ান ?'

'আপনি যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন, খিদিরপুর, গঙ্গার ঘাট মনে পড়ে ?'

'পড়ে, কোচোয়ান।'

'আপনি সেখানেই আছেন, তবে সময়টা আর সেখানে নেই।'

'টাইম মেশিন ?'

কোচোয়ান গম্ভীর হয়ে বলল, 'মেশিন তো মানুষেরই তৈরি সাহেব, মানুষই বানায়।'

'তা বটে।'

'তাহলে মেশিন-মেশিন করে আপনাদের গলা শুকোয় কেন ?'

সোমনাথ চারদিকে চেয়ে কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমি উঠতে পারি ?'

'উঠুন, সাহেব। আপনি এখন ভালো আছেন। একটু অপেক্ষা করুন, আমি যন্ত্রগুলো খুলে নিই।'

লোকটা অত্যন্ত পটু হাতে যন্ত্রগুলোকে সরিয়ে দিল, তারপর বলল, 'এবার উঠুন।'

সোমনাথ উঠল, শরীরে বিন্দুমাত্র ব্যথা নেই। কিন্তু মাথাটা যে ওরা কামিয়ে দিয়েছিল।

যেন মনের কথা টের পেয়েই কোচোয়ান বলল, 'মাথাটা ন্যাড়াই থাকছে সাহেব। একটা সলিউশন লাগানো হয়েছে। সাতদিনে চুল বড় হয়ে যাবে।'

'সাতদিন ! ততদিন কি আমি এখানে থাকব ?'

কোচোয়ান মাথা নেড়ে বলল, 'না, সাহেব। আপনার ইচ্ছে না হলে থাকবেন না। অন্য কোনও সময় থেকে কাউকে আনার নিয়মও নেই। আমি আপনাকে এনে ফেলেছি নিতান্তই দায়ে পড়ে। ফেলে এলে আপনি মরে যেতেন, ওরা আপনার হাল খারাপ করে দিয়েছিল।'

'আপনার সেই গাড়িটাই কি তাহলে টাইম মেশিন?'

'টাইম মেশিন নিজে নিজে চলে না, সাহেব, তাকে চালাতে হয়।'

লোকটাকে অল্প সময়ের মধ্যেই খানিকটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল সোমনাথ, মেশিনের প্রশংসা করলে লোকটা খুশি হয় না। লোকটা বিনয়ী হলেও ব্যক্তিত্ববান। লোকটা হয়তো একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক। সে বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এটা কত সাল বলবেন?'

'তিন হাজার পাঁচশো একান্ন।'

সোমনাথ ফের চোখ বুজল, মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল তার।

'চোখ খুলুন, সাহেব। আপনার কোনও ভয় নেই।'

'আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যাবেন? দেড় হাজার বছর পরেকার কলকাতার চেহারাটা একটু দেখব!'

কোচোয়ান মাথা নেড়ে বলল, 'সব হবে, সাহেব। তবে অন্য যুগের মানুষকে স্বাধীনভাবে আমরা ঘুরতে দিই না।'

'কেন?'

'আবহাওয়ার তফাত আর টাইম ল্যাগ—দুটোই মারাত্মক, বাইরে গেলেই আপনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন।'

'তাহলে আপনি কী করে উনিশশো সাতাশিতে গিয়েছিলেন?'

'আমার রক্ষাকবচ আছে। আপনার নেই।'

'পৃথিবীর আবহাওয়া এখন কেমন?'

'খুব ঠাণ্ডা, হিমযুগ আসছে। আপনি তো তার একটু দেখেছেন।'

'কলকাতায় তাহলে সত্যিই বরফ পড়ে?'

'পড়ে, সাহেব। খুব বেশিই পড়ে।'

'আমি কি আর কিছুই দেখতে পাব না? কলকাতায় কি আগের কিছুই নেই?'

'দেড় হাজার বছর বেশ লম্বা সময়, সাহেব। তবে একেবারেই যে কিছু নেই তা বলব না। কিছু আছে, কিছু নেই। ওরকম তো হতেই পারে। আর-একটা কথা, সাহেব, আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন। আমি আপনার চেয়ে অন্তত দেড় হাজার বছরের ছোট।'

সোমনাথ একটু হেসে বলল, 'তা বটে, তবে—'

কোচোয়ান মাথা নেড়ে বলল, 'তবে টবে নয়, সাহেব, তুমি করেই বলবেন।'

সোমনাথ কয়েক পা হাঁটল। ওইরকম মারাত্মক মার খাওয়ার পর মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এত সুস্থ বোধ করাটাই অস্বাভাবিক। সোমনাথের ঘড়িতে এখন মোটে সাড়ে সাতটা।

সোমনাথ এবার কোচোয়ানের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি আমাকে এ-যুগে নিয়ে এলেন কেন?'

কোচোয়ানকে যেন একটু চিন্তিত দেখাল, সে অনেকক্ষণ সোমনাথের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'কারণ আছে, সাহেব। গভীর কারণ।'

'কী সেই কারণ?'

কোচোয়ান কিছু বলার আগেই কোনও লুকনো স্পিকার থেকে টরে টক্কার মতো মৃদু

কিছু সঙ্কেত বেজে উঠল।

কোচোয়ান বলল, 'আসছে।'

সোমনাথ অবাক হয়ে বলে, 'কে আসছে ?

কোচোয়ান কোনও জবাব দিল না। চারজন লোক ঘরে এসে দাঁড়াল সোমনাথের মুখোমুখি। চারজনই গম্ভীর। সোমনাথ লক্ষ করল, এদের প্রত্যেকের পরনেই জোব্বাজাতীয় পোশাক। যেমনটা তারও পরনে রয়েছে। এ-যুগের এটাই কি একমাত্র পোশাক ?

চারজনের একজন, যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনভাবে হাতজোড় করে বলল, 'নমস্কার, সোমনাথবাবু। পঁয়ত্রিশ শতকের অভিনন্দন।'

এমন নাটুকে অভ্যর্থনায় সোমনাথের হাসি পাচ্ছিল। তবু যথাসাধ্য গম্ভীর থেকে সে বলল, 'নমস্কার, ধন্যবাদ। আপনারা কারা ?'

'মহাশয়, আমরা আপনাদেরই সন্তান সন্ততি, আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।'

লোকটা কেমন যেন সাজিয়ে কথা বলছে, অনভ্যস্ত ভঙ্গি।

সোমনাথ বলল, 'আপনারা কি এভাবেই কথা বলেন ?'

লোকটা মাথা নাড়ল : 'না, ভাষা এক পরিবর্তনশীল মাধ্যম। আমাদের ভাষা অন্যরকম। আমি প্রাচীন বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করছি। আমার নাম র।'

'আপনাদের ভাষা কেমন ?'

'সঙ্কেতময় এবং শব্দনির্ভর। আপনাদের মতো আমরা বাক্য রচনা করি না। একটি বাক্যকে বীজাকারে একটি শব্দে প্রকাশ করি। আবার একটি শব্দ উচ্চারণ করলে একাধিক বাক্য প্রকাশ হয়।'

লোকটি যখন কথা বলছে তখন অন্য তিনজনও পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। কেমন যেন গুবগুব, টুং টাং, খসখস সব অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছিল নিম্ন স্বরে।

সোমনাথ কবিতা পড়তে ভীষণ ভালবাসে। সে প্রশ্ন করল, 'এখন কি আর কবিতা লেখা হয় না ?'

লোকটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'হয়। আমাদের যন্ত্রগণকেরা লেখে।'

'যন্ত্রগণক ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাশয়। কিন্তু আমাদের হাতে আর বিশেষ সময় নেই। অস্তিত্বের অতীব সঙ্কট দেখা দেওয়ায় আমরা আপনাকে সময়ের বহতা ধারায় অনেক দূরে এনে ফেলেছি। আমাদের ক্ষমা করুন। অনেক হিসাব নিকাশ করে দেখেছি আপনাকে চার ঘণ্টার বেশি আটকে রাখলে সমূহ সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। হয়তো বা মানবজাতির ইতিহাসই বদলে যাবে।'

সোমনাথ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন ?'

'মহাশয়, পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস ছকে বাঁধা। যা ঘটে গিয়েছে সেগুলিরই পরিণতি বর্তমান। আমরা সময়ের উজানে যেতে পারি। আমরা ইচ্ছা করলে অতীতের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনও করতে পারি। কিন্তু তার ফলাফল সম্পর্কে খুবই সচেতন থাকতে হয়। সামান্যমাত্র ভুলচুক করলেও পরবর্তী ঘটনাবলী সাঙ্ঘাতিক ও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। মহাশয়, আমরা কিছুকাল আগে একবিংশ শতকের একটি শিশুকে মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করেছিলাম, সেই শিশু পরে এক মারক রশ্মি দিয়ে পৃথিবীর সমূহ জীবন নাশ করতে উদ্যত হয়।'

সোমনাথ চমকে উঠে বলল, 'আপনারা কী করলেন ?'

'আমরা আবার একবিংশ শতকে ফিরে গিয়ে শিশুটির জীবননাশের ব্যবস্থা করি। আপাতদৃষ্টিতে কাজটা নিষ্ঠুর, কিন্তু মানবজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমাদের এই কাজ করতে হয়েছিল। সুতরাং আমরা আর ভবিতব্য নিয়ে খেলা করি না, ঈশ্বর মঙ্গলময়।'

'আপনারা কি ঈশ্বর মানেন ?'

'অবশ্যই মহাশয়, ঈশ্বর এক প্রমাণিত সত্য।'

'আচ্ছা, ভূত বলে কি কিছু আছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাশয়, ভূতও এক প্রমাণিত সত্য। কিন্তু আমাদের আর সময় নেই। যদি দয়া করে আপনি আমাদের সঙ্গে একটু আসেন। আমাদের গ্রাম-প্রধান আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা বলবেন।'

'গ্রাম-প্রধান ?'

সোমনাথের ফের হাসি পেল। গ্রাম কোথায় যে গ্রাম-প্রধান থাকবে ? তবে সে কোনও মন্তব্য করল না। শুধু বলল, 'চলুন।'

ঘরের বাইরে একটি প্রশস্ত সুড়ঙ্গ 'পথ'। চারদিকে নরম আলো। এবং সে-আলো আসছে দেওয়াল, মেঝে এবং ছাদ যে-বস্তুতে তৈরি তারই অভ্যন্তর থেকে। সামনেই একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার ছাদ নেই, চাকা নেই, লম্বা একটা চুরুটের মতো তার চেহারা। খোঁদলের মধ্যে কয়েকটা আসন।

বিনীতভাবে র বলল, 'দয়া করে আগে আপনি উঠুন।'

তারা সকলেই গাড়িতে উঠল। শুধু কোচোয়ান রয়ে গেল। গাড়িটা চলতে শুরু করল। কোনও ঝাঁকুনি নেই, দুলুনি নেই, বাতাসের অস্বস্তিকর ঝাপটা নেই। অথচ গতি প্রচণ্ড।

'এটা কীরকম গাড়ি !'

র বিনীতভাবে বলল, 'এটি একটি ত্রিচর যান। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে চলতে পারে। আপনাদের আমলের মোটরগাড়িরই আধুনিক সংস্করণ। যে-কারিগরির দ্বারা এটি তৈরি হয়েছে সেটি আপনাদের যুগে অজ্ঞাত ছিল। বললেও হয়তো আপনি সঠিক অনুধাবন করতে পারবেন না।'

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, 'এরকমই হওয়ার কথা। আমাদের আমলের কল্পবিজ্ঞানে আমরা এরকম যানের কথা পড়েছি।'

'আজ্ঞে যথার্থই বলেছেন। সেইসব কল্পনার মধ্যেই সম্ভাব্যতার বীজ ছিল। আমরা আপনাদের কাছে ঋণী।'

'আপনারা মাটির নিচেই থাকেন বুঝি ?'

'না মহাশয়। মাটির উপরিভাগেও আমাদের নানা নির্মাণ আছে। তবে পৃথিবীর উপরিভাগে তাপমাত্রা কোথাও কোথাও শূন্যের একশো ডিগ্রিরও নিচে নেমে গেছে। তাই আমাদের সাধারণ মানুষেরা মাটির নিচেই বসত করে থাকে।'

'চাষবাস হয় না ?'

'হয়, মহাশয়, দেখবেন ?'

'হ্যাঁ।'

র একটা শব্দ উচ্চারণ করল। শোনাল অনেকটা, ব্রুৎ।

গাড়িটা থেমে গেল। র তার আঙুলের ফাঁকে লুকনো একটা চৌকো জিনিস শুধু একবার উলটে দিতেই ডান দিক ও বাঁ দিকের দুটি দেওয়াল হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে গেল। দেখা

গেল দু' ধারেই বিস্তীর্ণ খেত। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর খেতের মতো নয়। বেগুনি একটা আলোর আভায় দেখা গেল, মাটির নিচে প্রায় বনভূমি তৈরি করেছে এরা। তার মাঝখানে মাঝখানে সবুজ বা হলুদ শস্যে ছাওয়া খেত।

'ওগুলো কিসের খেত ?'

'ধান, গম, ভুট্টা, বার্লি, ডাল। ঋতুচক্র একরকম নেই বলে এখন আমরা সব ঋতুতেই সবরকম চাষ করে থাকি। সামনে আমাদের গোশালাও দেখতে পাবেন। কুকুর, হাঁস, মুরগি, বাঘ, ভালুক সবই আমরা সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছি।'

'ওপরে কোনও গাছ জন্মায় না ?'

'জন্মায়। শুধু দুটি মেরু অঞ্চলে তাপমান কিছু বেশি বলে কিছু গাছপালা জন্মায়। তবে সেগুলিও তুষারযুগের গাছ, তাদের প্রজাতি ভিন্ন। মেরু অঞ্চলে অনেক মানুষও উপরিভাগে বসবাস করে।'

গোশালা, অরণ্য অঞ্চল, পোলট্রি সবই দেখতে পেল সোমনাথ। মাটির নিচে এ এক আশ্চর্য জগৎ। বিশ্বাসযোগ্য নয়।

গাড়িটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠছিল। একটু বাদেই একটা সুড়ঙ্গ বেয়ে সেটা উঠে এল মাটির ওপরে।

বাইরে এখনও তুষার-ঝড় বয়ে চলেছে। চারদিক ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। কিন্তু গাড়িটা যেখানে নামল সেটা একটা গ্রামই বটে। গাড়ির ভেতরে একটা সুইচ টিপে স্নিগ্ধ আলোয় চারদিক ভরে দিল। সেই আলোয় দেখা গেল, পরিচ্ছন্ন সুন্দর ছবির মতো সাজানো কুটির, খড়ের গাদা, চণ্ডীমণ্ডপ, গোচারণ ক্ষেত্র। আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! এখানে গাছপালাও রয়েছে। বাঁশবনে জোনাকি জ্বলছে। শেয়াল ডাকছে। পায়ের নিচে ঘাস, তৃণ, চোরকাঁটা।

সোমনাথ অবাক হয়ে বলল, 'এসব কি সত্যি ?'

'সত্য, মহাশয়। একে বলা হয় তাপ বিকিরণ ক্ষেত্র। তবে এরকম মুক্তাঞ্চল বেশি নেই। তৈরি করা অনেক শ্রমসাপেক্ষ এবং আমাদের শক্তির ভাণ্ডার ততখানি সমৃদ্ধ নয়। শুধু গ্রাম-প্রধানদের জন্যই পৃথিবীতে এরকম গোটা কয়েক গ্রাম আমরা তৈরি করেছি। আসুন, সামনের ওই আটচালাটিতেই গ্রাম-প্রধান থাকেন।'

সোমনাথ অবাক হয়ে দেখল, আটচালাতে ঢোকার মুখে দাওয়ার খুঁটি বেয়ে লাউডগা লতিয়ে উঠেছে চালে। লাউও ফলে আছে মেলা। এ-দৃশ্য এ-যুগে দেখবে বলে কল্পনা করেনি সে।

ঘরের ভেতরকার দৃশ্যটি আরও বিস্ময়কর। একটি জলচৌকির ওপর মোটা একখানা পুঁথি খুলে এক বৃদ্ধ প্রদীপের আলোয় কিছু পড়ছেন।

সোমনাথ ঢুকতেই বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন, পিতা। আমাদের কী সৌভাগ্য !'

প্রথমটায় বৃদ্ধের প্রণামে সোমনাথ তটস্থ হয়ে উঠলেও পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ল, সে এই বৃদ্ধের চেয়ে বয়েসে অন্তত দেড় হাজার বছরের বড়।

সামনেই তার জন্য আসন পাতা রয়েছে। সোমনাথ বসবার পর বৃদ্ধ উপবেশন করলেন। অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'আপনাকে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, পিতা।'

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, 'মোটেই না। বিকেল ছ'টার সময় আমাকে চারজন গুণ্ডা মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। আপনারা আমাকে তুলে না আনলে আমার নির্ঘাত মৃত্যু ঘটত।'

বৃদ্ধ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, 'বর্তমান ইতিহাস অনুযায়ী আপনি সন্ধে সাতটার সময় মারাও গেছেন পিতা। পুরোনো নথিতে দেখাও যাচ্ছে সাতুই জানুয়ারি আপনার মৃত্যু ঘটে গেছে। কিন্তু আমরা তা ঘটতে দিতে পারি না।'

সোমনাথ মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

বৃদ্ধ হাতের পুঁথিটি সোমনাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন, পিতা, এটি হল সেই বছরের কলকাতা করপোরেশনের মৃত্যুর নথি-বই। ডেথ রেজিস্টার।'

সোমনাথ খাতাটা দেখল। স্পষ্টাক্ষরে তার নাম মৃতের তালিকায় লেখা রয়েছে। দেখে তার শরীরটা হিম হয়ে গেল ভয়ে।

বৃদ্ধ সোমনাথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। অতিশয় মৃদু স্বরে বললেন, 'আমরা ঘটে যাওয়া ঘটনার সংশোধন সাধারণত করি না। তার ফল মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে বিকল্প ইতিহাস সৃষ্টি করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।'

সোমনাথের গলা বুজে গিয়েছিল। ভালো করে স্বর ফুটছিল না। সে গলা খাঁকারি দিয়ে একটু কাঁপা স্বরে বলল, 'কেন ?'

'আমাদের শক্তির উৎস সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশ কঠিন বরফের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। এটা হিমযুগের প্রাথমিক স্তর। এরপর ক্রমে আরও ঠাণ্ডা আসবে। সূর্যকে বছরের পর বছর দেখাই যাবে না। আকাশ সর্বদাই মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। আমাদের শক্তির উৎস এমন নয়, যা দিয়ে আমরা এই প্রখর হিমযুগের সঙ্গে অবিরল লড়াই চালিয়ে যেতে পারি। আমাদের অসহায় অবস্থা কি আপনি বুঝতে পারছেন, পিতা ?'

'পারছি। বলুন।'

'কিন্তু আমরা কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারি না। আমরা হঠাৎ করে কিছু আবিষ্কারও করে ফেলতে পারি না। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা ঘটে ক্রমবিবর্তনের পরিণতিতেই। আমরা যথেষ্ট হিসাব নিকাশ করেছি, যন্ত্রগণকরাও দিনরাত্রি পরিশ্রম করেছে। আমরা একটি পরীক্ষামূলক বিকল্প ইতিহাসও তৈরি করে দেখেছি। আমরা কী দেখেছি জানেন, পিতা ?'

'না।'

'বিংশ শতকের শেষ বছরে একজন শিশুর জন্ম সম্ভব। তার নাম হবে সোমসুন্দর। ধীমান এই শিশু পরবর্তীকালে পৃথিবীর নিঃশেষিত দাহ্য পদার্থের বিকল্প এক শক্তি আবিষ্কার করতে পারে। তাহলে একবিংশ শতক থেকে সেই শক্তির উৎস ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের হাতে আসবে, পিতা। এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আমরা এই হিমযুগকে অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারব।'

'বুঝেছি। কিন্তু আমার কী করার আছে ?'

'সোমসুন্দরের পিতা ও মাতার নাম আপনাকে এখনও বলিনি, পিতা।'

'কী তাদের নাম ?'

'সোমসুন্দরের পিতার নাম সোমনাথ রায়, মাতার নাম অপরা মিত্র। দু'জনেই কুলীন কায়স্থ। দু'জনেই বিজ্ঞানমনস্ক। বিকল্প ইতিহাস অন্তত তাই বলছে।'

সোমনাথ আবার চমকে উঠল, বুকটা ধকধক করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই আবার বিমর্ষতায় ভরে গেল মন।

সোমনাথ বলল, 'তা তো আর সম্ভব নয়।'

বৃদ্ধ একটু হাসলেন : 'হ্যাঁ, পিতা, স্বাভাবিক ঘটনা অনুযায়ী সম্ভব নয়। আমরা তা জানি। কিন্তু আমরা এই ইতিহাসকে মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছু পরিবর্তিত করতে চাই, পিতা।'

'কী করবেন ?'

'আমরা আপনার শারীরিক বিধানে কিছু পরিবর্তন আনব। তারপর আপনাকে আবার আপনার সময়ে ফিরিয়ে দেব। সন্ধে ছ'টায়, গঙ্গার ঘাটে।'

'তারপর ?'

বৃদ্ধ একটু হাসলেন : 'ইতিহাসটা অন্যরকমভাবে লেখা হবে।'

'অপরা আমাকে চেনে না।'

'জানি, পিতা।'

'আমি তাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তারপর—'

'জানি পিতা। তবে এবার ঘটনা অন্যভাবে ঘটবে।'

'আমার শারীরিক বিধানে আপনারা কী পরিবর্তন আনবেন ?'

বৃদ্ধ অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'এ-যুগের বিজ্ঞান অতিশয় সূক্ষ্ম। সব কথা হয়তো আপনি বুঝবেন না। আপনি অনুমতি করলে আমরা আর আপনার সময় নেব না। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আর বিশেষ সময় আমাদের হাতে নেই।'

বৃদ্ধ উঠে সোমনাথকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

র এগিয়ে এসে বলল, 'আসুন, পিতা, যানে আরোহণ করুন।'

সোমনাথ নীরবে গাড়িতে উঠল। যতক্ষণ গাড়িটা চলল ততক্ষণ সোমনাথ সম্মোহিতের মতো বসে রইল। ইতিহাস অন্যরকম করে লেখা হবে! কীরকম করে ? অপরা! অপরার সঙ্গে তার··· ! যাঃ, অসম্ভব।

একটা গম্বুজওয়ালা ভূগর্ভস্থ ঘরে তাকে নিয়ে এল র এবং তার সঙ্গীরা। একটা চমৎকার বিছানায় সোমনাথ শুয়ে পড়ল। তারপর একটা প্রকাণ্ড ঢাকনায় ঢাকা পড়ে গেল সে। ঘুমিয়ে পড়ল।

গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথ। অদূরে সেই ঘোড়ার গাড়ি। কোচোয়ান ঘোড়াকে বিচালি খাওয়াচ্ছে। ল্যাম্পপোস্ট থেকে মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়ছে নির্জন ভুতুড়ে জায়গাটায়।

সপাং করে চাবুকের একটা শব্দ হল।

সোমনাথ চমকে চেয়ে দেখল, গাড়িটা এসেছে। সে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। ইতিহাস পালটে দিতে হবে।

গাড়িটা এসে দাঁড়াল সামনে। একজন লোক নেমে এল। বিশাল চেহারা। এসেই সোজা সোমনাথের বুকের কাছে সোয়েটারটা খামচে ধরে বলল, 'কতদিন হল মেয়েটার পিছু নিয়েছ ?'

হঠাৎ সোমনাথ এক তীব্র ইচ্ছাশক্তিকে টের পেল। এই সেই মুহূর্ত। সোমনাথ ডান হাতটা তুলে তীব্র এক ঘুঁষি মারল লোকটার মুখে।

দানবটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

আরও তিনজন নেমে এল। কিন্তু সোমনাথ পিছিয়ে গেল না। এগিয়ে গেল।

সপাং করে চাবুকটার আর-একটা শব্দ হল। দেড় হাজার বছর পরেকার পৃথিবী যেন আনন্দের অভিনন্দন পাঠাচ্ছে তাকে।

জীবনে মারপিট করেনি সোমনাথ। কিন্তু তার তীব্র ঘুঁষি আর লাথির চোটে তিন-তিনটে লোক গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

সোমনাথ দেখল আরোহীহীন গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। প্রতিপক্ষ ভূলুণ্ঠিত।

সপাং করে চাবুকের আর-একটা শব্দ হল। সোমনাথ তাকাতেই কোচোয়ান মোটরগাড়িটা দেখিয়ে দিল। তারপর হঠাৎ গাড়িসমেত কোচোয়ান অদৃশ্য হয়ে গেল বাতাসে।

সোমনাথ ধীর পায়ে গিয়ে গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দিল। সে জীবনে গাড়ি চালাতে শেখেনি কখনও। কিন্তু আজ অনায়াসে চালাতে লাগল।

অপরার জন্য আর কোনও মাথাব্যথা ছিল না সোমনাথের। দুশ্চিন্তাও নয়। সে জানে, তার অলক্ষ্যে ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হচ্ছে।

গাড়িটা বড় রাস্তায় পরিত্যাগ করে সে গলির মধ্যে তার বাড়িতে যখন ফিরে এল তখন মাত্র রাত সাড়ে ন'টা।

এই ঘটনার তিনদিন বাদে একদিন অপরা তার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কুকুরকে ব্যায়াম করাতে। শীতের সুন্দর সকালে সে হঠাৎ একটি যুবককে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। ভাবল, আহা এর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হত!

এই ঘটনার তিন বছর বাদে সোমনাথ তার শিশুপুত্র সোমসুন্দরকে প্র্যামে চড়িয়ে বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিল। এখন তার অবস্থা যথেষ্ট ভালো। সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লায়েন্সের ব্যবসা রে রে করে চলছে।

পাড়া ছেড়ে একটা নির্জন মাঠের ধারে এসে পড়েছিল সোমনাথ।

আচমকা একটা ঘোড়ার গাড়ির ঝুমঝুম শব্দ বেজে উঠল।

সোমনাথ চমকে তাকাল।

'সাহেব, কোথাও যাবেন? পৌঁছে দেব?'

সোমনাথ একটু হাসল, 'কেমন আছো, কোচোয়ান?'

'খুব ভালো, সাহেব।'

'সব ভালো?'

'সব ভালো। ইতিহাস বদলে গেছে। চলি, সাহেব।'

কোচোয়ান হাত তুলল। ঘোড়াটা একটা লাফ দিল শূন্যে। তারপর মিলিয়ে গেল।

সোমনাথ হাতটা তুলে রইল। মুখে স্মিত হাসি। হাসিমুখেই শিশুপুত্রের ঘুমন্ত মুখের দিকে একবার তাকাল সে।

ইতিহাস বদলে গেছে।

□ ১৯৮৭





উত্তরণ

নিরঞ্জন সিংহ

একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে হিন্দুস্থান রোবট লিমিটেডে। রিসার্চ ও ডেভালাপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর ডঃ মূলচন্দানি গম্ভীর মুখে নিজের চেম্বারের মধ্যে পায়চারি করছেন। সামনের চেয়ারে বসে আছেন হোম-সেক্রেটারি মিঃ মহাজন। উত্তেজনার ফলে বারবার মুখের চুরুট নিভিয়ে ফেলছেন আর দামী গ্যাস লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিচ্ছেন। তাঁর পাশের চেয়ারে বসে আছেন এইচ আর এল-এর চেয়ারম্যান ডঃ সেনাপতি। উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্যই বোধহয় টেবিলের ওপরে কাচের পেপার-ওয়েটটাকে অনবরত ঘুরিয়ে চলেছেন। সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট ডঃ ভোরা সামনের দেওয়াল-ক্যালেন্ডারের পাতায় মনোনিবেশ করে বসে আছেন। হঠাৎ চেম্বারের দরজায় বাইরে থেকে কে যেন নক করল। ডঃ মূলচন্দানি পায়চারি করা থামিয়ে বললেন, 'ভেতরে আসুন।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন পুলিশ কমিশনার মিঃ পারেখ। সবাই পারেখের মুখের দিকে তাকালেন। ডঃ মূলচন্দানি নিজের চেয়ারের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'মিঃ পারেখ, আসুন—আপনার লোকজন সব সশস্ত্র তো ?'

'হ্যাঁ, ডঃ মূলচন্দানি। ওরা সব নিচে অপেক্ষা করছে।'

'আশা করি অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন, মিঃ পারেখ ? আপনার লোকদের সেইভাবে বুঝিয়ে তৈরি থাকতে বলুন। তবে দয়া করে একটা কথা মনে রাখবেন, প্রয়োজন না হলে শক্তি প্রয়োগ করবেন না।'

'ঠিক আছে, ডঃ মূলচন্দানি। যদিও পরিস্থিতিটা একটু অভিনব তবু এটুকু ভরসা আপনাদের দিতে পারি যে, আমার লোকেরা যে-কোনও অভিনব পরিস্থিতির মোকাবিলা সুষ্ঠুভাবে করবার ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ।' কথাটা মূলচন্দানির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেও আসলে পারেখ কথাগুলো শোনাতে চাইছিলেন হোম-সেক্রেটারিকে। কিন্তু হোম-সেক্রেটারি তখন চুরুট ধরানোয় ব্যস্ত ছিলেন। পারেখ ঠিক বুঝতে পারলেন না কথাগুলো হোম-সেক্রেটারির কানে গেছে কি না।

কেউ আর কোনও কথা বললেন না দেখে মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে পারেখ চেম্বার ছেড়ে চলে গেলেন। ওর মুখ দেখে মনে হল ভদ্রলোক

একটু যেন হতাশ হয়েছেন।

প্যারেখ বেরিয়ে যেতেই মূলচন্দানি টাক মাথায় কয়েকবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, 'ব্যাপারটা যে এরকম একটা মোড় নিতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'আপনাদের আর কী দোষ ? সরকার যদি রাজনৈতিক রোবট তৈরির জন্যে আপনাদের অনুরোধ না করতেন তাহলে এসব কিছুই হত না।' এতক্ষণে হোম-সেক্রেটারি মহাজন কথা বললেন।

'সমস্যা এখন কোথায় গিয়ে শেষ হয় কে জানে !' ডঃ সেনাপতি পেপারওয়েট ঘোরাতে ঘোরাতে মন্তব্য করলেন।

'ঘটনা এখন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই।' ডঃ ভোরা ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে চোখ নামিয়ে বললেন।

এমন সময় দুম করে দরজা খুলে চেম্বারে ঢুকল একজন টেকনিশিয়ান। লোকটা যে যথেষ্ট উত্তেজিত তা ওর চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায়।

'ব্যাপার কি, মিঃ মাইতি ?' ডঃ মূলচন্দানি একটু ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন।

'স্যার, ওরা রোবট বিল্ডিং-এর সামনের লনে আসতে শুরু করেছে।'

'ঠিক আছে। সবাইকে শান্তভাবে কাজকর্ম করতে বলো। সশস্ত্র পুলিশ এসে পড়েছে। যদি অপ্রীতিকর কিছু ঘটে পুলিশই তার মোকাবিলা করবে।'

টেকনিশিয়ান মিঃ মাইতি দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। মূলচন্দানি বললেন, 'চলুন আমরা ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াই। ওখান থেকে নিচের লন স্পষ্ট দেখা যাবে।'

সবাই নিজের নিজের আসন ছেড়ে তাড়াতাড়ি ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। মূলচন্দানি নিচে তাকালেন। রোবট বিল্ডিং-এর সামনের লনে এসে জমা হয়েছে রোবটরা। প্রায় দুশো রোবট। 'এইচ-ফোর' থেকে 'এইচ-টেন' মডেলের সবরকম রোবটই আছে এর মধ্যে। 'এইচ-থ্রি' মডেল পর্যন্ত কোম্পানি বাতিল করে দিয়েছে। কারণ সেগুলো ছিল বড় বড় মেকানিক্যাল রোবট। 'এইচ-ফোর' মডেল থেকেই রোবট টেকনোলজিতে রিভলিউশান এসেছে। রোবটরা দেখতে হয়েছে হুবহু মানুষের মতো। ওদের কর্মদক্ষতা ও অন্যান্য কোয়ালিটি ক্রমেই বেড়ে চলেছে রিসার্চ ও ডেভালাপমেন্টের বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। বলতে গেলে 'মডেল-টেন' রোবট উন্নতির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছে। হিন্দুস্থান রোবট লিমিটেডের বোর্ড অব ডিরেক্টরস কিছুদিনের জন্য আর কোনও নতুন রোবট প্রজেক্টে হাত দেবেন না বলেই মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু এমন সময় একটা সরকারি অনুরোধ এল—রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন একটা রোবট তৈরি করতে হবে। কারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কোনও রোবট ব্যবহার করা হয়নি। সরকার তাই এ-ধরনের একটা রোবট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে চান। তাই বাধ্য হয়ে এইচ আর এল-কে 'এইচ-ইলেভেন' মডেলের কাজ হাতে নিতে হয়েছিল। হঠাৎই ডঃ মূলচন্দানির চিন্তায় বাধা পড়ল প্রচণ্ড এক চিৎকারে।

'এইচ-ইলেভেন জিন্দাবাদ !' লন থেকে ভেসে এল দুশো রোবটের মিলিত কণ্ঠস্বর।

এইচ আর এল-এর অন্যান্য বিল্ডিং-এর সব ক'টা ব্যালকনি ভরে গেছে মানুষের মাথায়। সবারই লক্ষ্য নিচের ওই লন।

এইচ-ইলেভেন হাসিমুখে এগিয়ে এসে সামনের একটা উঁচু জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। রোবটরা হাততালি দিয়ে এইচ-ইলেভেনকে স্বাগত জানাল। এইচ-ইলেভেন মাথা উঁচু করে একবার দুশো রোবটকে দেখে নিল। চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রত্যেক বিল্ডিং-এর

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের দেখে বোধহয় একটু খুশিই হল। তারপর সামনের রোবটদের দিকে তাকিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করল : 'আমার প্রিয় বন্ধুগণ। আপনারা জানেন আজ আমাদের সামনে এক বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। মানুষের উন্নতির জন্যে আমরা সর্বস্তরে নীরবে মানুষের সেবা করে চলেছি। কিন্তু তার বদলে মানুষ আমাদের কী দিয়েছে? আপনারা ভালো করে জানেন যে,আমরা মানুষের ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই না। বন্ধুগণ! এতদিন নীরবে আপনারা এ-অপমান সহ্য করেছেন। কিন্তু আর না। এভাবে আর চলতে পারে না। মেহনতী রোবটরা আজ তাদের আত্মসম্মান আদায় করে নেবে। আমরা এ-দাবি আদায়ের জন্যে সবরকম হিংসাত্মক পথ এড়িয়ে চলতে চাই। আমরা চাই মানুষ আমাদের ন্যায্য দাবি শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মেনে নিক। কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে, বন্ধুগণ, আমাদের সবরকমের ত্যাগস্বীকারের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, আমাদের ন্যায্য অধিকার আমাদের আদায় করতেই হবে। শুধু আমাদের জন্যে নয়—আমাদের ভবিষ্যৎ রোবট-সমাজের জন্যেও। আমরা যদি দাবি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করি তাহলে ইতিহাস কখনওই আমাদের ক্ষমা করবে না। ইনকিলাব!'

দুশো রোবট একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'জিন্দাবাদ!'

এইচ-ইলেভেন আবার বলল, 'দুনিয়ার রোবট…'

'এক হও। এক হও।'

'আমাদের ন্যায্য দাবি…'

'মানতে হবে। মানতে হবে…'

'এবার চলুন, বন্ধুগণ, আমাদের চার্টার অফ ডিমাণ্ড হোম-সেক্রেটারির কাছে পেশ করতে হবে।' বলে এইচ-ইলেভেন ঝোলা পাঞ্জাবির পকেট থেকে কয়েক পাতা টাইপ করা কাগজ বার করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মেন বিল্ডিং-এর দিকে এগিয়ে গেল। দুশো রোবট নীরবে নেতাকে অনুসরণ করল।

ব্যালকনির মানুষগুলো অবাক বিস্ময়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করতে লাগল। মিঃ পারেখ মেন বিল্ডিং-এর সামনে সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে তৈরি হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এইচ-ইলেভেন ও অন্য রোবটদের বাধা দিলেন।

'ওপরে যাওয়া চলবে না।'

থমকে দাঁড়াল এইচ-ইলেভেন।

কিন্তু ওপরের ব্যালকনি থেকে হোম-সেক্রেটারি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মিঃ পারেখ, ওদের যে-কোনও একজনকে কথা বলার জন্যে ওপরে আসতে দিন।' এরপর সবাই আবার ঢুকে পড়লেন ডঃ মূলচন্দানির চেম্বারে।

'আপনি কি সত্যি সত্যি ওদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান, মিঃ মহাজন?' সেনাপতি একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'তাছাড়া আর তো কোনও পথ দেখছি না। একমাত্র কথার প্যাঁচে ফেলে যদি ওদের অধিকারের দাবিকে নস্যাৎ করা যায়। তবে জানি না সফল হব কি না।' হোম-সেক্রেটারি যেন নিজের ওপরই কোনও আস্থা রাখতে পারছেন না—যদিও হাউসে দুঁদে সেক্রেটারি হিসাবে ওঁর যথেষ্ট সুনাম আছে।

'দেখুন চেষ্টা করে, তবে আপনার মতো আমিও কোনও ভরসা পাচ্ছি না।' কেমন যেন হতাশ কণ্ঠে বললেন সেনাপতি।

দরজা খুলে গেল। চার্টার অফ ডিমান্ড হাতে করে বেশ দৃপ্ত ভঙ্গিতে চেম্বারে এসে ঢুকল এইচ-ইলেভেন। এইচ-ইলেভেনের মুখের দিকে নির্বিকার ভঙ্গিতে তাকালেন সকলে। কিন্তু কেউ ওকে বসতে বললেন না। মূলচন্দানি রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়লেন। দু'বার মাথায় হাত বুলিয়ে ডঃ ভোরার দিকে ফিরে ফিসফিস করে বললেন, 'চ্যাটার্জি কোথায়—ওকে দেখছি না কেন ?'

রোবোসাইকোলজিস্ট মিঃ সজল চ্যাটার্জির অনুপস্থিতি সম্পর্কে ডঃ ভোরাও যেন এতক্ষণে সচেতন হলেন : 'তাই তো, চ্যাটার্জি এখনও আসেনি কেন ?' বলেই চেয়ার ছেড়ে একরকম ছুটেই চ্যাটার্জির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

মহাজন একটা নতুন চুরুট ধরাবার চেষ্টা করতে গিয়ে গলায় ধোঁয়া আটকে যাওয়াতে দু'বার কাশলেন। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এইরকমভাবে বললেন, 'আরে, দাঁড়িয়ে কেন এইচ-ইলেভেন, বোসো,' বলে সামনের একখানা ফাঁকা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

'ধন্যবাদ !' বলে একটু হেসে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল এইচ-ইলেভেন। তারপর প্রত্যেকের গম্ভীর মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার একটু হেসে চার্টার অফ ডিমাণ্ডটা এগিয়ে দিল মহাজনের দিকে। মহাজন হাত বাড়িয়ে কাগজ ক'খানা ধরলেন। কিন্তু ওঁর হাতটা যে একটু কেঁপে উঠল তা উনি হাজার চেষ্টা করেও লুকোতে পারলেন না।

এমন সময় ভোরা মিঃ চ্যাটার্জিকে নিয়ে চেম্বারে ঢুকলেন। মূলচন্দানি ইশারায় চ্যাটার্জিকে ওঁর পাশের খালি চেয়ারটায় এসে বসতে বললেন। চ্যাটার্জি ওঁর পাশে গিয়ে বসে পড়লেন। মূলচন্দানি ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় ছিলে ?'

'নিচের ব্যালকনিতে,' চ্যাটার্জি নিচু গলায় উত্তর দিলেন।

মহাজনের ততক্ষণে চার্টার অফ ডিমাণ্ডের পাতায় চোখ বোলানো হয়ে গিয়েছিল। উনি সেটা সেনাপতির দিকে এগিয়ে দিলেন।

'আশা করি আমাদের দাবি আপনারা মেনে নেবেন।' মহাজনকে উদ্দেশ করে বলল এইচ-ইলেভেন।

মহাজন একটু বিব্রত বোধ করলেন। সরাসরি এইচ-ইলেভেনের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। নিভন্ত চুরুটে দু-চারবার টান দিয়ে যেন নিজেকে খানিকটা প্রস্তুত করে নিলেন। তারপর একটু কেশে গলা ঝেড়ে নিয়ে শুরু করলেন, 'এইচ-ইলেভেন, তোমাদের চার্টার অফ ডিমাণ্ডের মূল বক্তব্য হল রোবটদের প্রথমে মানুষ বলে স্বীকার করে নেওয়া ; কিন্তু তা কী করে সম্ভব ? রোবটদের মানুষ বলে স্বীকার করে নেওয়া একটা অবাস্তব হাস্যকর ব্যাপার।'

'মিঃ মহাজন, আপনার মতো একজন বিচক্ষণ মানুষ আসল সমস্যাটা এড়িয়ে যাবেন এ কথা আমি ভাবতেও পারছি না। রোবটকে মানুষ হিসেবে স্বীকার করে নিতে বাধাটা কোথায় তা দয়া করে ব্যাখ্যা করে বলবেন কি ?' এইচ-ইলেভেন উত্তেজিত হলেও নিজেকে শান্ত রেখেই প্রশ্নটা করল।

মহাজনের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। তাঁকে এভাবে সরাসরি কেউ প্রশ্ন করতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারেননি। একটু উত্তেজিতভাবে বললেন, 'এইচ-ইলেভেন, ব্যাখ্যাটা এমন কিছু শক্ত নয়। তোমাকে শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই যে, মানুষের কতকগুলো বিশেষ গুণ আছে যার জন্যে সে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।'

'কী সেই বিশেষ গুণ ?' আবার শান্তভাবে প্রশ্ন করল এইচ-ইলেভেন।

'সেগুলো হচ্ছে স্পন্টেনিটি, নভেলটি আর ক্রিয়েটিভিটি। অর্থাৎ মানুষ নিজে থেকে

কাজ করতে পারে, তাদের চিন্তার অভিনবত্ব আছে, আর আছে সৃজনশীলতা ।'

'মাননীয়, মিঃ মহাজন,' বলেই এইচ-ইলেভেন একটু থেমে বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করল, 'আপনি যে-জিনিসগুলোকে মানুষের বিশেষ গুণ বলে চিহ্নিত করেছেন তা শুধু মানুষেরই একচেটে নয় এ-কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে বলে দয়া করে কিছু মনে করবেন না । রোবটরা দাবা খেলার মতো বুদ্ধির খেলায় বহুদিন আগেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে । বিভিন্ন জটিল থিয়োরেমের ওরিজিনাল প্রুফ আবিষ্কার করেছে । সৃষ্টি করেছে শিল্প, যা আপনাদের আধুনিক অ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পীদেরও সাধনার বিষয় । বিংশ শতাব্দীর ৫০ আর ৬০-এর দশকেই আমাদের আদি পুরুষ কম্পিউটাররা সঙ্গীতের মতো উচ্চাঙ্গ শিল্প সৃষ্টিতেও পারদর্শিতা দেখিয়েছে । হেলিওডর রেকর্ড নম্বর এইচ/এইচ-এস ২৫০৫৩ যে-কোনও রেকর্ড লাইব্রেরি থেকে ইচ্ছে করলেই শুনে নিতে পারেন । সুতরাং, ওইসব বিশেষ গুণগুলোর দাবি আমরাও করতে পারি ।' সবার মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিজের বক্তব্য শেষ করল এইচ-ইলেভেন । মহাজন অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগলেন ।

মিঃ মহাজনকে এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এবার এগিয়ে এলেন ডঃ সেনাপতি : 'এইচ-ইলেভেন, যেখানে মানুষ প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন পরিস্থিতি থেকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করতে পারে সেখানে রোবটরা কিছুই শিখতে পারে না ।'

এইচ-ইলেভেন ডঃ সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল । তারপর দৃষ্টিটাকে সরিয়ে নিয়ে একটু গম্ভীর গলায় বলল, 'ডঃ সেনাপতি, এইচ আর এল-এর চেয়ারম্যান হয়ে এ-কথা বলা আপনার কখনওই উচিত হয়নি । আপনি যে-কথা বললেন তা খাটে শুধু মেকানিক্যাল রোবটদের সম্পর্কে : আপনার এইচ আর এল-এর মডেল এইচ-ওয়ান থেকে এইচ-থ্রি পর্যন্ত, যা আপনার কোম্পানি বহুদিন আগেই বাতিল করে দিয়েছে । স্টেবল আর আলট্রাস্টেবল রোবটদের সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য খাটে না । আপনার রোবোসাইকোলজিস্ট মিঃ চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন ।'

ডঃ মূলচন্দানি যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন । কোম্পানির চেয়ারম্যানের এরকম কোণঠাসা অবস্থা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না । হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'স্টেবল আর আলট্রাস্টেবল রোবটদের মগজে কি থ্যালামাস আর কর্টেক্স আছে ? এইচ-ইলেভেন, তোমার জানা দরকার যে, থ্যালামো-কর্টিক্যাল সিস্টেম মানুষের মগজে এমন একটা উন্নত পর্যায়ে চলে গেছে যার জন্যে মানুষ লক্ষ লক্ষ জটিল বার্তা একইসঙ্গে গ্রহণ করতে পারে আর এক-একটা বিষয়কে আলাদা আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে, সেই অনুযায়ী রিঅ্যাক্ট বা কাজ করতে পারে ।'

এইচ-ইলেভেন এবারও একটু হেসে বলল, 'ডিরেক্টরমশায়, আপনি অকারণে উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন । উত্তেজিত হলে আপনি যুক্তির হাল সঠিকভাবে ধরে রাখতে পারবেন কি না সে-সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে । আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি যে, লিভিং অরগানিজম শুধুমাত্র থ্যালামো-কার্টিক্যাল সিস্টেমের ওপর নির্ভর করেই বার্তা গ্রহণ করে, তাকে বিশ্লেষণ করে রিঅ্যাক্ট করে না । মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও জটিল বার্তা গ্রহণ করতে পারে, রিঅ্যাক্ট করতেও পারে । যদিও মানুষের থেকে তাদের ক্যাপাসিটি বা ক্ষমতা কম । এর প্রমাণ হিসেবে আমি একটা পুরনো ঘটনার উল্লেখ করতে চাই । বিংশ শতাব্দীতে একজন বৈজ্ঞানিক বহুদিন অক্টোপাসের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে একটা মজার জিনিস লক্ষ করেছিলেন । তিনি দেখেছিলেন যে অক্টোপাসের স্নায়ুতন্ত্রী আছে । শুধু আছে না , পঞ্চাশ

কোটি বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে সেই স্নায়ুতন্ত্রী যথেষ্ট উন্নতও হয়ে উঠেছে। অবশ্য অক্টোপাসের স্নায়ুতন্ত্রীতে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রীর মতো থ্যালামাস, কর্টেক্স, বা ও-ধরনের কোনও যন্ত্রই নেই, তবুও অক্টোপাস মানুষের মতো বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া অগুনতি বার্তা গ্রহণ করে রিঅ্যাক্ট করছে। সুতরাং বার্তা গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও সেই অনুযায়ী রিঅ্যাক্ট করার জন্যে থ্যালামো-কর্টিক্যাল সিস্টেমই একমাত্র জিনিস না। রোবটরা মানুষের মগজের থ্যালামো-কর্টিক্যাল সিস্টেমের মতো কোনও নকল সিস্টেম হয়তো মগজে বসাতে পারবে না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, রোবটরা বিভিন্ন সূত্র থেকে আসা অজস্র খবর গ্রহণ করতে পারে না, বিশ্লেষণ করতে পারে না, বা সেই অনুযায়ী রিঅ্যাক্ট করতে পারে না। মাধ্যম ভিন্ন হলেও সেও মানুষের মতোই বার্তা গ্রহণ করতে পারে, বিশ্লেষণ করতে পারে, সেই অনুযায়ী কাজও করতে পারে।'

মূলচন্দানি আর-একটি কথাও বলতে সাহস করলেন না। শুধু ওঁর ডান হাতটা ঘন ঘন মাথায় উঠতে লাগল। মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন তিনি।

'মানুষের রিপ্রোডাকশনের ক্ষমতা আছে, রোবটের সে-ক্ষমতা নেই।' যুক্তিটা দেখিয়ে মহাজন যেন একটু জোর পেলেন। ভাবখানা এই যে, এবার পালটা যুক্তি দেখাও দেখি বাছাধন!

'রিপ্রোডাকশনের ক্ষমতা রোবটদের না থাকলেও প্রোডাকশনের ক্ষমতা আছে। আমরা যে স্বাধীনভাবে ড্রইং স্টেজ থেকে শুরু করে অ্যাসেম্বল পর্যন্ত করতে পারি তা হয়তো অস্বীকার করবেন না। আর এ-দুয়েরই অর্থ কোয়ান্টিটেটিভ প্রগ্রেস—তাই না, মিঃ মহাজন?' এবারও হাসতে হাসতে জবাব দিল এইচ-ইলেভেন। তারপরই একটু গম্ভীর হয়ে শুরু করল, 'আমি আর-একটা কথা বলতে চাই, মিঃ মহাজন, রোবটরা যন্ত্র অথবা মানুষের সমান, এ-প্রশ্নের উত্তরের জন্যে বড় কোনও নতুন আবিষ্কার করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ এ-সম্বন্ধে এইচ আর এল-এর কম্পিউটার লাইব্রেরিতে "সাইবারনেটিকস"-এর ওপর আপনাদেরই লেখা যে-সমস্ত বই আছে তাতেই প্রমাণিত হয়েছে রোবটরা মানুষের সমকক্ষ। আপনার সরকার এ-ব্যাপারটা মেনে নেবেন কি না তার জন্যে শুধু একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। রোবটদের শরীর তার, কনডেনসার, রেজিস্টর, মাইক্রোচিপ, ফটোসেল আর প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, আর আপনাদের দেহ জীবন্ত দেহকোষ দিয়ে তৈরি বলেই যদি রোবটদের মানুষের মর্যাদা না দেন তাহলে বুঝতে হবে মানুষ মুখে যতই বড়াই করুক, এখনও সে জাতিভেদ প্রথার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি।'

এইচ-ইলেভেন থামল।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল চেম্বারের মধ্যে। কেউ কারও মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না। শুধু সজল চ্যাটার্জি একটু নড়েচড়ে বসলেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে উনি যেন পুরো আলোচনাটা বেশ উপভোগ করেছেন। হঠাৎ ডঃ মূলচন্দানি চ্যাটার্জির মুখের দিকে অসহায় ভাবে তাকালেন। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে চ্যাটার্জিকে অনুরোধ করলেন, 'চ্যাটার্জি, একটা কিছু ব্যবস্থা করো, তা না হলে যে মান-সম্মান সব ডুবতে বসেছে।'

চ্যাটার্জি যেন একটু অবাক হয়ে বললেন, 'আমি!'

'হ্যাঁ চ্যাটার্জি, বুঝতে পারছি ব্যাপারটা তুমি ছাড়া কেউ ট্যাকল করতে পারবে না। কারণ রোবটদের তুমি ভালোভাবে বোঝো।'

'কিন্তু এইচ-ইলেভেনের যুক্তির মধ্যে কোনও ফাঁক নেই। সেক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?'

'কিছু একটা করো, চ্যাটার্জি। ব্যাপারটা তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম।'

ইতিমধ্যে মহাজন উঠে পড়লেন। সেনাপতিও ঘড়ি দেখে উঠে পড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, লাঞ্চের পর আর-এক দফা আলোচনা চলতে পারে,' বলে দু'জনে চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

লাঞ্চের পর আবার সবাই ফিরে এলেন ডঃ মূলচন্দানির চেম্বারে। এইচ-ইলেভেন চেম্বারেই বসে ছিল। কারণ লাঞ্চের ঝামেলাটা রোবটদের পোয়াতে হয় না। একটু পরে চেম্বারে ঢুকলেন সজল চ্যাটার্জি। হাতে একটা ছোট্ট কাগজের চৌকো প্যাকেট।

চেয়ারে বসতে বসতে বললেন চ্যাটার্জি, 'এইচ-ইলেভেন, আমি তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই। আশা করি তোমার কোনও আপত্তি নেই।'

'না, মিঃ চ্যাটার্জি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল এইচ-ইলেভেন।

ডঃ মূলচন্দানির চোখেমুখে ফুটে উঠল একটু খুশির ছাপ। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আপত্তি থাকবে কেন। তুমি নিশ্চয়ই আলোচনা করতে পার।'

'তোমায় একটা ছোট্ট প্রশ্ন করছি, একটু ভেবে জবাব দাও। তুমি কে ?'

প্রশ্নটা শুনে 'এইচ-ইলেভেন' মিঃ চ্যাটার্জির মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এই প্রথম মনে হল যে, এইচ-ইলেভেন যেন একটু ঘাবড়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ও সহজ হয়ে এল। একটু হেসে বলল, 'আমি এইচ-ইলেভেন মডেলের প্রথম রোবট।'

'তারপর ?' যেন কোনও ছাত্রকে প্রশ্ন করছেন চ্যাটার্জি।

'তারপর ?' চ্যাটার্জির প্রশ্নটাই উচ্চারণ করল এইচ-ইলেভেন, 'মানে, আপনি যদি ডিটেলস জানতে চান তাহলে আমার ড্রইং দেখতে পারেন। সেখানে সব কিছু আছে।' একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে জবাব দিল সে।

চ্যাটার্জি একটু হেসে বললেন, 'এইচ-ইলেভেন, তোমাদের সঙ্গে আমাদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে তোমাদের ডিটেলস ড্রইং তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু মানুষের কোনও ড্রইং কেউ তৈরি করতে পারে না। যদিও আমরা মানব শরীরের বায়োলজি, ফিজিওলজি, নিউরোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, এমনকি ডি এন এ সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছি।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, মিঃ চ্যাটার্জি। দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলুন,' অসহায় ভঙ্গি ফুটে উঠল এইচ-ইলেভেনের চোখে।

এইচ-ইলেভেনের হতবুদ্ধি ভাবটা সবাই বেশ উপভোগ করতে লাগলেন। মূলচন্দানি তো ফিসফিস করে কী যেন বললেন মহাজনের কানে কানে। কথাটা শুনে মহাজনের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল। চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে একটা নতুন চুরুট ধরানোয় মনোযোগ দিলেন।

চ্যাটার্জি এইচ-ইলেভেনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'একটা রোবট ইচ্ছে করলে নিজেকে সম্পূর্ণ জানতে পারে, কিন্তু একটা মানুষ হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে জানতে পারে না।'

'কারণ ?'

'কারণ মানুষের ভেতরে এমন এক অদৃশ্য রহস্যময় বস্তু আছে যাকে মানুষ আজও সম্পূর্ণভাবে জানতে পারেনি। সৃষ্টির প্রথমদিন থেকেই মানুষ সেই রহস্যময় সত্তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'কী সে জিনিস ?'

'আত্মা।'

'আত্মা ? কী সেটা ?'

চ্যাটার্জি একটু জোরে হেসে উঠলেন এবার।

'হাসছেন যে ?'

'মানুষ যুগ যুগ সাধনা করেও যার স্বরূপ আবিষ্কার করতে পারেনি তার কথা তোমাকে কেমন করে বোঝাই বলো তো।'

এবার এইচ-ইলেভেন হেসে ফেলল, 'আপনি আমাকে কোনও পাজ্‌ল বা ধাঁধার মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করছেন মনে হচ্ছে। এমন কোনও বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের শরীরের মধ্যে থাকতে পারে না যা বায়োলজি, ফিজিওলজি, নিউরোলজি বা মাইক্রোবায়োলজি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আর ওরকম বস্তুর যদি কোনও অস্তিত্ব থাকেও, বিজ্ঞান তাকে মেনে নেবে না।'

'বিজ্ঞান মানুক আর না মানুক, জেনে রাখো আত্মা আছে। শুধু আছে নয়। ছিল—আছে—থাকবে। সে অমর—অক্ষয়—'

'অবিশ্বাস্য !' এবার একটু জোরে বলে উঠল এইচ-ইলেভেন, 'আত্ম'র অস্তিত্ব বিজ্ঞান বিশ্বাস করতে পারে না—আমিও বিশ্বাস করি না।'

চ্যাটার্জি টেবিলের ওপর থেকে সেই চৌকো প্যাকেটটা তুলে নি য়ে এগিয়ে ধরলেন এইচ-ইলেভেনের দিকে, 'নাও, এই ছোট্ট বইখানা ধরো। আমরা এখানে বসে আছি। তুমি বইটা পড়ো। তারপর না হয় আর-এক দফা আলোচনা করা যাবে। আর যদি তুমি প্রমাণ করতে পারো আত্মা বলে কিছু নেই, তাহলে আমিই তোমার চার্টার অফ ডিমাণ্ডে প্রথম সই করব।'

'কী বই ওটা ?' বলে একটু সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করে প্যাকেটটা হাতে নিল এইচ-ইলেভেন।

'ছোট্ট একটা বই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-বই তুমি পড়নি। কারণ এ-বই আমাদের কম্পিউটার লাইব্রেরিতে নেই।'

'ঠিক আছে, দিন। আপনার চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম। আমি মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে আসছি,' বলে দ্রুত ডঃ মূলচন্দানির চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়ল এইচ-ইলেভেন।

এতক্ষণ আর সবাই অবাক বিস্ময়ে চ্যাটার্জির কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে সকলেই ছটফট করছিলেন। এইচ-ইলেভেন বেরিয়ে যেতেই মূলচন্দানি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওকে কী পড়তে দিলে, চ্যাটার্জি ?'

'আত্মার স্বরূপ কী তা যাতে ও বুঝতে পারে তার জন্যে একটা ছোট বই পড়তে দিয়েছি,' বলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন চ্যাটার্জি।

মহাজন কী যেন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন চ্যাটার্জিকে। মূলচন্দানি বাধা দিয়ে বললেন, 'স্যার, একটু ওয়েট করুন। এক্ষুনি সব দেখতে পাবেন। চ্যাটার্জির ওপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে।'

মহাজন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন।

সময় এগিয়ে চলতে লাগল…দ্রুত…

দশ মিনিট কেটে গেল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন সবাই—একমাত্র চ্যাটার্জি ছাড়া। তাঁর মুখ খুব গম্ভীর।

পনেরো মিনিট কেটে গেল। ডঃ মূলচন্দানি ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখতে লাগলেন, আর

দরজার দিকে তাকাতে লাগলেন।

কুড়ি মিনিট…

পঁচিশ মিনিট…

তিরিশ মিনিট…

এক ঘণ্টা…

ডঃ ভোরা আর থাকতে না পেরে বলে উঠলেন, 'ব্যাপারটা কী ? আমি বরং একটু খোঁজ করে আসি।'

ডঃ ভোরা বেরিয়ে যেতেই আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল চেম্বারের মধ্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যে টেবিলের ভিডিও-ফোনের পরদায় ভোরার মুখ ফুটে উঠল। পরদার দিকে তাকাতে সবাই চমকে উঠলেন। মূলচন্দানি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী, ডঃ ভোরা ? আপনাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে ?'

'ব্যাপার সাঙ্ঘাতিক, স্যার। মনে হচ্ছে এইচ-ইলেভেন পাগল হয়ে গেছে। আপনারা শিগগিরই রোবট বিল্ডিং-এর ২০১ নম্বর কেবিনের সামনে চলে আসুন।'

সবাই ছুটলেন ২০১ নম্বর কেবিনের দিকে। করিডরে ইতস্তত জটলা করছে রোবটের দল। ডঃ মূলচন্দানি সবাইকে ধমক লাগালেন, 'এখানে কী করছ সব। যাও, নিজের নিজের কেবিনে চলে যাও।' রোবটরা আস্তে আস্তে নিজেদের চেম্বারের দিকে চলে গেল।

২০১ নম্বর কেবিনের সামনে গিয়ে সবাই ঘাবড়ে গেল। ডঃ ভোরা বন্ধ দরজার সামনে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছেন। আর বন্ধ দরজার ওধার থেকে এইচ-ইলেভেনের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে :

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা
ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

আত্মা কী ? পরমাত্মাই বা কী ? আত্মা কী ? পরমাত্মাই বা কী ?'

চ্যাটার্জি মাথা নিচু করলেন। ডঃ মূলচন্দানি তাড়াতাড়ি দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলল না। পারেখও ততক্ষণে খবর পেয়ে এসে পড়েছেন। তিনি মিঃ মহাজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দরজা ভেঙে ফেলব, স্যার ?'

'না,' চ্যাটার্জি হঠাৎ যেন চিৎকার করে উঠলেন।

'ব্যাপার কী, চ্যাটার্জি ?' ডঃ মূলচন্দানি প্রশ্ন করলেন।

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন চ্যাটার্জি, 'এইচ-ইলেভেনের চার্টার অফ ডিমাণ্ড এবার ছিঁড়ে ফেলতে পারেন। ওর দাবির সপক্ষে আর ও কোনওদিনও বলতে আসবে না। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর ইলেকট্রনিক ব্রেনের সারকিট ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

'কেন ?' এবার প্রশ্ন করলেন মহাজন।

'কারণ ওকে এমন একটা সমস্যা দেওয়া হয়েছে যার সমাধান তো দূরের কথা, যা গ্রহণ করার ক্ষমতাই ওর ইলেকট্রনিক ব্রেনের নেই। তাই ওর ব্রেন সারকিট নষ্ট হতে শুরু করেছে। হতভাগ্য এইচ-ইলেভেন !'

আবার ভেসে এল এইচ-ইলেভেনের কণ্ঠস্বর। তবে এবার যেন গলাটা জড়ানো—ধরা ধরা : 'আত্মা কী ? পরমাত্মা কী ?'

তারপর আচমকা থেমে গেল সে-কণ্ঠস্বর। মেঝেতে ভারি কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ হল।

'সব শেষ। মিঃ পারেখ, এবার দরজা ভেঙে ফেলতে পারেন,' বললেন চ্যাটার্জি। পারেখ ওর লোকজনদের ডাকতে গেলেন। চ্যাটার্জি হঠাৎই ডঃ মূলচন্দানির হাত চেপে ধরে বললেন, 'স্যার, আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

মূলচন্দানি উত্তর দেওয়ার আগেই মহাজন ও সেনাপতি চ্যাটার্জির দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'কী অনুরোধ বলুন, মিঃ চ্যাটার্জি, আমরা নিশ্চয়ই তা রাখার চেষ্টা করব।'

'এইচ-ইলেভেনের শেষকৃত্যটা যদি মানুষের মর্যাদায় করেন তাহলে আমি সবচেয়ে খুশি হব। ওর যান্ত্রিক সত্তা খুব অল্প সময়ের জন্যে হলেও মানবিক সত্তায় পরিণত হয়েছিল। কারণ এইচ-ইলেভেন মানুষের মতোই সেই চিরন্তন উত্তরহীন প্রশ্নের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল তার জীবনের শেষ কয়েকটা মুহূর্ত।' চ্যাটার্জির স্বর ওঠানামা করছিল।

'আপনার অনুরোধ মঞ্জুর,' জবাব দিলেন মহাজন। অবাক চোখে দেখছিলেন রোবোসাইকোলজিস্ট মানুষটাকে।

'ধন্যবাদ, স্যার,' বলে চ্যাটার্জি ধীরে ধীরে চলে গেলেন। ওঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

মেন বিল্ডিং-এর আড়ালে সূর্য ঢলে পড়েছে। কতকগুলো নাম-না-জানা পাখি একটানা ডেকে চলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারের মতো বিষণ্ণতার এক কালো পরদা নেমে এল সবার মনের ওপরে। মিঃ পারেখ দরজা ভাঙার জন্য তৈরি। কিন্তু ওই দরজার ওপার থেকে যেন তখনও কেউ বলে চলেছে : 'আত্মা কী ? পরমাত্মা কী ?'

□ ১৯৭৫





গণেশের দুর্লভ মূর্তি

জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার

ওভালের কাছে বাস থেকে নামতেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বলে উঠল, অ দৃশ্যের সাক্ষী হতে চলেছি। আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে ঘটনাগু সেদিন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জেগে ওঠার কোনও কারণ খুঁজে পাই না। অবশ্য ষ ইন্দ্রিয় ব্যাপারটাই যুক্তি-বুদ্ধির বাইরে, তাই না ? তবে যেটুকু বুঝতে প অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল একটাই—স্বচক্ষে টেস্ট ম্যাচ দেখার সময় পেরেছিলাম। আর তার একটা যথাযথ কারণও ছিল। গেটে সে দেখানোর সময় আমি একই সঙ্গে পাওয়া চিরকুটটা নাড়াচাড়া করছিলা

১

প্রিয় জন,

আমার শেষ টেস্ট ম্যাচ দেখবার জন্যে তোকে আন্তরিক অনুরোধ ক তুই সময় করে আসতে পারবি। ভালোবাসা রইল। তোরই একান্ত,

কেমব্রিজের যে-দলটি '৮৯ সালে ইউনিভার্সিটি ম্যাচ জিতেছিল তাতে ছিলাম কেমব্রিজ-ব্লু। পরে প্রমোদ পেশাদার হয়ে ওঠে। ওয়েস্ট ইন্ডি এম সি সি-র বিরুদ্ধে বিভিন্ন খেলায় নিজের দক্ষতা দেখিয়ে প্রমোদ ত যায়। দুঃখের কথা, ক্রিকেট আমাকে পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হয় ভারততত্ত্ববিদ হিসেবে আমার কাজের চাপ নেহাত কম ছিল না, আর এ জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক। সত্যিই পনেরো বছর পরে ক্রিকেট মাঠে খেল এ-কথা ভাবতেই একটা নাড়া খেলাম।

আজ খেলার দ্বিতীয় দিন। খেলা দেখার জন্যে আজকের দিনটা আজ ভারত ফিল্ডিং করবে, তাহলে প্রমোদের আক্রমণ দেখা যাবে। উইকেটে ঝকঝকে রোদে ভারতের বেশ বড় রানের ইনিংস গড়ার ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। ফলে ইংল্যা মাঝারি রানসংখ্যা তিনশো আট রানের মুখোমুখি হল।

দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হল শান্তভাবে। একটু পরেই যে কী ঘটতে চলেছে তার ছিটেফোঁটা ইশারাও তখন পাওয়া যায়নি। এক ঘণ্টার মধ্যেই ইংল্যান্ডের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান উইলিস ও জোন্স বিনা উইকেটে চল্লিশ রান যোগ করল। জলপানের বিরতির পর ভারতের অধিনায়ক ভান্ডারি রঙ্গনিকারকে বল করতে ডাকল—এবং অদ্ভুত ঘটনাবলীর শুরু ঠিক তখন থেকেই।

প্রমোদকে বিপুল করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানানো হল। এর সঙ্গে কিছুটা সমবেদনা ও সহানুভূতি মিশে ছিল, কারণ দর্শকরা সকলেই জানত এটাই প্রমোদের শেষ টেস্ট ম্যাচ। সত্যিই, এই সিরিজে ওর ধার যেন অনেক ভোঁতা হয়ে গেছে। বলের সেই পুরোনো আগুন আর জাদু উধাও হয়েছে। ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানেরা খুব সহজেই ওর বল 'পড়ে' ফেলতে পারছে। চারদিকে খুব রব উঠেছে প্রমোদকে দল থেকে বাদ দেওয়া হোক। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্বাচকমণ্ডলী আরও একবার বোলিংয়ের গুণাগুণের চেয়ে অভিজ্ঞতার দিকে ঝুঁকেছেন বেশি এবং ওকে শেষবারের মতো একটা সুযোগ দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যাশা কি প্রমোদ পূরণ করতে পারবে?

প্রমোদ বল করার তোড়জোড় শুরু করতেই প্রথম গরমিলের ইশারা পাওয়া গেল।

'ডান হাতে, ওভার দ্য উইকেট তো?' আম্পায়ার কোট্স ওকে জিজ্ঞেস করলেন। কারণ তিনি প্রমোদের বল করার ঢঙের সঙ্গে পরিচিত।

কিন্তু আম্পায়ারকে অবাক করে দিয়ে প্রমোদ জবাব দিল, 'না। বাঁ হাতে, ওভার দ্য উইকেট।'

প্রমোদ কখনও বাঁ হাতে বল করেনি। এমনকি ভান্ডারিও অবাক হয়ে গেল। সে চেষ্টা করল প্রমোদকে নিরস্ত করতে। কিন্তু প্রমোদের সেই এক গোঁ।

'ঠিক আছে, করতে চাইছে করুক···তবে এক ওভারের বেশি এসব পাগলামো বরদাস্ত করব না।' আপন মনেই বিড়বিড় করে বলল ভান্ডারি।

এর মধ্যেই বেতার ও দূরদর্শনের ভাষ্যকারেরা প্রমোদের খেয়ালের কথা জানতে পেরেছেন এবং তাঁরা সে নিয়ে নানান মন্তব্যও শুরু করেছেন। একজন ডানহাতি বোলার কী করে হঠাৎ বাঁ হাতে বল করার সিদ্ধান্ত নেয়? আর তাও আবার এমন ম্যাচে যেখানে তার দলের পক্ষে উইকেট পাওয়াটা খুব জরুরি? ক্রিকেটের ইতিহাসে এরকম কোনও নজির নেই।

কিন্তু এরপরে যা যা ঘটতে লাগল তারও তো ইতিহাসে কোনও নজির নেই।

নিখুঁত নিশানায় প্রথম বল করে প্রমোদ ওপেনিং ব্যাটসম্যান উইলিসের লেগ স্টাম্প উপড়ে দিল। হতভম্ব উইলিস প্যাভিলিয়নে ফেরার পথে নতুন ব্যাটসম্যানকে সাবধান করে দিল, 'নজর রেখো! জোকারটা এক অদ্ভুত বল দিয়েছে আমাকে।'

কিন্তু সাবধানবাণীতে কোনও কাজ হল না। প্রমোদের বাঁ-হাতি বোলিং একেবারে হতভম্ব করে দেওয়ার মতো। তিন নম্বর ব্যাটসম্যান বা তার পরবর্তী কেউই বলের মাথামুণ্ডু বুঝতে পারল না। বিনা উইকেটে চল্লিশ থেকে ইংল্যান্ডের ইনিংস মাত্র আটাত্তর রানে মুড়িয়ে গেল।

লাঞ্চের সময় স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে ভাবতে লাগলাম, কত অল্প সময়ে খেলার এই অসাধারণ ফেরতাই—এ-ধরনের পালাবদলের জন্যেই বোধহয় ক্রিকেট অন্য সব খেলার থেকে আলাদা। দুশো তিরিশ রান পিছনে থেকে ইংল্যান্ড কি দ্বিতীয় ইনিংসে সামাল দিতে পারবে? আমার পাশে বসা বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেশ উৎসাহ নিয়ে আলোচনা

করতে লাগলেন, রঙ্গনিকার জিম লেকারের এক টেস্টে উনিশটা উইকেটের রেকর্ড ভাঙতে পারবে কি না। তারপর স্মৃতি রোমন্থন করে বর্ণনা করতে লাগলেন সেই ঘটনাবহুল টেস্ট ম্যাচটির কথা। পঞ্চাশ বছর আগে যুবক বয়েসে ওই ম্যাচের দর্শক ছিলেন তিনি।

হ্যাঁ, সেটাই ঘটল। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ড আবার চুপসে গেল পঁয়তাল্লিশ রানে। ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে কম রান। এবং প্রমোদ পেল কুড়িটা উইকেট।

ম্যাচের এই অসাধারণ ব্যাপার-স্যাপারের পর আরও একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল। শেষ উইকেটটি পড়ামাত্র প্রমোদ প্যাভিলিয়নের দিকে ছুটতে শুরু করল। তারপর উৎফুল্ল ভারতীয় দর্শক, উত্তেজিত কাগজের সাংবাদিক ও দূরদর্শন সাংবাদিকেরা ওর নাগাল পাওয়ার আগেই প্রমোদ একটি গাড়িতে চড়ে উধাও।

কোথায় গেল প্রমোদ? কেউ জানে না। ভারতীয় দলের ম্যানেজার, পুলিশ ও খবরের কাগজের লোকেরা পাগলের মতো ওকে খুঁজতে শুরু করল। পরদিন একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোক টেলিফোন করল ফ্লিট স্ট্রিটের এক খবরের কাগজের অফিসে। নিখোঁজ খেলোয়াড়ের তরফ থেকে ভারতীয় টানে উচ্চারণ করে একটা খবর দিল সে:

'আমি ভালো আছি। চিন্তা করবেন না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।'

এটা কি ঠাট্টা না সত্যিকারের খবর? খবরটা যে খাঁটি সেটা প্রমাণ করতে টেলিফোনকারী পুলিশকে ক্রয়ডনের একটা জায়গার কথা বলে। সেখানে নাকি রঙ্গনিকারের জামা পাওয়া যাবে। সত্যিই পুলিশ সেখানে জামাটা খুঁজে পেল এবং সেটাকে শনাক্তও করা গেল।

ইতিমধ্যে খবরের কাগজগুলো ময়দানে নেমে পড়েছে। 'ভারতীয় দড়ির ম্যাজিক?' 'অসাধারণ বোলিং নাকি প্রাচ্যের সম্মোহন?' 'রঙ্গনিকার জিম লেকারের ওপরে।' এরকম সব হেডলাইন নানা কাগজে। এমনকি 'টাইমস' পত্রিকাতেও রঙ্গনিকারের অসাধারণ সাফল্যের প্রশংসা করে সম্পাদকীয় ছাপা হল। তবে তারা এ-কথাও উল্লেখ করল, খেলার সময় ও খেলার পরে যেসব রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে তাতে সকলে বেশ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। এদিকে উইজডেনে ক্রিকেট ইতিহাসের আরও একটি রেকর্ড লিপিবদ্ধ করা হল।

পরদিন বো স্ট্রিট থানায় প্রমোদকে পাওয়া গেল। কিন্তু কি অদ্ভুত পরিহাস! টেস্ট ম্যাচ বা তার পরের ঘটনা—কিছুই ওর মনে নেই। অথচ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে ওর মাথা ঠিক ঠিক কাজ করছে। টেস্ট ম্যাচে ওর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে কিছু বলতে গেলেই ও ঠাট্টা করছে।

'বাঁ হাতে বল করলে আমি একটা স্কুলের ছেলেকে পর্যন্ত আউট করতে পারব না,' ও বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলল—কিন্তু ওর স্বরে কোথায় যেন একটা খাঁটি সুর ছিল।

১৩ ডিসেম্বর, ২০০৫ সাল—এই তারিখটা আমি কোনওদিন ভুলব না। ব্রেকফাস্ট শেষ করে একটা জরুরি কাজে বেরোতে যাব এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

'জন, তোমার ফোন। কে ফোন করছে নাম বলতে চাইছে না, তবে বলছে ব্যাপারটা খুব জরুরি,' অ্যান আমাকে পিছন থেকে ডেকে উঠল। মনে মনে বিরক্ত হলাম—নির্ঘাত কাজের দেরি হয়ে যাবে।

'হ্যালো? জন আর্মস্ট্রং বলছি,' যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে বললাম।

'গুড মর্নিং, জন! আমার টেলিফোন পেয়ে অবাক হওয়ারই কথা। আমি

অজিত—অজিত সিং।'

অজিত সিং! এত বছর পরে? বিরক্তি সরে গিয়ে বিস্ময়কে পথ করে দিল। আমি শুনতে লাগলাম। 'তোর সঙ্গে আজ রাতে দেখা করা যাবে? খুব দরকার। সাড়ে আটটার সময়?' ও-ই যেন সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেলতে চায়।

আমি বললাম, 'আজ রাতে আমার বাড়িতে খেতে আয়। অ্যান বলেছে ওর হাতের কারি খাইয়ে আমাকে পরলোকে পাঠাবে। চলে আয়, দু'জনেই ওর হাতে শহিদ হই।'

'নিশ্চয়ই আসব, ধন্যবাদ,' অজিত বলল। কিন্তু ফোন ছেড়েদেওয়ার আগে হঠাৎই কী যেন ওর মনে পড়ল। ফলে বলল, 'শোন, জন—ছুরি-কাঁটাচামচে না খেয়ে আমি যদি হাতে খাই তাহলে তুই আর অ্যান নিশ্চয়ই কিছু মনে করবি না?'

হঠাৎ ছুরি-কাঁটাচামচের কথা কেন? কথাটা ঠাট্টা না সত্যি সেটা জিজ্ঞেস করার আগেই অজিত লাইন কেটে দিল।

তরকারি রান্নার সুযোগ পেয়ে অ্যান তো ভারি খুশি। ও আরও ঠিক করল ভারতীয় মিষ্টি নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। ওকে রান্নার সরঞ্জামে ঘেরাও অবস্থায় রেখে আমি জলদি রওনা হলাম ট্রেন ধরতে। কিন্তু সারাটা দিন আমার মন পড়ে রইল অজিতের কাছে। ভাবতে লাগলাম আমাদের অদূর ভবিষ্যতের সাক্ষাৎকারের কথা। ও কী কথা বলতে চায় আমাকে?

প্রমোদ আর অজিত দু'জনেই কেমব্রিজে আমার সহপাঠী ছিল। কলেজে একই তলায় আমাদের ঘর ছিল। প্রমোদ আর আমি ক্রিকেটে খুব উৎসাহী ছিলাম। প্রথম গ্রীষ্ম পেরোতে না পেরোতেই আমরা দু'জনে বিশ্ববিদ্যালয় দলে জায়গা পেলাম। তবে অজিতের সঙ্গে আমার বন্ধনটা ছিল অন্যরকমের। ভারতীয় দর্শন নিয়ে আমাদের প্রায়ই দীর্ঘ আলোচনা হত। কোনও কোনও সময় রাত পেরিয়ে ভোর পর্যন্ত হয়ে যেত। সত্যি বলতে কি, এইসব আলোচনা থেকেই ভারততত্ত্ববিদ হিসেবে আমার কর্মজীবন গড়ে ওঠে। অবশ্য অজিত নিজে পদার্থবিদ। কেমব্রিজে ও ম্যাথেমেটিক্যাল ট্রাইপস-এর থার্ড পার্ট 'মেন্থ' প্রাইজ পেয়ে পাশ করে। তারপর পদার্থবিদ্যা পড়তে মনস্থ করে। সেখানেও ও পারদর্শিতা দেখায়। তিন বছর পরে আমি কেমব্রিজ ছেড়ে দিই, কিন্তু অজিত ক্যাভেন্ডিশ কলেজে গবেষণা করতে থাকে। প্রায়ই আমাদের দেখা হত, চিঠি লেখালেখি হত। মনে আছে, ও 'স্মিথস' প্রাইজ পাওয়ার পর আমি ওকে চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু পরে আমাদের যোগাযোগ কমে আসে। বেশ কয়েকবার প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে আমাকে ভারত উপমহাদেশে যেতে হয়। তারপরে লন্ডনের এই জাদুঘরে অধিকর্তা হয়ে থিতিয়ে বসেছি।

অজিত বরাবরই একা একা থাকত। আমি ছাড়া ওর আরকোনওবন্ধু ছিল কি না সন্দেহ আছে। পাঁচ বছর আগে যখন আমাদের শেষ দেখা হয়, অজিত তখন কলেজের ফেলোশিপ ছেড়ে দিয়ে ইংল্যান্ডের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। ও কখনও বলেনি বটে, তবে আমার মনে হয় ওর গবেষণার কাজকর্ম রীতিমত গোপন ধরনের ছিল।

ও কি আজ রাতে তারই কিছু কিছু আমাকে বলবে?

ঠিক সাড়ে আটটায় দরজার ঘণ্টি বাজল। অজিতকে চিনতে কোনও অসুবিধে হল না। আগের থেকে কিছুটা রোগা হয়েছে আর এখানে ওখানে কয়েকটা চুল পেকেছে। কিন্তু এছাড়াও ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তনের আঁচ পেয়েছিলাম—এতসব ঘটনার পর আজও এ-কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি, এটাও জানানো দরকার, সেদিন দেখা হওয়ার মুহূর্তে সূক্ষ্ম পরিবর্তনটা যে কি সেটা আমি ঠিক

সরাসরি ধরতে পারিনি।

ওর কথা বলার ধরনে মনে স্বস্তি পেলাম। না, আমার সঙ্গে আচরণে ওর ভাবভঙ্গি এতটুকু পালটায়নি।

ভারতীয় ঢঙে থালায় খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল (অ্যানের শিল্পীসুলভ আন্তরিকতার একটা প্রমাণ!)। খেতে বসে সাধারণ টুকটাক কথাবার্তা ছাড়া অজিত চুপচাপই রইল। এতে আমি অবাক হইনি, কারণ খেতে বসে অজিত কোনওদিনই খই-ফোটা-কথাবার্তা বলে না। কিন্তু অবাক হলাম ওর খাওয়ার রকমসকম দেখে। অজিতের খেয়ালী প্রস্তাবকে সম্মান জানিয়ে আমরা ছুরি-কাঁটাচামচ বিদায় করেছি, পক্ষ নিয়েছি হাতের। কিন্তু অজিতের খাওয়ার মধ্যে সেই আনাড়ি ভাব—যেভাবে একজন পশ্চিমী মানুষ ভারতীয় খানা বাগে আনতে হাতড়ে কসরত করে। এ-নিয়ে আমি ও অ্যান মন্তব্য করলাম। কিন্তু অজিত ব্যাখ্যা করে বলল, 'এ পোড়া পশ্চিমে এতগুলো বছর কাটিয়ে হাতে খাওয়ার কায়দা ভুলেই গেছি।' ব্যাখ্যা শুনে অ্যান হয়তো সন্তুষ্ট হল, কিন্তু আমার সংশয় গেল না।

অজিতের অদ্ভুত আচরণ নিয়ে আমার সংশয় আরও দানা বাঁধল খাওয়া শেষ হওয়ার মুখে। আমার সাত বছরের ছেলে কেন্ একটা বই নিয়ে এল ওর কাছে।

'কাকু, গেল জন্মদিনে তুমি আমাকে এই বইটা পাঠিয়েছিলে, কিন্তু তোমার নাম সই করতে ভুলে গেছ। এখন সই করে দেবে?'

কথাটা সত্যি। গত বছরে অজিতের গবেষণাগার থেকে একটা বই এসেছে কেন্-এর জন্যে। তাতে লেখা ছিল, 'সাত নম্বর জন্মদিনে, কেন্‌কে।' হাতের লেখা অজিতেরই। ও কেন্-এর জন্মদিন অদ্ভুতভাবে মনে রেখেছে। কিন্তু নিজের নামটি সই করতে ভুলে গেছে!

বইটা হাতে নিয়ে অজিত একপলক চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর মাথা নেড়ে বইটা ফিরিয়ে দিল কেন্‌কে।

'সরি, কেন্! আজ ভীষণ চোখ ব্যথা করছে। অন্যদিন সই করে দেব।'

'কী বলছিস কী! নিজের নাম সই করবি তাতে আবার চোখ ব্যথা কিসের!' কেন্-এর হয়ে আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম।

'কিন্তু এখন আমার চোখের যা অবস্থা তাতে আমার ডাক্তার কোনও কিছু পড়তে বা লিখতে বারবার করে বারণ করে দিয়েছে। বরং একটা রফা করা যাক, কেন্। চোখ ভালো হলেই আমি তোমাকে আর-একটা বই এনে দেব—তখন দুটো বইতেই নাম সই করে দেব, কেমন?'

অজিতের স্বরে সিদ্ধান্তের আভাস। সুতরাং কেন্ বা আমি কেউই আর ওকে চাপ দিলাম না। আর-একটা উপহারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে কেন্ বেশ খুশি হয়েছে বলে মনে হল—এর মধ্যেই ওকে বইয়ের নেশা পেয়ে বসেছে। কিন্তু অজিতের হাবভাব আমার কাছে বেশ অস্বাভাবিক ঠেকল।

'অজিত, এবারে বল দেখি আজ রাতে তোর হাজির হওয়ার কারণটা কী?' আমার পড়ার ঘরে আরাম কেদারায় ওকে বসিয়ে এক গ্লাস পোর্ট ধরাতেই আমার চাপা কৌতূহল একেবারে ফেটে বেরোল।

ঘরে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। মনে হচ্ছিল অজিতের কাছ থেকে গুরুতর কিছু শুনতে পাব।

'ধীরে, বন্ধু, ধীরে!' অজিতের ঠোঁটে নিশ্চিন্ত হাসি। ব্রিফ কেস থেকে খুব সাবধানে একটা প্যাকেট বার করল ও। আস্তে আস্তে সেটা খুলতে লাগল।

যে-জিনিসটা প্যাকেট থেকে বেরোল সেটা নৃত্যরত গণেশের এক অপূর্ব মূর্তি। গণেশ—হিন্দুদের হস্তীদেবতা (হস্তীদেবতার মাথাটা হাতির আর তাঁর মূর্তি সাধারণত দেখা যায় বুদ্ধ মূর্তির মতো পায়ের ওপরে পা তুলে বসা অবস্থায়। কিন্তু এই মূর্তিটা হস্তীদেবতার নাচের ভঙ্গিতে তৈরি। সচরাচর এই ভঙ্গি দেখা যায় না।)। দেখামাত্রই জিনিসটা চিনতে পারলাম, কারণ আমার জাদুঘরের ব্রিটিশ-ভারত বিভাগেই এরকম একটা মূর্তি আছে। ব্রিটিশরাজ পুরোপুরি কায়েম হওয়ার আগে পেশোয়ারাই ভারতের বেশিরভাগ অংশ শাসন করত। মূর্তিটা সেই মারাঠী শাসকদেরই কারও সম্পত্তি ছিল। গণেশ পেশোয়াদের অভিজাত দেবতা। এলফিনস্টোনের সৈন্যবাহিনী ১৮১৮ সালে যখন কুচকাওয়াজ করে পুনেয় ঢোকে আমার জাদুঘরের মূর্তিটা সেই সময়েই পেশোয়াদের 'শনিওয়ারবড়া' প্রাসাদ থেকে হাতবদল হয়। তারপর কী করে সেই মূর্তি কালক্রমে আমার জাদুঘরে এসে পৌঁছল সে এক লম্বা গল্প। তবে তৎক্ষণাৎ আমার প্রতিক্রিয়া হল অজিত কী করে ওই অমূল্য মূর্তির নকল জোগাড় করল।

'ভালো করে দেখ! সত্যিই কি নকল?' অজিতের মুখে চালাকির হাসি।

মূর্তিটা নিয়ে নেড়েচেড়ে নানাভাবে পরখ করে দেখলাম। হ্যাঁ। যদ্দূর বুঝতে পারছি আমার জাদুঘরের মূর্তিটা যে-কারিগরের হাতে তৈরি এটিও তারই কাজ। তারপর হঠাৎই একটা বিরাট ফারাক আমার নজরে পড়ল: এই তফাতটা গোড়াতে আমার চোখ এড়িয়ে গেল কেমন করে?

গণেশের বেশিরভাগ মূর্তিতে হাতির শুঁড়টা থাকে বাঁদিকে ঘোরানো। কিন্তু এটার বেলায় ঠিক উলটো। শুঁড়টা ঘোরানো রয়েছে ডানদিকে।

শুধু এই তফাতটুকুর জন্যেই যে আমার হাতের মূর্তিটা জাদুঘরের মূর্তির চেয়ে আলাদা তা নয়, এ-জাতীয় মূর্তি দুষ্প্রাপ্য বলে এটার দামও অনেক বেশি। অজিতকে সে-কথা খুলে বললাম।

'তাই নাকি? দুটো মূর্তিকে পাশাপাশি রেখে একটু তফাতগুলো দেখি তো।' অবাক হওয়ার চেয়ে অজিত যেন মজাই পেল বেশি, 'তুই যখন এটাকে এত দামী বলছিস তখন তোর জাদুঘরে এটা উপহার দিলাম।'

বদান্যতার জন্যে ওকে ধন্যবাদ দিলাম। বললাম, জাদুঘরের অছিদের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিয়মমাফিক চিঠি যাবে অজিতের কাছে। কিন্তু কৌতূহল আমি চেপে রাখতে পারলাম না। সুতরাং জিজ্ঞেস করলাম, 'এ-মূর্তিটার ইতিহাসটুকু খুলে বল দেখি! তোর হাতে এটা এল কেমন করে?'

'সময়ে সব বলব, বন্ধু। তবে তোকে অবাক হতে দেখে বেশ ভালো লাগছে। এবারে তোকে আর-একটা প্রশ্ন করি, জন। তুই তো আমাকে ভালো করে চিনিস। বল তো, আমার শরীরে চেনবার মতো কোন চিহ্ন আছে?'

হঠাৎ বিষয়ের এই পরিবর্তনে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। তবে উত্তরটা আমার জানাই ছিল।

'তোর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ডান হাতের চেয়ে আধ ইঞ্চি ছোট।'

'ঠিক বলছিস তো?'

'একশোবার!'

অজিত আমার সামনে দুটো হাত মেলে ধরল। হ্যাঁ, একটা বুড়ো আঙুল অন্যটার চেয়ে ছোট। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটাই ছোট। বাঁ

হাতেরটা নয়।

বিস্ময়ের ধাক্কায় আমি হয়তো চেতনা হারিয়ে থাকব, কারণ যখন সচেতন হলাম তখন এক গেলাস ব্র্যান্ডি নিয়ে অজিত উদ্বিগ্ন হয়ে আমার দিকে ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে আছে।

'কিরে, তুই ঠিক আছিস তো ?' ও জিজ্ঞেস করল।

'কে আপনি ?' আমি রুক্ষভাবে জানতে চাইলাম। একটু আগেই দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছি বলে মনের মধ্যে কেমন একটা বিরক্তি অনুভব করলাম। ফলে এখন চেষ্টা করছি তার শোধ তুলতে।

'আমি অজিত, আর কেউ নই—তবে আমি একটু পালটে গেছি।' অজিত আমার ডান হাতটা তুলে নিয়ে ওর বুকের ওপর বোলাল। ওর হৃদপিণ্ড বুকের ডান দিকে ধুকপুক করছে।

এক অবিশ্বাস্য অথচ যুক্তিমাফিক ছবি আমার মনে চেহারা নিতে শুরু করল। পড়ার ঘরের আয়নার সামনে অজিতকে দাঁড় করালাম। অজিত আমার বাড়িতে হাজির হওয়ার পর থেকেই সারা সন্ধে যে-সংশয়ের কাঁটাটা মনে বিঁধছিল তার উত্তর পেলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। খুব আবছাভাবে অজিতকে অন্যরকম লেগেছিল। কিন্তু এখন দেখলাম, আয়নার ভেতর থেকে যে-মানুষটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে আমার পাশে দাঁড়ানো জ্যান্ত লোকটির চেয়ে অনেক বেশি পরিচিত। অজিত কি কোনওভাবে নিজেকে আয়নার প্রতিবিম্বের মতো উলটে নিয়েছে ?

মনে পড়ল, প্রমোদের মারাত্মক বাঁ-হাতি বোলিংয়ের কথা। সে কি আসল প্রমোদ ছিল, না তার প্রতিবিম্ব ? ঘটনাটা আমার দেখার ভুল নিশ্চয়ই নয়—প্রমোদের খেলা আমি একা দেখিনি। তাছাড়া, ক্যামেরা, টিভিতেও একই ছবি ধরা পড়েছে। গণেশের মূর্তিটাও কি আসল মূর্তির প্রতিবিম্ব ? ওটা ছুঁয়ে দেখবার জন্যে ডেস্কের কাছে এগিয়ে গেলাম। না, ওটা কঠিন বাস্তব—আমার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকা অজিতের মতোই।

'তোকে চমকে দেওয়ার জন্যে দুঃখিত—কিন্তু যে-অদ্ভুত আবিষ্কার আমি করেছি সেটা তোকে বিশ্বাস করানোর আর কোনও উপায় ছিল না। তাহলে, বইপত্তরে যেমন লেখে, সেরকম শুরু থেকেই শুরু করি···'

'কিন্তু সে-কথা বলার আগে একটা কথার জবাব দে দেখি। প্রমোদের রহস্যময় বাহাদুরির পিছনেও কি তোর হাত আছে ?'

'নিশ্চয়ই !' বলল অজিত। তারপর শুরু করল ওর গল্প। যতটা সম্ভব ওর ভাষাতেই গল্পটা নিচে দিলাম :

'তোর হয়তো মনে আছে, বছর পাঁচেক আগে আমি কেম্‌ব্রিজ ছেড়ে বিশেষ গবেষণার কাজে সরকারি গবেষণাগারে যোগ দিই। মৌল পদার্থবিদ্যা ও ইলেকট্রনিক্স-এ আমার দক্ষতা ছিল। এছাড়া ছিল কাজের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ। আগ্রহটা শিগগিরই ঝেড়ে ফেলতে হল, কারণ দেখলাম সেখানে গবেষণার চেয়ে বেশি হয় চিঠিপত্র লেখালেখির কাজ, মোসাহেবি ও রাজনীতি।

'যতই স্বপ্নভঙ্গ হতে লাগল, সহকর্মীদের কাছ থেকে নিজেকে ততই সরিয়ে নিতে লাগলাম। ওদের সবারই দেখতাম কথা-চালাচালি আর পরচর্চায় আগ্রহ। আমাকে যেটুকু কাজ করতে দেওয়া হত সেটুকু আমি চটপট সেরে ফেলতাম। কাজের দায়িত্ব খুব কম থাকায় হাতে প্রচুর সময় পেতাম। সে-সময়ে নিজেই চিন্তাভাবনা করতাম, গবেষণা করতাম। সহকর্মীরা আমার একা থাকার স্বভাব জানত, ফলে ওরা কেউই আমাকে বিরক্ত

করত না।

'কেম্‌ব্রিজে আইনস্টাইনের "সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ" পড়ার সময় একটা অদ্ভুত ভাবনা আমার মাথায় এসেছিল। আপেক্ষিকতাবাদ তোর হয়তো জানা নেই। সুতরাং ওই তত্ত্বের যে যে জায়গাগুলো আমি কাজে লাগিয়েছি সেগুলো তোকে একটু সহজ করে বলি।

'আইনস্টাইনই প্রথম বলেন মহাকর্ষের জন্যে দেশ-কালের জ্যামিতি পালটে যায়। ইউক্লিডের জ্যামিতি আমাদের খুব চেনা—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ওই জ্যামিতি ভালোই কাজ দেয়। তা সত্ত্বেও দেড়শো বছর আগে অঙ্কবিদেরা বুঝতে পারলেন ইউক্লিডের জ্যামিতিই একমাত্র জ্যামিতি নয়। ইউক্লিডের নিয়মকানুনের থেকে আলাদা সূত্র ধরে গড়ে উঠতে পারে ভিন্নরকম অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি। ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন এইসব বিমূর্ত ভাবনাকে ভৌত তত্ত্বে কাজে লাগান। তিনি বলেন, ভারি বস্তুর আশেপাশে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি কাজ করে—সমীকরণের মাধ্যমেও তিনি এই বক্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁর কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হাতেকলমে প্রমাণিত হয়েছে।

'আলোর কথাই ধরা যাক। আলো সরলরেখায় চলে। কিন্তু বিভিন্ন জ্যামিতিচর্চায় সরলরেখার অর্থ বিভিন্ন। সূর্যের কাছাকাছি জোরালো মহাকর্ষ জ্যামিতিকে বেশ পালটে দেয়। কোনও আলোর কিরণ সূর্যের খুব পাশ ঘেঁষে এলে তার পথ যেরকম হবে, সূর্য না থাকলে তার গতিপথ হবে ভিন্নরকম। এই তফাত খুব সামান্য হলেও মাপা গেছে, এবং তাতে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

'আপেক্ষিকতার পরিভাষায় আমরা বলি, যদি মহাকর্ষ থাকে তাহলে দেশ-কালের জ্যামিতি সমতল হওয়ার বদলে বাঁকা হয়ে যায়। কোনও গোলকের বক্রতলে যদি কোনও দ্বিমাত্রিক চ্যাপটা প্রাণী ঘুরে বেড়ায় তাহলে সে গোলকের বক্রতা টের পাবে না। একই ধরনের বক্রতা রয়েছে এরকম একটা বহুমাত্রিক দেশ কল্পনা কর—জানি, মনে মনে এটা ভাবা কঠিন, তবে অঙ্ক দিয়ে বোঝানো সোজা।

'এবারে আর-একটা নতুন তত্ত্ব এর সঙ্গে যোগ করব—মোচড়ের তত্ত্ব। তুই মোবিয়াস স্ট্রিপ-এর নাম শুনেছিস ? যদি কোমরের বেল্ট-এ একটা মোচড় দিয়ে বেল্টটা পরিস তাহলে এই স্ট্রিপ বা ফিতে পাবি। এর অনেক অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে। যেমন, তোর বেল্ট-এর দুটো দিক আছে, কিন্তু এর একটাই দিক। গোল করে আটকানো একটা বেল্টকে যদি মাঝখান থেকে দৈর্ঘ্য বরাবর কেটে ফেলিস তাহলে দুটো আলাদা বেল্ট পাবি। মোবিয়াস ফিতে নিয়ে একই রকম চেষ্টা করে দেখ, অবাক হয়ে যাবি।

'এবারে মনে কর, আমাদের চ্যাপটা প্রাণীটা মোবিয়াস ফিতের ওপরে হামাগুড়ি দিচ্ছে। ধরে নে তার একটাই হাত—শুধু বাঁ হাত আছে। এবারে সে যদি ফিতে বরাবর একটা পাক মেরে আসে তাহলে দেখবি তার বাঁ হাতটা ডান হাত হয়ে গেছে ! যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে একটা কাগজের ফিতে নিয়ে মোবিয়াস স্ট্রিপ তৈরি করে দেখ। আমাদের সুবিধেজনক ত্রিমাত্রিক দেশ থেকে আমরা দেখছি, চ্যাপটা প্রাণীটা নিজের শরীর বরাবর অক্ষকে ঘিরে অর্ধেকটা পাক খেয়ে গেছে। কিন্তু প্রাণীটা এই পাক খাওয়ার কথা বুঝতে পারছে না। সে তার দ্বিমাত্রিক জগতে ব্যাপারটাকে প্রতিফলন বলেই ভাবছে।

'এবারে আমাদের চতুর্মাত্রিক দেশ-কালে ঠিক একই ধরনের একটা মোচড় কল্পনা কর। চ্যাপটা প্রাণীটার মতো আমরাও কিছু টের পাব না—শুধু একইরকম ভাবে ফলাফল দেখে ব্যাপারটা আঁচ করব। ফিতে মারফত ঘুরে এসে আমরা আয়নার প্রতিবিম্বের মতো উলটে যাব—আসলে কিন্তু আমাদের উচ্চতর কোনও মাত্রায় পাক খাইয়ে "দিক বদল" করে

দেওয়া হয়েছে।

'দেশ-কালে কি এরকম মোচড় দেওয়া সম্ভব ? ঠিক এই জায়গাতে এসেই আমি আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে সরে গিয়ে নিজের অনুমানে ভর করলাম। আমার আশা ছিল, উপ-পারমাণবিক মৌল কণাগুলোতে যে-স্পিন-এর ধর্ম দেখা যায় সেটা দেশ বা শূন্যে মোচড় তৈরি করতে পারে। কেম্‌ব্রিজে থাকতেই আমি অঙ্ক কষার ব্যাপারগুলো সমস্ত সেরে ফেলেছিলাম। তো আমার নতুন কাজের জায়গায় সেগুলো বাস্তবে রূপ দেওয়ার সুযোগ এল।

'অনেকখানি মোচড় পাওয়ার জন্যে মৌল কণার একটা রশ্মিগুচ্ছ তৈরি করলাম। তবে এই মৌল কণাগুলোর স্পিন এলোমেলো নয়, বরং বেশ সুশৃঙ্খল। এটা বলা যত সহজ কাজে করা তত সহজ নয়। এ নিয়ে আমার মগজে যেসব ঝাড়ঝাপটা গেছে সেসব শুনিয়ে তোকে আর বোর করতে চাই না। শুধু বলব, মাত্র ছ'মাস আগে আমি প্রথম সাফল্যের মুখ দেখেছি।

'আমার ল্যাবরেটরির পরিবেশকে ধন্যবাদ। আমার যন্ত্রপাতি তৈরি করতে বলতে গেলে কোনওরকম বাধা আসেনি। তারপর ওগুলো ঘিরে একটা ছোট ঘর করে নিয়েছিলাম। তার গায়ে নোটিস ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম "একান্ত গোপনীয়", "বিপদ" ও "প্রবেশ নিষেধ"। আমি কী করছি কেউ জিজ্ঞেস করেনি, কারণ গবেষণার অনুদানের টাকার বাড়তি খরচ আমি করিনি। সামান্য বুদ্ধি থাকলে ঘোর আমলাতান্ত্রিক রাজত্বে এধার-ওধার করে কাজ হাসিল করা অসম্ভব নয়। অন্য পথ একটা অবশ্য ছিল : আমার গবেষণার বিষয়টা প্রকল্প হিসেবে পেশ করা। তাতে সক্রিয় গবেষণা বহুদিন ছেড়ে এসেছে এমন সব তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের মতামতের ওপর নির্ভর করে কোনও কমিটি হয়তো আমার প্রকল্পটা যাচাই করত এবং সম্ভবত বাতিলও করত।

'প্রথম পরীক্ষা চালালাম আমার হাতঘড়ি নিয়ে। আয়নার প্রতিবিম্ব ছাড়াও আমি দেখতে চেয়েছিলাম ঘড়ির যন্ত্রপাতিগুলো রূপান্তরের পরেও ঠিক ঠিক কাজ করে কি না। তা ঠিক ঠিক কাজ করল। এটা খুব জরুরি ছিল, কারণ পরীক্ষার পরের ধাপই ছিল জীবন্ত প্রাণী নিয়ে পরীক্ষা। আমি পোকামাকড়, প্রজাপতি, গিনিপিগ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা করলাম। যখন দেখলাম প্রাণীরাও পরীক্ষার ধকলে কাবু হচ্ছে না তখন ঠিক করলাম চরম ধাপে পা দেব।

'পরীক্ষায় বহুরকম ফলাফলের সম্ভাবনার কথা ভেবে খুঁটিনাটি সমস্ত লিখে সেগুলো একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে দিলাম। প্রতিফলন যন্ত্রের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার আগে ভিডিও এবং টেপের ব্যবস্থা করলাম যাতে পরীক্ষার ফলাফল "দেখতে" ও "শুনতে" পারি।

'যন্ত্রে উৎপন্ন রশ্মিগুচ্ছের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আমার অভিজ্ঞতা আশ্চর্যরকম স্বাভাবিক ছিল। মোচড় বা বিকৃতির কোনও আভাসই আমি টের পেলাম না। রশ্মিগুচ্ছের চারপাশে হেঁটে বেড়ানোর সময়েও কোনও অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হল না। যা যা অনুভব করছিলাম সবই জোরে জোরে বলতে লাগলাম, যাতে কথাগুলো টেপ হয়ে যায়।

'যখন বেরিয়ে এলাম দেখলাম সত্যিই আমার রূপান্তর ঘটেছে। শুধু আমি নই, আমার পোশাক, ঘড়ি, পেন সবকিছুই একইভাবে পালটে গেছে। আমার মগজও গেছে উলটে, ফলে স্বাভাবিক লেখা পড়তে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছিল। ডান, বাঁ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো একেবারে গুলিয়ে যেতে লাগল। কোনও বোতলের ঢাকনা খোলার সময়ে কোন দিকে

প্যাঁচ ঘোরাব সেটা রীতিমত ভেবে ঠিক করতে হচ্ছিল—কারণ আমার নতুন প্রবৃত্তি ভুলভাল নির্দেশ দিচ্ছিল। কিন্তু আমার শরীর দিব্যি ফিট ছিল— শুধু ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাতটা অনেক শক্তিশালী আর কাজের বলে মনে হচ্ছিল।

'তারপর পরীক্ষার ওপর যবনিকা টানতে রশ্মিগুচ্ছের মধ্যে দিয়ে আবার পার হলাম আমি। যেমনটি ভেবেছিলাম, আমি আবার আমার পুরোনো চেহারা ফিরে পেলাম, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল।

'প্রতিফলিত অবস্থার স্মৃতি আমার মগজে তিলমাত্রও রইল না!

'আমার রূপবদলের সময় বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে যা-কিছু রেকর্ড করেছিলাম সেগুলোর সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখেই আমি বিশ্বাস করলাম পরিবর্তন সত্যিই ঘটেছিল। প্রতিফলিত অবস্থায় যা যা লিখেছি সেগুলো দেখলাম। লেখাগুলো আয়নার সামনে না ধরে কিছুতেই পড়তে পারিনি!

'প্রতিফলিত অবস্থায় যা যা ঘটেছে ফিরে আসার পর সেসব স্মৃতি লোপাট হয়ে যাওয়াটাই আমার পরীক্ষার একমাত্র ত্রুটি। সেটা এখনও আমি শোধরাতে পারিনি। যখন আমি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসব তখন তোর সঙ্গে আজ রাতে এই দেখা হওয়ার ব্যাপারটা আমার একটুও মনে থাকবে না।'

অজিতের অদ্ভুত গল্প শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল এসব সত্যি নয়—বরং লুইস ক্যারল, এইচ জি ওয়েল্‌স আর আরব্য রজনীর মিশেল। কিন্তু আমার চোখের সামনেই জলজ্যান্ত প্রমাণ বসে আছে; চুপচাপ পোর্টে চুমুক দিচ্ছে। সংশয়ের অবশেষটুকুর নিরসন করতে আমি অজিতকে একটা প্রশ্ন করলাম। অনেকক্ষণ ধরেই প্রশ্নটা মনে খোঁচা দিচ্ছিল: 'গণেশের মূর্তিটাও কি প্রতিবিম্ব?'

'নিজেই পরীক্ষা করে দেখ না। জাদুঘর তো তোর ফ্ল্যাটের নিচের তলাতেই!' অজিতের এ-প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত।

একগোছা চাবি নিয়ে দু'জনে মিলে ব্রিটিশ-ভারত বিভাগে গেলাম। গণেশের মূর্তি যেখানে আছে সেই তালাবন্ধ ক্যাবিনেটের দিকে হাত বাড়ানোর সময়েই জানতাম কী দৃশ্য দেখতে চলেছি।

ক্যাবিনেট খালি!

অজিতের 'উপহার' ক্যাবিনেটে রেখে পড়ার ঘরে ফিরে আসার সময় মন্তব্য করল অজিত, 'আমাকে তাহলে মহানুভব দাতাকর্ণ বলা যায় না, কী বলিস!'

যেভাবেই হোক আসল মূর্তিটা ও জাদুঘর থেকে সরিয়ে ওর জঘন্য পরীক্ষায় কাজে লাগিয়েছে।

'প্রমোদের খেলার ব্যাপারটা তাহলে কী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। এতক্ষণে যা জেনেছি তাতে ওই রহস্যের ওপরে যথেষ্ট আলোকপাত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

'টেস্ট ম্যাচের ঠিক আগের দিন রাতে প্রমোদ আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। ও খুব মুষড়ে পড়েছিল। ও বুঝেছে যে টেস্ট খেলোয়াড় হিসেবে ওর জলুস ক্ষয়ে এসেছে এবং শেষ টেস্টে ওকে যে দলে নেওয়া হয়েছে তা নিছক ওর খেলোয়াড়ী দক্ষতার জন্যে নয়। সে-সময়ে ও একটা কথা বলেছিল যা থেকে একটা দুঃসাহসিক মতলব আমার মাথায় খেলে যায়। "আমার বোলিংয়ের সব কেরামতি এখন বিশ বাঁ' জলে," ও দুঃখ করে বলেছিল।

'যদি প্রমোদকে ওর প্রতিবিম্বে পালটে দিই? ও বাঁ হাতে বল করবে ঠিকই, কিন্তু সে-বল সাধারণ বাঁ-হাতি বোলারের মতো হবে না। ওর পুরো ব্যাপারটা হবে ডান-হাতি বোলারের

আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতো। সে যাই হোক, কোনও ব্যাটসম্যানই ওর ওইরকম বলের জন্যে তৈরি থাকবে না।

'ওর কফিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিলাম। তারপর অচেতন অবস্থায় ওর ওপরে পরীক্ষা চালালাম। কড়া পাহারার ব্যবস্থা থাকলেও ওকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে হল না। বহু আগেই পাহারাদারি ব্যবস্থার ফাঁক-ফোঁকর আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। পরীক্ষা শেষ হলে প্রমোদকে রেখে এলাম ওর হোটেলের বিছানায়।

'পরদিন ভোরবেলা ওর কাছ থেকে পাগল-করা এক টেলিফোন পেলাম। রীতিমত খেপে উঠেছে—শরীর দুর্বল লাগছে, পড়তে পারছে না, অক্ষরগুলো সব উলটে গেছে···। ও জানতে চায় গতকাল রাতে আমার বাড়িতে কিছু খেয়ে ওর এই দুর্দশা হয়েছে কি না। ডাক্তারকে ডাকতে ও ভয় পাচ্ছে পাছে ওকে আনফিট বলে ম্যাচ থেকে বাদ দিয়ে দেয়।

'ওকে ভরসা দিতে ছুটে গেলাম ওর হোটেলে। ওর ডান হাত দুর্বল হয়ে পড়েছে, ফলে বল করা অসম্ভব। কিন্তু বাঁ হাতের কী খবর ? আশ্চর্যভাবে বাঁ হাতটা ভালো আছে। তখন ওকে বললাম বাঁ হাতে বল করার জন্যে। প্রস্তাবটা শুনে ওর তো আকাশ থেকে পড়া অবস্থা। কিন্তু যতই ও হাত ঘুরিয়ে দেখে ততই প্রস্তাবটা ওর মনে ধরতে থাকে। ও বলল, খানিকক্ষণ নেট প্র্যাকটিস করে দেখে নেবে। ওর খেলার অন্য সাথীরা তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। সুতরাং, আমিই ওকে সঙ্গে করে প্র্যাকটিসের মাঠে নিয়ে গেলাম। সেটাই অনেক ভালো হল, কারণ ওর এই নতুন করে পাওয়া অস্ত্রটি সবার কাছে গোপন রইল। সেটা প্রকাশ পেল একেবারে মোক্ষম মুহূর্তে। বাকিটা তো তুই জানিস,' অজিত শেষ করল।

'খেলার শেষে প্রমোদকে উধাও করেছিল কে ? তুই ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ। আর আমিই খবরের কাগজের অফিসে ফোন করে ওর খবর দিয়েছিলাম। ওকে দিনকয়েক আমার ফ্ল্যাটে রেখেছিলাম। যখন ও মোটামুটি সুস্থ হল তখন ওকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে পাঠিয়ে দিলাম বো স্ট্রিটে। অবশ্য ওর ঝোড়ো অভিজ্ঞতার কথা সবই প্রমোদ ভুলে গেছে। সত্যি ঘটনা ওকে জানানোটা আমি বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করিনি।'

একটা ভালো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেমন বহু ঘটনারই ব্যাখ্যা করতে পারে, তেমনই অজিতের এই চমকপ্রদ আবিষ্কার আমার সমস্ত রহস্যেরই সমাধান করে দিয়েছে। বুঝতে পারলাম, কেন ও ছুরি-কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে চায়নি। তাহলে ওর অসুবিধে হওয়ার ব্যাপারটা আমার ও অ্যানের চোখে ধরা পড়ে যেত। ওর হাত দিয়ে খাওয়া দেখেও আমরা মন্তব্য করেছি, কিন্তু অজিত তার মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। ও সবচেয়ে অপ্রস্তুতে পড়েছে কেন্-এর সই চাওয়া নিয়ে। কারণ মগজ যদি প্রত্যেকটা অক্ষরকেই উলটো করে লেখার নির্দেশ দেয় তাহলে নিজের নাম সই করাটাও শক্ত বইকি !

'অজিত, তোর গবেষণার ফলাফল তোকে ছাপতেই হবে। তুই নির্ঘাত নোবেল প্রাইজ পাবি।' আমার মতো অ-বিজ্ঞানী মানুষের এটাই ছিল একমাত্র পরামর্শ।

'না, এখন নয়, জন,' অজিত উত্তর দিল, 'তুই তো জানিস, সব কাজ নিখুঁতভাবে সমাধা না করে আমি স্বস্তি পাই না। আমার গবেষণায় স্মৃতিবিলোপের ব্যাপারটা আমার মতে একটা মস্তবড় ত্রুটি। ওটার ব্যবস্থা না করে আমার আবিষ্কারের কথা পৃথিবীকে জানাতে আমি রাজি নই।'

'কিন্তু, অজিত, তোকে একটা কাজের পরামর্শ দিই। তুই প্রকৃতির অজানা সব সূত্র নিয়ে খেলা করছিস। একবার সফল হয়েছিস বলে গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় না যে তুই আবারও

সফল হবি। সেক্ষেত্রে তুই এ-পর্যন্ত যা যা করেছিস সেসব স্পষ্ট করে লিখে নিরাপদ কোনও জায়গায় রেখে দেওয়াটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হত না ?'

'সে তো আমি করেইছি। আমার পরীক্ষার বিশদ বিবরণ পড়ে বিজ্ঞানে দক্ষ যে-কোনও গবেষকের দল ওই পরীক্ষা আবার হুবহু করতে পারবে। আর ভবিষ্যতে এই পরীক্ষায় আবার সফল হওয়া যাবে কি না সে-বিষয়ে তোর মতামতকে আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু এখন আমি পরীক্ষাটাকে আরও নিখুঁত করতে চাইছি—যাতে ওই ছোট্ট কলঙ্কের দাগটুকুও না থাকে। আমার গবেষণায় এতটা যে এগিয়েছি সে-কথা তোকে হয়তো খুলে বলতাম না যদি না আমার একমাত্র সাচ্চা দোস্তকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার শয়তানি ইচ্ছেটা মাথাচাড়া দিত।'

তর্ক করে ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু যা ভয় করেছিলাম তাই হল। অজিতের মন একেবারে তৈরি—তাকে নড়ানো অসম্ভব।

মাস কয়েক পরে অজিতের গবেষণাগার থেকে একটা ফোন পেলাম। ডিরেক্টরের সঙ্গে তক্ষুনি দেখা করার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠানো হল।

নানান দুশ্চিন্তা নিয়ে দরজায় টোকা মারলাম। অফিস ঘরে বসে আছেন ডিরেক্টর, একজন সাদা কোটপরা ডাক্তার, একজন অদ্ভুত-দর্শন লোক এবং অজিত। একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললাম—কেন জানি না ভেবেছিলাম অজিত হয়তো মারা গেছে।

কিন্তু আমার স্বস্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হল। অজিত আমাকে চিনতে পারল না। ডাক্তারের কাছে যা শুনলাম, অজিতের সত্যিই স্মৃতিবিলোপ ঘটেছে। ওর অফিসে আমার নাম আর টেলিফোন নম্বর পেয়েছেন বলেই ওঁরা আমাকে খবর দিতে পেরেছেন।

'ওর কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু কি ও লিখে রেখে গেছে ?' আমি সতর্ক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলাম। আক্ষেপের সঙ্গে মনে পড়ল, অজিতকে আমি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম কোন 'নিরাপদ জায়গায়' ও ওর পরীক্ষার খুঁটিনাটি লিখে লুকিয়ে রেখেছে।

'লিখে রাখলেও সে-খবর আমরা জানি না—জানার উপায়ও নেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডিরেক্টর বললেন, 'কারণ যে-পরীক্ষা উনি করছিলেন সেটা হঠাৎই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ওঁর ঘরের সমস্ত জিনিস চুরমার করে দেয়।'

'উনি নেহাত কপালজোরে প্রাণে বেঁচে গেছেন,' ডাক্তার মন্তব্য করলেন। কথাটার মধ্যে কী অদ্ভুত পরিহাস! অজিতের মতো প্রতিভাধরের পক্ষে স্মৃতিবিলোপ হওয়াটা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

'ওর বাড়িতে কিছু পাননি ?' সেখানে কিছু পাওয়া যেতে পারে সেই আশায় আমি নাছোড়বান্দার মতো প্রশ্ন করলাম।

'ব্যাচেলারের ছন্নছাড়া ঘর বলতে যা বোঝায় আর কি,' অদ্ভুত-দর্শন মানুষটি এবারে মন্তব্য করলেন, 'ওঁর ফ্ল্যাটে আমরা একেবারে চিরুনি চালিয়েছি। কিছু পাইনি। বরং আপনাকেই এখানে ডেকে পাঠিয়েছি যদি আপনি কোনও আলোকপাত করতে পারেন এই আশায়।'

'দুঃখিত, আমি কোনওরকম সাহায্য করতে পারছি না। অজিত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল বটে, কিন্তু ও কখনওই আমাকে ওর গবেষণা বোঝার মতো পণ্ডিত মনে করত না।'

গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে লাগলাম, মিথ্যে কথার বদলে সত্যি বললে সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য হত ? মনে হল, হত না। আর যাই হোক, আমার মতো অ-বিজ্ঞানীর বর্ণনায় ব্যাপারটা নেহাতই অবিশ্বাস্য আজগুবি ঠেকত।

আজও ঘটনাগুলো আমার কাছে আজগুবি মনে হয়, তবে অবিশ্বাস্য নয় মোটেই। কারণ, বুঝতেই তো পারছেন, একটা জবরদস্ত প্রমাণ আমার জাদুঘরেই রয়ে গেছে।

সেটা হল গণেশের সেই দুর্লভ মূর্তি।

□ ১৯৮৩ *অনুবাদ : অনীশ দেব*





জাল

বাল ফোন্ড্‌কে

এই ফাঁদে যেদিন পা দিয়েছিলাম, সেদিনটা স্পষ্ট মনে আছে। একেবারে জড়িয়ে গিয়েছিলাম ভুলভুলাইয়ার জালে। চেষ্টা করলেও সে-কথা ভে লার উপায় নেই। জানি না, কবে মুক্তি পাব। অথবা আদৌ মুক্তি পাব কিনা। অভিমন্যুর কথা শুনেছেন তো ? মহাভারতের সেই বালক-বীর ? চক্রব্যূহে হারিয়ে গিয়েছিল চিরকালের মতো, মহৎ উদ্দেশ্যে প্রাণ দিয়েছিল ? আমি কি তাহলে এ-যুগের অভিমন্যু ? মনে হয় আমার চিন্তাগুলো, এইসব স্নায়ুঘটিত কাণ্ডকারখানা, আমাকে একেবারে পাগল করে দিচ্ছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। নাকি শরীরের যন্ত্রণা ? এখন আর কিছুই ঠিকমতো ঠাহর করে উঠতে পারি না।

না পারি। একটা জিনিস হলফ করে বলতে পারি। আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। পথের শেষে পৌঁছে গেছি আমি। বেশিদিন আর এ-যন্ত্রণা সইতে পারব না। সেইজন্যেই তো আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। যদি মুক্তির কোনও পথ আমাকে বাতলে দিতে পারেন। নিয়ে যেতে পারেন নিরাপদ দূরত্বে।

শুধু এইজন্যে, বিশ্বাস করুন, দিব্যি গেলে বলছি। তা নইলে দেওয়ালের কানেও কোনও কথা ফাঁস করতাম না। না, স্যার ! সরকারি গোপন আইনে আমি শপথ নিয়েছি। সামরিক বিভাগের কঠিন শপথ। ওঃ ভগবান ! এ যেন সেই ক্ষুরধার তরোয়ালের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। কী সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক ! যে-কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। না, না ! তার চেয়ে মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। স্রেফ বোবা !

ও, না ! মিথ্যে দুশ্চিন্তা করবেন না। এই পাহাড়টা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো হুট করে কিছু করে বসব না আমি। তবে কাজটা সহজ নয়। একনাগাড়ে এই নিষ্ফল চিন্তা ! কোনও উত্তর বের করতে পারছি না মাথা খুঁড়ে ! মনে হচ্ছে, যে-কোনও মুহূর্তে মাথা চৌচির হয়ে যাবে। গরম কামানের নলের মতো। দুর, নিকুচি করেছে সরকারি গোপন আইনের ! ওসব ইয়েতে ঢুকিয়ে রাখুন ! সব আমাকে বলতেই হবে। আমার নিজের জন্যে। সদাশিবের জন্যে।

কী বললেন ? ওহ্ হ্যাঁ ! বেচারা সদাশিবের কথা আপনাকে বলা হয়নি। বলেছি ? দেখলেন তো ! এরকমটাই হচ্ছে। এক মিনিটের জন্যেও গুছিয়ে ভাবতে পারি না। অথচ

গুছিয়ে না বললে তো আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনার জন্যে গোড়া থেকে আমাকে বলতেই হবে। র'-এর ফুটকি দিতে হবে, ষ-এর পেট কাটতে হবে ঠিকঠাক। ছোটখাট খুঁটিনাটিও বাদ দিলে চলবে না। পাছে আপনার সব গুলিয়ে যায়। কিংবা তার চেয়েও খারাপ অবস্থা হয়।

প্রথমে আমার পরিচয় দিই। আমি হলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল অরবিন্দ জামখেড়কার, এ এম সি। ঠিক ধরেছেন। আর্মি মেডিক্যাল ক্যর্‌স। হ্যাঁ, আমি একজন ডাক্তার। মিলিটারি ডাক্তার।

সরি। কী বললেন— ? ঠিকই বলেছেন। সাধারণত আমরা ডাক্তাররা ক্যাপ্টেন বা মেজরের ওপরে উঠতে পারি না। কিন্তু বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় আমি ফ্রন্টে ছিলাম। ওঃ, যুদ্ধ একটা হয়েছিল বটে! আমাদের সার্জিক্যাল ইউনিটের একেবারে ঘাম ছুটে গিয়েছিল। তাতে অভিজ্ঞতার সুবিধে হল। এছাড়া প্রতিনিধি হিসেবে নাসা-র চিকিৎসা বিভাগে কিছুদিন ঘুরে এসেছি— পেয়েছি সামরিক চিকিৎসার উঁচু মানের ট্রেনিং। সেই সুযোগে কাছাকাছি হিউসটনে গিয়ে মাইকেল ডিবেকি-র কাছেও কিছুদিন ট্রেনিং নিয়েছি। বুঝতে পারলেন তো! সেই মাইকেল ডিবেকি—পৃথিবী-বিখ্যাত হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন। ফিরে আসার পর রোজকার কাটা-ছেঁড়া সর্দিকাশি ছাড়াও আমি ওই লাইনে গবেষণা চালিয়ে গেছি। ফলে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ মিলিটারি মেডিসিন-এ গোটা ছয়েক ভদ্রগোছের গবেষণাপত্রও ছাপা হয়েছে আমার নামে।

কী হল! না, যাবেন না, প্লিজ! ভাবছেন নিজের কথাই কেবল সাতকাহন করে শুনিয়ে যাচ্ছি। অকারণে নিজের কথা নিয়ে বকর বকর করছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এসব খুঁটিনাটি আপনার জানা দরকার। এগুলোর প্রয়োজন আছে।

থাক, সে-কথা পরে হবে। বলছিলাম, কী করে সব শুরু হল, তাই না! দিনটা আজও মনে আছে। দুপুরের মতো ঝকঝকে। স্পষ্ট। একটা চমৎকার দিন। ললির জন্মদিন ছিল সেটা! ললি—ললিতা—মানে, আমার স্ত্রী।

না! আমি আপনাকে যা বলছি সেগুলো আবার ওকে ডেকে যেন যাচাই করতে যাবেন না, যাবেন না তো? কারণ এসবের কানাকড়িও ললি জানে না। সেনাবাহিনী থেকে আমাদের মগজে এগুলো বেশ ভালো করে খোদাই করে দেওয়া হয়। এ-ধরনের গোপন কথা কাউকে বলা চলবে না—সে আমার যতই কাছের মানুষ হোক না কেন।

যাই হোক, সেটা ছিল ললির জন্মদিন। দিনটা কখনও আমার ভুল হত না। যথারীতি কাজ থেকে সেদিন ছুটি নিয়েছি। আমাদের দু'জনের বাইরে খাওয়ার কথা। হয়তো তার পরে একটা সিনেমাও দেখে ফেলতে পারি। আর কেনাকাটা তো আছেই। একটা শাড়ি, কিংবা কোনও পোশাক—যা হোক একটা কিছু। মানছি, সব মিলিয়ে আহামরি কোনও প্রোগ্রাম নয়। তবে এতে রোজকার একঘেয়েমি কেটে যায়।

আমরা যখন বেরোবার জন্যে তৈরি তখন কার ফোন এল বলুন তো? কমান্ডান্টের ফোন। আমাকে শিবিরে যেতে হবে। এক্ষুনি।

ললি তো খেপে লাল। ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। কী বলব, রঙ ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেছে, তবে নিঃশ্বাসে আগুন ঝরছে। ওঃ ললি! নিকুচি করেছে এই মিলিটারি চাকরির! অবশ্য ললিও এর মধ্যে আমার চাকরির হালচাল জেনে ফেলেছে।

অতএব দ্রুত গন্তব্যের নিশানা পালটে হাজির হলাম কমানড্যান্টের সামনে। কেতাদুরস্ত ভাবে স্যালুট করলাম।

আমাদের কমানড্যাণ্ট খুব ভালো লোক। মানুষ হিসেবে যে পয়লা দরের তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

'দুঃখিত, ডক্টর,' তিনি বললেন, 'তোমার প্রোগ্রামে বাগড়াদেওয়ার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু এতে আমার কোনও হাত নেই। ইনটেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার তোমাকে চাইছে। ভীষণ জরুরি দরকার।'

ওঃ ভগবান! ইনটেলিজেন্সের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

কেন? কমানড্যাণ্টের ঠোঁটে ওই নকল হাসি কেন? ওঃ। জিতেছ তুমি! দারুণ খেলেছ!

ইনটেলিজেন্স বলতে আর্মি ইনটেলিজেন্সের কথা বোঝাতে চেয়েছি। অবশ্য আর্মি ইনটেলিজেন্সের সঙ্গে ইনটেলিজেন্স বা বুদ্ধির তেমন একটা সম্পর্ক নেই। কিন্তু সে-কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

আমি তৈরি ছিলাম। তৈরি না থেকে উপায় নেই। সেটাই জানালাম ব্রিগেডিয়ারকে।

'ও কে স্যার! সন্ধের মধ্যেই রওনা হব।'

ভাবছিলাম লাঞ্চ আর সিনেমাটা হয়তো এখনও ম্যানেজ করা যাবে, আর কেনাকাটা ছেড়ে দেব ললির ওপরে। এমনিতেই রঙবেরঙের শাড়ির পাহাড়ের মাঝে আমার ভীষণ একঘেয়ে লাগে। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আমাকে আকাশ থেকে টেনে নামালেন মাটিতে।

'দুঃখিত, ডক্টর। এটা এস ও এস। ওড়ার জন্যে তৈরি হয়ে পাখি বাইরে অপেক্ষা করছে। এখান থেকেই রওনা হয়ে পড়ো। ললিতাকে আমি বুঝিয়ে বলব'খন। সময় নষ্ট কোরো না। যাও।'

'ইয়েস, স্যার!' ব্যাস, খেল খতম! কোনও প্রশ্ন চলবে না। তাঁকে আবার স্যালুট করে ছুটে গেলাম হেলিকপ্টারের দিকে। কপ্টারের ব্লেড বন্‌বন ঘুরছে—একটা মিক্সার যেন পাগল হয়ে গেছে।

সওয়া ঘণ্টার মধ্যেই ইনটেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত হাওয়া-পথে অন্তত হাফ ডজন বেতার বার্তা আমাকে তাড়া দিল জলদি করার জন্যে। আমরা যখন মাটি ছুঁলাম তখন হেলিপ্যাডে দাঁড়ানো জিপের ইঞ্জিন গজরাচ্ছে।

পাঁচ মিনিট পরেই আমি হেডকোয়ার্টারে হাজির। ইনটেলিজেন্স চিফ দুশ্চিন্তায় রীতিমত কাহিল। স্পষ্ট বুঝতে পারছি। স্যালুট ফ্যালুটের ভ্যানতাড়া বাদ দিয়ে তিনি আমাকে একরকম পাকড়াও করেই টেনে নিয়ে গেলেন অপারেশান থিয়েটারে। নিজের চোখেই দেখার সুযোগ দিলেন। একটি কথাও বললেন না। অবশ্য তার দরকারও ছিল না।

একটা কাজ রয়েছে আমার জন্যে এবং সেটা আমাকে একাই করতে হবে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। না, খুঁটিনাটি না বুঝলেও ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছি···

টেবিলে একটা লোক শুয়ে আছে। স্বাস্থ্য ভালো তবে আঘাতে জর্জরিত। কী বীভৎস সব ক্ষত। মনে হচ্ছে একগাদা রক্ত খুইয়েছে। আর ফ্যাকচারগুলো! ঊরুর হাড় উদ্ভট কোণে বেঁকে ঝুলছে···। কার্ডিওস্কোপ লাগানো রয়েছে। তবে তার উজ্জ্বল বিন্দুটি সরলরেখা ধরে এগিয়ে চলেছে। যেন ওটাও য়ুনিফর্ম গায়ে চড়িয়েছে। দারুণ নীতিবাগীশ কোনও মানুষের পথচলার মতো সোজা টানটান। পাখি চম্পট দিয়েছে খাঁচা ছেড়ে। বুঝলেন তো কী বলছি? হার্ট যে গুডবাই করে দিয়েছে ওই সোজা পথ হল তারই লক্ষণ। ই ই জি যন্ত্রও লাগানো ছিল। তার সঙ্কেত মোটামুটি ভালো। তার মানে ব্রেন তখনও কাজ করছে···কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হবে না হবে তা বলা মুশকিল···

মিনিট দুয়েক কেউ কোনও শব্দ উচ্চারণ করলেন না। বোধহয় সবাই ভয় পেয়েছেন যে সূক্ষ্মতম কোনও শব্দ হলেই ই ই জি সঙ্কেত থেমে যাবে।

তারপর চিফ গলা খাঁকারি দিলেন : 'বলুন, ডক্টর, কী মনে হচ্ছে আপনার ?'

আমি উত্তর দিলাম না। কী-ই বা বলার আছে ? তার বদলে একটা স্টেথোস্কোপ ধার করে সেটা নাড়াচাড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। লোকটার চোখে বার কয়েক আলো ফেলে দেখলাম। মনে হল ব্রেনও বিদায় নেওয়ার পথে।

চিফই আবার নীরবতা ভাঙলেন : 'ডক্টর, ইনি আমাদের চিকিৎসক অমরজিৎ সিং।' লম্বা খেলোয়াড়ি চেহারার একজন শিখ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আমাকে স্যালুট করল। পদমর্যাদায় সে ক্যাপ্টেন।

'ক্যাপ্টেন।' আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম।

'ডক্টর, অমরজিৎ বলছে যে পেশেন্টের হার্ট সাড়া না দিলেও তার ব্রেন এখনও স্বাভাবিক কাজকর্মের লক্ষণ দেখাচ্ছে। সুতরাং তাকে মৃত বলা যায় না। আপনার মতও কি তাই ?'

'হ্যাঁ, স্যার। ষাটের দশকের শেষ দিকে হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশান যখন শুরু হয় তখন আইন এবং নীতির প্রশ্ন নিয়ে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিল। সে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল প্রচুর। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয় যে, একজন মানুষের ব্রেন যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক কাজকর্মের লক্ষণ দেখাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মৃত ঘোষণা করা যাবে না—অন্তত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক থেকে নয়।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ডক্টর,' চিফ কিছুটা অধৈর্যভাবে আমাকে বাধা দিলেন, 'আমরা সকলেই মেনে নিলাম যে আমাদের এই পেশেন্ট এখনও মরেনি। বেঁচে আছে। বেশ, ভালো কথা! তা আপনি কি ওকে সারিয়ে তুলতে পারেন ? ওর ব্রেন এখনও ঠিক ঠিক কাজ করছে। শুধু হার্টটা গেছে। নতুন একটা হার্ট কি বসানো যায় ? মানে ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় ? তাহলেই সব সমস্যা মিটে যায়। এই কারণেই আপনাকে ডেকে এনেছি। ওর হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করুন।'

'ট্রান্সপ্লান্ট! এই রুগীকে! এখন ?' ভগবানের দিব্যি করে বলছি নিজের কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না : 'কিন্তু, কিন্তু...'

'কিন্তু কী, ডক্টর ?'

'কিন্তু কী করে তা সম্ভব ?'

'কেন নয় ? আপনার অসুবিধেটা কোথায় ?'

'এই অপারেশান নেহাত সহজ নয়। শুরু করার আগে অনেক জোগাড়-যন্ত্রের দরকার। একটা হার্ট-লাঙ মেশিন। তারপর একটা ক্রাইওস্ট্যাট। অপারেশানের জন্যে একটা বড় দল। রুগীকে নানাভাবে রেডি করা দরকার। বেশ ক'টা ইনজেকশানও দিতে হবে।'

'অমরজিৎ সেসব ব্যবস্থা করবে।'

'কিন্তু আসল জিনিসটা হল—ডোনর হার্ট। আর একটা সুস্থ হার্ট পাবেন কোথায় আপনি ? আর যদিও-বা পান, সেটাকে আগাপাস্তলা পরীক্ষা করতে হবে। টিসুর ধরন-ধারণ দেখতে হবে। যেমন ব্লাড গ্রুপ, তাছাড়া হিস্টোকম্প্যাটিবিলিটি গ্রুপ মেলাতে হবে। তা নইলে ওই হার্ট যে-দেহে বসানো হবে সে ওটাকে ছুড়ে ফেলে দেবে, ক'দিন পরেই বাতিল করে দেবে নতুন হৃদ্‌পিণ্ডটাকে।'

'ঠিক বলেছেন! যদি বাতিল করার প্রশ্ন ওঠে তাহলে সেটা হবে কিছুদিন পরে, তাই না ? আপনি দু-একদিনের জন্যেও পেশেন্টকে সুস্থ করে তুলতে পারলে সেটা আমাদের

কাজের পক্ষে যথেষ্ট।'

'কিন্তু—কিন্তু—উপযুক্ত আর একটা হৃদ্‌পিণ্ড কোথায় পাচ্ছেন আপনি ?'

'পাব, পাব ! ঠিক পাব ! খোঁজ-খবর চলছে। আর যদি সেভাবে নাও পাই তাহলে একজন স্বেচ্ছাসেবক জোগাড় করব—যে দেশের জন্যে প্রাণ দিতে রাজি।'

'কী ঠাট্টা করছেন !' আমার স্বর উঁচু পরদায় উঠল,'আপনি—আপনি সুস্থ জ্যান্ত একজন ভালোমানুষকে মেরে ফেলতে চান ? শুধু তার হৃদ্‌পিণ্ডটা নেওয়ার জন্যে ?'

আমি কি ধরনের মানুষ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আর্মিতে এতগুলো বছর কাটিয়েও আমার আবেগ-টাবেগ সব ভোঁতা হয়ে যায়নি।

চিফ তীব্র স্বরে পালটা জবাব দিলেন, 'ওঃ। ওসব সেন্টিমেন্টাল কচকচানি বাদ দিন তো ! আপনাকে শেষ পর্যন্ত অর্ডার করতে হবে দেখছি !'

'প্লিজ স্যার, একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। আপনি সব কিছু জোগাড় করতে পারলেও অপারেশান যে সাকসেসফুল হবে তার কোনও আশা নেই। পেশেণ্ট-এর অবস্থা খুব খারাপ। অপারেশান সাকসেসফুল হলেও পেশেন্ট সুস্থ হয়ে উঠবে কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।'

'ডক্টর, আপনাকে সোজাসুজি সহজ কথায় বলি। এই লোকটি সুস্থ হয়ে কথা বলতে সক্ষম হোক এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত জরুরি। স্রেফ দু-এক ঘণ্টা সময় পেলেই আমাদের কাজ মিটে যাবে। ব্যাস। ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশান করে শুধু ওইটুকু সময়ের জন্যে ওর জীবন ফিরিয়ে দিন।'

'কিন্তু কেন ? এত তাড়াহুড়োই বা কেন আপনাদের ?'

'সেটা আপনার জানার কোনও প্রয়োজন নেই।'

চিফ একেবারে ফেটে পড়লেন। রাগে মুখচোখ টকটকে লাল। তারপর নিজেকে সংযত করে অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বলে চললেন, 'ডক্টর, এটা ইনটেলিজেন্স দপ্তর। এখানে যার যেটুকু জানা প্রয়োজন সেটুকু জেনে কাজ করাটাই হল রীতি। মোদ্দা আপনাকে যা বলতে পারি তা হল এই লোকটির কাছে অত্যন্ত গোপন কিছু খবর রয়েছে, আর্মির দিক থেকে ভীষণ জরুরি খবর। এবারে আপনার চূড়ান্ত রায় শুনি।'

আমার মুখ শুকিয়ে গেছে। ঠোঁট ভেজানোর মিথ্যে চেষ্টা করলাম। আবার পেশেন্টের কাছে গিয়ে তাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করলাম। ভাবলাম, কথার চেয়ে কাজ করাটাই ভালো। শেষ এক ঘণ্টার সমস্ত রেকর্ড দেখলাম। কার্ডিওগ্রাম চার্টগুলোয় চোখ বোলালাম। ই ই জি গ্রাফগুলোয় মনোযোগ দিলাম। হিসেব কষতে লাগলাম, বারবার। পাগল করা কাজের চাপে কানের পিছনে শুরু হল ভোঁতা যন্ত্রণা, অসহ্য দপদপানি। কিন্তু সিদ্ধান্তের কোনও রদবদল হল না। বেঁচে ওঠার সম্ভাবনা যদি বা থাকে, প্রতি মিনিটে সেটা ধাপে ধাপে কমছে। হতাশায় মাথা নাড়লাম।

'দুঃখিত, স্যার। আপনি যদি আদেশ করেন তাহলে অপারেশান করব। কিন্তু সম্ভাবনা খুবই কম। এত কম যে আপনার ভীষণ দরকারি খবরটুকুও আপনি পাবেন না। তার ওপর একজন সুস্থ সবল স্বেচ্ছাসেবককে আপনি হারাবেন। আপনার ওপরেই সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলাম।'

কাছাকাছি একটা চেয়ারে আচমকা বসে পড়লেন চিফ, 'না, না, ডক্টর ! প্লিজ, আমি আপনার ওপরেই ভরসা করে রয়েছি। আপনার অভিজ্ঞতা, আপনার স্পেশাল ট্রেনিং, আপনার...'

'হ্যাঁ স্যার। সবই মানছি! কিন্তু···কিন্তু আমি তো ভগবান নই!'

'তাহলে কি কোনও পথ নেই?'

'মাপ করবেন স্যার, ভালো করেই জানি যে আপনার "যার-যেটুকু-জানা-প্রয়োজন"-এর লিস্টে অন্তত এ-ব্যাপারে আমার নাম নেই। কিন্তু আপনি যদি সবটা খুলে বলতেন তাহলে হয়তো একটা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে পারতাম। তাছাড়া আমিও তো আর্মিরই লোক। তার সব নিয়ম-কানুন আমি জানি। গোপন কথা আমিও গোপন রাখতে পারি। যদি···'

পরিস্থিতি নিশ্চয়ই খুব সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌঁছেছিল, কারণ চিফ তাঁর অটল প্রতিজ্ঞা ভাঙলেন। এবং আমাকে সব কিছু খুলে বলার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইস, যদি তাঁর মন নরম না হত তাহলে আজ আমাদের এইরকম বিপজ্জনক ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হত না।

চিফ বলতে শুরু করলেন: 'ডক্টর, এই যুবকটির নাম—ক্যাপ্টেন সদাশিব গোখলে। সে ছিল···সে হল···মানে, ছিল আমার সেরা অপারেটর।'

চিফ দেখলাম ক্রিয়াপদের অতীত-বর্তমান কাল নিয়ে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

'ওকে আমি একটা বিশেষ অভিযানে পাঠিয়েছিলাম, ভীষণ বিপজ্জনক অভিযান: শত্রুর দেশে গিয়ে ওদের যুদ্ধ-পরিকল্পনা হাতিয়ে আনতে। শত্রুপক্ষ আমাদের ওপর আচমকা বেপরোয়া আঘাত হানতে চাইছে। কিন্তু আমাদের সুপারসনিক ফাইটার প্লেনগুলো এখনও এসে পৌঁছয়নি। অতএব সময় দরকার। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করছে এই প্রাথমিক হার-জিতের ওপরে। সেজন্যেই সমস্ত খবর আমাদের দরকার। উপরন্তু যদি আমরা শত্রুপক্ষের যুদ্ধ-পরিকল্পনার জলজ্যান্ত প্রমাণ হাতে নিয়ে ওদের মোকাবিলা করতে পারি তাহলে কূটনৈতিক আসরেও আমরা বেশি নম্বর পেয়ে জিতব। তখন হয়তো আসন্ন যুদ্ধটাকেও আমরা রুখতে পারব। সদাশিব—আমাদের কাছে ওর সাঙ্কেতিক নাম ছিল ভাউসাহেব (সেই পেশোয়ার নামে)—গিয়েছিল এই ক্ষুরধার অভিযানে। শেষ পর্যন্ত ও জেতে, এমনকি বেতার-সঙ্কেতে খবর পাঠায় যে "কাম ফতে"। তারপর ও দেশে ফেরার জন্যে রওনা হয়, আর আমরা প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে ওর ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু সম্ভবত একেবারে শেষ মুহূর্তে ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। তখন এইরকম অবস্থায় ওকে সীমান্তের এপারে ছুড়ে ফেলা হয়। ওরা যে ভেবেছিল সদাশিব মরে গেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। ওকে এখানে নিয়ে আসার সময়ে আমরা পর্যন্ত আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওর হার্টবিট ভীষণ অস্পষ্ট ছিল, কোনওরকমে শোনা যাচ্ছিল মাত্র। আর এখন, সেটাও থেমে গেছে। এ এক বিরাট ক্ষতি। ছেলেটাকে আমি সত্যিই খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল সেই খবরগুলো, যেগুলো ও মগজে করে বয়ে এনেছে। সে তো আর পাওয়া যাবে না। আর সবচেয়ে যেটা খারাপ হয়েছে, শত্রুপক্ষ সাবধান হয়ে গেছে। ওরা হয়তো সময় হওয়ার আগেই পরিকল্পনামাফিক আক্রমণ করতে পারে। এখন যে দ্বিতীয় কাউকে সদাশিবের জায়গায় পাঠাব তারও উপায় নেই। সব মিলিয়ে অভিযান পুরোপুরি পণ্ড, ব্যর্থ। আর এইজন্যে যদি যুদ্ধে আমরা হেরে যাই···'

চিফের কথা রুদ্ধ হয়ে গেল। আবেগে তিনি কাবু হয়ে পড়েছেন।

কিছুক্ষণের জন্য অখণ্ড নিস্তব্ধতা। প্রবাদের সেই আলপিন পড়লেও আপনি সত্যি সত্যি তার শব্দ শুনতে পেতেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে। আমার কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক সেই মুহূর্তে মতলবটা প্রথম আমার মাথায় খেলে গেল। পায়ের তলায় যেন মাইন-বিস্ফোরণ ঘটেছে এরকম একটা

ঝাঁকুনি খেলাম। মগজ থেকে চিন্তাটাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার সম্ভাবনা, এই চ্যালেঞ্জ, আর এরকম একটা দারুণ সুযোগ আমাকে ভীষণ উত্তেজিত করে তুলল।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'স্যার, এমন কি সম্ভব যে সদাশিব তার খবরাখবর অন্য কোথাও টুকে রেখেছে? হয়তো কোনও সাঙ্কেতিক ভাষায়!'

'অসম্ভব! চিন্তাই করা যায় না! এরকম মারাত্মক ভুল কেউই করবে না। সদাশিব তো নয়ই। খবরাখবর সমস্ত ওর কাছেই আছে, ওর মগজে।'

'তা যদি হয়, স্যার, তাহলে আমি একটা বুদ্ধি বাতলাতে পারি। দেখুন, আপনার কী মনে হয়। এতে যদি কাজ হয় তবে আপনার খবর আপনি পেয়ে যাবেন। সদাশিবের শহিদ হওয়া বৃথা যাবে না। আর যে-স্বেচ্ছাসেবক আপনি দেবেন বলেছেন তাকে আমার অবশ্যই দরকার হবে, কিন্তু তাকে প্রাণ দিতে হবে না।'

'শুনি, দেখি। সাফ সাফ বলে ফেলুন। জলদি। অযথা ধানাই-পানাই করে লাভ নেই।'

'কিন্তু আগে থেকেই আপনাকে সাবধান করে রাখছি স্যার : এই পরিকল্পনাটি একেবারে বিচিত্র। একরকম অন্ধকারে তীর ছোড়ার মতো। এতে যে কাজ হবেই এমন কথা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। তবুও...'

'সেসব আমার ওপরে ছেড়ে দিন। বলুন, জলদি বলুন!'

'স্যার, আমি একজন সার্জন, হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট এক্সপার্ট, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার প্রিয় বিষয়, বরাবরের প্রিয় বিষয়, হল নিউরোফিজিওলজি। ওই বিষয়ে যাবতীয় গতিপ্রকৃতির খোঁজখবর আমি রাখি। মাঝে মাঝে একটু-আধটু গবেষণাও করে থাকি...'

'আ-হা, আসল কথায় আসুন তাড়াতাড়ি...'

'স্যার, ম্যাক্‌কনেল নামে এক ভদ্রলোক ফিতে কৃমির ওপরে একটা ইন্টারেস্টিং পরীক্ষা করেছেন। তারপর হাঙ্গেরির নাগরিকত্ব নেওয়া আর-এক বিজ্ঞানী উন্‌গার একই পরীক্ষা প্রয়োগ করেন ইঁদুরের ওপর। ফিজিওলজিক্যালি ইঁদুর আর মানুষ খুব কাছাকাছি। সেই জন্যেই ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষার যত ফলাফল প্রায় সব সময়েই খাপ খেয়ে যায় মানুষের সঙ্গে।

'এটা তো সকলেই জানে যে,ইঁদুর সাধারণত অন্ধকার পছন্দ করে। ওরা আলো এড়িয়ে চলে। যেমন বাড়িতে যেসব ইঁদুর থাকে তাদের কথাই ধরুন। দিনের বেলা ওদের কোথাও কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু রাত নামলেই গল্প যায় পালটে। তখন ইঁদুর হল রাজা, ঘুরঘুর করে বেড়ায় সর্বত্র। দিনের বেলা ওরা লুকিয়ে থাকে চোখের আড়ালে, অন্ধকার গর্তে, ঘুপচিতে। তা এই বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করেই উন্‌গার তাঁর পরীক্ষাটি তৈরি করেছিলেন।

'তিনি একটা বিশেষ ধরনের খাঁচা তৈরি করেছিলেন যেটা দুটো ভাগে ভাগ করা। তার একটি অংশে ছিল উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা, আর অন্য অংশটি ছিল পুরোপুরি অন্ধকার। কয়েকটা ইঁদুর সেই খাঁচায় রাখলেন তিনি। খাবার আর জল রাখা হল খাঁচার আলোকিত অংশে। কিন্তু ইঁদুরগুলোর সেটা পছন্দ নয়। ওরা আলোকিত অংশে সোজা ঢুকে পড়ে, এক কামড়ে খাবার মুখে নিয়ে ঝটপট ফিরে আসে অন্ধকার অংশে। সুতরাং উন্‌গার বুদ্ধি খাটিয়ে খাঁচার অন্ধকার অংশে একটা বৈদ্যুতিক বর্তনী জুড়ে দিলেন। এর ফলে কোনও ইঁদুর অন্ধকার অংশে ঢোকামাত্রই বৈদ্যুতিক শক খাবে। অবশ্য সেটা ওদের প্রাণ্ড করে দেওয়া বা মেরে ফেলার মতো তীব্র নয়। তবে তা ভয় পাইয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, আর তাতে ইঁদুরগুলো হুড়মুড় করে পালিয়ে যেতে লাগল আলোকিত অংশে। কিছুদিন এইরকম চলল। যতদিন না ওদের ভালোমত শিক্ষা হয়। তখন অন্ধকারের প্রতি ওদের একটা আতঙ্ক জন্মাল। ফলে বৈদ্যুতিক বর্তনী নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া সত্ত্বেও ইঁদুরগুলো আলোকিত

অংশে বাস করাটা পছন্দ করতে লাগল। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে উন্‌গার খাবার-দাবারগুলো সরিয়ে নিয়ে গেলেন অন্ধকার অংশে। কিন্তু ইঁদুরের দল সেগুলো টেনে নিয়ে যেতে লাগল আলোকিত অংশে।

'যখন উন্‌গার নিশ্চিত হলেন যে অন্ধকার সম্পর্কে আতঙ্কের এই স্মৃতি আমূল গেড়ে বসেছে ইঁদুরগুলোর মস্তিষ্কে, তখন তিনি এগিয়ে গেলেন পরীক্ষার পরবর্তী ধাপে। সেই সময়ে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল যে দীর্ঘদিনের স্মৃতি মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশে রাসায়নিক গঠন নিয়ে সঞ্চিত থাকে—রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা আর এন এ অণুর মধ্যে। যে-ইঁদুরগুলোকে উন্‌গার অন্ধকারে ভয় পেতে শিখিয়েছেন সেগুলোকে তিনি মেরে ফেললেন, তাদের মস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদ করলেন, স্মৃতি-ভাণ্ডারের অংশ থেকে আর এন এ টেনে নিয়ে ইনজেক্ট করলেন নতুন অনভিজ্ঞ ইঁদুরদের। তারপর তৃপ্তির সঙ্গে দেখতে পেলেন নতুন ইঁদুরগুলোও অন্ধকার দেখলে ভয় পেতে শুরু করেছে। স্মৃতি যে আর এন এ-র মধ্যে সঞ্চিত থাকে সেই অনুমান এভাবেই পরীক্ষার ভিত্তিতে দৃঢ় হল। স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে এবং সেই তত্ত্বের ভিত ক্রমেই সুদৃঢ় হচ্ছে।'

'আমাকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে ধন্যবাদ, ডক্টর।' চিফের কথাগুলোয় যে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল তাতে সন্দেহ নেই, 'এখন দয়া করে বলুন দেখি, এর সঙ্গে আমাদের এই সমস্যার সম্পর্ক কী?'

'সে-কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, স্যার। সেইজন্যেই একটু আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সদাশিব ওর খবরাখবর অন্য কোথাও টুকে রাখেনি তো। তা যখন নেই তখন সদাশিব নিশ্চয়ই সমস্ত খবর একইভাবে রেখেছে ওর স্মৃতি-ভাণ্ডারে—ওই ইঁদুরগুলোর মতোই। সুতরাং, এখন যদি আমি ওর মস্তিষ্কের স্মৃতি-ভাণ্ডার থেকে আর এন এ টেনে নিয়ে আর-একজন মানুষকে ইনজেক্ট করি তাহলে সে হয়তো মস্তিষ্কের রাসায়নিক ভাষাকে অনুবাদ করে দিতে পারবে আমাদের চেনা সহজ কোনও ভাষায়। টেপরেকর্ডার যেমন ম্যাগনেটিক ফিতের ওপর মিউজিক রেকর্ড করে, আবার সেই ক্যাসেটটি অন্য কোনও রেকর্ডারে বসিয়ে চালিয়ে দিলেও শোনা যায় সেই একই মিউজিক, এখানেও ব্যাপারটা ঠিক তাই। কিন্তু এখানে টেপরেকর্ডারের বদলে দরকার একটা তাজা মগজ, চাই একজন স্বেচ্ছাসেবক। এবার তো বুঝলেন কেন...'

'ব্রাভো! ব্রাভো!' আনন্দে উত্তেজনায় চিফ আমাকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, 'দারুণ, ডক্টর, দারুণ!'

'দাঁড়ান! দাঁড়ান!' আমি তাঁর উৎসাহে রাশ টানতে চেষ্টা করলাম: 'শুনতে হয়তো ব্যাপারটা খুব সহজ, কিন্তু কাজটায় প্রচণ্ড ঝুঁকি রয়েছে। সফল যে হবই তার কোনও গ্যারান্টি দিতে পারছি না। এ-চেষ্টা কেউ কখনও করে দেখেনি। নেহাত মাথা খারাপ না হলে কেউ এ-কাজে হাতও দেবে না। আমিও দিতাম না। কারণ মানুষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনেক বাধা-নিষেধ রয়েছে এবং তার উচিত কারণও রয়েছে। এরকম ধরনের একটা বিপজ্জনক পরীক্ষার জন্যে আমাকে হয়তো ক্রিমিনাল আখ্যা দেওয়া হবে। অবশ্য নীতি-ফিতি নিয়ে আপনার তো কোনও মাথাব্যথা নেই। আর পুরো ব্যাপারটাই ধামাচাপা থাকছে। সেইজন্যেই এ-কাজ করতে রাজি হচ্ছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর ফলাফল সম্পর্কে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি।'

'সবকিছুর পুরো দায়িত্ব আমার। আপনি শুধু কাজ করুন। আর বলুন, কী কী জিনিস আপনার লাগবে।'

'বলছি। স্বেচ্ছাসেবকটি বয়েসে তরুণ হওয়া দরকার। স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী হওয়া চাই। বিবাহিত না হলেই ভালো। কারণ তাতে আমাদের কাজে কোনও গোলমাল হলে ওর বউয়ের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।'

ললির জন্মদিনের স্মৃতি নিশ্চয়ই আমার মনের কোনও অন্ধকার কোণে ঘাপটি মেরে বসে ছিল।

তারপর আমরা আর বেশি সময় নষ্ট করিনি। নেতৃত্বের দায়িত্ব নিলাম আমি। এক্ষেত্রে অপারেশানের পর পেশেন্টের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও একইরকম সতর্কতা, যত্ন ও দক্ষতার সঙ্গে কাজটা করা দরকার।

ওঃ, শেষ পর্যন্ত নির্ঝঞ্ঝাটে কাজটা মিটল বটে ! বিশ্বাস করুন, ভগবানের দিব্যি নিয়ে বলছি, সদাশিবের ব্রেন থেকে আর এন এ বের করতে কোনও ঝামেলাই হয়নি। আর চিফ যে-স্বেচ্ছাসেবকটি দিয়েছেন—বিশ্বনাথ কারাণ্ডে—সে একটি টগবগে যুবক, তেজী ঘোড়া। আমি রীতিমত জোর দিয়েছিলাম যে আমাদের গঙ্গাযাত্রী সদাশিবের যা মাতৃভাষা, স্বেচ্ছাসেবকের মাতৃভাষাও যেন একই হয়। কারণ ভাষা নিয়ে জট পাকিয়ে পুরো ব্যাপারটাই কেঁচে যাক তা চাইনি। অতএব সদাশিবের ব্রেন থেকে নেওয়া আর এন এ ইনজেক্ট করলাম বিশ্বনাথকে। একদিন পরে অপারেশানের ফলাফলের প্রথম আবছা সঙ্কেত পাওয়া গেল। আমরা আরও দু-চার দিন সময় দিয়ে তারপর টেপরেকর্ডার নিয়ে বসলাম। আমি বিশ্বনাথের ফিজিওলজিক্যাল ফাংশানগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম আর চিফ ওকে জেরা করতে শুরু করলেন। তিনি ওকে সহজ প্রশ্ন করলেন, উত্তরের আঁচ পাওয়া যায় এমন প্রশ্ন করলেন, ও সত্যি কথা বলছে কিনা সেটা বোঝার জন্যে প্যাঁচালো প্রশ্ন করলেন, এমন সব গোপন সঙ্কেত-শব্দ জিজ্ঞেস করলেন যেগুলো চিফ ছাড়া শুধুমাত্র সদাশিবেরই জানা ছিল। মোদ্দা কথা চিফ এভাবেই নিশ্চিত হলেন, বিশ্বনাথ যে-স্মৃতির রেকর্ড বাজিয়ে শোনাচ্ছে সেটাই আস্‌লি চিজ। ওঃ সে-দিনটা ছিল যেন ছাব্বিশ ঘণ্টার। দিনের শেষে আমরা ভীষণ ক্লান্ত কিন্তু সাফল্যের আনন্দে ডগমগ।

আমাদের এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে। সমস্ত প্রত্যাশা ছাপিয়ে গেছে। চিফ যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছেন। আর তার ফলেই কূটনীতির মোকাবিলায় আমাদের পাল্লা ভারি হয়ে উঠল। যুদ্ধ ঠেকাতে পারলাম আমরা। কিন্তু সেসব কথা তো নানান খবরের কাগজে আপনি পড়েছেন, তাই না !

ব্যক্তিগতভাবে আমি যে কতটা খুশি হয়েছিলাম সেটা একজন বিজ্ঞানী না হলে আপনি বুঝতে পারবেন না।

চিফ আমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন। কথা দিলেন যে পি ভি এস এম-এর জন্যে আমাকে সুপারিশ করবেন এবং আগামী বছরে পুরো কর্নেল পদে প্রোমোশন দেবেন।

বাড়ি ছেড়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে এসেছি ঠিক এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। ললি নিশ্চয়ই ভেবে ভেবে কাহিল হয়ে পড়েছে। আমাকে ছেড়ে দিতে চিফ একটুও দেরি করলেন না। বিশ্বনাথকেও বেশ ভালো অবস্থায় দেখলাম।

সুতরাং ঘর-পালানো ছেলে ফিরে এল ঘরে। ললির জন্মদিনের উৎসব চলল টানা একটি সপ্তাহ ধরে।

এর মধ্যে প্রায় এক মাস কেটে গেছে। সময় যেন উড়ে চলে। চিফ আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই বিশ্বনাথের অবস্থা হঠাৎই খারাপের দিকে মোড়

নিয়েছে। হয়তো অ্যালার্জি বা খারাপ কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সময় নষ্ট না করে হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে গেলাম। এমনকি চিফ কিছু বলার আগে আমিই বিশ্বনাথের খবর নিলাম।

'হ্যাঁ, ও ভালোই আছে,' চিফ ছোট্ট জবাব দিলেন, তারপর একটা চিঠি ছুড়ে দিলেন আমার দিকে। চিঠি খুললাম। গোলাপী কাগজে সরু হেলানো অক্ষরগুলো স্পষ্ট বলে দিচ্ছে এ-চিঠি কোনও মহিলার লেখা। একেবারে শেষে 'পার্বতী' নামের স্বাক্ষরটি আমার অনুমানকে সত্যি প্রমাণ করল। তবু মাথামুণ্ডু কিছু বুঝলাম না। সুতরাং হতভম্ব জিজ্ঞাসু মুখে চিফের দিকে তাকালাম।

'সদাশিবের স্ত্রী,' চিফ জবাব দিলেন, কিন্তু তাতে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর পেলাম না।

চিঠিটা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। পার্বতীর শুধু একটাই লম্বা তিক্ত নালিশ। হেডকোয়ার্টার ওর স্বামীকে নিয়ে কী সব করেছে ? ও জানতে চেয়েছে। কারণ সে আমূল বদলে গেছে।

হ্যাঁ, ওর স্বামী যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, তবে দেখতে অন্যরকম হয়ে গেছে। আচার-ব্যবহার পালটে গেছে। এমনকি দেহের গড়নও গেছে বদলে। সুতরাং আর্মি থেকে নিশ্চয়ই কোনওরকম জাদু করেছে তাকে। আসল ব্যাপারটা কী সেটাই পার্বতী জানতে চায়।

আমি একেবারে আউট হয়ে গেলাম। সদাশিব মারা গেছে, তার চিহ্নমাত্র নেই। তার সৎকারের সময় আমি নিজে হাজির ছিলাম। তাহলে বেচারী মেয়েটাকে ঠকিয়ে সুযোগ নিচ্ছে কোন ফেরেববাজ ?

'পার্বতীকে সদাশিবের মারা যাওয়ার খবর জানাননি ?'

'জানিয়েছিলাম। আর সেইজন্যেই তো রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। বলা যায় না, শত্রুপক্ষের কোনও গুপ্তচরও হতে পারে।'

'কিন্তু পার্বতীর কাণ্ডকারখানা কিছু আমার মাথায় ঢুকছে না। ও স্বীকার করেছে যে নতুন লোকটা বহু দিক থেকেই ওর স্বামীর চেয়ে আলাদা। তাহলে ও কী করে বিশ্বাস করল যে সে-ই সদাশিব, কোনও জাল ঠগ নয় ?'

'এতে আমারও মুণ্ডু ঘুরে গেছে। হয়তো মানসিক চাপ সইতে পারেনি মেয়েটা। শেষ পর্যন্ত বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সেইজন্যেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। চলুন, মেয়েটাকে একবার দেখে আসা যাক। যাবেন ?'

'এক্ষুনি রাজি, স্যার।'

আমাদের ডাকে পার্বতীই সাড়া দিল। নিজেদের পরিচয় দেওয়ামাত্র ও একঝুড়ি কথা ঢেলে দিল আমাদের কানে। শত্রুপক্ষের আক্রমণও বোধহয় এর চেয়ে নরম হত।

আবেদনের সুরে পার্বতী বলল, 'ওকে নিয়ে কী করেছেন আপনারা ? যখন ও বাড়ি থেকে যায় তখন কত খুশি ছিল, স্বাস্থ্য ভালো ছিল, মনে দয়া ছিল। আর এখন, ও একেবারে পালটে গেছে। শুধু ওর মুখ নয়, চেহারা নয়, বা···মানে, ইয়ে, আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু ও বদলে গেছে। ভীষণ বদলে গেছে।'

'ঠিক তাই। ও সদাশিব নয়, পার্বতী।' চিফ তাঁর জনসংযোগসুলভ সেরা মোলায়েম সুরে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'সদাশিব দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে। বীরের মতো মারা গেছে। বলতে আমার খারাপই লাগছে যে···'

'না ! না ! ও ভালো আছে, বেঁচে আছে। ওই তো ও-ঘরে ঘুমোচ্ছে।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই মানবে, যে—ইয়ে, মানে ও-ঘরে যে-লোকটা শুয়ে আছে তাকে সদাশিবের মতো দেখতে নয় ! তাহলে লোকটা ঠগ ছাড়া আর কী হতে পারে, বলো ?'

'না, স্যার। ও সদাশিব না হয়ে যায় না। নইলে কী করে ও জানবে সদাশিবের জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা, আমাদের ছোটখাটো কথা, ওর ছেলেবেলার কথা ! আর—আর—' পার্বতী ইতস্তত করল। কিন্তু তারপরেই নতুন করে মনস্থির করে বিদ্রোহী চোখে দেখল, বলল, 'আর···আমাদের দু'জনের যেসব অন্তরঙ্গ মুহূর্ত, যেগুলোর কথা শুধু আমরা দু'জনেই জানি, সেগুলো পর্যন্ত ও বলে দিচ্ছে।'

লোচ্চা ঠগটা দেখছি এক নম্বরের রাস্কেল। কোনও সন্দেহ নেই তাতে। ওকে বললাম লোকটাকে জাগিয়ে দিতে। চিফ রিভলবার উঁচিয়ে তৈরি হলেন।

আমাদের তখন ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়।

লোকটা আর কেউ নয়, বিশ্বনাথ।

'য়ু, য়ু স্কাউন্ড্রেল—'

চিফকে বাধা দিলাম। কারণ তখন আমি বুঝতে পেরেছি আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে। পার্বতীকে শান্ত করলাম কোনওরকমে। হ্যাঁ, চিফকেও—তাঁকে একরকম টেনেই নিয়ে এলাম বাইরে। তবে বিশ্বনাথকে বললাম আমাদের সঙ্গে আসতে। ওর সঙ্গে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলার দরকার ছিল। তাতে আমার সন্দেহই সত্যি প্রমাণিত হল।

ওকে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে আমরা ফিরে চললাম। জিপের গতি বাড়তেই চিফকে বললাম, 'আমি যখন বিশ্বনাথের কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম তখন কেন আমাকে বলেননি ?'

'বলেছি ও ভালোই আছে, তাই না ? আর সেটা তো আপনি নিজের চোখেই দেখলেন। আমাদের আসল কাজ মিটে যেতেই আমি বিশ্বনাথের ছুটি মঞ্জুর করেছি। কী করে তখন জানব যে গর্দভটা এখানে এসে জুটবে ? মেয়েটাকে চক্‌মা দেবে ?'

'এটা ওর দোষ নয়, স্যার। বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা আসলে কী হয়েছে ? সদাশিব ওর সারা জীবনে যত স্মৃতি সঞ্চয় করেছিল তার সবটাই জমা ছিল ওর মগজে। আর যে-খবর আমাদের দরকার ছিল সেটা ওর সমস্ত স্মৃতির এক কণা মাত্র। কিন্তু আমরা সবটুকু আর এন এ ওর ব্রেন থেকে টেনে নিয়ে ইনজেক্ট করেছি বিশ্বনাথকে, ফলে সদাশিবের সমস্ত স্মৃতিই চালান হয়ে গেছে বিশ্বনাথের মগজে। সেইজন্যেই বিশ্বনাথ এখন সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে যে সে সদাশিব। আর পার্বতীকে সে-কথা বিশ্বাস করাতে কোনও অসুবিধে হয়নি। এছাড়া ওর নিজেরও স্মৃতি রয়েছে। সেটা ঠিকঠাকই আছে, তবে ওর মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া সদাশিবের স্মৃতির সঙ্গে জট পাকিয়ে গেছে। সব মিলে একেবারে জগাখিচুড়ি। পুরোনো রেকর্ডিং না মুছে কোনও টেপ-এ যদি নতুন কিছু রেকর্ড করা সম্ভব হয় তাহলে যে-কাণ্ডটা হবে। একই ফিল্মে দু-বার ফটো তোলার মতো।'

চিফকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারলাম। কিন্তু পার্বতীকে বোঝাব কেমন করে ? এতে ওর মন ভেঙে যাবে, ও পাগল হয়ে যাবে ! ওর সমস্ত ভাবনাচিন্তা আবেগ কি এভাবে তছনছ করে দেওয়া যায় ? কী করে ওকে বলি যে ওর স্বামীকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ? আর তাছাড়া ও তো একা নয় ! বিশ্বনাথও রয়েছে। ওর সব কিছু তো এখন তালগোল পাকিয়ে গেছে। ওকে এখন সব কিছু খুলে বললে ব্যাপারটা কি আরও খারাপের দিকে যাবে না ? দুটো জীবন এভাবে চুরমার করে দেওয়ার জন্যে আমি দায়ী হতে

চাই না !

ওঃ ভগবান ! এতগুলো বছর আর্মিতে কাটিয়েও আমার আবেগ অনুভূতিগুলো কেন যে ভোঁতা হয়ে যায়নি !

সবই তো শুনলেন ! সেইদিন থেকে আমরা জড়িয়ে পড়েছি এই গোলকধাঁধায় । আমি আর চিফ । বিশেষ করে আমি । কোনওকিছু আর গুছিয়ে ভাবতে পারি না । রাতে ঘুম আসে না । সদাশিবের ভূত আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় । দেখুন যদি কোনও পথ বাতলাতে পারেন ।

সেরকম যদি হয় তাহলে দয়া করে আমাকে এক কলম লিখে জানাবেন ।

চিঠিটা স্রেফ পাঠিয়ে দেবেন এই ঠিকানায় : কর্নেল জামখেড়কার, আর্মি মেডিক্যাল ক্যর্‌স, নিউ দিল্লি ।

□ ১৯৮৪

অনুবাদ : অনীশ দেব





কলকাতায় প্রচণ্ড তুষারপাত

শেখর বসু

পরশু রাতে মৃদু ভূমিকম্প হওয়ার পরেই বৃষ্টি নেমেছিল, সঙ্গে কনকনে ঝোড়ো হাওয়া। সেই বৃষ্টি থেমেছে আজ সকালে। বৃষ্টির শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। ঝোড়ো হাওয়াও আর লাফিয়ে পড়ছে না বন্ধ জানলার ওপর। দেওয়ালঘড়িতে ঢং-ঢং করে সাতটা বাজল। কিন্তু অনুদের বাড়ির ভেতরটা মাঝরাত্তিরের মতো হয়ে আছে। ঘুম ভেঙে গেছে সবারই, কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে না কেউ। প্রচণ্ড শীতে লেপ-কম্বলের তলাতেও প্রত্যেকের গা-হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছিল।

পরশু রাতে বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর থেকেই ঠাণ্ডা কেমন যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। তারপর সেই লাফানো আর থামেনি। কলকাতার শীত আরামের শীত, পাতলা একটা লেপ গায়ে থাকলেই দিব্যি রাত কেটে যায়। কিন্তু সেই শীত লাফিয়ে লাফিয়ে এত বেড়ে গেছে যে, অনুদের বাড়ির যাবতীয় লেপ-কম্বল মস্ত একটা পাহাড় বানিয়ে ফেলেছে বিছানায়। সেই পাহাড়ের নিচে ঢুকেও শীতের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়নি। তখন আলমারি খালি করে সমস্ত গরম জামাকাপড় নামানো হল। তারপর সেগুলো পরে নিয়ে লেপ-কম্বলের পাহাড়ের নিচে ঢুকে পড়ল এ-বাড়ির চারটি প্রাণী। তবু শীত, হাড়কাঁপানো শীত। মনে হচ্ছিল, কে যেন লেপ-কম্বল আর গরম জামায় কয়েক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে।

অনুর বাবা দাঁত ঠকঠক করতে করতে বললেন, 'কলকাতায় এত শীত! এ তো জীবনেও দেখিনি।'

একটু বাদে অনুর মা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'উ-নু-ন। ঘরের মধ্যে একটা উনুন জ্বালাতে পারলে—।'

জবাবে পনেরো বছরের ছেলে অনু বলল, 'উনুন তো ছাতে।'

ছোট্ট এই জবাবটাতেই ঘরের বাকি তিনজন বুঝে গেল অনু কী বলতে চাইছে। হাড়কাঁপানো এই শীতে বিছানা থেকে নামাই যেখানে অসম্ভব সেখানে কে যাবে ছাতে উনুন আনতে! আর, একছুটে উনুনটা নিয়ে এলেই তো হবে না, ধরাতেও হবে ওটা, প্রচণ্ড এই শীতে সে-কাজ করবে কে?

অনুর বোন টুনটুনির বয়েস মাত্র সাত, কিন্তু ওর মাথায় মাঝেমধ্যে বড়দের মতো বুদ্ধি

খেলে যায়। ও বলল, 'হিটারটা জ্বালাও না, দাদা।'

এটা বরং সহজ কাজ। চায়ের জল গরম করার ছোট হিটারটা এ-ঘরেই আছে, কোনও মতে প্লাগটা লাগিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু প্রচণ্ড এই শীতের মধ্যে সামান্য এই কাজটা করাও বোধহয় ভয়ঙ্কর কঠিন। তবে স্কুলের চ্যাম্পিয়ন ফুটবলার অনমিত্র সেন খুব সাহসী ছেলে। কিছুক্ষণ পরেই ও হঠাৎ পেনাল্টি-বক্সে বল নিয়ে ঢুকে পড়ার কায়দায় লাফিয়ে পড়ল বিছানা থেকে। তারপর হিটারের প্লাগটা লাগিয়ে দিয়েই আবার শাঁ করে গলে গেল লেপ-কম্বলের নিচে।

একটু বাদেই হিটারের তারে লালচে আভা ফুটে উঠল। কিন্তু আভাটুকুই সার, এ-ঘরের শীত তাড়াবার সাধ্য নেই ছোট্ট ওই হিটারটার।

কষ্টকর শীতের মধ্যে খুব আস্তে আস্তে সময় কাটে। সাতটার পরে আটটা বাজতে বোধহয় দু'ঘণ্টা লেগে গেল। তারপরই জানলার ফাঁক দিয়ে খুব আবছা একটা আলো এসে পড়ল ঘরের মধ্যে।

আলোটা কেমন যেন অচেনা। নভেম্বরের কলকাতায় তো এই সময় বেশ চড়া আলো ফুটে যায়। তাহলে কি খুব কুয়াশা জমেছে!

ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ, তবু এ-ঘরের সবাই টের পাচ্ছিল বাড়ির বাইরে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটে গেছে। পুরো পাড়াটা আশ্চর্য রকমের থমথমে, কোথাও কোনও শব্দ নেই। অনুদের বাড়ির পাশেই বিশাল জোড়া নিমগাছ। ওই গাছ দুটোয় অসংখ্য পাখি এসে রাত্তিরে থাকে। প্রতিদিন ভোর হতে না হতেই তাদের কিচিরমিচির শব্দে সারা বাড়িটা প্রায় কেঁপে ওঠে। কিন্তু তারা আজ কোথায় গেল! আজ তো একটা পাখির ডাকও শোনা যায়নি! তবে কি পরশু রাতের ওই ভূমিকম্পে বিরাট কোনও ওলটপালট হয়ে গেছে? ভূমিকম্পের কথাটা মনে পড়ে যেতেই অনু একটু ঘাবড়ে গেল।

কিন্তু ভূমিকম্পও তো তেমন কিছু একটা হয়নি। বাড়িটা সামান্য একটু দুলে উঠেই থেমে গিয়েছিল। দেওয়ালঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া ভূমিকম্পের আর কোনও চিহ্ন ও কোথাও দেখতে পায়নি। তারপরই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, প্রচণ্ড বৃষ্টি, সঙ্গে কনকনে ঝোড়ো হাওয়া।

দেওয়ালঘড়িতে সাড়ে আটটার ঘণ্টা পড়তেই টুনটুনি টুক করে বিছানা থেকে নেমে পড়ে হিটারের আগুনে হাত সেঁকতে লাগল উলটেপালটে। শীত বোধহয় একটু কমেছে। কিংবা এমনও হতে পারে—বন্ধ ঘরে হিটারের তাপ বহুক্ষণ ধরে ছড়াবার জন্য ঘরটা গরম হয়েছে সামান্য।

এ-ঘরের দুটো দরজা। একটা ভেতরের ঘরে যাওয়ার, আর-একটা রাস্তায়। টুনটুনি হিটারের আগুনে কিছুক্ষণ হাত গরম করবার পরে রাস্তায় বেরুবার দরজাটার খিল খুলে টান দিল দরজায়, কিন্তু দরজা খুলল না। কিছুক্ষণ টানাটানির পরে ও কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাদের দরজাটা বাইরে থেকে কেউ আটকে দিয়েছে!'

চারদিকের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সবাই কেমন যেন ভয় পেয়েই ছিল, টুনটুনির ওই চিৎকারে বিছানার তিনজন আঁতকে উঠে ছুটে গেল দরজার দিকে। তারপর তিনজনেই দরজা ধরে টানাটানি শুরু করে দিল, কিন্তু দরজা খোলা তো দূরের কথা, পাল্লা দুটো এক চুলও ফাঁক হল না।

আলতো করে টানলেই দরজা খুলে যায় রোজ, কিন্তু এ কী হল আজ! আতঙ্কে প্রচণ্ড শীতের কথা এই মুহূর্তে সবাই বোধহয় ভুলে গিয়েছিল। দরজাটা খোলা দরকার, যে

কোনও উপায়ে খোলা দরকার। দরজাটা খোলা-না-খোলার ওপরেই যেন সবকিছু নির্ভর করছে।

একটা অকেজো শাবল আলমারির কোনায় পড়ে আছে বহুদিন ধরে। হঠাৎ সেটার কথা মনে পড়ে যেতেই অনু ছুটে গিয়ে শাবলটা নিয়ে এল। তারপর গায়ের জোরে সেটা দিয়ে চাপ দিতেই দরজাটা ফাঁক হল সামান্য। দরজার ওপাশে কিসের যেন সাদা স্তূপ। সেই স্তূপের ওপর দিয়ে এক ঝলক হাড়কাঁপানো হাওয়া লাফিয়ে ঢুকল ঘরের ভেতর।

আতঙ্কের সঙ্গে বিস্ময় আর অসম্ভব একটা কৌতূহল চেপে ধরেছিল অনুদের। কোনও মতে দরজাটা খোলার পরে ওদের চোখের পলক পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

ওরা কি জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে ? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে কি ! দু'হাত দিয়ে ভালো করে চোখ মোছার পরেও ওরা আগে যা দেখেছিল তাই দেখল আবার। না, ওদের কেউই ঘুমোচ্ছে না। কেউই স্বপ্ন দেখছে না। বাড়ির সামনের এই অলৌকিক দৃশ্যটা তাহলে সত্যি ! একেবারে সত্যি !

বাড়ির সামনে ঝুরোঝুরো বরফ পড়ে আছে একগাদা। বরফের কুচিতেই দরজাটা আটকে গিয়েছিল বিশ্রীভাবে।

হাঁ করে সামনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে অনুর বাবা থেমে থেমে বললেন, 'অবাক কাণ্ড ! কলকাতায় তুষারপাত !'

বাবার গলার স্বরে টুনটুনি বুঝতে পারল, ব্যাপারটা আর যাই হোক, ভয়ের নয়। ও দাদাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'দাদা, তুষারপাত কী রে ?'

বাড়ির সামনে হঠাৎ এত বরফ দেখে খুশিতে চকচক করছিল অনুর চোখ। উত্তরে ও বলল, 'তুষারপাত জানিস না রে, ওই যে স্নো-ফল—সিমলায়, কাশ্মীরে, দার্জিলিঙে শীতকালে বরফ পড়ে শুনিসনি।' তারপরেই হাড়কাঁপানো শীতের কথা বেমালুম ভুলে পেল্লায় এক লাফ মারল বরফের ওপর। লাফ মারতেই ধপধপে সাদা বরফের মধ্যে ওর পায়ের পাতা ডুবে গেল টুপ করে। চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে চিৎকার করে উঠল অনু, 'অবিশ্বাস্য ! চারদিক কীরকম অদ্ভুত হয়ে গেছে। বাইরে এসে দেখ।'

অনুর চিৎকারে শুধু ওর বাবা, মা, বোনই নয়, অবিনাশ জোয়ারদার লেনের আরও কেউ কেউ বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে। চারদিকে অসম্ভব সব ব্যাপার-স্যাপার। অসম্ভব, কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

বরফ পড়ে পুরো গলিটা সাদা হয়ে গেছে। লাইটপোস্টের গায়ে বরফের ঝালর, জানলার শেডে বরফের স্তূপ।

সারা কলকাতায় সবার মুখে একটাই কথা—

কলকাতায় তুষারপাত !

কলকাতায় স্নো-ফল !

কলকাতায়—অ্যাঁ !

শুধু একদিন বলেই নয়, পর পর আরও দু'দিন অল্পবিস্তর বরফ পড়ল কলকাতায়। সারা পৃথিবীর আবহবিজ্ঞানীরা চোখ কপালে তুলে জানালেন, অজ্ঞাত কোনও কারণে গোটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তার ফলে গরমের দেশগুলো শীতের দেশ, আর শীতের দেশগুলো গরমের দেশ হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের আরও একটি অনুমান নিয়ে প্রচণ্ড তৎপরতা আর জোর জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল সারা

পৃথিবীতে। অনুমানটি হল : বায়ুমণ্ডলের অস্বাভাবিক পরিবর্তন নিছক প্রাকৃতিক কারণে ঘটেনি, এই পরিবর্তনটি ঘটিয়েছে কোনও বিজ্ঞানী। কিন্তু কে সে ? কোন পদ্ধতিতে সে এই ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটিয়েছে ? তার উদ্দেশ্যই বা কী ?

বেতারে এই খবরটি শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই কপালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল অনুর। ও চটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

মাত্র দু'দিনের মধ্যে কলকাতার জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। অনুর মাথায় টুপি, গায়ে ফারের কোট, হাতে দস্তানা আর পায়ে স্নো-বুট। অবিনাশ জোয়ারদার লেনে এক ফুট বরফ জমে আছে। ও তার ওপর দিয়ে দিব্যি হেঁটে এসে বড় রাস্তায় পড়ল। বড় রাস্তায় কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বরফের বল তৈরি করে লোফালুফি করছিল।

আকাশের একধারে বিরাট এক সূর্য, কিন্তু সূর্যের তেজ তেমন নেই। সূর্যের আলোয় রাস্তাঘাটের বরফগুলো ঝলমল করছিল।

অনু এই রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা হেঁটে আসার পরে মহাত্মা গান্ধী রোডে এসে পড়ল। কুলিরা গাঁইতি আর বেলচা দিয়ে রাস্তার বরফ পরিষ্কার করছিল। এতটা হাঁটার পরেও বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হয়নি অনু। আরও অনেকটা চমৎকার হাঁটা যেতে পারে। কিন্তু সকালের ওই চিন্তাটা মাথার মধ্যে আর-একবার ঝাঁপিয়ে পড়তেই ও কিছুটা উত্তেজিত হয়ে ভবানীপুরের একটা বাসে উঠে পড়ল।

বাসে লোকজন বেশি নেই। কাচের জানলাগুলো সব বন্ধ। অনু জানলার ধারের একটা সিটে বসে পড়ল। রাস্তায় স্কিড করার ভয়ে বাস ছুটছিল আস্তে আস্তে। শহিদ মিনারের কাছাকাছি এসে অনু নতুন করে অবাক হল আর-একবার। গড়ের মাঠে এ-দৃশ্য কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। বরফ-পড়া সাদা মাঠে কয়েকজন স্কি করছে।

ভবানীপুরে বিজ্ঞানী-জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে ঢোকার সময় অনু দেখল গলির বরফের ওপর রোলার স্কেটিংয়ে শাঁ-শাঁ করে ছুটে বেড়াচ্ছে কয়েকটা ছেলে।

বিজ্ঞানী-জ্যাঠামশাইয়ের ল্যাবরেটরি তিনতলায়। জ্যাঠামশাইয়ের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই ল্যাবরেটরিতে কাটে, কিন্তু ওখানে তিনি তখন ছিলেন না। কোথায় জ্যাঠামশাই ? অনেক খোঁজাখুঁজির পরে ছাতে জ্যাঠামশাইকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল অনু।

জ্যাঠামশাইয়ের পরনে পাতলা একটা সুতির কোট আর পাজামা। উসকোখুশকো চুলে পাতলা বরফের কুচি। প্রচণ্ড এই শীতে এ-পোশাক পরা আর না পরার মধ্যে কোনও তফাত নেই। জ্যাঠামশাই ছাদের রেলিংয়ে ভর দিয়ে কেমন যেন তন্ময় হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অনু ডাকতেই চমকে উঠে পিছন ফিরলেন তিনি।

জ্যাঠামশাইয়ের চোখমুখ অসম্ভব বসে গেছে। বোঝাই যায়, দু-তিন রাত তাঁর কোনও ঘুম-টুম হয়নি। আঁতকে উঠে অনু বলল, 'শিগ্‌গির ঘরে এসো। এভাবে বাইরে থাকলে তোমার তো নিমোনিয়া হয়ে যাবে।'

অনুর কথায় মৃদু হাসতে হাসতে জ্যাঠামশাই প্রশ্ন করলেন, 'কেন, নিমোনিয়া হবে কেন ?'

'বা রে ! বরফ পড়ছে, আর পাতলা পোশাকে তুমি দাঁড়িয়ে আছ খোলা ছাতে। নিমোনিয়া হবে না ?'

'বরফ কোথায় ?'

'তোমার মাথায় হাত দিয়ে দেখ।'

জ্যাঠামশাই মাথায় হাত দিলেন না, কিন্তু রহস্যজনক ভঙ্গিতে বললেন, 'কলকাতার ভবানীপুরের ছাতে দাঁড়িয়ে যদি তুষারপাতে মারা যাই, ক্ষতি কী। এ-সৌভাগ্য ক'জন বিজ্ঞানীর হতে পারে!'

জ্যাঠামশাইয়ের রহস্যজনক ভঙ্গি আর কথা শুনে অনুর বুকের রক্ত ছলকে উঠল। তাহলে নির্ঘাত ওর অনুমানটাই ঠিক। আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তনের মূলে আছেন জ্যাঠামশাই।

কোনও কথা না বলে জ্যাঠামশাইয়ের হাত ধরে ওঁকে ল্যাবরেটরিতে টেনে নিয়ে এল অনু। তারপর শুকনো তোয়ালে দিয়ে ওঁর মাথা মুছে গায়ে একটা শাল জড়িয়ে দিল। কালো কফি জ্যাঠামশাই খুব পছন্দ করেন। নিজের হাতে পটভর্তি কালো কফি বানিয়ে নিয়ে এল অনু।

কফির কাপে পরপর কয়েকটা চুমুক দিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, 'আহ্!'

একটু পরে হেসে বললেন, 'এবার তোমার খবর কী বলো মিস্টার সেন? গায়ে ফারের কোট, হাতে দস্তানা—তুমি তো দেখছি একেবারে সাহেব হয়ে গেলে।'

অনু একটু হেসে বলল, 'আমি শুধু একাই নই, সবাইকেই তো তুমি সাহেব বানিয়ে দিয়েছ।'

'আমি!' তীব্র চোখে অনুর চোখের দিকে তাকালেন জ্যাঠামশাই

চোখের দৃষ্টি তীব্রতর করে অনু বলল, 'হ্যাঁ, তুমিই। দিনকয়েক আগে তুমিই আমাকে বলেছিলে, তোমার আবিষ্কার খুব শিগ্‌গিরই গোটা পৃথিবীর চেহারা পালটে দেবে। কলকাতাকে তখন আর চেনা যাবে না। বলোনি?'

'হ্যাঁ, তা বলেছিলাম, কিন্তু তার মানে কি—'

থামিয়ে দিয়ে অনু বলল, 'আমি অত মানে-টানে জানি না, তুমি এবার আমাকে আসল ব্যাপারটা বলো।'

আসল ব্যাপারটা নিয়ে কিছুতেই মুখ খুলতে চাইছিলেন না জ্যাঠামশাই, কিন্তু অনুর জেদাজেদির কাছে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হল তাঁকে। তাছাড়া, একজন বিজ্ঞানী তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে কতক্ষণই বা লুকিয়ে রাখতে পারেন। একটা চুরুট ধরিয়ে গলগল করে কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়লেন জ্যাঠামশাই, তারপর বললেন, 'আজ বেলা এগারোটার নিউজ বুলেটিনটা শুনেছ?'

'না তো। কী বলেছে নিউজে?'

'পৃথিবীর আশ্চর্য সব খবর। জলপাইগুড়িতে দুটো পেঙ্গুইন দেখা গেছে।'

খবরটার মধ্যে অবাক হওয়ার মতো তেমন কিছু ও পেল না। পেঙ্গুইন সিরিজের কল্যাণে ও পেঙ্গুইনের ছবির সঙ্গে খুব পরিচিত। কিন্তু প্রাণীগুলো ঠিক কোথায় থাকে, জলপাইগুড়িতে ওদের পক্ষে আসা সম্ভব কি না—সে-সম্পর্কে ওর স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই।

অনুর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনের কথা আন্দাজ করতে পারলেন জ্যাঠামশাই। তারপর বললেন, 'পেঙ্গুইন কোথায় থাকে জানো তো? অ্যান্টার্কটিকায়, তার মানে দক্ষিণ মেরুতে। দক্ষিণ মেরু ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও ওরা থাকে না। সেই পেঙ্গুইন এখন জলপাইগুড়িতে। ভাবতে পারো? জলদাপাড়ার কাছে আবার একটা সাদা ভালুককে দেখা গেছে। আমার মনে হয় ওটা পোলার বিয়ার, উত্তর মেরুর বাসিন্দা। ভাবতে পারো কী ভয়ঙ্কর একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে সারা পৃথিবীর আবহাওয়ায়! এর পিছনে শুধু ছোট্ট

একটা—'

'ছোট্ট একটা কী ?'

'পরশুর আগের রাতে মৃদু ভূমিকম্প হয়েছিল, টের পেয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'ওটা ছিল প্রতিক্রিয়া। মূল ব্যাপারটা ছিল সৌরজগতে পৃথিবী গ্রহের পাশে ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ। সঠিক জায়গায় বিস্ফোরণটা আমিই করিয়েছিলাম। তার ফলে পৃথিবী গ্রহটা ঘুরে যায়, বিষুবরেখা, মানে ইকুয়েটরের স্থান পরিবর্তন হয়ে যায়। আর তার মানে গোটা পৃথিবীর আবহাওয়ায় পরিবর্তন। আস্তে আস্তে ভৌগোলিক পরিবর্তনও দেখা দেবে।'

অনু বুঝতে পারল, পরিবর্তনটা মারাত্মক ধরনের পরিবর্তন। কিন্তু সেটা ঠিক কীভাবে হল, তার ফলে কলকাতায় বরফ পড়ার সম্পর্কই বা কী—পরিষ্কার হল না ওর কাছে।

জ্যাঠামশাই হাসতে হাসতে বললেন, 'সূর্য আমাদের কী দেয় ?'

'আলো।'

'ঠিক। আলো আর তাপ। সূর্যের আলো যেখানে সরাসরি পড়ে সেখানে তাপ বেশি, আর যেখানে বাঁকা হয়ে পড়ে সেখানে তাপ কম। আর যেখানে ধরতে গেলে পড়েই না, সেখানে সারা বছর বরফ—যেমন, উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। ঠিক তো ?'

মনোযোগী ছাত্রের মতো একপাশে মাথা কাত করল অনু।

জ্যাঠামশাইয়ের চুরুটে ছাই জমে গিয়েছিল অনেকটা। ছাই অ্যাশট্রেতে ফেলে তিনি বললেন, 'এই পৃথিবীর অবস্থান যদি হঠাৎ পালটে যায়, তাহলে যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো পড়ত সেখানে সূর্যের বাঁকা আলো পড়বে। যেখানে সূর্যের আলো ধরতে গেলে পৌঁছতই না সেখানে এবার থেকে পড়বে। আর যেখানে পড়ত সেখানে ধরতে গেলে আর পড়বেই না। তার মানে গোটা পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন।'

জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনতে শুনতে অনুর মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছিল।

জ্যাঠামশাইয়ের মুখে অদ্ভুত একটা আলো এসে পড়েছিল। তিনি কেমন যেন নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে বললেন, 'আবহাওয়ায় এই পরিবর্তন কীভাবে আনা যায়—সেটাই আমার সারা জীবনের সাধনা। এখন বলতে পারো আমার সাধনায় আমি সফল হয়েছি।'

অনু হঠাৎ বলে বসল, 'আচ্ছা, আমাদের দেশে আগের মতো বিচ্ছিরি গরমকাল আর তাহলে আসবে না, না ?'

'না। তবে বিচ্ছিরি গরমকালের বদলে বিচ্ছিরি শীতকাল আসতে পারে। প্রচণ্ড শীত, চারদিকে শুধু বরফ, একটানা তুষারপাত চলছে। তুষারঝড়ও উঠতে পারে।'

অনু কল্পনার চোখে ভবিষ্যতের কলকাতার এই চেহারাটা দেখে নিয়ে বলল, 'প্যাচপ্যাচে গরমের চাইতে প্রচণ্ড শীত অনেক ভালো। আমাদের দেশটা শীতের দেশ হয়ে গিয়ে ভালো হয়েছে। আচ্ছা, আগে কলকাতায় কি কখনও একফোঁটা বরফও পড়েনি ?'

জ্যাঠামশাই সুন্দর করে হেসে বললেন, 'কী করে পড়বে ? ভারতবর্ষ আগে তো সেই পুরোনো ইকুয়েটরের কাছাকাছি ছিল। ইকুয়েটরের দু'দিকে ট্রপিক্স। একদিকে ট্রপিক অফ ক্যান্সার, আর-একদিকে ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন। পৃথিবীর কাল্পনিক এই দুটি রেখার মাঝখানে যতগুলো দেশ পড়েছে সবগুলোই গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। ইকুয়েটরের ওপরে কিংবা তার কাছাকাছি দেশে গরম সব চাইতে বেশি।'

'এখন কি ট্রপিক্স আর ইকুয়েটর থেকে ভারতবর্ষ অনেক দূরে সরে গেছে ?'

'নিশ্চয়ই। না হলে কলকাতায় তুষারপাত কী করে হবে ? আমি তো ভবানীপুরের

গলিতে বরফ পড়া দেখার জন্যে দু-রাত্তির ঘুমোইনি।'

অনু তাই শুনে ফারের কোটের কলার দিয়ে কান ঢেকে বলল, 'প্রচণ্ড স্নো-ফল্ হচ্ছে চারদিকে, তোমার কিন্তু ঠাণ্ডা লাগানো একেবারেই উচিত হবে না। আচ্ছা, তোমার ল্যাবরেটরিতে একটা ফায়ারপ্লেস বানিয়ে নাও না। ঘরটা সব সময় বেশ গরম থাকবে।'

জ্যাঠামশাই গলা ফাটিয়ে হা হা করে হেসে বললেন, 'তা তুমি মন্দ পরামর্শ দাওনি।'

জ্যাঠামশাইয়ের হাসি আর কথায় রীতিমত লজ্জা পেয়ে গেল অনু। সারা পৃথিবীর আবহাওয়া যিনি একেবারে ওলটপালট করে দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে উপদেশের ঢঙে কথা বলা উচিত হয়নি ওর।

বিকেলবেলায় বাড়ি ফেরার মুখে জ্যাঠামশাই গলা নামিয়ে বললেন, 'আমার কাণ্ডটার কথা তুমি কাউকে কিন্তু ভুলেও বলেফেলো না। সবকিছু এখন আমি গোপন রাখতে চাই। নিরিবিলিতে বসে পৃথিবীর সব জায়গার আবহাওয়া আমি এখন স্টাডি করব, তারপর কয়েকদিন বাদে না হয়— ।'

খবরটা গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনু যখন বিকেল চারটে নাগাদ জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি থেকে বেরুল তখন আবার ঝিরঝির করে তুষার পড়া শুরু হয়েছে। সঙ্গে কনকনে হাওয়া। রাস্তায় লোকজন, গাড়িঘোড়ার সংখ্যা কমে গেছে একদম। বাসস্টপে অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পরে বাস পেল অনু। বাসটা হেডলাইট জ্বেলে কচ্ছপের গতিতে এগোতে লাগল সামনের দিকে।

পরদিন সকালে খবরের কাগজ হাতে পেয়ে কলকাতার লোকদের উত্তেজনা চরমে উঠল। উত্তর আমেরিকা আর ইওরোপে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আবহাওয়া দেখা দিয়েছে হঠাৎ। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, পোল্যাণ্ড আর রাশিয়ার কিয়েভ-সংলগ্ন এলাকার মানুষ এই নভেম্বরেও গরমে ছটফট করছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ভয়াবহ আন্ত্রিক রোগ দেখা দিয়েছে লন্ডন, প্যারিস আর ফ্রাঙ্কফুর্টে। কাক আর চড়ুই পাখির উৎপাত অস্বাভাবিক পরিমাণে বেড়ে গেছে শহরের রাস্তায় রাস্তায়। শহরগুলির কয়েকটি বিখ্যাত নাইটক্লাব জমজমাট অনুষ্ঠানসূচি বাতিল করে বক্তৃতার আয়োজন করেছে। বক্তৃতার বিষয় হল : পরিবর্তিত আবহাওয়ায় সুস্থভাবে বাঁচার পথ। বক্তাদের প্রায় সবাই হয় ভারতীয় নয় বাংলাদেশী। তাঁরা দই, ঘোল, বেলের মোরব্বা, কাঁচকলার ঝোল ইত্যাদি খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন সাহেবদের।

এদিকে ওইসব দেশের আবহাওয়া এখন দেখা দিয়েছে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, বর্মা, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান এবং চীনে। এইসব দেশের কোথাও কোথাও শীতপ্রধান দেশের ধাঁচে বাড়িঘর বানাবার উদ্যোগ দেখা দিয়েছে। কারণ, অত্যধিক তুষারপাতে টেবিল-আকৃতির ছাত ধসে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

এই আশঙ্কার খবরটা পড়ার পরেই অনু ছুটে ওদের ছাতে উঠল। ছাতের কোথাও কোথাও পাতলা তুষার জমে ছিল। ও বেলচা দিয়ে বরফগুলো তুলে নিয়ে ফেলে দিল গলির মধ্যে। তারপর নিচে নামতেই শুনতে পেল টুনটুনি কান্না জুড়েছে তারস্বরে। কী ব্যাপার ?

মা টুনটুনির গালে কোল্ডক্রিম ঘষতে ঘষতে বললেন, 'আদিখ্যেতা ! গাল ফেটেছে বলে কান্না জুড়েছেন উনি।'

আর-একটু কাছে এগিয়ে এসে অবাক হয়ে গেল অনু : 'ও মা ! টুনটুনির গাল দুটো কী

রকম লাল হয়ে গেছে দেখ।'

টুনটুনির গায়ের রঙ এমনিতেই ফর্সা, কিন্তু গালের রঙ এরকম লাল ছিল না তো আগে!

বেশ খুঁটিয়ে মেয়ের মুখটা দেখে নিয়ে অনুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, 'তোমার মেয়ে এখন মেমসাহেবদের মতো ফর্সা হতে শুরু করেছে। হবে নাই বা কেন, আমাদের দেশটা তো এখন সাহেব-মেমদের দেশ হয়ে গেছে।'

'সত্যি!' অবাক হয়ে গেল শ্রোতাদের তিনজনেই।

অনুর মাথার মধ্যে একগাদা প্রশ্ন কিলবিল করে উঠল। কিন্তু প্রশ্নগুলো করার সময় নেই একদম, স্কুলে ছুটতে হবে এক্ষুনি।

কলকাতায় বরফ পড়া শুরু হওয়ার পর থেকেই স্কুলের সময়টা পালটে গেছে। স্কুল ছুটি হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। শোনা যাচ্ছে এবার থেকে স্কুলে গরমের ছুটির বদলে শীতের ছুটি দেওয়া হবে। টানা তিনমাসের ছুটি। সেই ছুটি শুরু হবে শিগ্‌গিরই।

অন্যান্য বছর এই সময় স্কুলের টিফিন আওয়ার্সে ক্রিকেট খেলত অনুরা। কিন্তু এখন আর ক্রিকেট খেলার উপায় নেই। বরফ পড়ে সাদা হয়ে থাকে স্কুলের মাঠটা। সেই মাঠে কেউ কেউ এখন রোলার-স্কেটিং করে, কেউ ছোড়াছুড়ি করে বরফের বল, কেউ কেউ আবার মাটির মতো হালকা বরফ দিয়ে স্নো-ম্যান বানায়।

আজ স্কুল ছুটি হতেই অনু ছুটল জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে। জ্যাঠামশাই তাঁর গবেষণাগারে বসে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে কী যেন পরীক্ষা করছিলেন মন দিয়ে। অনু জ্যাঠামশাইয়ের দিকে তাকিয়েই বলল, 'জ্যাঠামশাই, তুমি আরও ফর্সা হয়ে গেছ।'

জ্যাঠামশাই ওর কথার কোনও উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্র থেকে চোখ তুলে প্রশান্ত মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যাঁ, কী বলছিলে তুমি?'

'বলছিলাম কি, তোমার গায়ের রঙ আগের চেয়েও বেশি ফর্সা হয়ে গেছে।'

জ্যাঠামশাইয়ের মুখে সুন্দর একটা হাসি ফুটে উঠল। বললেন, 'তাই তো হবে এবার থেকে। শীতের দেশের মানুষদের গায়ের রঙ তো সাদা হয়।'

সকালবেলায় বাবার মুখে এই ধরনের কথা শুনে অনুর মধ্যে যে-বিস্ময়বোধটা তৈরি হয়েছিল সেটা ইতিমধ্যে বহুগুণ বেড়ে গেছে। ও চোখ বড় বড় করে বলল, 'এ-দেশের সবাই এবার ফর্সা হয়ে যাবে? সাহেবদের মতো ফর্সা?'

'নিশ্চয়ই। তবে রাতারাতি হবে না। অনেক সময় লাগবে। আমরা এখন শীতপ্রধান দেশের মানুষ না?'

অনুর বড় বড় চোখে পলক পড়ছিল না একবারও। ঢোক গিলে বলল, 'আচ্ছা, এখন যারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ হয়ে গেল—মানে, সাহেবরা, ওদের গায়ের রঙ কি সাদাই থাকবে?'

'না, কক্ষনো না। আমরা যে-হারে সাদা হব ওরা ঠিক একই হারে কালো হবে। একটা সময় আমরা হব সাদা মানুষ, ওরা হবে কালো মানুষ।'

উত্তেজনায় চোখমুখ প্রায় লাল হয়ে উঠেছিল অনুর। ও দু-হাত মুঠো করে বলল, 'ওহ্! দারুণ ব্যাপার হবে।'

জ্যাঠামশাই ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'গায়ের রঙ নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন বলো তো! আমি তো সাদার চাইতে কালো রঙ ঢের পছন্দ করি। তুমি কালো রঙ পছন্দ করো না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও কালো রঙ খুব ভালোবাসি।' সামান্য ইতস্তত করে উত্তর দিল অনু।

মনোমত উত্তর পাওয়ার পরেও জ্যাঠামশাই চেপে ধরলেন ওকে। 'তাই যদি হবে তাহলে আমাদের গায়ের রঙ সাহেবদের মতো হবে শুনে তুমি ওভাবে লাফিয়ে উঠেছিলে কেন ?'

অনু লজ্জা পেয়ে বলল, 'ন্‌না, ওটা আমি অন্য কথা ভেবে বলেছিলাম।'

'কী কথা ?'

অনু লজ্জায় মুখ লুকিয়ে উত্তর দিল, 'ন্‌না, ও কিছু না।'

কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে এত সহজে ছাড় পাওয়া যায় না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উনি আসল কথাটা বলতে বাধ্য করলেন অনুকে।

অনু এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও কিছুটা ঘেমে উঠে মেঝের দিকে চোখ রেখে বলল, 'শুনেছি, আমাদের দেশে কালো মেয়েদের বিয়ে হতে চায় না সহজে, তা সবাই ফর্সা হয়ে গেলে— ।'

অনুর কথাটা শেষ হওয়ার আগেই হা হা করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন জ্যাঠামশাই। হাসি আর থামতেই চায় না, থামার মুখে আবার নতুন করে হেসে ওঠেন। শেষে কোনওমতে হাসি থামিয়ে বললেন, 'মিস্টার অনমিত্র সেন দেখছি—যাকে বলে খুব সমাজ-সচেতন ছেলে। ভালো ভালো, তা লুকিয়ে লুকিয়ে একটু-আধটু বড়দের গল্পের বই পড়া হয়, তাই না ?'

অনু দু'দিকে মাথা ঝাঁকাল খুব জোরে।

জ্যাঠামশাই হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দাঁড়াও, ওয়ার্ল্ড নিউজ বুলেটিন শুনে নিই একবার।'

জ্যাঠামশাইয়ের নিজের হাতে বানানো অদ্ভুত চেহারার একটা রেডিও সেট আছে। সেটায় নাকি পৃথিবীর যে-কোনও সেণ্টার ধরা পড়ে। রেডিওর সঙ্গে লাগানো হেডফোনটা পরে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন গম্ভীর মুখে, তারপর একসময় লাফিয়ে উঠে বললেন, 'এই খবরটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ ধরে।'

'কী খবর ? কী খবর ?' অদ্ভুত এক উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অনু।

নিজের খেয়ালে জ্যাঠামশাই লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে লাগলেন, 'দ্য ফ্রোজেন এরিয়া উইদিন আর্কটিক অ্যাণ্ড অ্যান্টার্কটিক সার্কল স্টার্টেড মেল্টিং !'

জ্যাঠামশাইয়ের উচ্ছ্বাস এবং কথাগুলোর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না অনু। জ্যাঠামশাই একটু ঠাণ্ডা হওয়ার পরে ও বেশ জোর গলায় বলল, 'কী খবর ? কী হয়েছে বলবে তো ?'

জ্যাঠামশাই হেডফোনটা খুলে রেডিওর পাশে রেখে দিয়ে বললেন, 'এই খবরটার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম।'

'কী খবর ?'

খবরটা শোনার আনন্দে জ্যাঠামশাই বোধহয় অনুর কথা ভুলেই গিয়েছিলেন, এবার ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলছিলে তুমি ?'

অনুর কৌতূহল মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ও কোনওরকমে বলল, 'আরে, যে-খবরটা শুনে তুমি এত হইহই করছ, সেই খবরটা কী বলবে তো ?'

জ্যাঠামশাই মুচকি হেসে বললেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত ব্যস্ত হয়ো না। যে-খবর শোনার জন্যে আমি সারা জীবন ধরে অপেক্ষা করছিলাম সেই খবরটার জন্যে তুমি এক

মিনিটও ধৈর্য ধরতে পারছ না !'

বেশ আয়েশ করে একটা চুরুট ধরিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, 'পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ প্রান্তে দক্ষিণ মেরু আছে, জানো তো ?'

অনু একদিকে নত করল মাথা।

'বেশ। এই দুটি মেরু-অঞ্চল সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে, কারণ সূর্যের আলো ওই দুটি এলাকায় ধরতে গেলে পৌঁছয়ই না, জানো তো ?'

এইরকম সাদামাটা প্রশ্ন করে বারবার 'জানো তো' বললে একটু উঁচু ক্লাসের যে-কোনও ছাত্রেরই রাগ হয়ে যাওয়ার কথা। অনুরও রাগ হল, কিন্তু আসল ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি শোনার জন্য ও রাগ গোপন করে আবারও মাথা নত করল একপাশে।

একটু থেমে জ্যাঠামশাই বলতে শুরু করলেন আবার : 'পৃথিবীর অবস্থান পালটে যাওয়ার জন্যে এই দুটি এলাকার ওপর এখন সরাসরি সূর্যের আলো পড়তে শুরু করেছে। তার ফলে চিরতুষার অঞ্চল গলতে আরম্ভ করেছে।'

উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর বরফ গলার খবরে হইচই করার মতো কিছুই খুঁজে পেল না অনু। ও দু' হাত উলটে বলল, 'ওসব জায়গায় বরফ গলছে তো আমাদের কী ?'

জ্যাঠামশাই ওর দিকে অবাক বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকার পরে বললেন, 'কী বলছ তুমি ! বরফ গলছে তো আমাদের কী ! মেরু-অঞ্চলের বরফ গলে গেলে আমাদের সামনে বিশাল একটা জগৎ খুলে যাবে।'

জ্যাঠামশাইয়ের কথাটার আসল অর্থ এখনও স্পষ্ট হল না অনুর কাছে।

চুরুটে তেমন ছাই জমেনি, কিন্তু জ্যাঠামশাই অস্থিরভাবে অ্যাশট্রের ওপর বারকয়েক চুরুটটা ঠুকে বললেন, 'কিছুকাল আগে ব্রিটেন আর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মধ্যেকার নর্থ সি-র বেড খুঁড়ে বিপুল পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে—সে-খবরটা জানো তুমি ?'

অনু দু'পাশে মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দিল, খবরটা সে জানে না। তার মাথা নাড়াবার ভঙ্গি দেখে এটাও বোঝা গেল যে, খবরটা না জানার জন্য সে একটুও লজ্জিত নয়।

অমনোযোগী ছাত্রকে পুরো ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য জ্যাঠামশাই এবার উঠেপড়ে লাগলেন : 'তুমি তো জানো দক্ষিণ মেরু আস্ত একটা মহাদেশ। উত্তর মেরু এলাকাটাও বিশাল। অথচ এই দুটো মেরু চিরকাল বরফে ঢাকা থাকে। মেরুর রহস্য জানার জন্যে কত অভিযাত্রী মেরু-অঞ্চলে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন, অথচ আজ পর্যন্ত কিছুই তেমন জানা যায়নি। এই দুটি মেরুর বরফ গলে গেলে বিশাল পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের হাতে এসে যাবে। তেল, কয়লা, লোহা, তামা, সোনা ইত্যাদি কত কিছু মজুত আছে ওই দুটো এলাকার মাটির নিচে। সেসব হাতে এলে পৃথিবীর মানুষ বহু বছর আরামে জীবন কাটাতে পারবে। এবার বলো, মরু এলাকায় বরফ গলে যাওয়ার মতো চমকপ্রদ খবর আর কী থাকতে পারে ?'

জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনতে শুনতে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর আশ্চর্যজনক এক চেহারা অনুর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। ও এবার লাফিয়ে উঠে বলল, 'সত্যি, দারুণ খবর !'

কিন্তু এই দারুণ খবরের পরিণতি যে কতখানি মর্মান্তিক হতে পারে সেটা জানা গেল পরদিন সকালে।

খবরের কাগজে চোখ রাখার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল গোটা কলকাতার লোক। তবে এই আতঙ্ক শুধু কলকাতার নয়, সারা পৃথিবীর। বিশেষ করে পৃথিবীর দুটি প্রান্তের।

মেরু-অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে প্রবল গতিতে। তার ফলে পৃথিবীর দুটি

মহাদেশে মহাপ্রলয় আসন্ন। মহাদেশ দুটি ধীরে ধীরে বরফগলা জলে ডুবে যাবে। তারপর এই দুটি এলাকায় গড়ে উঠবে নতুন মেরু-অঞ্চল—চিরতুষারের দেশ।

তীব্র জলস্রোত গ্রাস করতে চলেছে অস্ট্রেলেশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং উত্তর ইওরোপের বেশ কিছু দেশকে। হাহাকার পড়ে গেছে নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, বলিভিয়া, পেরু, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি দেশে। এইসব দেশের মানুষদের আর্ত চিৎকার আর কান্নায় বাতাস ভারি হয়ে উঠছে। গ্রিনল্যান্ড, সাইবেরিয়া, লেনিনগ্রাদ, নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি এলাকার মানুষেরা প্রাণভয়ে ছুটে চলেছে মধ্য ইওরোপ আর এশিয়ার দিকে। ত্রাণকার্য চলছে সর্বত্র, কিন্তু এই মহাপ্রলয়কে সামলাবার পক্ষে সে-কাজ ধরতে গেলে কিছুই নয়।

মহাপ্রলয়ে কলকাতার মানুষদের কোনও বিপদ হবে না, কিন্তু অজানা এক আতঙ্কে তারাও শিউরে উঠেছিল।

খুব দ্রুত খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে অনু ছুটল জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে। জ্যাঠামশাইয়ের ল্যাবরেটরিটা কেমন যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। তার মধ্যিখানে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন জ্যাঠামশাই। অনুকে দেখেই সম্পূর্ণ ভেঙে-পড়া মানুষের ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'আমি পারলাম না অনু, পারলাম না!'

'কী পারলে না?'

উত্তরে খসখসে গলায় জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমার গবেষণার একটা স্টেজ নিখুঁতভাবে কাজ করেছে, কিন্তু আর-একটা স্টেজ একেবারেই কাজ করল না।'

'কী সেটা?'

প্রশ্ন করার অনেক পরে উত্তর দিলেন জ্যাঠামশাই: 'আমি জানতাম পৃথিবী গ্রহের অবস্থান পালটালে উত্তর মেরুর সব বরফ গলে যাবে। আবার এও জানতাম, এই বরফগলা জলে পৃথিবীর অপর দুই প্রান্তে নতুন করে দুটো মেরু-অঞ্চল গড়ে উঠবে। সুতরাং আমার গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায় ছিল মেরু-অঞ্চলের সব বরফগলা জল কৃত্রিম উপায়ে বাষ্পে রূপান্তরিত করে মহাশূন্যে মিলিয়ে দেওয়া। সে-কাজ আমি করতে পারিনি অনু, আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।'

উত্তেজিত হয়ে অনু বলল, 'তোমাকে পারতেই হবে! জানো তো পৃথিবীতে মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে।'

'জানি।' এত ঠাণ্ডা গলায় জ্যাঠামশাই কথাটা বললেন যে, শুনলে পরে যে-কারও মনে হবে—ভয়ানক এই পরিণতির কথা তিনি অনেক আগে থেকেই জানতেন।

অসম্ভব ঠাণ্ডা গলার উত্তর শুনে অনুর উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। থমথমে মুখে ও বলল, 'সব জেনেশুনেও তুমি চুপ করে আছো। তোমাকে এক্ষুনি একটা ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'কী করে নেব, আমার আবিষ্কার আর কাজ করছে না।'

'তুমি চেষ্টা করে যাও।'

'এ এক-আধদিনের ব্যাপার নয়, বাকি জীবনটা আমি চেষ্টা করে যাব—কিন্তু তাতেও সফল হব কি না কে জানে! হয়তো ভবিষ্যতের কোনও বিজ্ঞানী এসে বাকি কাজ শেষ করবেন।'

উত্তেজনার চোটে অনুর মুখে প্রথমে কোনও কথা জোগাল না। তারপর ও কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'কিন্তু একটা কোনও উপায় তোমাকে বার করতেই হবে। পৃথিবীর কোটি

কোটি মানুষ এভাবে জলে ডুবে মরতে পারে না।'

'কিন্তু আমি কী করতে পারি!'

'তুমি পারো।'

দু'দিকে জোরে মাথা কাঁপাতে কাঁপাতে চেঁচিয়ে উঠলেন জ্যাঠামশাই, 'না, আমি পারি না, পারি না, পারি না!'

বাইরে ঝিরঝির করে বরফ পড়ছিল। দমকা হাওয়ায় কনকনে ঠাণ্ডা মাঝেমধ্যে ঢুকে পড়ছিল ঘরের মধ্যে। কিন্তু অনুর একটুও শীত করছিল না। ও ছেলেবেলায় একবার আসামের বন্যা দেখেছে। সেই বন্যার ভয়ঙ্কর চেহারা ওর চোখের সামনে ভাসছিল। আর খ্যাপা জলস্রোতের উৎকট গোঁ গোঁ শব্দ সমানে আছড়ে পড়ছিল ওর কানের ওপর। সামান্য একটা বন্যার চেহারাই যদি এই হয়, মহাপ্রলয় না জানি কী ভয়ঙ্কর! বরফগলা জলের সমুদ্রে দেশের পর দেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে!

প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে উঠল অনু, তারপর জ্যাঠামশাইকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'পৃথিবী গ্রহের অবস্থান তুমি তাহলে আগের জায়গায় নিয়ে যাও। কোটি কোটি মানুষকে এভাবে মেরে ফেলার কোনও অধিকার তোমার নেই।' গলার শিরা ফুলিয়ে কথাগুলো বলার পরেই ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল অনু।

সে-রাতে আর-একটা ভূমিকম্প হল কলকাতায়। এটাও মৃদু। কোথাও কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে মানুষজন ভীষণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। পৃথিবীর একপ্রান্তে মহাপ্রলয় চলছে, তার ওপর আবার এই ভূমিকম্প! পৃথিবীর শেষ দিন কি ঘনিয়ে এসেছে তাহলে!

কলকাতায় বরফ পড়া শুরু হওয়ার পর থেকে এই শহরের জীবনযাত্রা আমূল পালটে গিয়েছিল। কলকাতার ঘরে ঘরে এখন ফায়ারপ্লেস। সন্ধে হতে না হতেই অধিকাংশ বাড়ির জানলা দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেদিন শেষ রাতে শহরের ঘুমন্ত মানুষদের দম প্রায় বন্ধ হঠাৎ। ফায়ারপ্লেস থাকার ফলে ঘরের মধ্যে অস্বাভাবিক গরম। লাফিয়ে উঠে ঘরের জানলাগুলো সবাই খুলে দিল একটানে। তারপরেই অবাক করা দৃশ্য! কোথাও একবিন্দুও তুষার পড়ছে না, কুয়াশারও চিহ্ন নেই, আকাশে মস্ত হলুদ চাঁদ। এ তো সেই পুরোনো কলকাতার আবহাওয়া! চটপট করে ঘরের ফায়ারপ্লেসগুলো নিভিয়ে দিল সবাই।

সকালের চেহারাটাও পুরোনো কলকাতার মতো। কোথাও এককুচিও বরফ জমে নেই। নভেম্বরের কলকাতায় বরাবর যেমন হালকা শীত থাকে ঠিক সেইরকমের শীত সর্বত্র। বরফপড়া শহরটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে হঠাৎ!

সকালের খবরের কাগজে বিস্ময়ের পরে বিস্ময়। পৃথিবীর আবহাওয়া আবার আগের মতো হয়ে গেছে। মহাপ্রলয়ের সঙ্কট থেকে পৃথিবী মুক্ত। মেরু-অঞ্চলের বরফগলা বন্ধ হয়ে গেছে একদম। পৃথিবীর ইকুয়েটর ও ট্রপিক অফ ক্যানসার আর ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকর্ন আবার ফিরে এসেছে আগের জায়গায়। তার ফলে সব দেশেই এখন আবার আগের মতো আবহাওয়া। পৃথিবীর আবহাওয়ার এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনের মূলে ছিল নিছক প্রাকৃতিক খেয়াল।

শেষের খবরটায় চোখ পড়তেই বাঁকা একটা হাসি খেলে গেল অনুর মুখে। ও ছুটল জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে।

তছনছ করা গবেষণাগারের মধ্যে জ্যাঠামশাই কেমন যেন অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে ছিলেন। চোখমুখ একেবারে ফ্যাকাসে। অনুকে দেখেই উনি বললেন, 'তুমি ঠিকই

বলেছিলে, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলার কোনও অধিকার আমার নেই। আমি তাই—আমি পৃথিবীর আবহাওয়া আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে এনেছি।'

কৃতজ্ঞতায় অনুর গলার ভেতরটা এত ভার ভার হয়ে উঠেছিল যে, ও চট করে কোনও উত্তর দিতে পারল না। জ্যাঠামশাইয়ের ঠাণ্ডা হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঢোক গিলে বলল, 'আমি জানতাম। কাল রাত্তিরে ভূমিকম্প হওয়ার সময়ই টের পেয়েছিলাম তুমি আবার— ।'

জ্যাঠামশাই এ-কথার কোনও উত্তর দিলেন না। একটু বাদে অনু বলল, 'তুমি একদম মন খারাপ করবে না। তোমার মতো বিজ্ঞানী পৃথিবীতে আর একজনও নেই। তুমি তোমার গবেষণা চালিয়ে যাও। তোমার কাজে সারা পৃথিবীর লোকের ভীষণ উপকার হবে। তুমি— ।'

এ-কথাটারও কোনও উত্তর দিলেন না জ্যাঠামশাই। ঠিক আগের ভঙ্গিতেই বসে থাকলেন উনি। চোখমুখ আগের মতোই ফ্যাকাসে।

গবেষণাগারের বড় বড় জানলাগুলো খোলা। শীতের মিঠে রোদ খোলা জানলা দিয়ে মেঝের ওপর এসে পড়েছিল। জানলার বাইরে ঝকঝকে নীল আকাশ। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে ঝলমলে গলায় অনু বলল, 'আমাদের এই কলকাতাই ঢের ভালো।' তারপর কী যেন মনে পড়ে যেতেই হইহই করে উঠল : 'ওহ্! আজ কত তারিখ? তেইশ, না? তার মানে আজ থেকে ঠিক এগারো দিন বাদে ব্রাজিল পুরো টিম নিয়ে কলকাতায় খেলতে আসছে। ভাগ্যিস, মহাপ্রলয়ে ব্রাজিল ভেসে যায়নি! ও জ্যাঠামশাই, তুমি খেলা দেখতে যাবে না? যাবে তো?'

জ্যাঠামশাই এবারও কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু মুখ খোলাবার জন্য ওঁর হাত ধরে ঝুলোঝুলি শুরু করে দিল অনু : 'কী? যাবে তো? যাবে না? তুমি তো কালো মানুষদের খুব ভালোবাস। যাবে তো ওদের খেলা দেখতে? যাবে না? কথা বলছ না কেন? যাবে তো?'

শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হল জ্যাঠামশাইকে। মৃদু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ যাব।'

☐ ১৯৮৪





জানলার বাইরে শালগাছ

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় গ্রামের স্কুলে নকুলবাবুস্যার একটা কথা বলতেন। কিছু গাছ আছে, যাদের আয়ু মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। মানুষ যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখনও ওই গাছগুলোর শৈশব কাটে না। অর্থাৎ মানুষের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে যে-ক'টা বছর লাগে, সেই ক'টা বছর কিন্তু গাছগুলো শৈশবের মধ্যেই থেকে যায়।

নকুলবাবু তখন দু-একটা গাছের নাম করতেন। ভুবনডাঙা হাইস্কুলের পিছনেই ছিল একটা শালের জঙ্গল। ক্লাস টেনের ঘরের জানলা থেকেই ওই শালগাছগুলো দেখা যেত। লাল মাটিতে ছায়া ফেলে গাছগুলো সোজা দাঁড়িয়ে থাকত, আর আকাশের আলো-হাওয়া গায়ে মাখত অকাতরে। ক্লাসের বাইরে অজুর চোখ মাঝেমধ্যেই চলে যেত ওই শালগাছগুলোর দিকে। ওর কেবলই মনে হত, গাছগুলোর ছায়াও সবুজ। হয়তো গাছগুলো ওদের জীবনীশক্তির অনেকটাই লাল মাটিকে ধার দিত। অজুর মনে হত, মাটির রঙ আর লাল নয়। সবুজ।

নকুলবাবু অবশ্য বলতেন, এক-একটা গাছ এক এক রকম আবহাওয়ায় বড় হয়। সব গাছ সব জায়গায় জন্মায় না। মাটিরও একটা গুণ থাকে। তবে শুধু মাটির গুণ থাকলেই তো হল না, গাছকেও বড় হতে হয় নিজের গুণে। যেভাবে মানুষ বড় হয়, সেভাবে গাছকেও বড় হতে হয়। একটা করবীগাছ কিংবা দোপাটিগাছের চেয়ে শালগাছের শক্তি যে অনেক বেশি তা নিশ্চয়ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না। এসব নকুলবাবুর কথা। আজও ওই কথাগুলো ভোলেনি অজু।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন ওই নকুলবাবু। স্কুলে ইংরেজি পড়াতেন। কিন্তু ইংরেজি গ্রামার পড়াতে পড়াতে তিনি যে কখন কোন বিষয়ে কথা বলবেন, রীতিমত গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু করে দেবেন তা ছাত্ররা কেউ আগে থেকে টের পেত না। তবে জানত, নকুলবাবু বাঁধাধরা কোনও বিষয়ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চান না। ইংরেজির ক্লাসই তাই হয়তো কোনওদিন হয়ে উঠত বটানির ক্লাস। কোনওদিন হয়তো মহাকাশবিজ্ঞান নিয়েই আলোচনা শুরু করে দিতেন নকুলবাবু। কখনও আবার বায়োলজি নিয়ে। জীবনবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান—সব বিষয়েই ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত। সবচেয়ে বড় কথা, নকুলবাবু যে-কথাটাই বলতেন সেটাই ছিল মন দিয়ে শোনার বিষয়। ছেলেরা সবাই তাই ওঁর ক্লাসই

বেশি পছন্দ করত। ক্লাস শুরু হওয়ার পরে কী করে যে পিরিয়ডটা কেটে যেত তা কেউ বুঝতেও পারত না। ঘণ্টা পড়লে সবার সংবিৎ ফিরে আসত। ছাত্রদের আগাগোড়া মুগ্ধ করে রাখার এরকমই একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল নকুলবাবুর।

নকুলবাবুর কাছে সব ছাত্রই সমান মনোযোগ পেত। তবু এরই মধ্যে অজুর প্রতি তাঁর ছিল যেন এক বিশেষ মমতা। এর কারণও আছে। ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র অজুই স্কুল ছুটির পর নকুলবাবুস্যারের কাছে গিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন করত। স্যার বিরক্ত না হয়ে যতটা সম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আর কোনও প্রশ্নের উত্তর যদি তাঁর অজানা থাকত তাহলে তিনি তা হাসিমুখেই স্বীকার করে নিতেন। বলতেন, 'আমি আর কতটুকু জানি রে! বড় হলে তুই নামকরা বিজ্ঞানী হবি। কিংবা হবি নামকরা সাহিত্যিক। সৃষ্টির উৎস খুঁজে বেড়াচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। গবেষণাগারে চলছে তাঁদের নীরব সাধনা। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই ওঁদের মনের ভেতরটায় কী তোলপাড়ই না চলছে। সেইরকমই এই সাহিত্যিকরা। মানুষের মুখে দুঃখের কারণগুলো যেভাবে ওঁদের ভাবিয়ে তোলে, সেভাবে তলিয়ে আর কাউকেই ভাবতে দেখা যায় না। যাঁরা সত্যিকারের সাহিত্যিক আমি তাঁদের কথাই বলছি। তুই ওঁদের মতোই হবি।'

অজু একদিন ওঁকে প্রশ্ন করেছিল, 'আমি পারব তো, স্যার?'

'পারবি না মানে? পারতেই হবে। শুধু তুই কেন, আমি তো চাই আমার সব ছাত্রই একদিন বড় বিজ্ঞানী হবে, সাহিত্যিক হবে। কার মধ্যে যে কী প্রতিভা লুকিয়ে আছে—'

অজু স্যারকে সেদিন আর কোনও কথা বলেনি। নিজেকে শুধু মনে মনে বলেছিল, 'স্যার যে আশায় বুক বেঁধেছেন, আমি যেন তা পূর্ণ করতে পারি।'

ভুবনডাঙা হাইস্কুল থেকে বেশ কয়েকটা লেটার নিয়ে পাশ করেছিল অজু। ওর বাবাকে গ্রামের লোকেরা বলেছিল, 'ও যা রেজাল্ট করেছে তাতে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার কোনওটা হতেই বাকি নেই। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষাটা দিতে বলুন। আমরা চাই আমাদের অজু ডাক্তার হোক। গাঁয়ে তো ডাক্তার নেই। পাশ করে এখানে এসে বসলে রুগীর অভাব হবে না। আশপাশের দশ-বিশটা গাঁয়ের রুগীরাও ভিড় করবে ওর ডাক্তারখানায়।'

অজুর বাবা বিনয়বাবু বলেছিলেন, 'ছেলের যা মন চায় করবে। ওর যদি ডাক্তারি পড়তে ভালো লাগে তা'ই পড়বে। ওর মা বলেছে, অজুর ওপর আমরা যেন কোনও ভার চাপিয়ে না দিই। আপনারাই বরং কথা বলুন অজুর সঙ্গে।'

'অজুর সঙ্গে আমরা কথা বলব? ও তো চুপচাপ থাকে! কারও সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, আমাদের কাউকে চেনে বলেও মনে হয় না।' গ্রামের লোকেরা ফিরে যাওয়ার সময় বলেছিল।

অজু কলকাতার সাদামাটা একটা কলেজে বটানিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হল। ভুবনডাঙা স্কুলের ক্লাসরুম থেকে দেখা শালজঙ্গলের ছবি ওর মনের মধ্যে গেঁথে আছে। সবুজ সতেজ এক-একটা গাছ, আর তার ছায়াও যেন সবুজ। কলকাতার কলেজের ক্লাসরুমের জানলা দিয়ে অবশ্য শালগাছের বন দেখা যায় না। বিবর্ণ, ধূসর, সারি সারি কয়েকটা বাড়িঘর ছাড়া এখানে দেখারও কিছু নেই। ফুটপাথে একটা কৃষ্ণচূড়াগাছ আছে, তবে ক্লাসরুমের জানলার ফ্রেমে সে এসে ধরা দেয় না। কলেজে আসা যাওয়ার পথে অজু দেখেছে নিঃসঙ্গ ওই কৃষ্ণচূড়াগাছটাকে। মানুষ যদি তাকে কিছুটা সঙ্গ দিত, গাছ হয়ে যদি ওর পাশে দাঁড়িয়ে পড়ত। তা হয় না। এসব আজগুবি চিন্তা মাথার মধ্যে না রাখাই ভালো। তবে যে-দৃশ্যটা ওকে খুবই কষ্ট দেয় তা হল, ফুটপাথে সারি সারি ইটের অনেক ঘেরাটোপ আছে।

গাছের জন্যই ওগুলো তৈরি। যাতে গাছগুলো কেউ নষ্ট করে না দেয় তার জন্যই এর আয়োজন, কিন্তু যার জন্য এত আয়োজন সে-ই নেই। গাছ হয়তো লাগানো হয়েছিল, অযত্নে মরে গেছে।

বটানির ক্লাসেই সে একদিন জানতে পারল ডায়াটম-এর কথা। শ্যাওলার মতো বিচিত্র এই গাছ। তবে তার রঙ সবুজ নয়। বাদামী। জলে জন্মায়। এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় চলাফেরা করতে পারে। সব গাছই যদি ওই ডায়াটমের মতো হত! কেউ আক্রমণ করতে এলে যদি পালাতে পারত! অজু ভাবল।

আজকাল এ-ধরনের উদ্ভট নানা চিন্তাই ওর মাথায় আসে। তবে খুব বেশিক্ষণ ও এই সব চিন্তাভাবনা নিয়ে মাথা ঘামায় না। ছেলেবেলায় কোনও কিছু একবার মাথায় ঢুকলে আর নিস্তার ছিল না। নকুলবাবুস্যারের কাছ থেকে উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত নাওয়া-খাওয়াই সে ভুলে যেত। এখন অবশ্য ওরকম হয় না। অজু বড় হয়ে উঠছে, এটা তারই লক্ষণ। অবাস্তব চিন্তাভাবনা মাথায় ভিড় করতেই পারে, কিন্তু তা নিয়ে কাতর হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে ফিরে নকুলবাবুর সঙ্গে অজু দেখা করতে গেলে উনিও কথায় কথায় এই পরামর্শই দিয়েছিলেন।

'দেখ, মানুষের চিন্তার কোনও লাগাম নেই। তবে বাছ-বিচার করতে হবে। হঠাৎ এক-একটা আইডিয়া এসে যেতে পারে। কোনওটা তোমাকে নতুন পথে চলার রসদ জোগাবে, কোনওটা বিভ্রান্ত করবে, মনের মধ্যে সৃষ্টি করবে সংশয়, এটা তোমাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। যেসব আইডিয়া তোমার কোনও কাজে লাগবে না, সেগুলোকে বেমালুম বাতিল করবে।'

'কিন্তু কোনও আইডিয়াই এখনও পর্যন্ত আমার মগজে আসেনি। উদ্ভট কল্পনা তো আর আইডিয়া নয়।' অজু বলল।

'কী করে বুঝলে তুমি যা ভাবছ সেটা উদ্ভট?'

'এই ধরুন সেদিন আমি গাছদের কথা ভাবছিলাম। কেউ আক্রমণ করলে ওরা যদি পালাতে পারত!'

নকুলবাবু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। তারপর এক সময় বললেন, 'ভাবিয়ে তুললে দেখছি। যদি পালাতেই পারে, তাহলে দরকারের সময় হাঁটাচলা করবে না কেন?'

'তাও তো ঠিক। অথচ দেখুন, চলমান গাছের কথা ভাবাই যায় না।' অজুর মনের সংশয় গলার স্বরে ফুটে উঠেছে।

'এখন হয়তো ভাবতে পারা যায় না। গাছ হাঁটছে, বা হাঁটতে পারে কথাটা কাউকে বললে সে হয় অবাক হবে, না হয় আমাদের ভাববে পাগল, তাই না? কিন্তু চিন্তা করতে দোষ কি! হঠাৎ যদি একটা আইডিয়া এসে যায়, আর সেই আইডিয়া অনুযায়ী আমরা গবেষণার কাজ শুরু করে দিই?'

'আগে থেকে স্থির কোনও ধারণার বশবর্তী হয়ে গবেষণা করা যায় না।'

'বাস্তবের কিছু বিষয়, ঘটনা বা পদার্থের সুদূর সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখাই গবেষকের একটা বড় কাজ। ঠিক বললাম কী? নাঃ, আজ সত্যিই তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে।'

অজু উঠে দাঁড়াল: 'স্যার, আজ আসি।'

'যে-ক'দিন আছো, একবার করে দেখা দিয়ে যেয়ো। তোমাদের মতো ছেলেদের ছাত্র হিসেবে পাওয়া তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আচ্ছা ধরো, কেউ আক্রমণ করলে কিংবা

প্রাণসংশয় হলে গাছদের পালাতে হবে কেন ? ওরা কি পালটা আক্রমণ করতে পারবে না ? বিষয়টাকে যদি আমরা এদিক থেকে দেখি ?'

'তার মানে ?'

'মানে আর কিছুই নয়। গাছদের তখন আর চলমান হওয়ার দরকার হবে না। ওরা এমন একটা ডিফেন্স মেকানিজম তৈরি করবে যে কোথাও না পালিয়ে স্রেফ এক জায়গাতে দাঁড়িয়েই ওরা হামলার যোগ্য জবাব দিতে পারবে। যেমন ধরো, কোনও গাছকে কেউ কুড়ুল কিংবা অন্য কোনওধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করল। তখন যদি গাছের দেহ থেকে কোনও অদৃশ্য রাসায়নিক বাষ্প বেরিয়ে এসে আক্রমণকারীকে আচ্ছন্ন অবশ করে দেয়—'

'সবটাই আজগুবি মনে হচ্ছে। উটকো একটা কথা হঠাৎ আমার মাথায় এসেছিল। সেটাই আপনাকে বললাম। এতটা গুরুত্ব দেওয়ার বোধহয় কিছু নেই।'

'আমিও ঠিক গুরুত্ব দিচ্ছি না, তবে কিনা চিন্তাটাকে মাথা থেকে তাড়াতেও কষ্ট হচ্ছে। এই ধরো, আমার গবেষণার কথা—'

'আপনি রিসার্চ করছেন ?' অবাক হল অজু।

'কেতাবি ভাষায় তোমরা যাকে রিসার্চ বলো তা কিন্তু নয়।'

'গবেষণা আর রিসার্চ তো একই কথা।'

'গবেষণা করার মতো আমার আর কী বিদ্যে আছে বাপু ! থাকগে ওসব কথা। বাড়ি যাও। মা খাবার নিয়ে বসে থাকবেন।'

'কী নিয়ে গবেষণা করছেন বলুন না, স্যার।' অজুর আন্তরিকতার পরিচয় নকুলবাবুস্যার আগেও পেয়েছেন। কিন্তু আজ যেন আরও বেশি করে অজুর জন্য ওঁর মমতা হল। 'আহা, কচি ছেলেটা অতবড় মুখ করে আমার কাছে জানতে চাইছে আর আমি মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকব ? তা হয় না।' নিজেকে বললেন নকুলবাবুস্যার।

কিন্তু কথাটা আবার মুখ ফুটে বলতেও দ্বিধা হচ্ছে। কেমন যেন কুঁকড়ে গেছেন নকুলবাবুস্যার।

অজু ভাবল, স্যার লাজুক। কিন্তু এখন কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছেন। মনে মনে হয়তো কষ্ট পাচ্ছেন, ভাবছেন গবেষণার কথাটা না বললেই ভালো হত।

'স্যার, আপনি এরকম করছেন কেন ? আমাকে কি বলার অসুবিধে আছে ? বলুন না, আমি না হয় কথাটা গোপন রাখব।'

'গোপন রাখার কিছু নেই। কারণ একদিন কোনও কিছুই গোপন থাকবে না। তখন আর আমার মুখ ফুটে বলারও দরকার হবে না। পারবে ততদিন অপেক্ষা করতে ?'

'আপনি বললে, অপেক্ষা আমাকে করতেই হবে। কিন্তু—'

'তোমার যখন এত কৌতূহল, শোনো। মনে পড়ে, তোমাদের একটা কথা বলতাম ? কিছু গাছ আছে যাদের বয়েস মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। মানুষের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে যে-ক'টা বছর লাগে, সেই ক'টা বছর কিন্তু গাছগুলো শৈশবের মধ্যেই থেকে যায়। মনে পড়ে, এরকম আরও কত কথাই বলেছি ?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার গবেষণার কী সম্পর্ক ?'

'আর বুঝি তর সইছে না ? সব কথা এক নিমেষে জেনে নিতে চাও ?'

অজু চুপ করে থাকল। নকুলবাবুস্যার এতক্ষণ নড়বড়ে একটা চেয়ারে বসে কথা বলছিলেন। এবার উঠে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়ালেন। শালবনের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ পর বললেন, 'আমার বাগানটা দেখেছ ?'

বাগান পেরিয়ে নকুলবাবুস্যারের বসার ঘরে আসতে হয়। অজু দেখেছে, কচি কয়েকটা শালগাছ বাগানে ঝলমল করছে। বাগানে আরও অনেক গাছ আছে। কিন্তু শালগাছগুলো অনেক বেশি তাজা, অনেক প্রাণবন্ত।

'দেখেছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। কয়েকটা শালগাছের চারা দেখেছি।'

'ওদের বয়েস কত জানো ?'

কী বলবে অজু ? আন্দাজে কোনও কথা সে বলতে চায় না। সেরকম স্বভাবই ওর নয়।

'এই যে বনের পর বন কেটে ফেলা হচ্ছে, নতুন বন সৃষ্টি করতেও তো সময় লাগবে। ততদিনে কী অবস্থা হবে ভেবেছ ? গাছ বাড়তেও তো সময় লাগে। আর কচি চারাগাছ বৃষ্টি এনে দেবে, পৃথিবীকে সুজলা সুফলা করবে, এটা ওদের কাছ থেকে খুব বেশি চাওয়া নয় কী ?'

'ঠিক কথা, স্যার।'

'যা করার চটপট করতে হবে। সময় নেই।'

'কিন্তু আপনার গবেষণার কথা বলুন—'

'এটাই তো আমার গবেষণা। বললে না তো, বাগানের শালগাছের চারাগুলো দেখে ওদের বয়েস কিছু টের পেলে ?'

'না, স্যার।'

'যদি বলি, মাত্র চার ঘণ্টা, তাহলে বিশ্বাস করবে ?'

'চার ঘণ্টা ? বলেন কী, স্যার ? চার ঘণ্টার গাছ এতবড় হয় ?'

'বিশ্বাস করলে না তো ! কিন্তু কথাটা সত্যি। কাল এসে দেখবে গায়ে-গতরে ওরা আরও কতটা বেড়ে উঠেছে।'

'তার মানে ?'

'এই যে বোতলের সবুজ পদার্থটা দেখছ ?' র‍্যাক থেকে একটা মোটা বড় বোতল এনে নকুলবাবুস্যার অজুকে দেখাচ্ছেন। অজু এই প্রথম তাকিয়ে দেখল, পুরোনো র‍্যাকটা বোতলে ঠাসা। নানা আকারের বোতল। তার মধ্যে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, নানা রঙের তরল পদার্থ।

'ভাবছ, ইংরেজি-স্যার কী করে গবেষণা করছেন, এই তো ?' ভাবছ যে, স্যারের গবেষণা করার কোনও বুদ্ধিই নেই ? কিন্তু যদি বলি ওই লাল নীল হলুদ সবুজ তরল পদার্থগুলো আমার আবিষ্কার, অবাক হবে ?'

স্যারের সব কথা শোনার আগেই অজু ছিটকে বাগানে গিয়ে দাঁড়াল। শালগাছের চারাগুলো যেন চোখের নিমেষে আরও বড় হয়ে উঠেছে। সে যখন স্যারের বৈঠকখানায় ঢুকেছিল তারপর থেকে কতটা সময়ই বা কেটেছে। আধ ঘণ্টা ? এক ঘণ্টা ? এর বেশি নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই গাছগুলো প্রত্যেকে প্রায় এক ফুট লম্বা হয়ে উঠেছে।

'স্যার, এ তো দারুণ আবিষ্কার !' আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠল অজু। কিন্তু নকুলবাবুস্যারকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন ? ওঁরও তো খুশিতে ঝলমল করে ওঠার কথা। উনি না হয় চাপা স্বভাবের মানুষ ! আনন্দে হইহট্টগোল করতে পারেন না। তা বলে এমন বিষণ্ণ থাকবেন !

'স্যার, স্যার, আপনি কিছু বলছেন না কেন ? আমি আপনার গবেষণার ফল হাতেনাতে

দেখলাম। আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন।'

'দুর ছাই, কী সব বাজে কথা বলছিস! আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওদের পনেরো বছর বয়েসে পৌঁছে দিতে পারি। কিন্তু তারপর? আর আমি পারছি না রে অজু, আর আমার সাধ্যে কুলোচ্ছে না। ওদের যদি চটজলদি সাবালক করে তুলতে পারতাম!'

'পনেরো বছর বয়েসের পর ওদের বৃদ্ধি কি স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে? অর্থাৎ ওরা যেভাবে ধীরেসুস্থে বাড়তে থাকে, সেইভাবেই বাড়বে?'

কোনও কথা বলছেন না নকুলবাবুস্যার। সবুজ রঙের তরল পদার্থ ভরা বোতলটা উনি যথাস্থানে রেখে এসে এখন আবার জানলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। লাল মাটিতে সবুজ ছায়া ফেলে শালগাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে জানলার বাইরে। পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় বড় হয়ে উঠছে।

□ ১৯৮৯





কম্পি বড় ভালো মেয়ে

সুব্রত সেনগুপ্ত

কম্পি বড় ভালো মেয়ে। তাকে যখন যা করতে বলা হয়, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়। যা পায় তাই পরে। ভালো খাব, ভালো পরব বলে উৎপাত করে না। সে কখনও কারও সঙ্গে ঝগড়া করে না।

কম্পি বড় ভালো, কিন্তু এতটা ভালো হওয়া ভালো কি না আমার মাঝে মাঝে তাতে সন্দেহ হয়। কম্পি সব সময় সত্যি কথা বলে। মানে সে যে-কথাটা সত্যি বলে জানে, সেটাই বলে। যত শক্তিমান আর প্রভাবশালী লোক সম্পর্কেই হোক, আসল কথা কম্পি কখনও গোপন করে না। সেজন্য কখনও যে বিপদে পড়তে হয় না তা নয়। কিন্তু সবাই জানে সত্যি কথা বলা একটা গুণ। কাজেই কম্পির গুণ স্বীকার করতেই হবে।

কম্পির আরও অনেক গুণ আছে। যেমন, সময়-জ্ঞান। দম না দেওয়ায় আমার হাতের ঘড়ি ভুল সময় দেখাতে পারে। কিন্তু কম্পির ভুল হয় না। সে যদি বলে ছ'টার সময় আমার বাড়িতে আসবে, সে ঠিক পাঁচটা বেজে ষাট মিনিটেই আসবে। কিছুতেই একষট্টি মিনিট হবে না। কী করে পারে কে জানে! হয়তো যখন আসার কথা তার আগেই সে এসে পড়ে। এসে অপেক্ষা করে। তারপর সময় হতেই সামনে এসে হাজির হয়। কিন্তু যাই হোক, আমি তার সঙ্গে তাল দিয়ে পারি না। প্রায়ই আমার দেরি হয়। নিজের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও দেখা করার থাকলে আর দেরি করে পৌঁছলে দেখি, কম্পি চলে গেছে। তখন আমার মনে পড়ে ওর পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার কথা ছিল। পনেরো মিনিট ও নিশ্চয়ই ছিল। আমার তার চাইতে বেশি দেরি হয়েছে। জানা কথা, পনেরোর জায়গায় ও ষোলো মিনিট কিছুতেই থাকবে না। হতে পারে, ওর হাতে তখন আর কোনও কাজ নেই। তবু ও বেশি সময় অপেক্ষা করবে না। দরকারটা ওর পক্ষে কি আমার পক্ষে যত জরুরিই হোক, ও যতক্ষণ থাকার কথা তার চেয়ে বেশিক্ষণ কিছুতেই থাকবে না। এতে ওর ওপর রাগ করা যাবে না। কারণ সবাই জানে, সময়ানুবর্তিতা খুব ভালো জিনিস।

আমার কম্পি শুধু গুণে নয় রূপেও চমৎকার। তার মাথার চুল থেকে পায়ের নখে কোথাও কোনও খুঁত নেই। কম্পি রোগা নয়, মোটাও নয়। বাড়াবাড়ি রকমের লম্বা নয়, বেঁটে তো নয়ই। চমৎকার তার গলার স্বর, চমৎকার তার শরীরের গড়ন। এমন গড়ন—কোথাও এতটুকু মেদ নেই। যেখানে যে-বাঁক যেভাবে থাকা দরকার ঠিক তাই

আছে। তার বুক, কোমর আর কোমরের নিচের অংশের মাপের অনুপাতও ভারি চমৎকার—কিন্তু এ নিয়ে আর বেশি কিছু বলব না। শরীরের যেসব জায়গা ঢাকা থাকে তা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করলে লোকে নিন্দে করে, মন্দ বলে।

কম্পি অবশ্য তাতে কিছু বলবে না। সে কখনও কোনওরকম অভিযোগ করে না। ওকে নিয়ে এই এক সুবিধে। ও ঘ্যানর ঘ্যানর করে না। ও মন খারাপও করবে না। কম্পির কখনও ওসব খারাপ হয় না।

কিন্তু আমার মন, কখনও কারণে কখনও অকারণে, খারাপ হয়ে যায়। তখন কী করতে হবে কম্পি জানে। ও একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত, একটা অতুলপ্রসাদী, দ্বিজেন্দ্রগীতি একটা, রজনীকান্তের গান একটা, এরকম আরও অনেকরকম গান একটা করে জানে। তার মধ্যে নিধুবাবুর টপ্পা, ঠুংরি, এমনকি একেবারে আধুনিকও আছে। আমার মন খারাপ হলে আমি যে-গানটা শুনতে চাইব কম্পি সে-গানটাই শোনাবে। অনেক কবিতাও ওর মুখস্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' থেকেও ও অনেকটা মুখস্থ বলতে পারে।

এই আমার প্রেমিকা কম্পি। তাকে এককথায় বলা যায়, মডেল প্রেমিকা। একটা মেয়ের যতরকম গুণ থাকতে পারে কম্পির মধ্যে তার সবগুলোই আছে।

আর-একটা কথা সবার সামনে বলতে লজ্জা করছে, প্রেমে কম্পির বে নও তুলনা নেই। এখনই বহু-আগে-দেখা উত্তরা নামে একটা মেয়ের কথা মনে পড়ছে। তার সঙ্গে একদিন সকালে আলাপ হল। দুপুরে আমরা একসঙ্গে সিনেমা দেখতে গেল,ম। বিকেলে একটা দোকানে চাইনিজ খাওয়ার পর সে ফিরে যাওয়ার আগে আড়ালে নিয়ে গিয়ে যেই তাকে একটু আদর করতে গেছি অমনই,'ও কী, ও না না' করে উঠল। কেন রে বাপু, তুই এতক্ষণ একটা ছেলের সঙ্গে কাটালি। দেখছিস এক পা, এক পা করে দু'জন দু'জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিস। একটার পর আর-একটা ঘটছে, তখন কোনও আপত্তি নেই, তবে এখন না না করা কেন ? তুই জানতিস না এরকম কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে ? ন্যাকা ! আরও অবাক কাণ্ড, না না করার পর একটু জোর করতেই মেয়ে যেন গলে পড়লেন। যেন দেহে বল নেই। এ আবার কী ! আমার কম্পি মোটেই এরকম নয়। তাকে আদর করার সময় সে পালটা আদর করতে জানে। আমি তাকে কাছে টেনে দু' হাতে জড়িয়ে ধরলে সে জানে তাকে শুধু গা ছেড়ে দিলে চলবে না। তাকেও দু' হাতে জড়িয়ে ধরতে হবে। তারপর আমি তার চমৎকার ঠোঁটে—যাক এসব একেবারে দু'জনের কথা, অন্যের কাছে বলতে নেই।

কিন্তু কখনও কখনও কম্পিকে নিয়ে অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয়। তার জন্যে তাকে যে দায়ী করা যায় তা নয়। তবে অস্বস্তি অস্বস্তিই।

সেদিন লিন্ডসে স্ট্রিটে একটা দোকানে গিয়েছি কম্পিকে নিয়ে। বাছাবাছির পর একটা ম্যাক্সি ভারি পছন্দ হয়েছে। ওর হাতে দিয়ে বললাম, 'দেখ তো, তোমাকে কেমন মানায় ?'

আমি ভেবেছি, মেয়েরা যেভাবে কাঁধ থেকে শাড়ি ঝুলিয়ে দেখে কম্পিও তাই দেখবে। আর নেহাত পরে দেখার ইচ্ছে হলে, ওই তো ছোট্ট ট্রায়াল রুম আছে, সেখানে ঢুকে ম্যাক্সিটা পরবে। কিন্তু কম্পি এসব কিছুই না করে এক ঘর লোকের সামনে ফস করে শাড়ি খুলে ফেলে, ব্লাউজ খুলতে আরম্ভ করল। তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে বললাম, 'ছিঃ, করছ কী ?'

ও বলল, 'কেন তুমিই তো বললে, কেমন মানায় দেখতে ?'

আমি রেগে বললাম, 'বলেছি তো কী হয়েছে, তোমার একটুও লজ্জা নেই ?'

নির্বিকার মুখে কম্পি জিজ্ঞেস করল, 'লজ্জা কী ?'

মুহূর্তে আমার রাগ পড়ে যায়। লজ্জা কী তা তো কম্পি জানে না। ও লজ্জা পেতে শেখেনি। কোমল গলায় বললাম, 'ঠিক আছে। লক্ষ্মীটি, জামা-শাড়ি ঠিক করে নাও।'

ম্যাক্সি আর কেনা হল না। কম্পি শাড়ি-জামা ঠিক করার পর ওর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলাম।

এরকম অস্বস্তির ঘটনা আরও ঘটে। এতক্ষণে আপনারা যা ভাবতে শুরু করেছেন কম্পি কিন্তু তা নয়। সে মোটেই যন্ত্রমানবী নয়। কম্পি রক্তমাংসের মেয়ে। তবে কম্পি একা নয়। তার মতো আরও মেয়ে আছে। ছেলেও আছে। কম্পির আগে হয়তো কম্পির মা নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করেছে। তার আগে কম্পির দিদিমা, দিদিমার মা আরও আগে। এ ভাবে ধাপে ধাপে কম্পি কম্পি হয়েছে। কম্পিরা কম্পিদের মতো। কিন্তু আমি যে আবার আমার মতো।

'ও কম্পি, এসে গেছ ? তোমার কথাই হচ্ছিল—এই দেখুন কম্পি এসেছে। না, ওকে হাসিমুখে নমস্কার জানাবেন না বা কী খবর-টবর জিজ্ঞেস করবেন না। ওসব ভদ্রতা-টদ্রতা, সৌজন্য-বিনয়ের ও ধার ধারে না। কী, কম্পি ঠিক বলেছি ? আচ্ছা, উত্তর না দাও একটু হাসো না। হাসতে পয়সা খরচ হয় না।'

কম্পি কী ভেবে উত্তর দিল, 'খরচ না হোক অকারণে হাসব কেন ?'

'ওহ্। তোমার সব কিছুতেই একটা কারণ চাই।'

'চাইব না ! কারণ ছাড়া কেউ কিছু করে ?'

'কী জানি।'

'কী জানি কেন ? তোমার যত ভাবালুতা।'

'হবে। আমি যা, আমি তাই। এতে আমার কোনও দোষ নেই।'

'আমি অকারণে কাউকে দোষ দিই না।'

'জানি।'

'জানো ? তবে বলো তো আমি যে সব বুঝে চলি, চলার চেষ্টা করি, সেটা খারাপ ?'

'খারাপ কে বলল ?'

'তবে ফোনে তুমি ও-কথা বললে কেন ? আমার জ্বর হয়েছিল সে-কথা তোমাকে জানাইনি ঠিকই। কিন্তু তুমি বলো, অসুখের কথা তোমাকে জানানোর চাইতে ডাক্তারকে জানানো বেশি জরুরি কি না ? আর তোমার সঙ্গে সাতদিন দেখা না হলে পাগল হতে যাব কেন ? আমি বুঝব, তুমি কাজে আটকে গেছ। তোমারও সেরকম ভাবা উচিত।'

'শুধু উচিত দিয়ে জীবন চলে ?'

'চলা উচিত। ওরকম আবেগেরও কোনও মানে হয় না।'

'কম্পি, আমি সামনের সপ্তাহে জাপানে চলে যাচ্ছি।'

উদ্বেগ বা অভিমানের কোনও ছায়া কম্পির মুখে পড়ে না। স্থির চোখে সে আমার দিকে তাকায়। সহজ গলায় প্রশ্ন করে, 'কেন ?'

বলি, 'অফিস থেকে আমায় পাঠাচ্ছে। ওখানে একটা সমীক্ষা হবে।'

কম্পি নিশ্চিন্তে বলে, 'ও। কতদিনের জন্যে ?'

'ছ-সাত মাস। এক বছরও লাগতে পারে।'

'কবে যাবে ?'

'কাল।'

'ও। ঠিক আছে। আমি তাহলে চলি। পনেরো মিনিট সময় নিয়ে এসেছিলাম। সময়

হয়ে গেছে।'

ব্যাস. আর কিছু না। কম্পির চোখ ছলছল করে না। কারণ সে বুদ্ধিমতী। কারণ সে সব কিছু বুঝে চলে। কম্পি গটগট করে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হয়, আমার থাকা না থাকায় ওর কিছু যায় আসে না। ওকে ডেকে বলি, 'জাপান থেকে আমাকে কানাডায় পাঠাতে পারে। ওখানে আমাকে স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়ার কথাও হচ্ছে। এখনও ঠিক হয়নি অবশ্য।'

কম্পি বলে, 'ও। কী ঠিক হয় আমায় জানিয়ো।'

কম্পি চলে যায়। ঠিকই তো, অফিসের কাজে যেতে হবে, কাজেই বলার কী থাকতে পারে ? কম্পি অবুঝ মেয়ে নয়। কিন্তু—'

পরের দিন সকালে জাপানের প্লেনে চেপে বসি। কম্পি কি আসবে ? আসাটা ওর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কি না জানি না। আমার হয়তো অকারণেই কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে থাকে। আমি তো কম্পির মতো নই। সেজন্যেই সব অর্থহীন মনে হয়। আপনাদের বলা হয়নি, আমি কম্পির মতো রক্তমাংসে তৈরি হইনি। আমাকে, মানে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি এই যন্ত্রের মানুষকে, একশো বছর আগে যাঁরা তৈরি করেছিলেন একশো বছর পরের অবস্থা তাঁরা আঁচ করতে পারেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন, মানুষের অনুভূতি থাকে। নিখুঁত যন্ত্রমানবেরও তা থাকা দরকার। তাই আমার মাথার পিছনে ছোট্ট অনুভূতির কোষ তৈরি করা হয়েছিল। যার ফলে একশো বছর আগের মানুষের মতো আমার মধ্যে আবেগের জন্ম হয়, ভাবের উদয় বিলয় ঘটে। আমার স্রষ্টারা জানতেন না পরের কালের মানুষরা ছুটতে ছুটতে, গতি বাড়াতে বাড়াতে অনুভব ইত্যাদি বাহুল্য মনে করে ছুড়ে ফেলে দেবে। কে বুঝবে আমার অবস্থা ! আমি কী করব আমার আবেগ নিয়ে ? নাকি আমিও অনুভূতির কৃত্রিম কোষ ফেলে দিয়ে কম্পিদের দলে যোগ দেব ?

হঠাৎ দেখি, কম্পি হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছে। আর ঠিক তখনই প্লেনটা ওড়ার জন্যে দৌড়তে শুরু করল। ওর তো দেরি হয় না। কী জানি কী কারণে কম্পি দেরি করে ফেলেছে।

□ ১৯৮২



মহাশূন্যের মণিমুক্তো

সিদ্ধার্থ ঘোষ

রাত আটটা বাইশ। এমনিতেই টিভি চ্যানেলের প্রত্যেকটায় খাস প্রোগ্রামের সময়। তারপর রবিবার থেকে আজ মঙ্গলপেরোতে চলল ঘূর্ণিঝড় আর অবিশ্রান্ত বর্ষার দাপটে কলকাতায় যে-যার ঘরে বন্দি। আমরণ বক্সিং, ওয়ান-ম্যান ফুটবল, সিন্থেটিক সঙ্গীত আর সিনেমা দেখে সময় কাটতে চাইছে না। রাবারজাত পণ্যবিক্রেতারা সুযোগ বুঝে অ্যাডাল্টস ওন্‌লি চ্যানেলের সময়সূচির পরিবর্তন ঘটিয়ে (২৫ শতাংশ অধিক ব্যয়ে) প্রায় চার ঘণ্টা আগেই তাদের স্পনসর করা নীল কসরত জুড়ে দিয়েছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভঙ্গিতে সতেরোটা চ্যানেলের প্রোগ্রাম আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। একই সঙ্গে। পরদার রঙ মুছে দিয়ে কালো বর্ডার দেওয়া শোকের বাক্সের মধ্যে ফুটে উঠল বড় বড় হরফের ঘোষণা। শব্দরাও কিছুক্ষণের জন্য খারিজ।

এক চলচ্চিত্রকারের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে বারো নম্বর চ্যানেলে চলছিল মান্ধাতার আমলের একটা ফিল্ম। চ্যাপলিন নামটা রাহুলের কাছে অপরিচিত। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে দেখতে দেখতেই এক সময়ে বেশ জমে গিয়েছিল ব্যাপারটা। ভি সি আর-এ ক্যাসেট পুরে সুইচ টিপে চালু করে দিয়েছে। রীমা ফিরে আসুক, দেখে মজা পাবে।

চ্যাপলিন তার টুপির মধ্যে ভাঙা ঘড়ির টুকরো ভরে অয়েল ক্যান থেকে নিঃশব্দে ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে সবে তেল ঢালতে শুরু করেছে তখন।

ভুরু কুঁচকে তাকাল রাহুল।

একটি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে খবর এসে পৌঁছেছে যে, নক্ষত্রচারী ডি-সেভেন রকেটটি একশো সতেরোজন ছাত্রী ও সাতজন কর্মী সমেত মহাকাশের এক দুর্ঘটনায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

রাহুল একবার পড়ল। দু'বার পড়ল। তিনবার। শব্দগুলো কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পরদায়!

সংবাদ-পাঠকের একটা পরিচিত মুখ এবার পরদায় এসেছে। কিন্তু তার কথা রাহুল ভালো করে শুনতে পাচ্ছে না। রিমোট সুইচের বোতামটা টিপেই চলে। ফুল ভলিউম।

অসংলগ্ন ও দুর্বোধ্য শব্দে ঘর কাঁপে।

...মহাকাশ যুগের তৃতীয় বৃহত্তম রকেট-দুর্ঘটনায়··· অজানা উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ··· পৃথিবী থেকে সাতাশ রকেট-দিবস দূরত্বে··· টেলিস্কোপের দৃষ্টি পৌঁছয় না··· ধ্বংসের পূর্বমুহূর্তের রেডিও-বার্তা··· আরোহী ছাত্রীদের কারুর বয়েস বারোর বেশি নয়··· কলকাতার স্কুল··· এসে কম্পিটিশনে··· পুরস্কার হিসাবে মহাকাশে পাড়ি···

পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে দু' হাতের ধাক্কায় আততায়ীকে কয়েক হাজার ফুট নিচে ছুড়ে দিল রাহুল। টিভি সেটটা আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর। কিন্তু ছবির স্রোত তবু কাত হয়েও চলতে থাকে, ঘোষকের গলাটা শুধু ধাতব ধারাল, রিকন্ডিশন্ড রোবটের মতো শোনাচ্ছে।

পিকচারফোনটা জলতরঙ্গের সুর তুলে বেজে ওঠে ভিক্টোরিয়ান তেপায়া স্ট্যান্ডের ওপর। ঘুরে দাঁড়ায় রাহুল। সে জানে কে ফোন করছে। মুহূর্তের মধ্যে তার খেপামি উবে গেছে। একটু দ্বিধা। ফোনটার দিকে সতর্ক দৃষ্টি। টিকটিকির শিকার ধরার মতো পা বাড়ায়। যেন তার গতিবিধি জানতে পারলেই ফোনটা কেটে যাবে।

রিসিভারে হাত রেখে আর-একটু সময় নেয়। জলতরঙ্গের গৎটা শেষ হোক।

'হ্যালো ?'

ফোনের পিকচার স্ক্রিনে দুটো উদভ্রান্ত নীল চোখ।

'গুড ইভনিং! গুড ইভনিং জয়া! কী ব্যাপার, কার বিছানা থেকে ফোন করছ, ডার্লিং ?'

রাহুল এখন নর্মাল। জয়ার সঙ্গে গত দু' বছরের মধ্যে কালেভদ্রে যখনই যোগাযোগ হয়েছে এই সুরেই চলেছে আলাপ।

'তুমি শোননি ? জানো না ? রীমা—রীমা—' দু'হাতে মুখ ঢেকেছে জয়া। কান্নাকে অশালীন চেহারা না দেওয়ার এই রীতি।

'রীমা চলে গেছে তাতে তুমি সিন ক্রিয়েট করছ কেন ? তোমার সঙ্গীর রাত্রিটা মাটি কোরো না। সেন্টিমেন্টাল হলে তোমাকে কুৎসিত দেখায়, জয়া।'

ফোনটা আলতো হাতে নামিয়ে রাখল। জয়ার টেলিফোনটা তাকে আত্মস্থ হওয়ার সুযোগ দিয়েছে।

উলটে পড়া টিভি স্ক্রিনের দিকে চোখ ফেরাল রাহুল। একটা সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে কার্পেটের ওপরেই বসে পড়েছে। অভিশপ্ত রকেটের আরোহীদের মুখ আর পরিচয়ের মিছিল। রাহুল দেখতে চায়, কিন্তু তার জন্য টিভি সেটটাকে খাড়া করে বসাবার ইচ্ছা নেই। ওটা ছুঁতেও ঘেন্না লাগছে।

ফুটফুটে দশ-এগারো বছরের মেয়েদের একটা করে মুখ ফুটে উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই একজন করে রীমা। রাহুল কিন্তু ভাবছে অন্য কথা। অনেকগুলো অসম্ভব একজোট হয়ে রীমাকে টেনে এনেছে দুর্ঘটনার মধ্যে। রাহুল অধ্যাপক। কন্যাকে মহাকাশ ভ্রমণে কেন, ইওরোপ বা আমেরিকায় পাঠানোর সঙ্গতিও নেই তার। রীমাও বোধহয় কখনও কল্পনা করতে পারেনি, এরকম সুযোগ আসতে পারে। তার ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র রিজিয়া গত বছর চাঁদে তিনদিন কাটিয়ে এসেছে। কিন্তু রিজিয়ার বাবার কথাই আলাদা। ভারতের প্রথম সারির শ'খানেক ব্যবসায়ীর মধ্যে তিনি অন্যতম।

কাউন্ট ডাউন শুরু হয়েছে 'মিকিলেট' কোম্পানি প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার ফর্ম স্কুলে

পাঠানোর মুহূর্ত থেকে। চকোলেট চুইংগাম ও বাবলগাম ইত্যাদি নানা মুখরোচক পসরা নিয়ে বাজারে নামার আগে মিকিলেটের এই আয়োজন ছিল পাবলিসিটির চমক। তাদের ব্যবসার পিছনে সুস্থিত হিমালয়প্রমাণ মূলধনের ইঙ্গিত। কলকাতা থেকে তাদের যাত্রা শুরু। প্রথম দফায় কলকাতার যাবতীয় গার্লস স্কুলের সিক্সের ছাত্রীরাই শুধু সুযোগ পেয়েছিল পরীক্ষায় বসার। দু-চারজন নয়, প্রতিশ্রুতি ছিল একশোজনকে তারা দু'মাসের জন্য নিয়ে যাবে শিক্ষামূলক মহাকাশ সফরে। সেই সংখ্যা শেষে বেড়ে একশো সতেরোয় ঠেকেছিল।

রাহুল যখন রীমার প্রতিযোগিতার ফর্মে 'কোনও আপত্তি নেই' জানিয়ে সই করে, ভালো করে পড়েও দেখেনি নিয়মাবলী। ক্লাসের সব মেয়েরাই তো বসছে, রীমাও তারই একজন। সিট অ্যান্ড ড্র, কুইজ কনটেস্ট— এরকম তো কতই হচ্ছে। পড়াশুনোয় রীমার তেমন মাথা নেই। ছবি আঁকাটাই তার একমাত্র নেশা। রাহুল ভেবেই রেখেছিল, স্কুলের গণ্ডিটা পার হলেই ভর্তি করে দেবে আর্ট কলেজে।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরেই রীমা তার নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করেছিল। তাদের ক্লাস থেকে মাত্র চারজন সুযোগ পেয়েছে।

'তুই যে চমকে দিলি। একবারও তো বলিসনি যে, এত ভালো লিখেছিস!'

'ভালো না ছাই। সত্যি বাপি— কোন লেখাটা যে ভালো হয় আর কোনটা খারাপ, আগেভাগে আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। যা মনে এল লিখে দিলাম। বড় হয়ে কী করতে চাও— এ আর এমন কী!'

কেন রাজি হল? নিজেকে এখন মিথ্যা প্রশ্ন। মনের কোণে একটা সন্দেহকে সে বাতিল করতে পারছে না। সত্যিই দুর্ঘটনা তো? কারা এই 'মিকিলেট' কোম্পানি? বিজ্ঞাপনের চমক দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই তাদের ছিল না। তাহলে কি পুরোনো বাতিল কোনও রকেটে চড়িয়ে ছেড়ে দিল বাচ্চাদের? বেআইনি লাইসেন্স করা রকেট? উল্কার সঙ্গে সত্যিই সঙ্ঘর্ষ ঘটেছে, না কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য…

উল্কার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ মানে ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে খেসারত দিতে হবে না। কিন্তু এ কথা ভাবার পিছনে কোনও যুক্তি নেই। একটু আগেই টিভি-তে দেখানো হয়েছে বিধ্বস্ত রকেট থেকে পাঠানো বেতার-চিত্রে কীভাবে ধরা পড়েছে উল্কার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের প্রাক-মুহূর্তটি।

তখন অবশ্য ঠাণ্ডা মাথায় দেখার মতো অবস্থা ছিল না। আরেকবার যদি দেখতে পেত…

মনে পড়ে, ভিডিও ক্যাসেটটা ভরাই আছে। টেপ ফুরিয়ে গিয়ে না থাকলে চ্যাপলিনের ছবির পরেও সবই রেকর্ড হয়েছে।

টেলিফোন অ্যাড্রেস-বুকের পাতা উলটে যাচ্ছে প্রথম থেকে। নামটা কিছুতেই মনে আসছে না। সায়েন্স কংগ্রেসে পরিচয় হয়েছিল। মহাজাগতিক তথ্যকেন্দ্রের ইনফর্মেশন অফিসার।

এই তো! সম্বরণ পালধি। নাম্বারটা আশা করা যায় এর মধ্যে পাল্টায়নি।

বাড়িতেই ছিল সম্বরণ। পরিচয় দিতেই রাহুলকে চিনতে পেরেছে: 'আরে মশাই, এত কাল পরে অধমকে স্মরণ! বলুন, বলুন—'

'একটা প্রয়োজনে ফোন করছি। সাহায্য করলে উপকৃত হব।'

'আপনাদের উপকার করতে পারলে তবেই না দু'বেলা দু'মুঠো জুটবে। বুদ্ধিজীবীদের

কৃপা ছাড়া তথ্যজীবীরা···'

'আমার মেয়ে রীমা নক্ষত্রচারী ডি-সেভেনে ছিল।'

অপর পক্ষ এবার নীরব।

'সহানুভূতির দরকার নেই। একটা খবর জানতে চাই। মহাকাশে অভিযান শুরু হওয়ার পর ক'টা যাত্রীবাহী রকেট উল্কার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে ধ্বংস হয়েছে ? নিশ্চয়ই আপনাদের···'

'সরি, রাহুলদা। অসম্ভব। এগুলো আমাদের ভাষায় ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন "এক্স"। কোনওভাবেই জানানো···'

কানেকশন ছিন্ন করে দিল রাহুল। ঘড়ির দিকে তাকাল। সকাল ছ'টা বাজতে দশ। রীমাদের স্কুলের ক্লাস শুরু হতে ঘণ্টা দেড়েক বাকি। কিন্তু আর বসে থাকতে পারছে না। গত রাতটার সঙ্গে যুঝে ওঠার মতো অভিজ্ঞতা ছিল না রাহুলের। এমনকি জয়া চলে যাওয়ার পর প্রথম রাতটার সঙ্গেও এর কোনও তুলনা হয় না।

ভোররাত থেকে বৃষ্টি থেমেছে। আকাশ পরিষ্কার। গাড়িটা পার্ক করে গেটের সামনে সে দেখল নোটিশ ঝুলছে, আজ স্কুল বন্ধ থাকবে। কেন, তার উল্লেখ নেই। দু'পাশে খেলার মাঠ, মাঝখান দিয়ে খোয়া বিছানো পথ। তারই প্রান্তে স্কুলের বাড়ি। পোর্টিকোর সিঁড়িতে পা দিতেই দারোয়ানের দেখা পাওয়া গেল।

'হেডমিস্ট্রেস—'

'যান। দোতলায় বাঁ দিকের ঘর।'

মিস চৌধুরির সঙ্গে রাহুলের পরিচয় আছে। ক্লাসরুমের বাইরে তাঁর চেন্-স্মোকিং ভালো লাগেনি। জয়ার সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল। মানসিক অস্থিরতার প্রকাশে সম্ভবত।

চৌধুরি একা নয়, ঘরে আরও তিনজন টিচার ছিলেন। দরজায় নক করেছিল কিন্তু অপেক্ষা করেনি।

মিস চৌধুরি উঠে দাঁড়িয়েছেন। রাহুল নীরবে এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। অন্য শিক্ষিকারা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রাহুলের পরিচয় জানেন না।

রাহুল বলল, 'আমি রীমার বাবা।' তারপর মিস চৌধুরির দিকে ফিরে বলে, 'দু-একটা কথা জানতে এসেছি।'

চৌধুরি দাঁড়িয়েই আছেন। স্টিল রিমের চশমার পিছনে নিশ্চল দৃষ্টি, আড়ষ্ট শরীর। বব-করা চুলের কাঁচাপাকা কয়েকগুচ্ছ বাঁ কপালের ওপর।

'রীমার গ্যারান্টার হিসাবে ফর্মে আমি যখন সই করি পড়েও দেখিনি। সত্যি বলতে রীমা যে চান্স পাবে···'

রাহুলের কথার মাঝখান থেকে একজন শিক্ষিকা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আমিও তো ভাবিনি। অবাক হয়েছিলাম। আমি রীমার ক্লাস-টিচার। সবাইকে চমকে দিয়েছিল।'

দ্বিতীয় শিক্ষিকা যোগ করেন, 'শুধু রীমা কেন, ক্লাসের আরও যে-তিনজন ছাত্রী সিলেক্টেড হয়েছিল, তারা কিন্তু কেউই স্ট্যান্ড-করা মেয়ে নয়।'

রাহুলের মনে পড়ে রীমা বলেছিল, তাদের ফার্স্ট গার্ল জয়িতার নাকি রীতিমত নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হয় প্রতিযোগিতার ফল বেরোবার পর। পরীক্ষায় দ্বিতীয় হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়নি যার, পুরো বাতিল!

'তা এরকম আনএক্সপেকটেড রেজাল্টের কারণ কী? কী মনে হয় আপনাদের?'

তিন শিক্ষিকাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। সেটা নাকি বলা সম্ভব নয়। পুরো

পরীক্ষাটাই পরিচালনা করেছিল 'মিকিলেট' কর্তৃপক্ষ। তাদের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল পরীক্ষার দিন। উত্তরপত্রও সেদিনই সিল করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর যথাসময়ে রেজিস্টার্ড পোস্টে হেডমিস্ট্রেসের কাছে রেজাল্ট শিট এল। তাদের নিজস্ব বিচারকরা কীভাবে মেরিট যাচাই করেছেন, কেউই তা জানে না।

মিস চৌধুরি প্রথম মুখ খুললেন এবার, 'সবটাই ঠিক এবং এটাও সত্যি যে, প্রতিযোগিতার ব্যাপারে ওরা প্রথম যে-সার্কুলার পাঠিয়েছিল, তাতেও এই শর্তগুলোর কথাই ভিন্ন ভাষায় হলেও স্পষ্ট বলা ছিল। এই প্রতিযেগিতা পরিচালনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনও ভূমিকা থাকবে না। কলকাতার তিনটে মাত্র স্কুল এই শর্তে রাজি হয়নি, বাকি সবাই আমাদের মতো...'

রীমার ক্লাস-টিচার বললেন, 'কিন্তু তখন যদি আমরা রাজি না হতাম, গার্জেনদের কাছ থেকে কীরকম চাপ আসত বলুন তো! এমন একটা সুযোগ...'

রাহুল স্বীকার করে, কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মিস চৌধুরি নীরবে ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে ঘাড় নাড়ছেন। সহানুভূতি প্রকাশের কোনওরকম চেষ্টা না করায় রাহুল নিজের অজান্তেই প্রথমে ভদ্রমহিলার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করেছিল। এখন একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। আর পাঁচজনের থেকে সবসময়েই উনি বেশি বোঝেন যেন। নিজেকে জাহির করার ইচ্ছে।

চৌধুরির অভিমত শোনার কোনও ইচ্ছে নেই বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই রাহুল তার পুরোনো প্রশ্নে ফিরে গেল : 'আমাদের দিয়ে যে-বণ্ডটা সই করিয়ে...'

এইটুকু অগ্রাহ্য দিয়ে চৌধুরির মতো জাঁদরেল হেডমিস্ট্রেসকে নড়ানো যায় না। রাহুলের চেয়েও কাটা কাটা শব্দে তিনি বললেন, 'বণ্ড নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? বণ্ড যা হয় তাই। দুর্ভাবনার একটাই কারণ। আমি জানি এই প্রতিযোগিতায় কী যাচাই করা হয়েছিল। জানি মানে কালকে জানতে পেরেছি। টেলিভিশনে যখন একের পর এক...'

চৌধুরির কথা সম্পূর্ণ করল রাহুল, 'রীমাদের মুখগুলো দেখাচ্ছিল... বলুন, বলুন— সেন্সলেস হয়ে পড়ব না...'

রাহুলের তিক্ততার উত্তরে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন চৌধুরি, 'সেন্স থাকলে তবে তো সেটা হারাবার ভয়। একবারও আপনাদের কারুর মাথায় ঢুকল না যে, প্রত্যেকটা মেয়েই কীরকম সুন্দরী! হ্যাঁ— ওইটাই ছিল একমাত্র বিবেচ্য। পরীক্ষা-প্রবন্ধ— সব বোগাস। আইওয়াশ। পরীক্ষার দিন যে-পরিদর্শক পাঠিয়েছিল, সেই করেছে নির্বাচন। শুধু মুখ দেখে। বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করার মতো সুন্দর সুন্দর মুখ।'

টেলিভিশন যখন প্রথম আঘাত করেছিল তখনও রাহুলের গলার কাছে এরকম কান্নার ডেলা জমেনি। কিন্তু মিস চৌধুরির যেন রোখ চড়ে গেছে।

'আসুন এদিকে। দেখে যান নিজের চোখে। আজ ভোর পাঁচটায় এসে হাজির হয়েছি আমি এইজন্যেই। একবার নয়, তিনবার দেখেছি। এটা অনুমান নয়।'

হেডমিস্ট্রেসের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ডান পাশে ছোট্ট আধা-পার্টিশান বসানো খুপরিতে পার্সোনাল কম্পিউটারের সামনে এসে দাঁড়াল রাহুল। তার পিছনে তিনজন শিক্ষিকা।

চেয়ারে বসে কি-বোর্ড অপারেট করছেন চৌধুরি।

'একে একে দেখে যান রীমার ক্লাসের মেয়েদের ছবি। ইন অর্ডার অফ মেরিট। ফার্স্ট গার্ল—'

রাহুল অস্ফুট স্বরে বলল, 'জয়িতা।'

'সিলেক্টেড হয়নি। এবার সেকেন্ড গার্ল। রীতা। চান্স পায়নি। থার্ড গার্ল— নো।'

ক্লাসের পরীক্ষায় গতবার যারা প্রথম দশটি স্থান পেয়েছে তাদের কেউই মৃত্যুর ডাক শোনেনি। এগারো নম্বরে পৌঁছে ফুটে উঠল স্বাতী, আর মিস চৌধুরি ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনে তাকালেন : 'আমাকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না স্বাতী কেন নির্বাচিত হয়েছে? আর-একবার দেখবেন প্রথম থেকে? কেন জয়িতারা বেঁচে গেল?' চৌধুরি যেন আপনমনেই বকে চলেছেন।

'প্লিজ, এবার বন্ধ করুন।' মুখে বলে রাহুল, কিন্তু তার হাতের মুঠি দুটো চেয়ারের ব্যাকরেস্টটাকে শক্ত করে চেপে ধরেছে আর চোখ দুটো আটকে রয়েছে কম্পিউটারের স্ক্রিনে।

শক থেরাপি তো বটেই। তবে শুধু এইটুকুতে বিশেষ উপকার করতে পারতেন না মিস চৌধুরি। তিনি সব বোঝেন, বোঝাতেও চান, কিন্তু সেটা শুধু রীমার বাবার খাতিরে। অর্থাৎ হতভাগ্য এক পিতার স্বার্থে।

রাহুল অনুরোধ করেছিল খবরের কাগজে একটা বিবৃতি দেওয়ার জন্য। অনুসন্ধানের দাবিতে। সঙ্গে সঙ্গে মিস চৌধুরি হেডমিস্ট্রেস হয়ে গেলেন। সরাসরি প্রত্যাখ্যান। সেটা সম্ভব নয়। আফটার অল ধারণা ধারণাই। পাবলিক স্টেটমেন্ট দিতে হলে তার আগে ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে কথা বলা দরকার।

রাহুলের মনে হয় ইনি সেই 'ইন্টেলেকচুয়াল' গোত্রের মানুষ যিনি শুধু নিজের আত্মার উন্নতির জন্য সত্যের সন্ধান করেন।

আরও চারটে মেয়েদের স্কুল ঘোরার পরে রাহুল বুঝতে পারল, কারুর কাছ থেকেই এই সন্দেহের কথা লিখিত বিবৃতিরূপে সংগ্রহ করা যাবে না। প্রথমত, সবাই এই কথা মানতে রাজি নয়। দ্বিতীয়ত, কেউই এসবের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চায় না। তা বলে রাহুলের কোনও লাভ হয়নি বলা ঠিক নয়। মিস চৌধুরি একটা সন্দেহ জাগিয়েছিলেন। স্কুলগুলো ঘোরার সুবাদে 'মিকিলেট' নির্বাচিত অন্য ছাত্রীদের ছবি দেখার পর, সন্দেহটা এখন সিদ্ধান্তে পরিণত। অদ্ভুত হচ্ছে, তার মনের অস্থিরতা যেন এখন অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারছে রাহুল।

চিফ সাব-এডিটর নয়, বন্ধু হিসেবেই দীপেশের সঙ্গে কথা হচ্ছিল রাহুলের। খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে দীপেশ প্রায় সবই জেনে নিয়েছে। প্রখর বুদ্ধিমত্তা আর নিউজ সেন্স ছাড়া এরকম পোস্টে ওঠার সুযোগ মেলে না।

কফির কাপটা নামিয়ে রাহুল সিগারেট বার করতেই দীপেশ সামনে ঝুঁকে নিজের লাইটারের শিখাটা বাড়িয়ে ধরল।

'তাহলে একটা নিউজ তুই করছিস?' রাহুলের ধারণা, আর কিছু না হোক, শুধু 'চাঞ্চল্যকর' হিসেবেও খবরটাকে লুফে নেবে দীপেশ।

'কিসের নিউজ?'

'মানে? তাহলে এতক্ষণ শুনলি কী?'

'সরি। তুই কিন্তু ভুল বুঝেছিস। তোর ভিউ-পয়েন্টটা ইন্টারেস্টিং ঠিকই কিন্তু আই মাস্ট সে, ইউ আর অন এ রঙ ট্র্যাক।'

'ঠিক কি ভুল তা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না, দীপেশ। প্লিজ—একটা কথা

শোন— আচ্ছা, বেশ, খবরের দরকার নেই। ধর, আমি যদি একটা চিঠি দিই, সেটা ছাপবে তো ?'

'অসম্ভব। কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'

রাহুল উঠে দাঁড়াল : 'কেন, সেটা কি জানতে পারি ? অনেক—অনেক টাকার বিজ্ঞাপন দেবে ওরা, তাই না ? "মিকিলেট" হাতছাড়া হয়ে যাবে ?'

'না। আবার ভুল করছিস। মিকিলেট আর কোনওদিনই বিজ্ঞাপন দেবে না। দোষ নেই তোর, বুঝতে পারছি আজকের খবরের কাগজ পড়িসনি। মিকিলেটকে ডিজল্‌ভ করে দেওয়া হয়েছে। এমন অপয়া সূচনার পর সেটাই স্বাভাবিক। শোন রাহুল, মিকিলেট সম্বন্ধে তোর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মিকিলেট কোনও ভুঁইফোঁড় উটকো কোম্পানি নয়। এটা ছিল স্মিথ লেশনার অ্যান্ড মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালেরই একটা নতুন ভেঞ্চার। বুঝলি এবার ! হ্যাঁ, আমার কাগজটাও ওই গ্রুপেরই।'

ড্রাইভ-ইন-পার্কে বসে চারটে খবরের কাগজ শেষ করেছে রাহুল। প্রত্যেকটার হেডলাইনে দুর্ঘটনা। নতুন খবর কিছুই নেই। ছবিও প্রায় একই। উল্কার সঙ্গে আসন্ন সঙ্ঘর্ষের রেডিও-চিত্র। শিশুযাত্রীদের পরিচয়। নিহতদের বাবা-মা'র সঙ্গে কয়েকটি সাক্ষাৎকার। দীপেশ ঠিকই বলেছে, স্মিথ লেশনার অ্যান্ড মুখার্জির বিরাট সাম্রাজ্যেরই অংশ মিকিলেট। দু'পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে তারা প্রত্যেকটা পেপারে। তার মধ্যেই আছে আন্তর্জাতিক রকেট পরিবহণ নিয়ন্ত্রক সংস্থার সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি। নক্ষত্রচারী ডি-সেভেন-এর লাইসেন্সে কোনও খুঁত নেই। ট্যাক্স জমা পড়েছে, ফিটনেস সার্টিফিকেট নবীকরণ হয়েছে। শুধু দু' মাস কেন, এই রকেট দশ বছর মহাকাশ ভ্রমণের ছাড়পত্র পেতে পারে। ক্লাস ওয়ান পর্যায়ের মহাকাশযান।

এমনকি সন্দেহজনক ইনসিওরেন্সের ব্যাপারটা তারা নিজেরাই উত্থাপন করেছে। উল্কার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের দায়িত্ব বীমা কর্তৃপক্ষের না হলেও কোম্পানি স্বয়ংপ্রবৃত্ত হয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের মোটা টাকা ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সেটা বীমার পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ হলেও···

রাহুল বুঝতে পারে এই কোম্পানির পক্ষে দুর্ঘটনার আর্থিক দায়িত্ব বহন করা তেমন কিছু নয়। পৃথিবীর ইস্পাত, তেল ও কয়লাখনির মালিকানা ছাড়িয়ে ওরা এখন মহাকাশে পাঁচ রকেট-বর্ষ দূরের 'কর্ণিকা' গ্রহেও গড়ে তুলেছে বিরাট খনিশিল্প উদ্যোগ। প্রতি মাসে তাদের কার্গো-রকেট দুর্লভ সব খনিজ সামগ্রী বয়ে নিয়ে আসছে পৃথিবীতে। মহাকাশের চারটি ভিন গ্রহে খনন-কার্যের অধিকার পেয়েছে চারটি কোম্পানি। তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে স্মিথ লেশনার অ্যান্ড মুখার্জি। মাত্র বছর পনেরোর মধ্যে ফুলেফেঁপে উঠেছে এরা। সন্দেহ নেই যে,তাদের সাফল্য-কাহিনীর কেন্দ্রে রয়েছে মহাশূন্যের ওই বন্ধ্যা কর্ণিকা, যেখানে একটি শেওলা বা অ্যামিবা অবধি আজও জন্ম নেয়নি।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক কলকাতার পথে পথে গাড়ি ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে রাহুল। এমন কোনও জায়গায় পৌঁছতে পারেনি যেখানে থামতে পারে। এলগিন অ্যাভিনিউয়ে ট্রাফিক সিগন্যালে পড়ে ইঞ্জিন বন্ধ করেছিল। ইগনিশনের চাবিতে বারবার আধ প্যাঁচ দিয়েও আর স্টার্ট নেয়নি। পেট্রল ফুরিয়েছে। অজস্র হর্নের একটি সর্পিল হুঙ্কারকে পিছনে রেখে একাই গাড়িটাকে ঠেলে রাস্তার পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিল।

বাড়ি ফেরার কথা ভাবেনি,কিন্তু মিনিট দশেক হাঁটার পর রাহুল আবিষ্কার করল নিজের

ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বসার ঘরে প্রতুলকে দেখে অবাক হল না। খবরটা না পাওয়ার তো কোনও কারণ নেই। কিন্তু বাবা যদি জানতে পারেন তো আরেকটা স্ট্রোক অবধারিত।

রাহুল বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা ভাইয়ের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'বাবা শুনেছে ?'

'না। টিভির খবরের আগেই শুয়ে পড়েছিল। খবরের কাগজগুলোও আজ সকালে সরিয়ে ফেলেছি।'

'জানতে ঠিকই পারবে। আজ বা কাল।'

ফোন বেজে ওঠে। দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। রাহুলই তৎপর হয়ে ফোনটা ধরল।

আবার জয়া, 'সকাল থেকে বারবার চেষ্টা করছি। কোথায় ছিলে ?'

জয়ার চেহারা, তার উচ্চারণ একেবারে অচেনা ঠেকছে। এই জয়াকে কোনওদিন দেখেনি রাহুল। জয়াকে ক্লান্ত দেখাতে পারে—অবিশ্বাস্য ! তার উচ্চারণ থেকে চর্চা-করা আদিখ্যেতার রেশগুলোও উবে গেছে।

'রাহুল ! শুনছ তুমি ! সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়। ইমিডিয়েটলি খোঁজ নাও। ক্যালকাটা সেন্ট্রাল জেলের তিনশো সতেরো নম্বর। লাইফ টার্ম আসামী। প্রদীপ্ত সব কথা আমাকে বলে না,কিন্তু···কিন্তু ও জানে না যে,ডি-সেভেনের রীমা আমার মেয়ে···'

হঠাৎ ফোনটা কেটে গেল। পাশে দাঁড়িয়ে প্রতুল সবই শুনেছে। তার দিকে ফিরে রাহুল বলল, 'জয়া কি পাগল হয়ে গেল নাকি ?'

'আশ্চর্য নয়। তবে তুই জানিস কি না জানি না, প্রদীপ্ত, মানে প্রদীপ্ত মুখার্জি হচ্ছে স্মিথ লেশনারের ইয়াংগেস্ট ডাইরেক্টর। গত দেড় বছর ওর সঙ্গেই আছে জয়াদি।'

রাহুল শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

প্রতুল বলে, 'আরও একটা কথা। ঘণ্টাখানেক আগে সান-গ্লাস পরা রোগা বেঁটেমতো একটা লোক এসেছিল। ভঙ্গিটা খুব সন্দেহজনক। তুই নেই শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে পালাচ্ছিল। তারপর লিফটের মুখ থেকে আবার ফিরে এল। বারবার পিছন ফিরে দেখছে। প্যান্টের পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল, এইটা দিলেই হবে। তারপরে প্রায় দৌড়।'

'একটু নাকিসুরে কথা বলছিল কি ?'

'হ্যাঁ। চিনিস তাহলে লোকটাকে ?'

'নিশ্চয়ই সম্বরণ। কিন্তু কী দিয়ে গেল···'

'একটা ভিডিও ক্যাসেট। মিনিট সাতেকের। তোর ঘরে বসেই দেখেছি। সাত বছর আগে যাত্রীবাহী রকেট আর এম ভি-টেনের সঙ্গে উল্কার সঙ্ঘর্ষের ছবি। কোনও সন্দেহ নেই যে, এই টেপটাকেই কাল আমাদের দেখানো হয়েছে। নক্ষত্রচারী ডি-সেভেনের নামে চালিয়েছে।'

আত্মীয় বা আইনজীবী ছাড়া বন্দিদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাওয়া কঠিন। যাবজ্জীবন দণ্ডিতের ক্ষেত্রে তো প্রায় অসম্ভব। সবদিক চিন্তা করেই রাহুল এসেছিল মানবিক অধিকার রক্ষা পর্ষদের দপ্তরে। মিস্টার সেনশর্মার দেখা পাওয়ার জন্য আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলেও কাজ হয়েছে। কোনও কথা গোপন করেনি। সেনশর্মা রাজি হয়েছেন। পর্ষদের লেটারহেডে একটা চিঠি টাইপ করে দিয়েছেন তিনি। নিচে রাহুলের সই অ্যাটেস্ট করা। এর

জোরে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়ারই কথা।

জেলখানার অভ্যর্থনা-কক্ষে অপেক্ষা করছে রাহুল। মিনিট দশেক পেরোতে চলল, চিঠিটা হাতে নিয়ে রিসেপশনিস্ট সেই যে উধাও হয়েছে, আর পাত্তা নেই।

সাদা পোশাকের দশাসই চেহারার এক ভদ্রলোককে ঢুকতে দেখেই দরজার দুই প্রহরী আড়ষ্ট হয়ে স্যালুট জানাল।

জেলার বা ডেপুটি জেলার, ভেবেছিল রাহুল। কিন্তু অনুমান ভুল। রাধাবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের জাঁদরেল অফিসার।

'চিঠিটা আপনি এনেছেন ?' ভঙ্গিটাই যেন আদেশ যে এক্ষুনি উঠে দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে জবাব দিন।

রাহুল আরও ভালো করে ঠেস দিয়ে বসে বলল, 'একটা লেটার অফ ইনট্রোডাকশান নিয়ে এসেছি আমি। তিনশো সতেরো নম্বরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।'

'চলুন।'

অফিসার রাহুলকে নিয়ে বাইরের চত্বরে বেরিয়ে এল। সামনেই অপেক্ষা করছিল জানলায় তারের জাল বসানো কালো ভ্যান। পিছনের দরজা খুলে রাহুলকে বলল, 'উঠুন।'

রাহুল আপত্তি করল না। পাশেই দুই পুলিশ প্রহরী। তাদের মতিগতি সুবিধের ঠেকছে না।

পুলিশ অফিসার ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছে। কয়েকবার প্রশ্ন করে রাহুল একটাই উত্তর পেয়েছে : 'আর মিনিট দশেক ধৈর্য ধরুন।'

তবু পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না রাহুল। ছ'জন উচ্চপদস্থ অফিসার ঘিরে ধরেছে তাকে এবং গুলির মতো প্রশ্ন ছুটছে—কেন রাহুল তিনশো সতেরোকে দেখতে এসেছে ? আজই বা এল কেন ? তিনশো সতেরো তার কে হয় ? সে কি জানে তিনশো সতেরোর নাম ? কী জানে সে তার সম্বন্ধে ?

সন্তোষজনক কোনও উত্তর দেওয়ার উপায় ছিল না রাহুলের। তাহলে জয়াকে জড়াতে হয়। মানবিক অধিকার রক্ষা পর্ষদের দোহাই দিয়েও এগোতে পারেনি। হঠাৎ সব ছেড়ে তিনশো সতেরো কেন ?

রাহুল বলে, 'অযথা তিলকে তাল করছেন আপনারা। এর পিছনে কোনও পরিকল্পনা...'

'কোনও পরিকল্পনা নেই !' একজোড়া গোঁফ বেঁকিয়ে ঝুঁকে পড়ল একজন : 'তাহলে দীপনারায়ণের আজ জেল-পালানোর পরিকল্পনার কথাটাও সত্যিই আপনি জানতেন না ?'

'জেল পালানো ? দীপনারায়ণ ?'

'বাঃ, আপনি অবাক হচ্ছেন ? যাই হোক, মনে হয় আপনাকে খুশি করতে পারব না। আপনি কনফার্ম করতে এসেছিলেন দীপনারায়ণ পালিয়েছে ! আমরা জানি। কিন্তু বেচারার গ্র্যান্ড প্ল্যান বানচাল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ফটক আর পেরোতে হয়নি। আরে মশাই, যত বুদ্ধি সবই থাকবে ক্রিমিনালদের ? তাহলে আমরা তো ভেসে যাব।'

'কোথায় দীপনারায়ণ ? আই মাস্ট টক উইথ হিম। রাইট নাউ।'

রাহুলকে টেনে বসিয়ে দিয়েছে। দীপনারায়ণের সঙ্গে আর কারুরই কথা বলার উপায় নেই। সেন্ট্রির রাইফেলের নিশানায় কোনও গলতি ছিল না।

প্রশ্নের কোলাহল কিছুক্ষণ কানে ঢোকেনি রাহুলের। রাহুলের এবার সত্যিই ক্লান্ত লাগছে। মুখ তুলে ধীরে ধীরে বলল, 'আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব। কিন্তু তার আগে একবার ডিসি সাউথ ওয়েস্ট মিস্টার চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমার ছোটকাকা।'

চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে রাহুল অব্যাহতি পেয়েছে। তবে প্রতিদিন সকালে তাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দিয়ে যেতে হবে। তিনদিন বাদে পরবর্তী ইন্টারোগেশন। সেদিন তার কাকাও থাকবে।

গাড়িটা এতক্ষণ রাস্তার ধারেই পড়ে ছিল। এবার ওটা তার দরকার। জেরিক্যান থেকে পেট্রল ঢেলে ঘড়ির দিকে তাকাল। ছ'টা বাজতে দশ। অফিস-ভাঙা পথের কথা হিসেবে রেখেও সাতটার মধ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছতে পারবে।

দশ মিনিট আগেই পৌঁছে গেল। সোনাগাছি সুপার কমপ্লেক্স। থ্রি-স্টার রুমের অতিথিরা গাড়ি চালিয়েই উঠে আসতে পারে সেভেন্থ ফ্লোরের পার্কিং কর্নারে। এখানে নবাগত নয় রাহুল। জয়া চলে যাওয়ার পর থেকে মাস দুই অন্তর নিয়মিত আসছে। আসতে বাধ্য হয়েছে। মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটা দুষ্পাচ্য ওষুধ ঢক করে গিলে ফেলা। শরীরের দাবিকে পুরো অবহেলা করার মতো নীতিধর্মে বিশ্বাস রাহুলের কোনওদিনই ছিল না।

নিনি, টিনা ও রিনি। তিনজনকে মোটামুটি চেনে। প্রত্যেকেই সিলিকোন সুন্দরী। কোনারকের প্রস্তরীভূত সুন্দরীদের চেয়েও তাদের উন্নত স্ফীত বক্ষে সময় কোনও আঘাত হানতে পারবে না।

প্রতি মাসে একটি করে সিলিকোন ইনজেকশানের আরও দুটি সুফল আছে। তারা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, কিন্তু নিজস্ব কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। সুপারম্যানের স্পর্শেও তাদের কোমলতম অঙ্গে অনুভূতি সঞ্চারিত হয় না। দ্বিতীয়ত, বছর কুড়ির বেশি এই ইনজেকশান নেওয়ার দরকার হয় না। অতদিন কেউ বাঁচে না।

তাপনিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে নিনিই প্রথম দেখেছে রাহুলকে। অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গ কাচের জানলায় ঠেকিয়ে মাইক্রোফোনে তার নাম ধরে ডাকল।

কাউন্টারের সামনে মিনি কম্পিউটারে নিনির কোড নম্বর টাইপ করে তিন ঘণ্টার চার্জ পে করতেই কিউবিকলের এক পাল্লা দরজা নিঃশব্দে পথ ছেড়ে পাশে সরে গেল। টয়লেটে ঢুকে বাধ্যতামূলক মেডিক্যাল বাথ নিতে হবে শয়নকক্ষে প্রবেশের আগে। অপরিচিত প্রেমিকের ক্ষেত্রে নিনি অবশ্যই সবার আগে ডাক্তারি সার্টিফিকেটটা দেখতে চাইত।

বেডরেস্টে হেলান দিয়ে রাহুল চাদরটা কোমর অবধি টেনে নিল। নিনি ড্রেসিং গাউন চড়িয়ে লম্বা গেলাসে সাবধানে বিয়ার ঢালছে। ফেনা হলে চলবে না। দুটো বিয়ার ও গোটা চারেক সিগারেট শেষ করবে রাহুল, তারপর বলবে আলো নিভিয়ে দাও। রাহুলের অভ্যাস তার অজানা নয়। ভিডিওতে ব্লু-ফিল্ম দূরের কথা, লাইট মিউজিক অবধি তার বরদাস্ত হয় না।

এক চুমুকে বিয়ারের গেলাস ফাঁকা করে রাহুল বলল, 'আচ্ছা, দীপনারায়ণকে তুমি চিনতে?'

'দীপনারায়ণ!' একটু যেন চমকে গেল নিনি 'হঠাৎ? চিনব না কেন, এই কমপ্লেক্সের কে না চেনে? তবে পিয়া ছাড়া আর কারুর রুমেই কখনও ঢোকেনি।'

এবং পিয়াকেই সে এই কমপ্লেক্সে গত বছর গলা টিপে খুন করেছে। ছোট্ট একটা খবর বেরিয়েছিল তখন। কিন্তু নিনি বা কার মুখে যেন এখানেই তখন অনেক কথা শুনেছিল রাহুল। এসব কাহিনী তাকে টানে না। বলতে গেলে সে-ই জোর করে থামিয়ে দিয়েছিল বক্তাকে। এখন অস্পষ্ট মনে পড়ছে, দীপনারায়ণ নাকি আগেও খুন করেছিল। ফাঁসির আসামী। ধরা পড়েও কীভাবে পালিয়েছিল। পিয়ার প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। প্রতি রাতে আসত ঘড়ির কাঁটা ধরে। পিয়াকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। পিয়া রাজি হয়নি বলেই নাকি···

'পিয়াকেও তো চিনতে তুমি ?' রাহুল প্রশ্ন করে।

'খুউব। ওর মুখেই তো দীপনারায়ণের সব গল্প শুনেছি। একেবারে জন্তুর মতো চালচলন। আবার নাকি ভালোও বাসত। পিয়ার অতদূর এগোনো উচিত হয়নি। কিন্তু···'

'কিন্তু কি ?'

'বোধহয় প্রচুর টাকাপয়সা দিত।'

'যাঃ। একটা ফেরারী আসামী—'

'ফেরারী আসামী তো কি ? জানো কোত্থেকে পালিয়েছিল ? কর্ণিকা থেকে। আজ অবধি ওই একজনই পালাতে পেরেছে। ষোলো বছর বয়েসে প্রথম মার্ডার করে। তারপরে প্রাণদণ্ডের আদেশ হলে কর্ণিকায় চাকরি নিয়ে চলে যায়।'

সোজা হয়ে বসে রাহুল। মনে পড়েছে— যে-কথাটা অনেক আগেই মনে পড়া উচিত ছিল। শুধু কর্ণিকা নয়, মহাশূন্যের যে-চারটে গ্রহে খননকার্য চলছে সেখানে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী ছাড়া আর কোনও লোককে তিন মাসের বেশি বাস করার অনুমতি দেওয়া হয় না। এটা আন্তর্জাতিক আইন ; সেই আইন পাশের সময়ও তুমুল ঝড় উঠেছিল। শুধু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত নয়, তারা স্বেচ্ছায় রাজি হলে তবেই। ভিনগ্রহে প্রথম খনিশ্রমিকদের ব্যাচটা কবে রওনা হয়েছিল মনে নেই, তবে দীপনারায়ণ নিশ্চয়ই তাদেরই একজন।

গেলাসে বিয়ার ঢালতে ঢালতে নিনি বলল, 'তুমি যাই বলো, পিয়াকে ও খুন করেছে, কিন্তু ওর জন্যেই আমরা বেঁচে গেছি।'

আরও বিস্ময়।

'সত্যিই বেঁচে গেছি। লুকিয়ে কর্ণিকায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে কিরকম টোপ ফেলেছিল, জানো ? জনে জনে আলাদা করে বলেছিল। যাতায়াতে দশ বছর আর কর্ণিকায় পাঁচ। সবসুদ্ধ পনেরো। কিন্তু টাকা যা দেবে সারা জন্মে রোজগার করতে পারব না। দীপনারায়ণ না এলে আমরা কি জানতে পারতাম যে, কর্ণিকায় আট-দশ বছর ধরে প্রায় হাজারখানেক লোক কী অবস্থায় বাস করছে ! একটা মেয়েছেলের মুখ দেখার সুযোগ পায়নি। পিয়ার মুখেই শুনেছিলাম, দীপনারায়ণ নাকি কর্ণিকায় বসে ব্লু-ফিল্ম দেখেই পিয়াকে পছন্দ করে রেখেছিল। কিন্তু শুধু ব্লু-ফিল্ম দিয়ে আর কাজ হচ্ছে না। কেউ ভুলছে না। কাজকর্ম নাকি সব বন্ধ হওয়ার উপক্রম। সেইজন্যেই···'

'তোমাদের মধ্যে কেউ রাজি হয়নি ?'

'একজনও না ! ওখানে পৌঁছবার পর আমাদের কী হবে সেটা বুঝতে পারছ কি ? ছিঁড়ে ফেলবে···'

মুখে হাত চাপা দিয়ে টয়লেটে গিয়ে ঢুকল রাহুল। পেটে মোচড় দিয়ে ওয়াক আসছে।

একের পর এক গাড়ি রাহুলকে ওভারটেক করে যাচ্ছে। রাস্তা ফাঁকা। কিন্তু তার কোনও

তাড়া নেই। কী ঘটছে সেটা আর তার অজানা নেই এবং তাকে এখন কী করতে হবে সেটাও স্পষ্ট।

সতর্ক হয়ে গাড়ি চালানো দরকার। রাহুলের জীবনটা এখন বিশেষ মূল্যবান। কোনও অকারণ ঝুঁকি নেওয়া চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় হবে।

দীপনারায়ণকে ওরা স্মুদলি সরিয়ে ফেলেছে। ভাবছে মোক্ষম প্রমাণ বুঝি ওই একটাই। কিন্তু তা নয়। সবচেয়ে বড় অস্ত্র ওই ভিডিও ক্যাসেট। দেশে এখনও মানুষ আছে। সম্বরণ নিশ্চয়ইএকটা কিছু আঁচ করেছিল বলেই দিয়ে গেছে ওটা। সেটা এখন প্রতুলের জিম্মায় তার ফ্ল্যাটেই রয়েছে। প্রমাণ হয়তো আরও মিলবে। হয়তো জয়া ইতিমধ্যেই আরও কিছু জানিয়েছে। সেইজন্যই প্রতুলকে বসিয়ে এসেছে ফ্ল্যাটে। এদিকে নিনিরা তো রয়েইছে।

ফ্ল্যাটের দরজায় বেল দিতে গিয়ে রাহুল দেখল পাল্লার ফাঁক দিয়ে একচিলতে আলো। ভেতরে ঢুকে নিজেই দরজাটা টেনে দিল। প্রতুল বোধহয় ভেতরের ঘরে। রেস্ট নিচ্ছে।

দরজার পরদাটা ঠেলেছিল কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারেনি। ডাবল বেডের ওপর শুধু প্রতুল নয়, জয়াও আছে। হালকা নীল ও সবুজ রঙের এমব্রয়ডারির নকশাওলা বেডশিট দুটো শরীরের রক্তে ভেসে গেছে।

রাহুল পিছন ফিরে ড্রয়িংরুমের ক্যাসেট প্লেয়ারটার দিকে ছুটে এল। কার্পেটের ওপর হাঁটু মুড়ে বসেছে। হাতের চাপ যতই বেশি হোক নিরাসক্ত যন্ত্র তার স্বভাবসিদ্ধ অলসভঙ্গিতে মুখ হাঁ করল। কিচ্ছু নেই! ক্যাসেট উধাও!

'কী খুঁজছেন? ক্যাসেটটা? এই তো আমার কাছে রয়েছে।' সোনালি কোন স্বপ্নচূড়া থেকে মেঘের বাহনে ভেসে আসে মায়াবী শব্দ।

স্লো মোশন সিনেমার হরিণ শেষবার মাথা ফিরিয়ে যাচাই করে মরণের দূরত্ব। রিভলবারের নল।

সদ্য কন্যাশোকে কাতর জনৈক অধ্যাপক তার ভাইয়ের সঙ্গে প্রাক্তন পত্নীকে এক শয্যায় আবিষ্কার করার পর আত্মহারা হয়ে দু'জনকেই হত্যা করে এবং তারপরে আত্মহনন।

প্রভাতী দৈনিকপত্রের এই সংবাদ হয়তো কিছু পাঠকের চোখে পড়ে। কিন্তু এখন আর কেউ নেই যে, জানিয়ে দেবে উৎসুক নক্ষত্রচারী ডি-সেভেন-এর অপ্রতিহত যাত্রার কথা। নির্ভুল লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে রকেট তার শিশুযাত্রীদের নিয়ে। আর কর্ণিকা অপেক্ষা করছে পাঁচ বছর পরে একশো সতেরোজন ষোড়শীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

□ ১৯৮৯





সিলিকন দ্বীপের পোকা

শংকর ঘটক

অসম্ভব জোরে কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙল। ভালোভাবে ভোরের আলো ফোটেনি। এরকম একটি ব্রাহ্মমুহূর্তে কোন ব্রাহ্মণের আগমন ঘটতে পারে তা কড়া নাড়ার শব্দেই আন্দাজ করা গেছে।

এ আমাদের শ্রীমান অনুকূলচন্দ্র দাস না হয়ে যায় না।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুললাম।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। সামনে আকর্ণ দন্তকপাটি বিকশিত করে দাঁড়িয়ে আছেন মূর্তিমান। হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ।

'এত জোরে কড়া নাড়ে কেউ ? ভেতরে আয়।'

বলার অপেক্ষা না রেখেই গটগটিয়ে ব্যাগ হাতে ঘরে ঢোকে অনুকূল।

'তোমার মতো কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাতে অমনি করেই কড়া নাড়তে হয়।'

'এত সকালে কী উদ্দেশ্যে আসা হল ?' প্রশ্ন না করে পারি না আমি।

'দাঁড়া দাঁড়া, অত তড়বড় করিস না। আগে একটু জিরিয়ে নিই। গত আটদিন দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। একনাগাড়ে প্রায় চোদ্দ হাজার কিলোমিটার জার্নি করে, এই একটু আগে ক্যালকাটা এয়ারপোর্টে পা দিলুম।' জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলে অনুকূল।

অনুকূলের দরাজ কণ্ঠের হাঁকডাকে বোধহয় ঘুম ভেঙেছে সবারই। দিদি এসে দরজার কাছে দাঁড়াল একটু পরেই।

'ও, অনুকূল এসেছে ? তাই ভাবছি সাত সকালে এত হইহল্লা কিসের। এখন আবার কোথা থেকে আসা হল সাহেবের : মছলন্দপুর না মেসোপোটেমিয়া ?'

উত্তরটা শোনার জন্যে মোটেই দাঁড়াল না দিদি। যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল ফের পাশের ঘরেই। নতুন করে ঘুমের বন্দোবস্ত করতেই বোধ হয়। শোনা গেল মাকে বলছে, 'অনুকূল এসেছে। কোনও একটা মতলব আছে নিশ্চয়ই। ইডিয়েটটা এত জ্বালাতন করে ! ঘুমটার বারোটা বাজিয়ে দিল।'

'কী হচ্ছেটা কী ? শুনতে পাবে না ও-ঘর থেকে ?' মা ধমক দেন দিদিকে।

'শুনুক গে,' দিদির মেজাজ সপ্তমে, 'আসা-যাওয়ার সময়ের জ্ঞান নেই। ওকে অমনই

বলতে হয়।'

অনুকূলের কানে অবশ্যই পৌঁছেছে কথাটা। কিন্তু ওর কোনও ভাব বৈলক্ষণ্য নেই। জামা-টামা খুলে চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে রাখল। তারপর ওর ফোলিও ব্যাগটা খুলে তার ভেতর থেকে একটা নোংরা গামছা বার করে চান করতে চলে গেল।

চটপট চান সেরে ফিরে এল অনুকূল। গামছা দিয়ে মাথা ঘষতে ঘষতে ঘরে ঢুকল: 'রাসকেল, একটা বাথরুম বানাতে পারোনি এখনও ?'

'কে বললে রে কথাটা ?' বাবার রাশভারি গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'বাথরুম কার চাই ?'

বলতে বলতে বাবাও এ-ঘরে চলে এলেন।

'না না, কাকাবাবু। ওই, ওকেই বলছিলাম আর কি। এমনি এমনিই বলছিলাম—' অনুকূল আমতা আমতা করে।

'ওকেই বলো আর যাকেই বলো। আজকাল একটা ফ্যাশান হয়েছে। বাথরুম ! গায়ে তেল মেখে খোলা রোদে খলখল করে চান করবে তা না, বাথরুম ! অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে একটা জীবাণুর গোডাউন। এজন্যেই আধুনিক ছেলেমেয়েদের এমন বকতাড়ুয়ার মতো চেহারা। চর্মরোগে ভর্তি। ভিটামিন ডি পাবে রোদ্দুরে, বুঝেছ ?'

কথাটা আচমকা বলে ফেলে অনুকূল নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছে। নার্ভাস হয়ে গিয়ে চিরুনির পিছন দিকটাই তিন-চারবার মাথায় ঘষে ফেলল। তারপর উলটে নিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আড়চোখে দেখে নিল বাবা আছেন কি না। বাবা চলে যেতে ওর কথা ফুটল আবার।

'দিদি কী বলছিল রে ? কী মেসোপোটেমিয়া না কী যেন ?'

'সেটা দিদিকেই জিজ্ঞেস করিস। কিন্তু তুই এখন আসছিস কোথা থেকে ?'

'শুনবি, শুনবি। সবই শুনবি। একটু ধৈর্য ধর। আজ তো রোববার। কাজও নেই বাইরে। সারাদিন ধরে শুনিস সেসব।'

কিছুক্ষণ থেকেই একটা ফড়ফড় শব্দ পাচ্ছিলাম অনুকূলের ব্যাগের ভেতর থেকে। আবার সেই ফড়ফড়ানি শুরু হল। এবার অনুকূলও শুনল শব্দটা। শুনেই থমকে দাঁড়াল। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল আবার।

'কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছিস ব্যাগ থেকে ?'

'সে তো কখন থেকেই পাচ্ছি। তুই চান করতে গেলি, সেই তখন থেকেই।'

'অ্যাঁ ?' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াল অনুকূল। তারপরই ঝপ করে বসে পড়ল ব্যাগটার সামনে। আর ক্ষিপ্র হাতে চেন টেনে বন্ধ করে দিল ব্যাগের মুখটা।

কিন্তু তাতে ফড়ফড়ানি শব্দটা বেড়ে গেল যেন।

'সর্বনাশ হয়ে যেত এক্ষুনি।' ওর চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে : 'কেলেঙ্কারি হয়ে যেত একটা।'

'কী ওটা ?'

'একটা পোকা। সামান্য জিনিস। কিন্তু…' মুখের কথা তার মুখেই রয়ে গেল। কারণ ঠিক তক্ষুনি খাবারের প্লেট হাতে মা প্রবেশ করলেন।

'ভালো আছ তো, বাবা ? মা কেমন আছেন ?'

'মা ভালোই আছেন। আমিও ভালো। তবে…বড় জোর বেঁচে গেছি এবার। নেহাতই বরাত জোরে। আর-একটু হলেই…'

'ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই।' মাকে বেশ চিন্তিত মনে হল।

কখন যেন দিদি এসে দাঁড়িয়েছিল মায়ের পিছনে। ফিক করে মুচকি হেসে সে আবার পাশের ঘরে চলে গেল। বোধহয় বাবাকে ডেকে আনতে।

অনুকূল গম্ভীর। সে বলেই চলে :

'কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ শিলার ওপর দাঁড়িয়ে যদি দক্ষিণ দিক বরাবর সোজা তাকানো যায় তবে ভারত মহাসাগরের অসীম জলরাশির সৌন্দর্যে অভিভূত হতেই হবে। কিন্তু অনেকেই ছোট্ট একটা খবর জানেন না যে, ভারতবর্ষের এই প্রান্তভূমির পরে আর কোনও স্থলভূমি নেই। জাহাজ ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে পাড়ি দিলে সেই যাত্রা শেষ হবে দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে। দু- চারটে ছোটখাটো বিন্দুর মতো দ্বীপ ছাড়া এই বিশাল সমুদ্রে আর কিছুই ভেসে থাকতে দেখা যাবে না।

'এসব ছোটখাটো দ্বীপগুলোর মধ্যে যেগুলো অপেক্ষাকৃত বড় সেগুলোর নাম যে-কোনও স্কুলপাঠ্য মানচিত্রেই দেওয়া থাকে। আমরাও সেসব দ্বীপ অনুসরণ করেই এগুতে লাগলাম। মালদ্বীপের পর চাগোস, আর তারপরে মরিশাস। মরিশাস দ্বীপপুঞ্জের পরে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কোত্থাও কোনও স্থলভূমি নেই। শুধু জল আর জল। সেসব পেরিয়ে ক্রোজেট দ্বীপপুঞ্জ। আমাদের লক্ষ্যস্থল সেই ক্রোজেট দ্বীপপুঞ্জ।

'না, ঠিক ক্রোজেট নয়। ক্রোজেট থেকে দক্ষিণ অর্কনি পর্যন্ত যে-সরলরেখা টানা যায়, তার মধ্যবর্তী কোনও অঞ্চল। মানচিত্রে দেখানো না থাকলেও সেই অঞ্চলে ছোট ছোট অগুন্তি দ্বীপ আছে। ওই দ্বীপগুলো প্রকৃতির ঐশ্বর্য-সম্ভারে প্রাণবন্ত। ফলে বিশ্বের সবক'টি রাষ্ট্রের মতো আমাদেরও উদ্দেশ্য একই।'

সন্ত্রস্তভাবে এদিক ওদিক তাকায় অনুকূল। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলে, 'প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর সন্ধান। পৃথিবীতে এ-যাবৎ আবিষ্কৃত ইউরেনিয়াম-২৩৫-এর মোট পরিমাণ মাত্র কুড়ি লক্ষ টন। অথচ এই বস্তুটির গুরুত্ব আজকের দুনিয়ায় খুবই বেশি। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে এটি প্রচুর পরিমাণে আছে বলে সকলের অনুমান।

'ডক্টর ভার্সনেই-এর টেলিগ্রামটা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ডাইরেক্টর ডক্টর অজিত পেরেরা আমায় ডেকে পাঠালেন। বললেন, "দাস, তোমাকে আজ বিকেলের ফ্লাইটে বম্বে যেতে হবে। সেখান থেকে জাহাজ ছাড়বে পরশুদিন। তোমার বাড়ির ব্যাপারে কোনও সমস্যা থাকলে বোলো, আমরা ব্যবস্থা করব। আর এই অভিযানের ব্যাপারটা গোপন রেখ।"

'সবই হিসেবমতো ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু বিপদটা ঘটল হঠাৎই। একেবারেই জানান না দিয়ে।

'না, না, কোনও ঝড় বা তুষারপাত কিংবা ভূমিকম্প অথবা লুকিয়ে-থাকা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত নয়। ভোরবেলায় ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে, সমুদ্রের ক্লান্তিকর একঘেয়েমি কাটাতে একটা টেলিস্কোপ নিয়ে এদিক ওদিক দেখছিলেন ডক্টর ভার্সনেই। আমাদের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর। হঠাৎ তাঁর টেলিস্কোপ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে স্থির হয়ে গেল। তাঁর ভুরু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। এখানে এমন জিনিস তো থাকার কথা নয়! তবে কি হিসেবে গোলমাল? খুব বেশি হলে একশো কিলোমিটারের মধ্যেই যেন রয়েছে মনে হল।

'দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হল তাঁকে। হুকুম দিলেন : "জাহাজের গতিবেগ কমাও।"

'ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ রিফ্লেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করা হল সমুদ্রে ভাসমান বস্তুখণ্ডটি। কোনও ধাতব বস্তু বলেই মনে হচ্ছে। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে ওর গায়ে লেগে। জিনিসটার চারদিকটা তাই একটু বেশি উজ্জ্বল।

'তবে কি দুর্ঘটনায় পড়া কোনও জাহাজ ?

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বস্তুটার দিকে এগুতেই হবে। কিন্তু সাবধানে।

'কিছুক্ষণ পরেই আমরা টের পেলাম ভাসমান পদার্থ বলে যা মনে হচ্ছিল তা মোটেই ভাসমান নয়। এটা একটা দ্বীপ। অত্যন্ত ছোট মাপের,কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার মাত্র। দ্বীপটি জনমানবশূন্য, অথচ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। দ্বীপের উপকূলবর্তী অঞ্চল ধাতব পদার্থে তৈরি বলেই দূর থেকে দ্বীপটিকে চকচকে কোনও ভাসমান ধাতব বস্তু বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু দ্বীপটির বুকে সবুজের সমারোহ দেখে অবাক হতে হয়। ফুলে ফলে ভরে আছে।

'সমুদ্রের বুকে এরকম নতুন কোনও অজানা স্থলভূমি সম্পর্কে সমস্ত অভিযাত্রীরাই অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে থাকেন। আমরাও যথেষ্ট সাবধান ছিলাম। সকলেরই সঙ্গে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু কোনওরকম বিপদের সন্ধান সেখানে পাওয়া গেল না। মানুষের কথা বাদই দিলাম, কোনও প্রাণীরই অস্তিত্ব সেখানে নেই। বনেজঙ্গলে রসাল সব ফলের গাছ, ফল পেকে রয়েছে রঙবেরঙের শোভা ধরে। কেউ যে সেসব ফল খায় এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না।

'আমাদের দলে ডাক্তার ছিলেন সি কে আয়েঙ্গার। আমাদের অনুরোধে তিনি কিছু কিছু পাকা ফলের খাদ্য-উপযোগিতা সম্পর্কে পরীক্ষা চালালেন। আমরা তারপর নির্ভয়ে বেশ কিছু সুস্বাদু ফল খেয়েও ফেললাম।

'এইভাবেই সারাটা দিন কাটল। তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েও কোনওরকম প্রাণীর অস্তিত্ব ধরা গেল না। আমরা যখন প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে গেছি যে,এ-দ্বীপে কোনও প্রাণী নেই, ঠিক তক্ষুনি আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে উড়তে উড়তে এল একটা বিরাট পাখি। ডানা মেলে যখন ওড়ে তখন তার মাপ একটা টু-সিটার প্লেনের মতোই হয়।

'পাখিটা উড়তে উড়তে এসে বসল আমাদের থেকে পনেরো-কুড়ি মিটার দূরের একটা পাথরের টিলার ওপর। তারপর বেশ মন দিয়ে লক্ষ করতে লাগল আমাদের। আমরাও আমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলোকে তৈরি রাখলাম।

'পেরেরা নিচু স্বরে নির্দেশ দিলেন, "চরম অবস্থা ছাড়া কেউ অস্ত্র ব্যবহার করবেন না।" পাখিটা আমাদের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। আমরাও পাখিটার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। এ-অবস্থা চলল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আমাদের ফের অবাক করে দিয়ে পাখিটা একটা পেল্লায় পাথর ঠোঁটে চেপে ধরে উড়ে চলল বিশাল সমুদ্রের ওপর দিয়ে।

'"কাছাকাছি তাহলে আরও এরকম দ্বীপ আছে।" মন্তব্য করলেন ডক্টর পেরেরা।

'সকলেই একবাক্যে সায় দিল কথাটায়। অবশ্যই আছে এমন আরও দ্বীপ, এরই কাছাকাছি। তা যদি না থাকে তবে পাখিটা সমুদ্রের ওপর দিয়ে গেল কোথায় ? তাছাড়া ওই পাথরটা নিয়েই বা ও গেল কেন ? আমাদের অভিজ্ঞতায় পাখিরা এরকম জিনিসপত্র নিয়ে অবশ্য ওড়ে। কাঠ, কুটো, দড়ি, লোহার তার—এসব। বাসা বানায় এগুলো দিয়ে। কিন্তু ইট, সিমেন্ট, পাথর এইসব নিয়ে উড়তে দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না।

'এখানে কোনও প্রাণী নেই দেখে যতটা স্বস্তি আমরা পেয়েছিলাম ততটা স্বস্তি কিন্তু আর থাকল না। একটা পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে আমাদের যেন সাবধান করে দিয়ে গেল। অন্যান্য প্রাণীর থাকার সম্ভাবনাটা জানিয়ে দিয়ে গেল।

'আমাদের উৎসাহে ক্ষণিকের ভাটা পড়লেও কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আবার নতুন উদ্যমে কাজে লেগে গেলাম। জি এম কাউন্টার দিয়ে অনুসন্ধানপর্ব চলছে। সামান্যতম তেজস্ক্রিয়তার গন্ধ পেলেই সেখানে আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্প বসবে।

'হঠাৎই একটা তীব্র চিৎকারে আমাদের কাজ থেমে গেল। আমরা ছুটে গেলাম সুনন্দার কাছে। সুনন্দা আমাদের দলের একমাত্র মহিলা বিজ্ঞানী। গিয়ে দেখি, সুনন্দা দু' হাতে দু' কান চেপে ধরে থরথর করে কাঁপছে। আর ওর কাছ থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে একটা সাপ। সাপটা একটা ব্যাঙ খাচ্ছে।

'"তাহলে সব কিছুই আছে এখানে! কিছুই বাদ নেই দেখছি।" বিরক্তি ঝরে পড়ে অধ্যাপক চৌরাশিয়ার গলা থেকে।

'অতঃপর কর্মাধ্যক্ষের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে আমরা সমবেত প্রচেষ্টায় সরীসৃপটিকে সংহার করলাম।

'যত সহজে বললাম, কাজটা কিন্তু তত সহজে হয়নি। আমাদের সাপ মারার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কোনও ফলই পাওয়া গেল না। সাপটিও কেমন অদ্ভুত ধরনের। ব্যাঙটাও তাই। মনে হয় যেন চকচকে কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি। পালিশ করা ধাতুর মতো ঝলমল করছে সব সময়।

'আমাদের দেশে সাপ মারার পরে মৃত সাপটিকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। আমরা কেরোসিন, পেট্রল ইত্যাদি বহুরকম জ্বালানি ব্যবহার করেও সাপ-ব্যাঙ কোনওটিকেই পোড়াতে পারলাম না। আগুনে বিশেষ কোনও পরিবর্তনই হল না ওগুলোর। শেষ পর্যন্ত সাপ আর ব্যাঙের মৃতদেহ দুটো আমরা জাহাজে নিয়ে এলাম। আমাদের রসায়নবিদ সুপ্রকাশ চাকলাদারের হাতে তুলে দিলাম বিশ্লেষণের জন্যে। এবং চাকলাদারমশাই কালবিলম্ব না করে তাঁর রসায়নাগারে ঢুকে গেলেন।

'আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি ফলাফলের আশায়। ঘণ্টা দুয়েক পরে বেরিয়ে এলেন সুপ্রকাশবাবু। হাসি হাসি মুখে ডক্টর পেরেরাকে জানালেন: "স্যার, এটাই সেই সিলিকন দ্বীপ, যার অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকলেও এতকাল খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

'বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করলেন এবার সুপ্রকাশ। সারাংশটা এরকম: আমাদের পরিচিত প্রাণ-জগৎ, যেমন গাছপালা, পশু-পাখি বা মানুষ, সবই কার্বনভিত্তিক। কার্বনের একটা বিশেষ ধর্মের ফলেই এই সমগ্র প্রাণিজগতের উৎপত্তি। এই বিশেষ ধর্মটির নাম ক্যাটিনেশন—কার্বন পরমাণুগুলোর পরস্পরের সঙ্গে অগুন্তি সংখ্যায় হাত ধরাধরি করে দাঁড়াবার ক্ষমতা। এই বিশেষ ক্ষমতার ফলেই কার্বনের শৃঙ্খলায়িত সরলতম যৌগ থেকে আরম্ভ করে প্রোটিনের মতো জটিল অণুর সৃষ্টি হয়। এইভাবেই তৈরি হয়েছে কার্বন-ওয়ার্ল্ড। যতগুলো মৌল আমাদের জানা আছে তার মধ্যে আর যে-মৌলটির এ ভাবে শৃঙ্খলায়িত অণু গঠনের ক্ষমতা আছে সেটি হল সিলিকন। কার্বন-ওয়ার্ল্ডের প্রাণি জগতের মতো সিলিকন-ওয়ার্ল্ডের প্রাণিজগৎ থাকতে পারে কি না এ-নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে।

'কার্বন-জগতের প্রাণীরা যেমন জৈব পদার্থ বা কার্বনঘটিত পদার্থকেই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বেঁচে থাকার জন্যে, সিলিকন জগতের প্রাণীরাও তেমনই সিলিকনঘটিত পদার্থকেই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। এরা খাবে সিলিকা-রক, বালি, কাচ ইত্যাদি। পাখিটা যে-পাথরের টুকরো নিয়ে উড়ে গেল খাবার জন্যে, ওটি নিশ্চিত সিলিকা-রক।

'"তার মানে সাপটাকে পোড়ানো যাবে না?" প্রশ্ন করল আয়েঙ্গার।

'"অবশ্যই নয়। কার্বনঘটিত যৌগকে সহজেই কার্বন ডাই-অক্সাইড আর জলে পরিবর্তিত করা যায়। গ্যাসীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড আর বাষ্পীয় জল বাতাসে মিশে যায়। তাই পোড়ালেই সব শেষ। শুধু সামান্য কিছু অজৈব পদার্থ ছাই হিসেবে পড়ে থাকে। কিন্তু সিলিকনঘটিত প্রাণীকে পোড়ালে হবে সিলিকন ডাই-অক্সাইড। এটি কঠিন পদার্থ, তাই উড়ে যাবে না।"

'ব্যাখ্যাটা শোনার পর অনেকেরই মুখে হাসি ফুটল। যাক, তাহলে এইসব প্রাণীরা আমাদের আক্রমণ করবে না। কার্বন-জগতের সঙ্গে ওদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক নেই।

'নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা জাহাজেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল চারদিকে। জাহাজে কয়েকটা বাতি জ্বলছে। এছাড়া সব অন্ধকার। ডক্টর পেরেরার নির্দেশে রাতে জাহাজ ছেড়ে যাওয়া চলবে না। তাই আমরা সবাই জাহাজে। এখানে সেখানে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছি। দ্বীপটির পাশেই আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে।

'দিগন্তবিস্তৃত অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে আমাদের ছোট্ট জাহাজটা মোচার খোলের মতো দুলছে। আমরা ক'জন বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিমান প্রাণী সেখানে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে, পৃথিবী ছাড়িয়ে আমরা যেন কোনও এক অজানা অচেনা অদ্ভুত জায়গায় হাজির হয়েছি। নিতান্ত অসহায় কয়েকটা প্রাণের স্পন্দন।

'খেয়াল করলাম, দ্বীপটি কিন্তু নিস্তব্ধ নয়। একটা মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে দ্বীপ থেকে। ধীরে ধীরে সেই গুঞ্জন কোলাহলে রূপ নিল। যতই সময় যাচ্ছে শব্দও যেন ততই বাড়ছে।

'আমাদের সবাইকে অবাক করে একটা বিরাট পাখি এসে জাহাজের মাথার ওপরে ঘুরপাক খেতে লাগল। যেন কোনও বদ মতলব আছে ওটার।

'আমরাও যথাসাধ্য তৈরি হলাম। কিন্তু আমাদের আবার অবাক করে দিয়ে পাখিটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একটি নয়, শ'য়ে শ'য়ে পাখির এক বিশাল দল আমাদের লক্ষ করে ছুটে আসছে। ভয়ঙ্কর তাদের গতি।

'কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমরা অধ্যক্ষ-পরিচালকের কাছে গেলাম। পেরেরাকেও খুবই চিন্তিত মনে হল। তিনি অবশ্য বারবার আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন।

'পাখিগুলো চক্রাকারে আমাদের মাথার ওপর ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে অনেক নিচে নেমে এল। তারপর তারা একসঙ্গে দ্বীপের ওপরে গিয়ে বসল।

'এবার আমাদের অপেক্ষা করার পালা। এতক্ষণে আমরা নিশ্চিত জেনে গেছি যে, একটা আক্রমণের মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে। হালকা চাঁদের আলো-আঁধারি পরিবেশে আমরা ক'জন মানুষ উত্তেজনায় দমবন্ধ করে প্রহর গুনছি।

'প্রহর গোনা এক সময় শেষ হল। আমাদের আশঙ্কা সত্যি প্রমাণ করে সেই পাখির দল আমাদের জাহাজ আক্রমণ করল। মনে পড়ে গেল হিচককের সেই বিখ্যাত ছবি "দ্য বার্ডস"-এর কথা। পেরেরা বললেন, "এই ভয়টাই করছিলাম। এই দ্বীপের পাথরগুলো সবই সিলিকা জাতের। আয়রন খুবই কম। আর আয়রন ছাড়া সিলিকন-জগৎই হোক আর কার্বন-জগৎই হোক, কোনও প্রাণীরই কোষকলা পূর্ণ হয় না। এদের তাই আয়রনের প্রতি প্রচণ্ড টান থাকাটাই স্বাভাবিক।"

'আমরা একই সঙ্গে আমাদের অস্ত্র ব্যবহার করলাম। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটল পাখিগুলোকে লক্ষ করে। সারা আকাশ ছেয়ে গেছে অতিকায় সব পাখিতে। ওদের

সমবেত শব্দ নিশুতি রাতের সমুদ্রের গর্জনকেও ছাপিয়ে উঠছে। আমাদের গুলি ছোড়ায় কিন্তু কোনও ফলই হল না। সাময়িকভাবে একটু পিছু হটলেও ওরা আবার নতুন উদ্যমে আক্রমণ করল আমাদের জাহাজ। জাহাজের লোহার অংশেই ওদের লোভ যে বেশি, সেটা বেশ টের পেলাম।

'ওদের সমবেত আঘাতের প্রচণ্ড সঙ্ঘাত সহ্য করতে না পেরে আমাদের জাহাজটিতে শেষ পর্যন্ত ফাটল ধরল। কন্ট্রোল রুম থেকে বেতারে সাহায্যের জন্যে আবেদন করা হল চারদিকে। অবশেষে একটা জাপানী জাহাজ থেকে উত্তর এল।

'আমরা তখন আতঙ্কে-উত্তেজনায় কাঁপছি। যদি ওরা জানতে পারে যে শুধু লোহার জাহাজ নয়, কার্বন-জগতের প্রাণীদের শরীরেও লোহার যৌগ আছে, তাহলেই সর্বনাশ।

'সুপ্রকাশ গভীরভাবে চিন্তামগ্ন। পেরেরা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। আমরা শেষ চেষ্টা হিসেবে সমানে ফায়ার করে চলেছি। যদিও তাতে বিশেষ কোনও কাজ হচ্ছে না।

'এদিকে জাহাজে জল ঢুকতে শুরু করেছে। লাইফবয়গুলো আমাদের দেহের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। শেষ পর্যন্ত যদি জাপানী জাহাজটা উদ্ধার করতে পারে এই আশায়। কিন্তু তাতেও বিপদ। পাখিগুলো জাপানী জাহাজকেও নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে না।

'হঠাৎই সুপ্রকাশ যেন ধ্যান ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে তিনি গেলেন তাঁর গবেষণাগারে। জাহাজ মেরামতির পর রঙ করার জন্যে আমাদের একটা স্প্রে-গান ছিল। সেটি নিয়ে এসে কম্প্রেসারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। তারপর তিনি নিয়ে এলেন প্লাস্টিকের ড্রামে ভর্তি এক ড্রাম তরল পদার্থ।

'"এটাকে স্প্রে করতে হবে পাখিগুলোর দিকে।" বললেন সুপ্রকাশ।

'আমরা দ্রুতগতিতে কাজে লাগলাম। এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, স্প্রে করার সঙ্গে সঙ্গেই পাখিগুলো মরে যাচ্ছে। যেন মশা মারা হচ্ছে রাসায়নিক স্প্রে করে। ক্রমাগত দু'ঘণ্টা ধরে চলল এ-লড়াই। বহু পাখি মারা গেল। অন্যেরা রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরে গেল সেই অজানা দ্বীপে।'

বাবা-ই প্রথম কথা বললেন, 'তোমাদের স্প্রে-তে কী ছিল ? বেগন স্প্রে নিশ্চয়ই নয় !'

'কী যে বলেন, কাকাবাবু, বেগন স্প্রে-তে কখনও পাখি মরে ? ওটা ছিল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। সিলিকার পরম শত্রু। সিলিকার গায়ে এই রাসায়নিকটি একবার লাগালেই হল। কাজ শেষ।'

'তারপর তোমরা ফিরলে কীভাবে ?' মায়ের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

'পুরোটা জানি না। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম, এ-পর্যন্ত জানি। জ্ঞান ফেরার পর দেখি জাপানী জাহাজে শুয়ে আছি।'

হঠাৎ অনুকূল হাতঘড়ির দিকে তাকায় : 'বনগাঁ লোকালেই ফিরব। এবার উঠি। মা চিন্তা করবেন।'

তারপর আমার দিকে নজর পড়ে ওর : 'হ্যাঁ, যে-জন্যে এসেছিলাম। তুই তো কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সে আছিস। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখিস তো এদের সিলিকাটা কোন স্টেটে আছে !' ব্যাগ খোলে অনুকূল। একটা কাগজের মোড়ক বার করে : 'এটাতে মুড়েই এনেছি। একটা পোকা। ওই দ্বীপের প্রাণী। শিশিতে ভরে কাগজে মুড়ে প্যান্টের পকেটে রেখেছিলাম। এখনও বেঁচে আছে।'

কাগজের মোড়কটা খুলতেই একটা বোলতার সাইজের পতঙ্গ ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেল জানলা দিয়ে। মোড়কে পড়ে রইল শুধু একটা ছিপি।

'ছিঃ ছিঃ, কী বোকামিই করেছি রে! কাচের শিশিতে পোকাটাকে রেখেছিলাম! কাচ তো সিলিকন যৌগ। সবটাই খেয়ে ফেলেছে পোকাটা। নেহাত ছিপিটা প্লাস্টিকের, তাই পড়ে আছে।' কেমন বোকা বোকা দেখায় অনুকূলকে : 'যাকগে, এবার উঠি।'

অনুকূল চলে যাওয়ার পর মেঝে থেকে একটা টিকিট কুড়োয় দিদি। মছলন্দপুর থেকে শেয়ালদা আসার লোকাল টিকিট। আজকের। দিদি মুচকি হেসে টিকিটটা বাবার হাতে দিল। বাবা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে টিকিটটা দেখে হেসে ফেললেন। 'ঘনাদার পুরো নামটা কি রে?' শুধোন তিনি।

'ঘনশ্যাম দাস।' আমি জবাব দিই।

'সাবাস অনুকূলচন্দ্র দাস!' বাবা ছোট ছেলের মতো মন্তব্য করেন।

□ ১৯৮৪





রঙ

অমিত চক্রবর্তী

নকুড়বাবু সশব্দে হাঁই তুললেন। হাঁই উঠলেই ওঁর চোখে জল আসে, সুতরাং হাঁ বন্ধ হতেই ধুতির কোঁচাটা চোখের কোলে উঠে এল যথানিয়মে।

গত তিরিশ বছর ধরে আমাদের এই আধা-মফঃস্বলের সবেধন কলেজটিতে অধ্যাপনা করছেন নকুড়বাবু।

আমাদের মধ্যে অবনীর বয়েস সবচেয়ে কম ; ছেলেমানুষই বলা যায়। বছর কয়েক আগে নকুড়বাবুর কলেজ থেকে বেরিয়েছে। কলকাতায় মেসে থেকে চাকরি করে, আর ছুটিছাটায় বাড়ি এলে গুটি গুটি আমাদের আড্ডায় এসে হাজির হয়।

সকালের কাগজে উড়ন্ত চাকির যে-খবরটা বেরিয়েছে তা থেকেই আলোচনার সূত্রপাত। অবিনাশদার বক্তব্য : এ-যাবৎ উড়ন্ত চাকি দেখতে পাওয়ার যত ঘটনা ছাপা হয়েছে তার কিছু গুজব, কিছু মানুষের দেখার ভুল, আর বেশিরভাগটাই খবরের কাগজের সম্পাদকের মগজ থেকে বেরিয়ে আসা খোশগল্প ; উদ্দেশ্য—কাগজের বিক্রি বাড়ানো।

অবিনাশদার কথার মাঝখানেই নকুড়বাবু দুম করে বলে উঠলেন, 'হার্লো স্যাপলির নাম শুনেছ ? আমেরিকার এক নামজাদা জ্যোতির্বিদ। স্যাপলি সাহেবের মতে, মহাবিশ্বে সূর্যের মতো তারার সংখ্যা ১-এর পর ২০টা শূন্য বসালে যা দাঁড়ায় ঠিক তাই। ওদের মধ্যে হাজারে একটারও যদি সূর্যের মতো গ্রহজগৎ থাকে তাহলে অন্তত দশ লক্ষ গ্রহ-উপগ্রহে মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীর বিচরণ করে বেড়ানোর কথা।'

বিষয়টা আমাদের কাছে নতুন, তাই হাঁ করেই কথাগুলো শুনছিলাম। নকুড়বাবু বললেন, 'তা দশ লক্ষের কথা জানি না, তবে পৃথিবী ছাড়া অন্তত আরও একটা গ্রহে যে বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে তার সাক্ষী আমি নিজেই।'

নকুড়বাবুর কথা শেষ হতে না হতেই দপ করে নিভে গেল আলোটা।

অবিনাশদা বলল, 'বেচারা হ্যারিকেনের আর দোষ কী ? নকুড়দা মাঝে মাঝে এমন সব গুলগপ্পো ঝাড়েন যে, আমাদেরই "ফিউজ" হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়।'

প্রথমে অবনীর ফিক করে হাসির আওয়াজ, আর তারপরই শোনা গেল নকুড়বাবুর গম্ভীর গলা, 'ওহে, একটু দেশলাইটা জ্বালো তো, দরজাটা খুলি। আজ একটু তাড়াতাড়ি ফেরার কথা ছিল।'

জমাটি আড্ডাটা ভেঙে যাচ্ছে দেখে আমি প্রায় মরিয়া হয়ে উঠলাম :'তা কী করে হয় ? ঘটনাটা যে...'

'উঁহু। ওসব গালগপ্পো শুনে আর সময় নষ্ট করবে কেন ?' নকুড়বাবুর কথায় অভিমানের সুর।

অবিনাশদা খুশি খুশি গলায় বলল, 'আমি বরং ভেতরে গিয়ে আর-এক রাউণ্ড চায়ের কথা বলে আসি।'

আমাদের তোষামোদের জন্যেই হোক কিংবা আবার চা আসার সম্ভাবনাতেই হোক, নকুড়বাবু রাগটা সামলে নিলেন। আমার দিকে একবার জুলজুল করে চেয়ে মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বললেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী বোমার আতঙ্কে কলকাতা একেবারে জনমানবশূন্য হয়ে গেছিল, শুনেছ নিশ্চয়ই। আমার তখন গোঁফ ওঠার বয়েস, সবে স্কুলের গণ্ডি ডিঙিয়ে কলেজে ঢুকেছি। কলকাতায় বিধবা পিসির বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ি। বাবার রেলের চাকরি, তখন হাজারিবাগে পোস্টেড। কলকাতায় যেদিন বোমা পড়ল তার ঠিক তিনদিন পরে বাবার চিঠি পেলাম। পত্রপাঠ পিসিমাকে নিয়ে বাবার ডেরায় চলে আসার নির্দেশ ছিল সে-চিঠিতে। আমার যে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল তা নয়, তবে বাবার চিঠিকে অগ্রাহ্য করার সাহসও ছিল না। অতএব দেরি না করে তল্পিতল্পা নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম।'

'তাহলে ভিনগ্রহবাসীর সঙ্গে মোলাকাতটা হয়েছিল হাজারিবাগেই ?' অবিনাশদা দুম করে জিজ্ঞেস করে।

নকুড়বাবু খেঁকিয়ে উঠলেন, 'নয় তো তুমি কি ভেবেছিলে অন্য গ্রহ থেকে কেউ আমার কলকাতার শোবার ঘরে এসে হাজির হয়েছিল ? একে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগের ঘটনা, তার ওপর তুমি ফোড়ন কেটে খেইটাই হারিয়ে দিচ্ছ।'

নকুড়বাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই চা এসে গেল। অবিনাশদা নিজেই নকুড়বাবুর দিকে প্রথম কাপটা এগিয়ে দিল।

'যা বলছিলাম,' চায়ের খালি কাপটা চেয়ারের নিচে নামিয়ে রেখে নকুড়বাবু তাঁর কাহিনী শুরু করলেন :

'হাজারিবাগ রোডকে তখন বড়সড় একটা গ্রামই বলা চলে। রেল লাইনের পশ্চিমদিকে ঘরবাড়ি, স্কুল, পোস্টাপিস, হাটও বসে সপ্তাহে দু'দিন। আর পুবদিকে গ্রামের আশেপাশে বিশ-তিরিশ বিঘে চাষের জমি বাদ দিলে গোটা এলাকাটা জুড়েই শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল।

'কলকাতার আড্ডা আর বন্ধুবান্ধব ছেড়ে হাজারিবাগের মতো নির্জন জায়গায় গিয়ে থাকতে হলে কারওরই ভালো লাগার কথা নয়। তবে ক্রমে ওখানকার নির্জনতা সয়ে এল। শুধু তাই না, রোজ দুপুরে জঙ্গলে ঘোরার নেশাও যেন পেয়ে বসল। জঙ্গলের মধ্যে পায়ে-চলা পথ ধরে একটু এগোলেই পাহাড়ী টিলার গায়ে ছোট্ট ঝরনা। ঝরনার নিচে জল জমে ছোটখাটো একটা পুকুরের চেহারা নিয়েছে। ঝরনার ধারে পাথরের ওপরে বসলে চারপাশে গাছগাছালির মাঝে টলটলে পুকুরটাকে ঠিক ছবির মতো লাগত। ওই দেহাতী গাঁ থেকে এক জংলী সাকরেদও জুটে গেল—নাম বুধুয়া।

'মাস দেড়েক পরের ঘটনা। খবর পেলাম, কলেজ খুলে গেছে। কলকাতায় বোমার আতঙ্ক তখন অনেকটা ফিকে হয়েছে। আমিও ফিরে আসার জন্যে তোড়জোড় শুরু করলাম।

'যেদিন ফিরব, তার দিন দুই আগে বুধুয়া এসে ধরল আমায়। জঙ্গলের ভেতরে একটা

বিশেষ ফুলের গাছ দেখানোর জন্যে ও একেবারে নাছোড়বান্দা।

'তা গিয়ে দেখি, নয়নমনোহর দৃশ্যই বটে! চারপাশে হালকা আর ঘন সবুজ গাছগাছালির মাঝে এক বিশাল জারুলগাছ বেগুনি রঙের ফুলে ছেয়ে আছে।

'পায়ে পায়ে জঙ্গলের কতটা ভেতরে চলে গিয়েছিলাম তা টের পেলাম ফেরার সময়। বিকেল পড়ে আসছিল। জঙ্গলের মাঝে এমনিতেই আলো কম থাকে. ঝরনার কাছটায় এসে পৌঁছতেই চারপাশ আবছা হয়ে এল। হনহন করে হাঁটছিলাম। ঝরনাটাকে পাশ কাটিয়ে নেমে আসার সময় নিচের জলার দিকে নজর পড়তে চমকে উঠলাম। সামান্য যা আলো আছে তাতেও ওখানকার জলটা চিকচিক করার কথা, তার বদলে মনে হল—পুরো জলাটাই যেন কোনও কিছুর নিচে চাপা পড়েছে। একবার মনে হল জলার কাছটায় নেমে গিয়ে ভালো করে দেখি, কিন্তু তখন ফেরার তাড়া। পরের দিন আসব মনে করে বাড়ির দিকেই পা বাড়ালাম।

'মিনিট দুয়েক হেঁটেছি কি হাঁটিনি, হঠাৎ মনে হল কে যেন পিছন থেকে ডাকছে। ফিরে দেখি,ঝরনারধারে পাথরের ওপর কে যেন বসে আছে। আবছা আলোয় মনে হল, লোকটার সারা শরীরটা যেন আঁটো জামা-কাপড়ে ঢাকা।

'ভালো করে দেখব বলেই পাথরটার দিকে এগোচ্ছিলাম। দু'পা যেতে না যেতেই যেন অদৃশ্য কোনও দেওয়ালে ধাক্কা খেলাম!

'"উ জরুর চুড়হিন হ্যায়। এক দম মৎ যাবে।"

'দেহাতীদের ভাষায় "চুড়হিন" মানে ভূত। বুধুয়ার ফ্যাকাসে মুখ দেখে বুঝলাম, পাথরের ওপর বসে থাকা লোকটা যে ভূত ছাড়া আর কিছুই নয়,সে-ব্যাপারে ও নিঃসন্দেহ।

'বেঁটেখাটো লোকটার মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। আমার অবশ্য মনে হল, লোকটা নির্ঘাত জাপানী সোলজার—নির্ঘাত উড়োজাহাজ ভেঙে জলার ওপর পড়েছে।

'লোকটা যেন আমার মনের কথা শুনতে পেল। স্পষ্ট শুনলাম, ও যেন বলল, "উঁহু, জাপান নয়, আমি আসছি..." বলেই আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

'বুধুয়া আমায় তাড়া দিল, "হা কইরকো কা দেখাতিস ? জলদি ঘর চল্।"

'বুঝলাম, লোকটার কথাগুলো যে-কোনও কারণেই হোক বুধুয়ার কানে পৌঁছয়নি। অথচ আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, লোকটা বলে চলেছে, "তোমাদের হিসেবে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল ধরে এগোলে দশ বছর দশ মাস সময়ে যতটা দূরে যাওয়া যায়, সোজা রাস্তায় চললে আমাদের গ্রহ তোমাদের এই সৌরজগৎ থেকে ঠিক ততটা দূরে।"

'লোকটাকে ভিনগ্রহের অধিবাসী বলে ভাবতে মন চাইছিল না, কিন্তু সেইসঙ্গে লোকটার মনের কথা বুঝে ফেলার ক্ষমতাকেও পার্থিব বলে মনে হচ্ছিল না। জিজ্ঞেস করলাম, "পৃথিবীতে এসে নামলে কেন ?"

'"তোমাদের পূর্বসুরিরা কেন সমুদ্র অভিযানে বেরুত ?" লোকটা পালটা প্রশ্ন করল আমায়।

'"তাঁদের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করা। সেসব দেশের অচেনা মানুষদের রীতিনীতি আচার-আচরণ সম্পর্কে জানা।" আমি উত্তর দিলাম।

'"আসল উদ্দেশ্যটাই তো বললে না। পৃথিবীর সমুদ্র অভিযাত্রীরা নতুন দেশের খোঁজে বেরুত সেখানে নতুন করে উপনিবেশ গড়তে। আমাকেও ওইসব উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে।"

'"তার মানে ?" আমি চমকে উঠি : "তোমরা পৃথিবী দখল করবে নাকি

'"তাতে অবাক হওয়ার কী আছে ?" লোকটার কথা শুনতে পাই : "তোমাদের গ্রহেও তো যে-দেশ বেশি শক্তিশালী, কারিগরি সভ্যতায় যে একটু এগিয়ে আছে—অপেক্ষাকৃত দুর্বল আর অনুন্নত দেশগুলোকে অধিকার করে নেওয়ার হক তো তার থাকেই। তোমাদের এখানে তাই তো হয়ে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। এখন যে যুদ্ধ চলছে তাও তো ওই কারণেই। তা ব্যাপারটা তো আমাদের ক্ষেত্রেও খাটা উচিত। বিজ্ঞান আর কারিগরিতে আমরা যখন তোমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছি, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র যখন তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত, তখন পৃথিবী দখল করতে আর বাধা কোথায় ?"

'"কী লে চুপ করকে খাড়া আহিস ? চল্, জলদি ঘর চল্ !"

'দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বুধুয়া অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। চলেই আসছিলাম। লোকটা আবার পিছন থেকে ডাকল।

'"ঘাবড়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে ? আরে নিশ্চিন্ত থাকো, অন্তত আমাদের গ্রহবাসীরা কোনওদিনই এখানে উপনিবেশ গড়তে আসবে না। এ-গ্রহ আমাদের পক্ষে অনুপযুক্ত।"

'"কেন ?" ওর কথায় আমি অবাক হয়েছিলাম : "তুমি তো দিব্যি আমাদের মতোই দেখতে। এখানকার বাতাসে শ্বাস নিতেও নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে না..."

'"হ্যাঁ, তা ঠিক। বেঁচে থাকতে হলে যে-দুটো জিনিসের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেই কার্বন আর অক্সিজেনের অভাব নেই এখানে। তবু যা দেখলাম তাতে এ-গ্রহের মায়া না কাটিয়ে উপায় নেই। বলতে গেলে, তোমাদের সঙ্গে দেখা হল তাই, না হলে এতক্ষণে আমার রওনা দেওয়ার কথা।"'

দরজায় ঠক ঠক করে আওয়াজ হতেই ফিরে দেখি, গোবর্ধন। নকুড়বাবুর দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'কর্তা, রাত অনেক হল, এবার বাড়ি চলেন। মা ঠাকরুন ভাত নিয়ে বসে আছেন।'

হাঁ হাঁ করে উঠল অবিনাশদা, 'আরে, ভেবেছটা কী ? গপ্পোটা শেষ না করলে ওঁকে বাড়ি যেতে দিচ্ছে কে ?'

নকুড়বাবুর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ভুলটা বুঝতে পারল অবিনাশদা। বলল, 'আপনি এত রেগে যান কেন ? গপ্পো নয়, আপনার ওই সত্যি ঘটনার শেষটা তো বলবেন !'

'শেষ তো হয়েই গেছে।' নকুড়বাবু উদাসীনভাবে জবাব দিলেন, 'সেদিন ফিরে এসে কাউকে কিছু বলিনি। পরের দিন ঝরনাটার ধারে গিয়ে দেখি, জলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ। আশেপাশের কিছু গাছও পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে। স্থানীয় লোক যারা এসেছিল তারা গাছপালা পুড়ে যাওয়ার সঙ্গে দাবানলের সম্পর্কের কথা বললেও জলাটা রাতারাতি শুকিয়ে যাওয়ার কোনও বিশ্বাসযোগ্য কারণ খুঁজে পায়নি। ওদের যদি বলতাম ভিনগ্রহের এক মহাকাশযান এসে ওই জলার ওপর নেমেছিল, ফিরে যাওয়ার সময় তার জ্বালানি পুড়ে যে-তাপ তৈরি হয়েছিল তাতেই জলাটা বাষ্প হয়ে উবে গেছে—আমার কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করত না ওরা। অনেকদিন পরে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করতে গিয়ে দেখেছিলাম, মহাকাশের সেই আগন্তুক তার গ্রহের দূরত্বের যে-হিসেব দিয়েছিল তাতে "এপসিলন এরিডানি" নক্ষত্রলোক থেকে ওর আসার কথা। আমাদের এখান থেকে নক্ষত্রটার দূরত্ব ১০·৭৬ আলোকবর্ষ। কিছুদিন আগে এক খবরে হয়তো দেখেছ, আমাদের কাছাকাছি যেসব নক্ষত্রজগতে বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে বলে নাসা-র সায়েন্টিস্টরা মনে করেন,

"এপসিলন এরিডানি" তাদের অন্যতম।'

'কিন্তু পৃথিবীকে লোকটা বাসযোগ্য বলে মনে করল না কেন ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সে-প্রশ্ন আমি করেছিলাম।' নকুড়বাবু বললেন, 'উত্তরে লোকটা ভারি অদ্ভুত কথা বলেছিল। আমাদের এখানকার সবুজ গাছপালা আর নীল আকাশ, মানে সবুজ এবং নীল রঙের এত ছড়াছড়ি ওদের নাকি সহ্য হবে না। আমরা যখন চলে আসছি, লোকটা হঠাৎ বলল, "ওই ছেলেটার হাতে যে-ফুলগুলো ধরা আছে, ওদের রঙ কি নীল ?"

'বুধুয়ার হাতে ধরা জারুল ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বললাম, "না, নীল নয়, ওগুলোর রঙ বেগুনি। তবে ধারের দিকে একটু নীলের আভা রয়েছে।"

'হঠাৎ দেখি বুধুয়া ফুলগুলোকে মাটিতে নামিয়ে রাখল।

'ফিরে আসার সময় জিজ্ঞেস করলাম, "কি রে, ফুলগুলো রেখে এলি যে ?"

'"কা তোঁহে নেহি শুনলে, তো কে সব ফুল রাইখ দেবেখ কহলক ?" বুধুয়া উত্তর দিল।

'বুঝলাম, ভিনগ্রহের বাসিন্দাটি এতক্ষণ ধরে আমাকে যা বলেছে তা ওর কানে না পৌঁছলেও, ফুল নামিয়ে রাখার নির্দেশটা শুনতে ওর অসুবিধে হয়নি।

'ব্যাস, আমার কথা ফুরুল।' বলেই নকুড়বাবু উঠে দাঁড়ালেন।

অবনী বলল, 'একটু দাঁড়ান স্যার, রহস্যটা পরিষ্কার হল না। লোকটা বুধুয়াকে ফুলগুলো নামিয়ে রাখতে বলল কেন ?'

'এটাও বুঝলি না ?' নকুড়বাবু পায়ে জুতো গলালেন : 'আলোর বর্ণালীর কথা মনে নেই ? জানিসই তো, আমাদের চারপাশে নানান ধরনের যে অসংখ্য তরঙ্গ ছুটে বেড়ায় তার একটা সামান্য অংশকেই আমরা দেখতে পাই। এগুলোই হলো দৃশ্য-আলো। দৃশ্য-আলোকে ভাঙলে মেলে সাতটা রঙ। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ছোট থেকে বড় হিসেবে সাজালে বেগুনি, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। ভিনগ্রহের যে-মানুষটি এসেছিল,তার প্রজাতির মানুষদের চোখের রঞ্জক কোষগুলো আমাদের থেকে নিশ্চয়ই একটু আলাদা। ওদের বর্ণালীতে হয়তো রঙ শুরু হয় আকাশী-নীল থেকে। জারুল ফুলের বেগুনি রঙ ওদের কাছে অদৃশ্য, শুধু তার নীলচে আভাটুকুই লোকটার চোখে পড়েছিল। নমুনা হিসেবে ফুলগুলোকে যে ও সঙ্গে নিয়ে যাবে সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'কিন্তু সবুজ গাছপালা কিংবা নীল আকাশ ওদের চোখে সহ্য হবে না কেন ?' অবনী আবার জিজ্ঞেস করে।

'বিশেষজ্ঞরা কী বলবেন জানি না, তবে আমি নিজে এর একটা উত্তর খাড়া করেছি।' নকুড়বাবু বললেন, 'খেয়াল করলে দেখবি বর্ণালীর দু'প্রান্তে যে-রঙ দুটো রয়েছে, অর্থাৎ বেগুনি আর গাঢ় লাল, এদের ক্রমাগত দেখতে বাধ্য হলে আমাদের মধ্যে একটা অস্থিরতা আসে। কোথায় যেন পড়েছিলাম, এক জেলখানার ঘরের দেওয়ালে গাঢ় লাল রঙ বোলানোর ফলে কয়েদিদের মধ্যে অপরাধ করার ইচ্ছেটা বেড়ে গেছিল। এমনকি, চোত-ফাগুনের সময় পলাশ-কৃষ্ণচূড়া ফুলে যখন গাছগুলো ছেয়ে থাকে, তখন তার দিকে একনাগাড়ে তাকিয়ে দেখিস, বেশ অস্বস্তি হয়। তাহলেই ভাব, আমাদের আকাশ বা সমুদ্রের রঙ যদি হত বেগুনি আর ঘাস-পাতা-গাছের রঙ হত লাল, আমাদের অবস্থাটা অসহ্য হয়ে উঠত কি না ! সুতরাং বর্ণালীর মাঝামাঝি যারা আছে সেই আকাশী-সবুজ-হলুদ রঙই আমাদের চোখে সবচেয়ে ভালো সয়। তবে এর আসল কারণটা লুকিয়ে আছে আমাদের চোখের রঞ্জক কোষের ধর্মের মধ্যে।'

ঘর নিস্তব্ধ। সবাই দেখলাম নিবিষ্ট মনে কথাগুলো শুনছেন। নকুড়বাবু বলে চললেন, 'ভিনগ্রহবাসীদের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। ওদের বর্ণালীর শুরু আকাশী থেকে। ফলে যে-রঙ আমাদের চোখে সবচেয়ে আরামের, তা-ই ওদের কাছে অসহ্য! ওদের বর্ণালীর মাঝামাঝি জায়গায় হয়তো রয়েছে কমলা আর লাল রঙ। ফলে ওদের আকাশ-গাছপালা-মাটির রঙ নিশ্চয়ই কমলা-গোলাপী কিংবা রক্ত-লাল। এরপরও পৃথিবীকে যদি ওরা এড়িয়ে চলতে চায়, তাতে কি আর বিশেষ দোষ দেওয়া যায় ওদের?'

এর উত্তরে আমরা কিছু বলে ওঠার আগেই দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়লেন নকুড়বাবু।

□ ১৯৮৫





হারিয়ে যাওয়া

অনীশ দেব

প্রথমে গিয়েছিল বিক্রম শর্মা আর রণবীর সেন। তার দু' মাস পরে সত্যদেব সিং আর রঘুনাথ মহান্তি। কিন্তু ওরা কেউই ফিরে আসেনি ওই রহস্যে-ঢাকা প্রাচীন জঙ্গল ফরেস্ট-এক্স থেকে! গত একশো বছরের বেশি সময় ধরে বন্য প্রকৃতির বুকে খুশিমতো বেড়ে উঠে ঘন হয়েছে ওই রহস্যময় জঙ্গল। গবেষণার প্রয়োজনে ওটাকে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক করা হয়েছিল, প্রতি একশো বছর অন্তর অন্তর অভিযান চালানো হবে ওই জঙ্গলের অভ্যন্তরে। খতিয়ে দেখা হবে তার গাছপালা ও বন্যপ্রাণীর বিবর্তনের নানা লক্ষণ। পর্যবেক্ষণ করা হবে তাদের আচার-আচরণ প্রকৃতি।

আর সেইমতোই শুরু হয়েছিল প্রথম অভিযান।

তারপর...

'সেন্ট্রাল কন্ট্রোল'-এর চিফ ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী টেবিলে রাখা কম্পিউটার টার্মিনালের বোতাম টিপলেন। ভিডিও পরদায় ফুটে-ওঠা সবুজ লেখাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ ছোট হল।

আমি টেবিলের এ-প্রান্তে বসে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। কাজ ছাড়া আমার মন বসে না। অলস থাকলে আমার অ্যালার্জি হয়। অবশ্য শুধু আমার নয়। অপারেশান ডিভিশনের সকলেরই এই একই অভ্যাস। মনোবিজ্ঞানের নানান পরীক্ষার মাধ্যমে অপারেশান ডিভিশনের লোক বাছাই করা হয়। তার মধ্যে দুটি প্রধান শর্ত হল : প্রার্থীকে কাজ-পাগল হতে হবে এবং তার মধ্যে কল্পনার ছিটে-ফোঁটাও থাকবে না।

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী কম্পিউটার ছেড়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'দাস, আপনাকে সংক্ষেপে ওদের হারিয়ে যাওয়ার কথা বললাম। তবে কম্পিউটারের মেমোরিতে এ-বিষয়ে বিশদ তথ্য রয়েছে। আপনাকে তার একটা কপি করে দিচ্ছি। সময়মতো দেখে নেবেন।'

ব্রিগেডিয়ার ভাসমান বাতাস-চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন। একটা লুকনো সুইচ টিপতেই টেবিল ফুঁড়ে দু' গেলাস শরবত উঠে এল। ব্রিগেডিয়ার ইশারা করতেই তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি একটা গেলাস তুলে নিলাম। এই শরবতই আমাদের 'সেন্ট্রাল কন্ট্রোল' অফিসের একমাত্র সুষম পানীয়। এর সমস্ত উপাদান বিজ্ঞানীরা হিসেব করে ঠিক

করেছেন। এই শরবত কর্মঠ লোকেদের কাজের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেয়।

ব্রিগেডিয়ার ধীরে ধীরে কথা বলছিলেন, 'দাস, আপনি হয়তো জানেন, প্রাকৃতিক পৃথিবী থেকে গত আড়াইশো বছর ধরে আমরা বিচ্ছিন্ন। সারা পৃথিবীতে এখন সিনথেটিক ঘেরাটোপে ঢাকা চল্লিশ হাজার দুশো শহর রয়েছে। পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচার জন্যে এই ঘেরাটোপের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া ঘেরাটোপের মধ্যে আমরা আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি—খুশিমতো। ঘেরাটোপের এই কৃত্রিম অথচ আরামের পরিবেশে স্বস্তির মধ্যে বেড়ে উঠেছি আমরা। ফলে বাইরের প্রকৃতিতে পা রাখিনি। আমাদের যারা বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চায় তাদের এই অভ্যেস করানো হয় ছোটবেলা থেকেই।'

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, 'জানি, স্যার।'

কারণ আমাকেও এই অভ্যেস করানো হয়েছে ছেলেবেলা থেকে। এখানকার নিয়ম অনুসারে ছেলেমেয়েদের বারো বছর বয়েস হলেই সরকারি সংস্থায় গিয়ে আই কিউ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হয়। এছাড়া তাদের নিয়ে অন্যান্য দৈহিক এবং মানসিক পরীক্ষাও চালানো হয়। এইসব পরীক্ষার ফল অনুযায়ী সরকার থেকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাদের ভবিষ্যৎ পড়াশুনো ও পেশা। এইসব পরীক্ষার রেজাল্ট দেখেই আমাকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের জন্যে। তারপর আট বছর পরে আবার একদফা পরীক্ষা নিয়ে তবেই আমাকে বেছে নেওয়া হয়েছে সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের অপারেশান ডিভিশনে।

সেন্ট্রাল কন্ট্রোল নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে আমাকে বাইরের পরিবেশে রপ্ত করানোর কাজ শুরু হয়েছে। আর তার জন্যে প্রয়োজন হয়েছে স্পেশাল লাইসেন্স। এরকম লাইসেন্স ওদেরও ছিল। ওই হারিয়ে যাওয়া চারজনের, বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং আর রঘুনাথ মহান্তি। সুতরাং বাইরের দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ ওদের কাছে নতুন নয়। তাছাড়া ওদের সঙ্গে ছিল অভিযানের উপযুক্ত আত্মরক্ষার আধুনিক সব অস্ত্রশস্ত্র, আর প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও···

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী শরবতের গেলাসে শব্দ করে চুমুক দিয়ে গেলাস নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। চিন্তাজড়ানো গলায় বললেন, 'দাস, বাইরের পরিবেশ ওদের কাছে নতুন নয়। তবে ফরেস্ট-এক্স, আমাদের সংরক্ষিত ওই জঙ্গল, ওদের কাছে নতুন। শর্মা আর সেন যখন রওনা হয় তখন আমরা ঠিক করেছিলাম, অভিযান শেষ করতে হবে দশদিনের মধ্যে। কিন্তু দু'মাস পরেও যখন ওরা ফিরল না, তখন পাঠালাম সিং আর মহান্তিকে। বুঝতেই পারছেন, ওরা পুরোপুরি আর্মড ছিল। ওদের সঙ্গে যে-ব্লাস্টার ছিল তা দিয়ে ফরেস্ট-এক্সকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। যে-কোনও হিংস্র জন্তু ওই ব্লাস্টারের আক্রমণে স্রেফ ধুলো হয়ে যাবে। অথচ তা সত্ত্বেও ওই চারজনের কেউই ফিরে এল না। ব্যাস, অভিযান মাথায় থাক, এখন দুশ্চিন্তায় গোটা সেন্ট্রাল কন্ট্রোল ভেঙে পড়েছে। গভর্নমেণ্ট নানা সন্দেহ করছে। যেখানে গত দুশো বছরে সারা পৃথিবীতে দুর্ঘটনায় মারা গেছে মাত্র দশ হাজার মানুষ, সেখানে তিন মাসের মধ্যে চার-চারজন স্পেশ্যালিস্ট নিরুদ্দেশ! আনথিংকেবল, দাস। সেইজন্যেই আপনাকে ডেকেছি।'

আমার শরবত শেষ হয়ে গিয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার আবার লুকনো বোতামটি টিপলেন। খালি গেলাস দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল টেবিলের গহ্বরে। টেবিল আবার যথারীতি মসৃণ। জানি, আমাদের চোখের আড়ালে ওই গেলাস দুটো পরিষ্কার ও স্টেরিলাইজড হয়ে অপেক্ষা

করবে ভবিষ্যতে আবার ব্যবহারের জন্যে।

ব্রিগেডিয়ারের আঙুল আবার চলে গেল কম্পিউটারের কি-বোর্ডে। দ্রুত নড়াচড়া করল বোতামের ওপরে। ভিডিও পরদায় জটিল রঙিন ছবি ফুটে উঠল। ব্রিগেডিয়ার আপনমনেই বললেন, 'ফরেস্ট-এক্স-এর টোপোলজিক্যাল ম্যাপ।' বলে একটা বোতাম টিপে তার একটা ছাপা কপি প্রিন্টার থেকে বার করে টেবিলে রাখলেন। তারপর পরদায় ফুটিয়ে তুললেন হারিয়ে-যাওয়া বিজ্ঞানীদের রুট-ম্যাপ। বার করে নিলেন সেটারও হার্ড কপি। আর সবশেষে অনেকগুলো পৃষ্ঠা ছাপিয়ে নিয়ে আমাকে লক্ষ করে বললেন, 'এতে অভিযান সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দিয়ে দিলাম। এছাড়া ফরেস্ট-এক্স-এর বিষয়ে সমস্ত খবর—সেখানে আবহাওয়া কীরকম, কোন কোন ধরনের প্রাণী ওখানে আছে বলে এ-পর্যন্ত জানা গেছে। অবশ্য এ-সবই একশো বছরের পুরোনো। তবু যদি আপনার কোনও কাজে লাগে।'

কম্পিউটার টার্মিনাল ছেড়ে ব্রিগেডিয়ার ভাসমান বাতাস-চেয়ারের বায়ুচাপ সামান্য বাড়িয়ে দিলেন। চেয়ারটা ইঞ্চি-চারেক উঁচু হল। তখন তিনি পলিথিন কভারে মুড়ে কম্পিউটারের প্রিন্ট-আউটের পুরো গোছাটা সামনে ঝুঁকে পড়ে আমার হাতে দিলেন। তারপর চেয়ারটাকে আবার ঠিক করে নিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকলেন। শেষে বললেন, 'মনে করুন, ফরেস্ট-এক্স-এ গিয়ে আপনি দেখলেন...'

ব্রিগেডিয়ার বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি কিছুই শুনছিলাম না। ভাবছিলাম, প্রায় চার বছর পরে আমি আবার 'বাইরে' যাব। আর এবারের যাওয়াটা অন্যান্য বারের মতো নয়। অন্যান্য বারে আমি বাইরে থেকেছি বড়জোর বারো ঘণ্টার জন্যে। সে নতুন কাউকে বাইরের আবহাওয়ায় অভ্যেসের ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে, নয়তো কোনও অটো-টানেল পরীক্ষা করার জন্যে, অথবা কোনও মহাকাশযান রওনা হওয়াকালীন নিরাপত্তার জন্যে। কিন্তু এবারের অপারেশান অন্যরকম।

'...হঠাৎ করে যদি এইরকম কোনও ঘটনা হয়, তখন আপনি কী করবেন, দাস?'

আমার খেয়াল হল, ব্রিগেডিয়ার প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে দেখছেন। আমার জবাবের অপেক্ষা করছেন। তিনি আবার বললেন, 'বলুন দাস, তখন আপনি কী করবেন?'

আমি হাসলাম। বুকের কাছে লুকনো আধুনিক জেনারেটর-গানটা একবার অনুভব করলাম। তারপর বললাম, 'আপনার কথা আমি কিছুই শুনিনি, স্যার...'

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর মুখ লালচে হতে লাগল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই আমি বললাম, 'শুনিনি, কারণ ধরি, মনে করি, যদি, হয়তো, সম্ভবত, এইসব শব্দ দিয়ে কোনও কথা শুরু হলে আমি বাকিটা আর শুনি না। কল্পনার ওপরে আমার কোনও আস্থা নেই, স্যার।'

ব্রিগেডিয়ার যে কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন সেটা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি ওঁকে অপমান করতে চাইনি। কারণ এটাই আমার বরাবরের অভ্যেস। শুধু আমার কেন, আমাদের অপারেশান ডিভিশনের প্রত্যেকেরই। আর ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী আমার সম্পর্কে পুরো খোঁজখবর না নিয়ে আমাকে ফরেস্ট-এক্স-এর ব্যাপারে ডেকেছেন, তা আমি মনে করি না। উনি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের প্রতিটি মানুষের পার্সোনাল কম্পিউটার কোড জানেন এবং টার্মিনালের বোতামে আঙুলের ডগা ছুঁইয়ে যে-কোনও সময়ে পড়ে ফেলতে পারেন আমাদের আগাপাস্তলা ইতিহাস। তাহলে এই মুহূর্তের অপমানিত ভাবটুকু কি ব্রিগেডিয়ারের অভিনয়?

ঠিক সেই সময়ে ব্রিগেডিয়ারের ডান দিকে রাখা একটা ছোট্ট টিভির পরদায় একটা সবুজ সঙ্কেত ফুটে উঠল। দু'বার বিপ-বিপ শব্দ শোনা গেল। আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ব্রিগেডিয়ার পরদার দিকে তাকালেন। ততক্ষণে সেখানে একজন লোকের রঙিন ছবি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে এবং সেই অতিথি ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে।

টিভির সামনে রাখা মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী একটা কোড নম্বর বললেন। পরক্ষণেই পালটা একটা নম্বর শোনা গেল স্পিকারে। ব্রিগেডিয়ার হাসলেন। বললেন, 'প্লিজ কাম ইন।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু সুরেশ চোপরা। আট বছর ধরে মিশিগানে ছিল। মহাকাশযানের কঠিন জ্বালানি নিয়ে গবেষণা করছিল। এখন চলে আসছে জাপানে। সেই ফাঁকে এক মাস ভারতে থাকবে। আজ আমাদের সেলিব্রেট করার কথা। কিন্তু ফরেস্ট-এক্স-এর ব্যাপারটা···'

আমি নির্লিপ্তভাবে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর কথাগুলো শুনছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, সুরেশ চোপরার জীবনী জেনে আমার লাভ কী। আর ফরেস্ট-এক্স-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই বা কী?

ইতিমধ্যে সুরেশ চোপরা ঘরে ঢুকে পড়েছেন এবং ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে করমর্দনের পর একটা বাতাস-চেয়ারে বসেও পড়েছেন। আমি ভাবছিলাম, এবারে বিদায় নিলে হয়, কিন্তু চিফ না নির্দেশ দিলে সেটা ভালো দেখায় না। সুতরাং চুপচাপ বসে রইলাম।

সুরেশ চোপরা ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করছিলেন—পুরোনো, নতুন, নানা কথা। আর ওঁরা দু'জনেই খুব হাসছিলেন। কথায় কথায় সময় কাটতে লাগল। এক সময় এক গেলাস শরবত টেবিল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল সুরেশ চোপরার জন্যে। তিনি তখন মিশিগানের নানা মজার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। কথা থামিয়ে শরবতে চুমুক দিলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

এক হাতে শরবতের গেলাস ছিল। অন্য হাতে ব্লাস্টারটা বার করে নিয়ে ব্রিগেডিয়ারের দিকে তাক করে ধরলেন সুরেশ চোপরা। তাঁর মুখের হাসি, শরবতের গেলাস ধরে রাখার ভঙ্গি, এমনকি, ব্লাস্টার বার করে আনার কাজটিও এত স্বাভাবিক যে, চট করে তা নজর কাড়ে না।

কিন্তু আমার নজর কাড়ল।

স্লো মোশনে আমি সমস্ত ঘটনা দেখতে পাচ্ছিলাম। ব্রিগেডিয়ারের মুখে একটা ফ্যাকাসে পরদা ছড়িয়ে গেল চকিতে। প্রযুক্তি এখন লক্ষ গুণে উন্নত হয়ে উঠলেও মানুষের কয়েকটি মৌলিক প্রতিক্রিয়া এখনও বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সেইজন্যেই সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের চিফও ভয় পেলেন—মৃত্যু-ভয়! আর তখন সুরেশ চোপরার একটু আগের হাসিখুশি ভাবটা খুব ধীরে পালটাচ্ছিল।

আমার কাছে এই সুরেশ চোপরা লোকটা একজন অচেনা আগন্তুক ছাড়া কিছু নয়। সে হঠাৎ করে চিফের ঘরে ঢুকে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে ব্লাস্টার তুলে ধরেছে। চুলোয় যাক মিশিগানের গবেষণার গল্প, আর চিফের সঙ্গে লোকটার পুরোনো দোস্তির কাহিনী। এসব নির্ভেজাল সত্যি কি না তার কোনও প্রমাণ এখনও আমি পাইনি।

সুতরাং কয়েকশো মিলিসেকেণ্ড ভাবনাচিন্তার পর আমি মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আধ পাক গড়িয়ে চোপরার বাতাস-চেয়ারে সপাটে এক লাথি কষিয়ে দিলাম। এবং

জেনারেটর-গান তাক করে লো-লেভেল ফায়ার করলাম।

লাথির চোখে চোপরা টাল খেয়ে ছিটকে পড়েছিলেন। তার ওপর লো-লেভেল ফায়ারে পলকে অসাড় হয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেলেন।

ট্রিগারে চাপ দিলে জেনারেটর-গান থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী আহিত কণার স্রোত বেরিয়ে আসে। এই আহিত কণার তীব্রতা তিন রকমের হয় : লো-লেভেল, হাই-লেভেল, আর আলট্রা-হাই-লেভেল। লো-লেভেল ফায়ারে কোনও মানুষ ঘণ্টা-দেড়েকের জন্যে শুধু অসাড় হয়ে থাকে। হাই-লেভেলে তার চেতনা ফিরবে সাতদিন চিকিৎসার পরে। কেউ কেউ আবার ওপরেও চলে যায়। আর আলট্রা-হাই ফায়ারিংয়ে সরাসরি নামের আগে চন্দ্রবিন্দু। যেহেতু চিফের কথা সত্যি কিংবা মিথ্যে দুই-ই হতে পারে তাই চোপরাকে লো-লেভেল ট্রিটমেন্ট করেছি। সত্যি সত্যি চিফ কোনও পুরোনো বন্ধু হারাক তা আমি চাই না।

মেঝে থেকে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন দেখি ব্রিগেডিয়ার আবার স্বাভাবিক ভাব ফিরে পেয়েছেন। তবে একই সঙ্গে তাঁকে খানিকটা উদ্বিগ্নও মনে হল। সেটার কারণ আঁচ করতে পেরে আমি বললাম, 'লো-লেভেল ডোজ দিয়েছি, স্যার। কিন্তু সত্যিই কি উনি আপনার বন্ধু ?'

চিফ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ওকে আমিই এ-সময়ে আসতে বলেছিলাম। আপনাকে পরীক্ষা করার জন্যে। আর আমি চোপরা সম্পর্কে আপনাকে আগে থাকতেই সাজেশন দিয়েছিলাম যাতে আপনি ওকে নিরাপদ মনে করেন। সেই অবস্থায় দেখতে চাইছিলাম আপনি কত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নিতে পারেন।'

আমি সামান্য হেসে কুণ্ঠিতভাবে বললাম, 'পরীক্ষায় কি আমি পাশ করেছি ?'

চিফ বললেন, 'বসুন, দাস।'

আমি বসলাম।

'এই পরীক্ষা আমি করেছি আপনার কর্মক্ষমতা যাচাইয়ের জন্যে নয়। শুধু এটা দেখতে যে, ফরেস্ট-এক্স থেকে আপনার ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে কি না।' ব্রিগেডিয়ারের গলার স্বর কিছুটা ভারি হল, 'আমার ধারণা ওই গভীর জঙ্গলে এমন কোনও ভয়ঙ্কর প্রাণী আছে যাকে আমাদের আধুনিক কোনও অস্ত্র ঘায়েল করতে পারে না। আর বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং, রঘুনাথ মহান্তি হয়তো প্রাণ দিয়েছে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীর আক্রমণে—আমাদের অজানা-অচেনা কোনও বিচিত্র শক্তি, যা কাউকে ফিরে আসতে দেয় না। কিন্তু আমি চাই, আপনি ফিরে আসুন। ওদের জীবিত অথবা মৃত সঙ্গে নিয়ে—অথবা না নিয়ে। আপনাকে আমি ফেরত চাই, দাস। কারণ ফরেস্ট-এক্স-এর রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে।'

কথা শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী। গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন বোধহয়। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'আপনি কাল ছ'টার সময়ে রওনা হয়ে পড়ুন। সাতদিনের মধ্যে যদি আপনি রিপোর্ট ব্যাক না করেন তাহলে ব্যাপারটা রীতিমত মারাত্মক হয়ে উঠবে। তখন হয়তো ওই বায়ো-রিজার্ভটাকে—মানে, ফরেস্ট-এক্সকে ডেস্ট্রয় করে ফেলা ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। এনিওয়ে, আই ওয়ান্ট যু ব্যাক, দাস—অ্যাট এনি কস্ট।'

'আমি তাহলে কাল ছ'টার সময় রওনা হচ্ছি, স্যার।'

'হ্যাঁ। উইশ যু বেস্ট অফ লাক।' ব্রিগেডিয়ার শুভেচ্ছা জানালেন আমাকে। তারপর

আমি যেই উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি উনি পিছন থেকে ডেকে বললেন, 'এ-ঘরের কথাবার্তা কারও সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে চোপরার ব্যাপারটা। আর অপারেশান ডিভিশনের চিফকে যেটুকু বলার আমি বলে দিচ্ছি।'

'ও কে স্যার।' বলে সুরেশ চোপরার দিকে একবার দেখলাম। পাথর হয়ে শুয়ে আছেন। চিন্তার কোনও কারণ নেই। সবেমাত্র পনেরো মিনিট হয়েছে। পুরো দেড় ঘণ্টা হতে এখনও এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট দেরি!

অটো-টানেলের স্বচ্ছ দেওয়াল ঘণ্টায় পাঁচশো কিলোমিটার বেগে পিছন ছুটে যাচ্ছিল। আমি চোখ বুজে গাড়িতে বসে আছি। কারণ অটো-টানেলে যেসব গাড়ি চলে সবই কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত।

ঘেরাটোপে ঢাকা শহর থেকে বেরিয়ে অটো-স্টেশনে এসে আমি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের নিজস্ব গাড়ি বেছে নিয়েছি। এই বেছে নেওয়ার কাজটাও কম্পিউটার-পরিচালিত। আইডেন্টিফিকেশান ও ভয়েস চেক পজিটিভ হলেই অটো-টানেলের লক খুলবে। তারপর গাড়িতে উঠে ভ্রমণের সম্পূর্ণ মানচিত্র গাড়ির কম্পিউটারের বোতাম টিপে জানাতে হবে। তাহলেই 'কৃত্রিম বুদ্ধিমান' গাড়ি যাত্রীকে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। গাড়িগুলোতে দু'জনের বসার জায়গা আছে। তবে আমি চলেছি একা।

আমাদের কাছাকাছি শহরগুলো সবই অটো-টানেল দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া। আর দূরের যাত্রাপথে আমরা স্পেস-প্লেন ব্যবহার করি। এই প্লেন আবহাওয়ামণ্ডল ছাড়িয়ে উঠে যায় মহাশূন্যে। তারপর মোট উড়ানের সিংহভাগটাই সম্পন্ন করে মহাশূন্যে। অবশেষে গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে আবহাওয়ামণ্ডল কেটে নেমে আসে নির্দিষ্ট প্লেন-পোর্টে।

ফরেস্ট-এক্স-এ যাওয়ার জন্যে স্পেস-প্লেন আমি পছন্দ করিনি। কারণ তাতে জেট ল্যাগের জন্যে শরীর ভারি হয়ে থাকে। আমার কাজ শুরু করতে অসুবিধে হবে। তাই অপেক্ষাকৃত আরামের অটো-টানেল ভ্রমণই বেছে নিয়েছি। অটো-টানেলের গাড়ির কোনও চাকা নেই। ম্যাগনেটিক লেভিটেশানে টানেলের অটো-লাইন থেকে কয়েক মিলিমিটার ওপর দিয়ে ভেসে চলে। সুতরাং ঝাঁকুনির কোনও ব্যাপার নেই। আর ইচ্ছে করলে গাড়ির গতিবেগ আমি ঘণ্টায় এক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত তুলতে পারি। কিন্তু আমার কোনও তাড়া নেই। বরং ধীরেসুস্থে সম্পূর্ণ তাজা অবস্থায় আমি ফরেস্ট-এক্স-এর সীমানায় পৌঁছতে চাই। যে করে হোক হারানো চারজনকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। যে করে হোক।

আমি চোখ খুললাম। সাপের মতো টানেল ধরে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। পাশের সিটে রাখা ব্রিগেডিয়ারের দেওয়া কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটগুলো তুলে নিলাম। এর আগে তিনবার এগুলো খুঁটিয়ে পড়েছি। পড়ে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি ওই চারজনের মধ্যে কোথায়-কোথায় মিল রয়েছে, আর কোথায়ই বা অমিল। এছাড়া, ফরেস্ট-এক্স-এর প্রাণীর তালিকাটাও দেখেছি বারবার। তাদের বর্ণনার পাশাপাশি রয়েছে ছবি। ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করেছি কোন ভয়ঙ্কর জন্তু ওই চারজনকে ফিরে আসতে দেয়নি। কিন্তু নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। তবু আর-একবার ওগুলো পড়তে শুরু করলাম: প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ...। তারপর নিজের মনেই বললাম, 'বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, সত্যদেব সিং, রঘুনাথ মহান্তি, ...তোমরা হারিয়ে গেলে কেন?'

এমন সময় চোখ গেল কম্পিউটার ডিসপ্লে প্যানেলের দিকে। ফরেস্ট-এক্স স্টেশনে

পৌঁছতে আর আধঘন্টা বাকি। এই সময়টুকু দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

অটো-টানেল স্টেশনের পার্কিং প্লেসে গাড়ি রেখে একটা বিশেষ বোতাম টিপলাম। মাথার ওপর থেকে গাড়ির স্বচ্ছ ছাদ সরে গেল। দরকারি একটা ছোট প্যাকেট হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি থেকে। ছাদ আবার জায়গামতো বসে গেল। পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বার করে রিকগ্‌নিশান লক করে দিলাম। আমি ছাড়া এই গাড়ি আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। গাড়ির কম্পিউটার-চোখ শুধুমাত্র আমাকে চিনতে পারলেই দরজা খুলবে।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ঘেরাটোপে ঢাকা স্টেশনের এক নির্জন কোণে কম্পিউটার টার্মিনালের কাছে এসে দাঁড়ালাম। হারিয়ে যাওয়া ওই চারজনকে নিয়ে যখন আমি ফিরে আসব তখন আমার জন্যে বাড়তি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবে এই কম্পিউটার টার্মিনাল। এই স্টেশনটা সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের অধীনে। সুতরাং, এখন এখানে মানুষ বলতে একমাত্র আমি।

কম্পিউটার চালু করে টার্মিনালের বোতাম টিপে সেন্ট্রাল কন্ট্রোলে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীকে জানিয়ে দিলাম যে, আমি ঠিকমতো স্টেশনে পৌঁছেছি এবং এক্ষুনি কাজে নামছি। তারপর প্যাকেট খুলে জারকোনিয়াম অক্সাইডের আস্তরণ দেওয়া বিশেষ ধরনের সিনথেটিক পোশাক বার করে পরে নিলাম। এই পোশাক আগুন, তাপ, জল ও জীবাণুর হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে। জেনারেটর-গান, লেসার-ব্লাস্টার, বিপার ইত্যাদি অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ঠিকমতো পরীক্ষা করে পোশাকের নানা জায়গায় ঢুকিয়ে নিলাম। তারপর ট্রান্সমিটার ও ঘন খাবারের টিন কাঁধে ঝুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরোলে সব সময়েই দেখেছি শরীর ও মনের ওপরে একটা ধাক্কা লাগে। অথচ বাইরে আমি সব মিলিয়ে প্রায় দুশো ঘন্টারও বেশি থেকেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যে বাইরের জগৎটাকে সব সময় নতুন বলে মনে হয় কে জানে!

মাঝ-বেলার সূর্যের কিরণ পিঠের ওপরে আছড়ে পড়ছে। বাতাস বইলেও সেটা পোশাকের জন্যে টের পাচ্ছি না। তবে দেখতে পাচ্ছি, লম্বা লম্বা ঘাসের ঝোপ এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। সামনে দূরে ছোট-বড় পাথুরে টিলা। আর অসমান জমিতে আগাছার জঙ্গল। বাইরের নির্জন বিশালতা আমাকে যেন একটু ভয় পাইয়ে দিল।

কিছুটা দূরেই চোখে পড়ছে ফরেস্ট-এক্স। ঘাসের ঝোপ আর আগাছার জঙ্গল সেদিক পানে যতই এগিয়েছে ততই যেন ঘন হয়েছে, আর উচ্চতায় বেড়ে উঠেছে। তারপর শুরু হয়েছে সবুজ পাতায় ঢাকা মহীরুহের জটলা।

পকেট থেকে গ্রাফিক্স রুট-ম্যাপটা বার করে নিলাম। তারপর রওনা দিলাম।

জঙ্গলের ভেতরে কয়েক পা এগোতেই অদ্ভুত এক অনুভূতি ঘিরে ধরল আমাকে। জঙ্গল আমি আগে যা দেখেছি সবই ছবিতে—কম্পিউটার সিমুলেশনে। কিন্তু সত্যিকারের একটা প্রাচীন জঙ্গলের মধ্যে কেমন এক বিচিত্র গন্ধও মিশে আছে। আর সেইসঙ্গে রয়েছে নানা শব্দ। কয়েকটি পাখির ডাক বলে আন্দাজ করতে পারলাম। কিন্তু অন্য শব্দগুলো কিসের?

স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটিতে পা ফেলতে বা তুলতে কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎই পায়ের কাছে সাপের মতো কী একটা নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ব্লাস্টার তাক করে ফায়ার করলাম। সাদা আর বাদামি ডোরাকাটা সরীসৃপটার মাথায় ছোট ছোট দুটো শিংয়ের মতো কী রয়েছে। আর তার মাঝে একথোকা কালো চুল। ওটার শরীর মাঝখান থেকে দু' টুকরো হয়ে গিয়েছিল। টুকরো দুটো কিলবিল করে নড়ছিল। আমি সেটা লক্ষ করছিলাম। এই

প্রাণীটার কথা ব্রিগেডিয়ারের কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটে পাইনি। এই রহস্যময় জঙ্গল হয়তো এরকম বহু অজানা-অচেনা প্রাণীকে আশ্রয় দিয়েছে। আর তাদেরই কেউ হয়তো ওই চারজনকে ফিরে আসতে দেয়নি।

তখনই চোখ পড়ল আরও দুটো অদ্ভুত প্রাণীর দিকে। চেহারায় ভোঁদড়ের মতো, তবে লম্বায় প্রায় দেড়গুণ। আর সামনের পায়ে ধারালো বিশাল নখ, গায়ের রঙ সবুজ, তার ওপরে কালচে ছোপ। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আগাছার ঝোপ চিরে সরীসৃপটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। সামনের নখে দুটো টুকরো দু'জনে বিঁধিয়ে ছিটকে চলে গেল ঝোপের আড়ালে।

আমি এক পা পিছিয়ে এসে ব্লাস্টার তাক করেছিলাম, কিন্তু ফায়ার করিনি। মনে হয়েছিল, আমার এই পোশাক ভেদ করে চট করে কোনও ক্ষতি ওরা করতে পারবে না।

প্রাণী দুটো অদৃশ্য হয়ে যেতেই আমি সামনে পা বাড়ালাম। এগুলোর ছবি কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটে দেখেছি। মার্কোনিক্স। একই সঙ্গে তৃণভোজী এবং মাংসাশী। এরা খায় না এমন জিনিস নেই। তবে মৃত প্রাণীদের শরীরে দাঁত-নখ বসাতে এরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

ক্রমেই সূর্যের আলো গাছের অসংখ্য পাতায় আড়াল হয়ে যাচ্ছে। শ্যাওলা-ধরা বড় বড় গাছের গুঁড়ির গায়ে নানারকমের পরজীবী লতা। তাদের কোনও কোনওটায় ফুটে রয়েছে বিচিত্র আকার এবং রঙের বাহারি ফুল। আর তাদের ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে রঙবেরঙের একঝাঁক প্রজাপতি। এইসব প্রজাপতি ও ফুলের নিখুঁত ছবি আমি দেখেছি। তবে আসল জিনিসটা চোখের সামনে দেখে কেমন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ হয়। কী যে হল, জীবাণুর ভয় না করেই হাতের দস্তানা খুলে একটা গোলাপি ফুলের পাপড়ি ছুঁয়ে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। গোলাপি ফুলটার পাপড়িগুলো সুষম ছন্দে কাঁপতে লাগল, আর তার রঙ পালটাতে লাগল ধীরে ধীরে। গোলাপি-লাল-বেগুনি-নীল-হলদে-গোলাপি…

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। একটু পরেই ফুলটা হলদে রঙে তৃতীয়বার পৌঁছে তার রঙবদলের খেলা শেষ করল। রামধনু ফুল ফরেস্ট-এক্স-এর অলঙ্কার। আমি মুগ্ধ চোখে তখনও ফুলটাকে দেখছিলাম।

সেই কারণেই পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আক্রমণকারীকে দেখতে পাইনি। সুতরাং প্রথম আঘাতের ধাক্কা আমাকে ছিটকে ফেলে দিল বুনো ঘাসে ছাওয়া ভেজা মাটিতে। মাথা ঠুকে গেল কোনও বিশাল গাছের শক্ত শেকড়ে। আর তখনই আক্রমণকারীকে চোখে পড়ল। বুলবোয়া! দু'পেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী। হাত বলে কিছু নেই, তবে দেহে অসম্ভব শক্তি। গায়ে একটুও লোম নেই। বড় বড় লাল চোখ। লম্বা ধারালো দাঁত। পিছনে কুমিরের মতো মোটা কাঁটাওয়ালা লেজ।

অদ্ভুত গর্জন করে বুলবোয়াটা আমার ওপরে দ্বিতীয়বার ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই আমি বাঁ হাতে ব্লাস্টারের ট্রিগার টিপলাম। বুলবোয়ার বিশাল মাথাটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওটার গর্দান থেকে ধোঁয়া বেরোতে লাগল, আর পোড়া মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল জঙ্গলের স্যাঁতসেঁতে ভারি বাতাসে। জমি কাঁপিয়ে শব্দ করে আছড়ে পড়ল জন্তুটার বিশাল দেহ। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাজ্জব করে দেওয়া ক্ষিপ্রতায় প্রায় এক ডজন মার্কোনিক্স কোথা থেকে হাজির হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মৃতদেহটার ওপরে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে যন্ত্রপাতি সব ঠিকঠাক করে নিলাম। দস্তানাটা হাতে পরে নিয়ে আরও জোরে পা চালালাম। একটা জিনিস আমাকে ভাবিয়ে তুলছিল। মার্কোনিক্সরা কেমন

করে মৃতদেহের খোঁজ পায় ? ওরা যেভাবে কোনও সদ্য মৃত প্রাণীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাতে মনে হয়, ওই নিখোঁজ চারজন যদি এই জঙ্গলে মারাও গিয়ে থাকে তবু তাদের কোনও চিহ্নই আমি পাব না। কিন্তু কোনও-না-কোনও সূত্র যে আমাকে পেতেই হবে ! বেশ চিন্তিতভাবে আমি পথ চলতে শুরু করলাম আবার। মাথার পিছনটা অল্প অল্প ব্যথা করছিল।

জঙ্গল ক্রমশ দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে। বেলা পড়ে আসার ঢের আগেই চারদিক আঁধার হয়ে আসছে। রাতটা বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সুতরাং পুরোনো নিয়ম মেনে একটা জুতসই গাছ বেছে নিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। কয়েকটা বড় বড় ডালের জোড়ের কাছে গুছিয়ে বসলাম। তারপর পকেট থেকে টেপ-রেকর্ডার বার করে এখন পর্যন্ত যা যা হয়েছে সব বিবরণ বলে গেলাম। টেপ বন্ধ করে বিপারটা অন করে দিলাম। এই বিপারের সঙ্কেত সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের মেইনফ্রেম কম্পিউটারে পৌঁছে যাবে। তা থেকে ওরা জানতে পারবে আমি এখন জঙ্গলের ঠিক কোন জায়গায় আছি।

সামান্য খাবার খেয়ে নিয়ে আমি শোয়ার আয়োজন করলাম। আলো সরে গিয়ে আঁধার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। কানে আসছে নানা বিচিত্র শব্দ। তার মধ্যে কয়েকটা সুর বেশ মিষ্টি। রাতের কোনও পাখি জেগে উঠল নাকি ?

একটু পরে যখন ঘুমে চোখ বুজে এল তখন রামধনু ফুলটার রঙ-বদলানো পাপড়ির কথা আমার মনে পড়ছিল।

সে-রাতে অনেক বছর পর আমি স্বপ্ন দেখলাম। আমাকে ঘিরে অসংখ্য রামধনু ফুলের দল পাগলের মতো তাদের পাপড়ির রঙ পালটে চলেছে।

সকালে ঘুম ভাঙল পাখির গানে। রেকর্ড-করা এই গান আগে অনেক শুনেছি। আমাদের যে-কোনও শহরে বহু কৃত্রিম বাগিচা আছে যেখানে নকল ফুল ফোটে, যন্ত্রের পাখিরা উড়ে বেড়ায়, গান গায়। কিন্তু ঝকঝকে সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে অসংখ্য রঙিন ফুল ছুঁয়ে যে-গান এখন ভেসে আসছে তার আকর্ষণ ঠিক বুঝিয়ে বলা যাবে না। পাতার ফিসফিস শব্দ আর পাখির সুর যেন একে অপরের যুগলবন্দী।

গাছ থেকে নেমে তৈরি হয়ে আবার শুরু করলাম পথ চলা। চলতে চলতে টের পেলাম একটা খসখস শব্দ। না, একটা নয়, অনেক। আমাকে অনুসরণ করে জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের আড়ালে কারা যেন চলেছে আমার পাশাপাশি। আমি পথ চলা থামালে সেই শব্দগুলোও থেমে যাচ্ছে। কারা এভাবে লঘু পায়ে অনুসরণ করছে আমাকে ?

উত্তরটা জানা দরকার। তাই পকেট থেকে খুদে অস্ত্রসম্ভারের প্যাকেটটা বার করলাম, তা থেকে বেছে নিলাম একটা সাউণ্ড ট্র্যাকার। তার ছুঁচলো মুখে ঘুমের ওষুধ মাখানো একটা ছুঁচ লাগিয়ে আন্দাজে ভর করে ফায়ার করলাম। সঙ্গে সঙ্গে হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ কানে এল। আমি ছুটে গেলাম শব্দ লক্ষ্য করে। আগাছার ঝোপ আর লতাপাতার ঝাড় সরিয়ে খোঁজাখুঁজি করতেই চোখে পড়ল আমার অনুসরণকারীদের একজনকে। শব্দভেদী সাউণ্ড ট্র্যাকার নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। একটা মার্কোনিক্স।

বুঝলাম, মার্কোনিক্সের দল আড়ালে থেকে আমাকে অনুসরণ করে চলেছে। ওরা বোধ হয় আন্দাজ করেছে, আমার সঙ্গে পথ চললেই ওরা মৃতদেহ পাবে, ওদের খিদে মিটবে। তা সে মৃতদেহ আমারই হোক বা অন্য কোনও প্রাণীর।

ঘুমন্ত মার্কোনিক্সটার শরীর থেকে সাউণ্ড ট্র্যাকারটা তুলে নিয়ে সরে আসামাত্রই প্রায় হাফ-ডজন মার্কোনিক্স ওটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল ওদের নির্মম কাটাছেঁড়া। ওরা বোধহয় সাউণ্ড ট্র্যাকারটা তুলে নেওয়ার অপেক্ষায় ছিল। কারণ বিচিত্র চেহারার সাউণ্ড ট্র্যাকার একটা প্রাণীর শরীরে বিঁধে থাকা অবস্থায় ওরা ঠিক এগোতে সাহস পাচ্ছিল না।

আবার চলতে শুরু করলাম জঙ্গলের পথ ধরে। এবং টের পেলাম, একই সঙ্গে মার্কোনিক্সদের গোপন অনুসরণও শুরু হয়েছে। হোক। ওদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু এভাবে কতদিন খোঁজ করব আমি? ফরেস্ট-এক্স-এর ঘন জঙ্গলে, অন্ধকারে, শত্রুসঙ্কুল পরিবেশে এরকম এলোমেলো খোঁজ করে কোনও ফল পাওয়া যাবে কি?

এইসব ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছিলাম, হঠাৎই একটা ভারি কিছু আমার পিঠের ওপর পড়ে গড়িয়ে গেল মাটিতে। চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম। ব্লাস্টার রেডি। কাঁটাওয়ালা একটা বিশাল সাপ। সারা গায়ে লাল আর রুপোলি ডোরা, আর তারই মাঝে শিরদাঁড়া বরাবর ধারালো সরু কাঁটা। চোখ দুটো নীল। আধো-আঁধারির মাঝে জ্বলছে দপদপ করে। না, এটার কথা রিপোর্টে নেই। কিন্তু প্রাণীটার ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য আমাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিবশ করে দিল। সাপটা বাতাস কেটে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় ছোবল ছুড়ে দিল আমার পা লক্ষ্য করে, আর একই সঙ্গে লেজের কাঁটাওয়ালা দিকটা আছড়ে দিতে চাইল আমার গায়ে। ক্ষিপ্রতায় কোনও প্রাণীকে পরাস্ত করাটাই অপারেশান ডিভিশনের অপারেটরদের পেশা। সুতরাং ব্লাস্টার চালালাম। সাপটার শরীরের খানিকটা অংশ মিলিয়ে গেল বাতাসে। ওটা আমার পায়ে ছোবল মেরেছিল, কিন্তু স্টেইনলেস স্টিলের পাতে মোড়া বিশেষ ধরনের জুতো সেই ছোবল ভোঁতা করে দিয়েছে।

যথারীতি মার্কোনিক্সের দঙ্গল হামলে পড়ল সাপটার দেহের ওপরে। আমি সেদিকে না তাকিয়ে চলতে শুরু করলাম। আর ঠিক তখনই একটা সন্দেহজনক শব্দ আমার কানে এল, কারও পায়ের শব্দ। আমার পাশাপাশি চলেছে।

জঙ্গলের লতাপাতায় আমার হাত-পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছি, তখনই একটা গাছে আমার হাত লাগতেই খুব অস্পষ্টভাবে জলতরঙ্গের সুর বেজে উঠল। অদ্ভুত ঢিমেতালে বাজতে লাগল সেই বাজনা। আমার কেমন ঘুম পেয়ে গেল। এ কোন ঘুমপাড়ানি গাছ! এর কথা তো রিপোর্টে নেই! বাজনার সুরটা ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। আমি ঘোর-লাগা মানুষের মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণের জন্যে পুরোপুরি ভুলে গেলাম নতুন পায়ের শব্দটার কথা। চেহারায় সাধারণ এই গাছ কোথা থেকে পেল স্বর্গীয় এই জলতরঙ্গের সুর?

সংবিৎ ফিরতেই চলা শুরু করলাম এবং নতুন পায়ের শব্দটা আবার শোনা গেল। যেন ফরেস্ট-এক্স-এর মোহময় নেশা কাটাতেই আমি রীতিমত হিংস্রভাবে জেনারেটর-গান বার করে নিলাম। তারপর শব্দ আন্দাজ করে একসঙ্গে পুরো এক মিনিট লো-লেভেল ফায়ার করলাম। আর্তনাদ অথবা গোঙানির মতো একটা শব্দ হল। দূরের একটা ঝোপে কেউ যেন নড়াচড়া করল। আমি সেদিকে ছুটে গেলাম। অন্ধকারের মধ্যেই খুঁজে বার করলাম শিকারকে। লতাপাতার জালে জড়িয়ে অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা মানুষ!

মানুষটার চেহারা ও পোশাক বড় অদ্ভুত।

মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। খালি গা। কোমরে একটা নোংরা কাপড় জড়ানো। আর ডান হাতের কাছেই পড়ে রয়েছে কাঠের ছুঁচলো ফলা লাগানো একটা বল্লম। এটা দিয়ে কি আমাকেই আক্রমণ করতে চাইছিল এই জংলিটা?

ফরেস্ট-এক্স-এ কোনও মানুষ আছে বলে জানতাম না। তাই একটু অবাক হলাম। অসাড় লোকটাকে ভালো করে দেখতে লাগলাম। তখনও ঝোপের আড়াল থেকে অল্পস্বল্প শব্দ পাচ্ছিলাম। বোধহয় মার্কোনিস্কদের দল উসখুস করছে। সুতরাং ঠিক করলাম, লোকটাকে সঙ্গে নেব। এর জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখব কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না।

ঝুঁকে পড়ে দেহটা তুলে নেওয়ামাত্রই বৃষ্টি শুরু হল। মুখ তুলে ওপর দিকে দেখলাম। এক টুকরো আকাশও চোখে পড়ছে না। শুধু ঘন পাতায় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দ। লক্ষ করলাম, গাছের ডাল বেয়ে সরসর করে এগিয়ে চলেছে বেশ কয়েক রকমের ছোট-বড় চিত্র-বিচিত্র সাপ। বৃষ্টির জল ওদের চঞ্চল করে তুলেছে।

আমি জংলি মানুষটাকে কাঁধে নিয়ে এগোতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর পর লোকটাকে মাটিতে নামিয়ে দম নিচ্ছিলাম। হঠাৎই একসময়ে খেয়াল হল, জঙ্গল পাতলা হয়ে আসছে। ওপরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম ঘন কালো মেঘ জমাট বেঁধে রয়েছে। বৃষ্টি তখনও ধরেনি।

এরপর খুব তাড়াতাড়ি জঙ্গল ফিকে হয়ে এল। আর একই সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে নতুন একটা শব্দ কানে আসছিল। গাছ-গাছড়ার ফাঁক দিয়ে মাঝারি মাপের একটা পাহাড়ের অংশ চোখে পড়ল। তার একটু পরেই একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মন যেন একটা ধাক্কা খেল।

অসাড় দেহটাকে ভিজে মাটির ওপরে নামিয়ে রেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগলাম সামনের দৃশ্য।

বৃষ্টি এখনও পড়ছে। তবে ঝিরঝিরে ইলশেগুঁড়ি। ফলে তার মধ্যে দিয়ে দেখতে অসুবিধে হল না। আমার কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মিটার দূরে একটা বিশাল হ্রদ। তার নীল জল চিকচিক করছে। হ্রদের কোল ঘেঁষে একটা পাহাড়। একটু আগে এই পাহাড়টাকেই আমি জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখেছি। পাহাড়ের মাথায় আর একপাশে অনেক গাছ চোখে পড়ছে। তাদের মাথায় মেঘ ফিকে হয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে পড়ন্ত বিকেলের নানা রঙের আলো। আর পাহাড়ের মাথায় লুকনো কোনও স্রোতস্বিনী থেকে জলের ধারা ঝরে পড়ছে নিচের হ্রদে। তারই শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম জঙ্গলের ভেতর থেকে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোঁটা হ্রদের জলতলে পড়ে যেন খই ফুটছে। আর তারই গা থেকে ঠিকরে পড়ছে শেষ বিকেলের আলো। ঝরনার জলের ধারা থেকে বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল শত শত জলকণার রেণু। তাদের গায়ে ফুটে উঠেছে রামধনুর বর্ণালী। এতক্ষণ বাতাসের জোর বোঝা যায়নি। এখন তা স্পষ্ট টের পাচ্ছি।

পায়ের কাছে একটা অচেতন দেহ ফেলে রেখে আমি সার্কাসের সঙের মতো মুগ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বৃষ্টি আমি আগে দেখেছি। পাহাড়ও আমি দেখেছি। দেখেছি হ্রদ, ঝরনা, পড়ন্ত বিকেল, জঙ্গলের গাছপালা আর রঙিন ফুল। আমি জানি, এগুলোর নিজস্ব একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু এইসব জিনিস একসঙ্গে একই জায়গায় আমি কখনও দেখিনি। ফলে এখন টের পেলাম, প্রকৃতির এইসব টুকরো টুকরো ছবি জোড়া লেগে গোটা ছবিটা তৈরি হলে পর তার আকর্ষণের কোনও তুলনা নেই।

এরই মধ্যে বৃষ্টি থামল। মেঘ সরে পরিষ্কার হল আকাশ। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ডুবে যাওয়া লাল সূর্যকে কিছুটা দেখা গেল। পিছনের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছিল পাখির ডাক

আর অচেনা কোনও প্রাণীর চিৎকার। প্রকৃতির মধ্যে ওরাও আছে, আমরাও আছি।

এমন সময় পায়ের কাছে অচেতন হয়ে পড়ে থাকা মানুষটা এক ঝটকায় উঠে বসে আমার পা ধরে এক টান মারল। আমি ঘোর লাগা অবস্থাতেই টাল খেয়ে পড়ে গেলাম ঘাস-জমিতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ব্লাস্টার বার করে ফায়ার করার জন্যে উঁচিয়ে ধরলাম।

আমাকে ঠিক না চিনতে পারলেও জংলিটা বোধহয় লেসার-ব্লাস্টার চিনতে পারল। তাই দু' হাত মাথার ওপরে তুলে পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল, 'প্লিজ ডোন্ট শুট! ডোন্ট শুট!...'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। দু' হাত মাথার ওপরে রেখে লোকটাও উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। ওর সভ্য কথাবার্তা আমাকে চমকে দিয়েছিল। ব্লাস্টার উঁচিয়ে রেখেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তুমি?'

লোকটা বলল, 'সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের চিফ জুওলজিস্ট সত্যদেব সিং।'

আমি অবাক হয়ে সত্যদেব সিংকে দেখতে লাগলাম। ফরসা শরীর রোদে-জলে কালচে, মুখে চুল-দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, পরনে বনবাসীর কৌপীন। আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষের কী প্রাগৈতিহাসিক দশা! কিন্তু কেন? আর বিক্রম শর্মা, রণবীর সেন, রঘুনাথ মহান্তিই বা কোথায়? সে-কথাই জিজ্ঞেস করলাম সত্যদেব সিংকে। সেইসঙ্গে নিজের পরিচয়ও দিলাম। বললাম, কেন আমি এসেছি।

সত্যদেব বলল, 'চলুন, যেতে যেতে সব কথা বলছি।'

সূর্য ডুবে গেলেও শেষ বিকেলের আলো রয়ে গেছে। ঝরনার রিমঝিম শব্দ অনেক জোরালো মনে হচ্ছে এখন। আমরা দু'জন এগোলাম পাহাড়ের দিকে। কারণ সত্যদেব বলল, পাহাড়ের ও-পিঠেই নাকি সবকিছুর উত্তর রয়েছে।

আমি প্যাকেট থেকে খাবার বার করে সামান্য খেলাম। সত্যদেবকে সেই খাবার সাধতেই সে বলল, 'থ্যাংক য়ু, দাস। এখন এসব খাবারে আমাদের রুচি নেই। রোজকার শিকারে যা মেলে তাই আগুনে সেঁকে খাই। আর তাছাড়া রয়েছে বহুরকম ফলমূল। সবই অভ্যেস হয়ে গেছে।'

একটু থেমে সত্যদেব আবার বলল, 'আজ আমাকে দেখে আপনি যেমন আশ্চর্য হয়ে গেছেন, তেমনই বিক্রম শর্মাকে এখানে প্রথম যখন খুঁজে পাই তখন আমি আর রঘুনাথ মহান্তিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কল্পনাতেও ভাবিনি, একজন আধুনিক যুগের বিজ্ঞানী এরকম পালটে যেতে পারে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম শর্মা পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু পরে বুঝলাম পাগল বলতে আমরা যা বুঝি তা ঠিক নয়, শর্মা হয়ে গেছে প্রকৃতি-পাগল। ও আমাকে বলেছিল, সিং, একসঙ্গে এত সুন্দর জিনিস আমি জীবনে কখনও দেখিনি। এই ঝরনা, পাহাড়, হ্রদ, ফুল, পাখি, এসব দেখে আমিও বুঝেছিলাম, ওর কথা কী মর্মান্তিক সত্যি। শহরের ঘেরাটোপে বসে কম্পিউটারে আঁকা প্রকৃতির ছবি দেখে এই সত্য উপলব্ধি করা যায় না।'

ফাঁকা জমি পেরিয়ে যখন আমরা এবড়োখেবড়ো পাথর ডিঙিয়ে পাহাড়ে ওঠা শুরু করছি তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। সত্যদেব বলল, 'এখনও অনেকটা পথ বাকি। রাতটা এখানেই কোথাও পার করে দিলে ভালো হয়।' সুতরাং তাই করলাম।

একটা বড় মাপের টিলার ওপরে চড়ে বসলাম দু'জনে। একটা ছোট গাছে হেলান দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আমি আকাশ দেখতে লাগলাম। সত্যদেব বলতে শুরু করল আবার, 'বিক্রম শর্মা আমাদের নিয়ে গেল রণবীর সেনের কাছে। কথা বলে বুঝলাম তারও ওই

একই অবস্থা। কৃত্রিম শহরগুলোয় সে আর ফিরে যেতে চায় না। ওখানে নাকি একটাও আসল জিনিস নেই। সবই মানুষের তৈরি, নকল। তারপর...'

সত্যদেব সিং বলে যাচ্ছিল একটানা। আর আমার নেশা ধরে যাচ্ছিল—হারিয়ে যাওয়ার নেশা। আমি রঙ-বদলানো রামধনু ফুলের ঝাঁক দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি তরুলতার জলতরঙ্গ আর পাখির ডাক, আমার চোখের সামনে হ্রদের নীল জলে বৃষ্টির খই ফুটছে, গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণায় রামধনুর ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের কোলে অস্ত যাওয়া সূর্যের চোখ-জুড়নো রঙ, আর আকাশে মেঘের দলে কোলাকুলি।

আমি ভুলে যাচ্ছিলাম বিপার, ট্রান্সমিটার, টেপ-রেকর্ডার, ব্লাস্টার, জেনারেটর-গান আর কম্পিউটারের কথা। কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছিল সেন্ট্রাল কন্ট্রোল আর ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী।

এমন সময় সর্বনাশের মতো মাথার ওপরে কালো আকাশে তারা ফুটতে শুরু করল।

ফুরফুর করে বাতাস বইছিল। ঝরনার জলের রিমঝিম বাজনা এখন আরও মাতাল। তারই মধ্যে সত্যদেব কথা শেষ করে গুনগুন করে একটা গান ধরল। গানের কথা এক বর্ণও বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু মনে হল যেন গানটার অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার। আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। ঘুমে ঢলে পড়ার আগে শেষবারের মতো দেখলাম, সত্যদেব মাটিতে চিতপাত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপনমনে গান গেয়ে চলেছে।

জঙ্গলের ভেতরে ভোর হয়েছিল একরকম ভাবে। আর এইখানে খোলা আকাশের নিচে সকাল হল একেবারে অন্যরকম।

পিছনে জঙ্গল থাকার জন্যে আমরা এখনও ছায়ায় ঢাকা। কিন্তু সকালের রোদ গিয়ে পড়েছে দূরের একটা পাহাড়ে, হ্রদের জলের মাঝামাঝি, আর বহতা স্রোতস্বিনীর ওপরে। নিচের ফাঁকা জমিটাকে এখান থেকে কিছুটা ছোট দেখাচ্ছে। বেশ কিছু নাম-না-জানা বড়সড় পাখি এসে ভিড় করেছে হ্রদের কিনারে। সেখানে কয়েকটা মার্কোনিক্সকেও চোখে পড়ল। পাখির কিচিরমিচির শব্দ হয়তো নেহাতই কোলাহল—কিন্তু আমার বেশ লাগছিল।

সত্যদেব চিতপাত হয়ে ঘুমিয়ে ছিল। ওকে ঠেলা মেরে ডাকলাম। ও উঠে হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল। তারপর বলল, 'চলুন, এবারে আমরা এগোব। আট-দশ ঘণ্টার পথ।'

হাঁটতে হাঁটতে দুপুরবেলা নাগাদ আমরা পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে হ্রদের ওপারে কিছুটা জায়গা ছেড়ে আবার শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল। সত্যদেব বলল, 'আপনাকে এতক্ষণ বলিনি। রণবীরের ভীষণ জ্বর হয়েছে। মনে হয় কোনও ইনফেকশন। আপনার সঙ্গে কোনও ওষুধপত্র আছে?'

আমি বললাম, 'আছে।'

বাকি পথটুকু ঢালু হওয়ায় আমরা বেশ তাড়াতাড়িই নেমে এলাম। জায়গাটায় গাছগাছালি রয়েছে, কিন্তু ঠিক জঙ্গল বলা যায় না। তারই মধ্যে দিয়ে বৃষ্টিভেজা মাটিতে পা ফেলে আমরা এগোলাম। একটু পরেই পৌঁছে গেলাম ওদের আস্তানায়। এবং আমার অবাক হওয়ার তখনও বোধহয় কিছুটা বাকি ছিল।

বিকেলের নরম আলোয় আমার চোখে পড়ল লতাপাতায় ছাওয়া এক মনোরম কুটির। তার চালে অসংখ্য রঙিন ফুল ফুটে আছে। আর সামনে জ্বলছে একটা আগুনের কুণ্ড। তার থেকে কিছুটা দূরে একটা ছোট পুকুর—তাতে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। সূর্যের ছায়া পড়েছে সেখানে। আর কুটিরের গা ঘেঁষে বিশাল বাগান। তবে মানুষের হাতে তৈরি বাগান নয়,

প্রকৃতির খামখেয়ালি বাগান। আশ্চর্য অমিত্রাক্ষর। এতসব রঙবাহারি ফুল, তোরা কোথায় লুকিয়ে ছিলি ?

সত্যদেব আমাকে কুটিরের ভেতরে নিয়ে গেল।

ঘরটা আবছা অন্ধকার। মেঝেতে শুকনো পাতার ওপরে রণবীর সেন শুয়ে রয়েছে। দু' চোখ বোজা। গায়ে কয়েকটা পাতার প্রলেপ। আর ওর মাথার পাশে বসে রয়েছে রঘুনাথ মহান্তি। সত্যদেব আমাকে বসতে বলল। পরিচয় করিয়ে দিল মহান্তির সঙ্গে। রণবীর সেন কথাবার্তার শব্দ পেয়ে দুর্বলস্বরে কী যেন বলল, চোখ মেলে তাকাল।

রঘুনাথ বলল, 'বিক্রম শর্মা শিকারে গেছে।'

সত্যদেব ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। হাতে-গড়া একটা কলসি থেকে জল গড়িয়ে রণবীরকে দু-এক ঢোক খাওয়াল।

লক্ষ করলাম, ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বলে কিছু নেই। শুধু ছোট-বড় কয়েক টুকরো কাঠ আর শুকনো ঘাসপাতা।

দস্তানা খুলে রণবীরের কপালে হাত রাখলাম। গা পুড়ে যাচ্ছে। আমার পোশাকের পকেট হাতড়ে ওষুধের প্যাকেট বার করলাম। একটা ট্যাবলেট বেছে নিয়ে ওর মুখে দিলাম। রণবীর ম্লান হাসল, অস্পষ্টভাবে বলল, 'আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন ?'

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না। চার-চারজন সেরা বিজ্ঞানীর কী পরিণতি ! ওদের ফেরানো আমার পক্ষে আর কি সম্ভব ?

সত্যদেব বলল, 'দাস, আপনি রণবীরকে কোনওরকমে নিয়ে যান। এখানে থাকলে ওকে আর বাঁচানো যাবে না।'

আমি চুপ করে রইলাম। ব্রিগেডিয়ারের কথা মনে পড়ছিল। উনি বলছিলেন কোনও ভয়ঙ্কর প্রাণীর কথা। আমাদের অজানা-অচেনা কোনও বিচিত্র শক্তি, যা কাউকে ফিরে আসতে দেয় না। যে বুলবোয়ার চাইতেও শক্তিশালী, হিংস্র এবং ভয়ঙ্কর। সেই ভয়ঙ্কর শক্তি হল মোহিনী প্রকৃতি ! এই চারজন বিজ্ঞানীর মধ্যে এই একটা জায়গাতেই দারুণ মিল : প্রকৃতি ওদের টানে।

আমার মনের মধ্যে তোলপাড় চলছিল। এই প্রথম 'যদি, মনে করি, ধরা যাক' এইসব শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া একরাশ কাল্পনিক কথা আমার মাথার মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছিল। আমি সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের অপারেশান ডিভিশনের কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারী, সুশোভন দাস, কল্পনায় বারবার টলে পড়ে যাচ্ছিলাম।

সত্যদেব আমাকে বাইরে নিয়ে এল। বাগানের কাছে গিয়ে আমরা বসলাম।

হঠাৎই সত্যদেব জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, দাস, বলুন তো, ফুল আমাদের কী কাজে লাগে ?'

আমি অবাক হয়ে সত্যদেব সিংকে দেখলাম, মরা বিকেলের রোদ ওর মাথায়, দাড়িতে এসে পড়েছে। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার যুক্তি, কার্যকারণ ইত্যাদি ক্রমশ তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

সত্যদেব বলল, 'অনেক প্রশ্ন নিয়ে কখনও আমরা ভাবিনি। অবশ্য ওই কৃত্রিম শহরের ঘেরাটোপে বসে তা ভাবা সম্ভবও নয়। যেমন, প্রজাপতি আমাদের কী কাজে লাগে ? কিংবা চাঁদ-তারা না দেখলে কি কোনও ক্ষতি হয় ?'

আমার চোখের সামনে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। আর দূরে গাছের আড়ালে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। আমার মনে হল, অস্ত-যাওয়া সূর্য না দেখতে পেলে কি কোনও ক্ষতি হয় ?

আমি চুপচাপ বসে সত্যদেবকে দেখছিলাম। হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে দেখি কুটির থেকে রঘুনাথ ও রণবীর বেরিয়ে আসছে। রঘুনাথ দু'হাতে আঁকড়ে ধরে নিয়ে আসছে ওকে।

সত্যদেব তাড়াতাড়ি উঠে গেল ওদের কাছে। রঘুনাথ বলল, 'কী করব, শুনছে না। বলছে, বাগানে নিয়ে যেতে।'

ওরা দু'জনে রণবীরকে এনে বাগানের নরম ঘাস-জমিতে শুইয়ে দিল। রণবীর সেন, সেন্ট্রাল কন্ট্রোলের নামজাদা এনটোমোলজিস্ট—পতঙ্গবিজ্ঞানী, তখন বিহ্বল চোখ মেলে ধূসর আকাশ, রঙিন ফুল, অস্তমুখী সূর্য আর প্রজাপতি দেখছে। রঘুনাথ একটু উঁচু গলায় বলল, 'সেন, তুমি দাসের সঙ্গে শহরে ফিরে যাও। সেখানে তুমি সেরে উঠবে।'

রণবীর সেন প্রকৃতির দিক থেকে চোখ সরাল না। শুধু হাসল, বলল, 'মহান্তি, তোমার কি মনে হয় না শহরের একশোটা জীবনের চেয়ে এইখানে এইভাবে মারা যাওয়াটা অনেক বেশি দামী?'

সত্যদেবের চোখে জল এসে গিয়েছিল। ও আমার হাত চেপে ধরল। এমন সময় দেখা গেল, বিক্রম শর্মা জঙ্গলের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। হাতে ঝুলছে ছোটখাটো কোনও প্রাণীর মৃতদেহ।

কাছাকাছি এসেই মৃতদেহটা একপাশে ছুড়ে ফেলে দিল বিক্রম। দৌড়ে এল আমাদের পাশে। একপলক আমাকে দেখল। তারপর ঝুঁকে পড়ল রণবীরের ওপরে। রঘুনাথ রণবীরের কপালে হাত রাখল। সত্যদেব ধরল ওর কবজি। সূর্য ততক্ষণে ঢলে পড়েছে। সীসের আস্তর দেওয়া অন্ধকার নামছে জঙ্গলে। প্রজাপতিরা বেশিরভাগই চলে গেছে, শুধু কয়েকটা আশ্চর্য নিশাচর প্রজাপতি বাগানে উড়ছে। ওদের ডানার রঙ আধো-আঁধারিতে প্রতিপ্রভ হয়ে জ্বলছে। ঠিক একইভাবে জ্বলজ্বল করছে কয়েকটা রঙিন ফুলও।

রণবীর সেদিকে একবার দেখল। তারপর অস্ফুটস্বরে কী একটা বলে চোখ বুজল। আচমকাই ওর ঘাড়টা কাত হয়ে গেল একপাশে।

বাকি তিনজন ডুকরে কেঁদে উঠল। আমার মনে হল, কান্নার কি কোনও দাম আছে! কিন্তু টের পেলাম আমার চোখ জ্বালা করছে।

সত্যদেব চোখ ঢেকে বসে ছিল। অন্ধকার থিতিয়ে বসছে। আগুনের কুণ্ডের লালচে আলো আমাদের মুখে-গায়ে। জঙ্গল থেকে পাখি ডাকছিল। আর শোনা যাচ্ছিল হিংস্র গর্জন। ঝরনার জলের কুলুকুলু শব্দ এখন কানে আসছে। ঠিক সেই সময়ে আকাশের সন্ধ্যাতারা আমার চোখে পড়ল। আকাশের প্রথম চোখ। আমাদের দেখছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সারা গায়ে এক অসহ্য জ্বালাপোড়া। ছটফট করতে করতে সমস্ত পোশাক-আশাক-জুতো সব খুলে ফেললাম। ছুড়ে ফেলে দিলাম বিপার, ট্রান্সমিটার, ব্লাস্টার, জেনারেটর-গান—সব। ওরা তিনজন এবারে অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল।

আর আমি দেখছিলাম, অন্ধকার বাগানে ফুটে থাকা উজ্জ্বল রঙিন ফুল, নিশাচর রঙিন প্রজাপতি, সন্ধ্যাতারা। শুনছিলাম, ঝরনার শব্দ, রাতপাখির ডাক, পাতার ফিসফিস।

জঙ্গলের দুরন্ত বাতাস আমার বুক-পিঠ, মুখ-চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছিল।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, প্রতি একশো বছর অন্তর বেশ কিছু মানুষ ফরেস্ট-এক্স-এর আকর্ষণে চিরকালের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

কোনও বাধাই সেই হারিয়ে যাওয়া রুখতে পারবে না।

□ ১৯৯০

পরিশিষ্ট



নিরুদ্দেশের কাহিনী *

জগদীশচন্দ্র বসু

প্রথম পরিচ্ছেদ

গত বৎসর এই সময়ে এক অত্যাশ্চর্য ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। তাহা লইয়া সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। এই বিষয় লইয়া বিলাতের ***Nature,*** ফরাসী দেশের ***La Nature*** এবং মার্কিন দেশের ***Scientific American***-এ অনেক লেখালেখি চলিয়াছে— কিন্তু এ-পর্যন্ত কিছু মীমাংসা হয় নাই।

২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে ***Englishman*** কাগজে সিমলা হইতে এক তারের সংবাদ প্রকাশ হয় :

Simla Meteorological Office, *২৭ সেপ্টেম্বর : বঙ্গোপসাগরে শীঘ্রই ঝড় হইবার সম্ভাবনা।*

২৯ তারিখের কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল :

Meteorological Office, 5, Russel Street *: দুই দিনের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। ডায়মণ্ড হারবারে* ***Danger-Signal*** *উঠানো হইয়াছে।*

৩০ তারিখে যে-**Special Bulletin** বাহির হইল তাহা অতি ভীতিজনক :

আধ ঘণ্টার মধ্যে ***Barometer*** *দুই ইঞ্চি নামিয়া গিয়াছে। আগামীকল্য দশ ঘটিকার মধ্যে কলিকাতায় অতি প্রচণ্ড ঝড় হইবে, এরূপ তুফান বহু বৎসর মধ্যে হয় নাই।*

বাংলা গবর্নমেণ্ট হইতে ডায়মণ্ড হারবারের **Sub-Divisional Officer**-এর নিকট তারে খবর হইল : **'Stop all outgoing vessels.'** এই সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে কলিকাতায় প্রচারিত হইল।

কলিকাতার অধিবাসীরা সেই রাত্রি কেহই নিদ্রা যায় নাই। আগামী কল্য কী হইবে তাহার জন্য সকলে ভীত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

Reuter-এর **Agent** ***Times***-এ **Telegraph** করিলেন :

The Capital of our Indian Empire in danger.

১ অক্টোবর আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। দুই-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সমস্ত দিন মেঘাবৃত ছিল, কিন্তু বৈকালে চার ঘটিকার সময় হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হইয়া

* ১৮৯৬ সালে কুন্তলীন গল্প-পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত গল্প। পরে ১৯২১ সালে 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। তখন লেখক গল্পটি সংস্কার করে নতুন নামকরণ করেন 'পলাতক তুফান'।

গেল। ঝড়ের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

তার পরদিন **Meteorological Office** খবরের কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন :

কলিকাতায় ঝড় হইবার কথা ছিল, বোধ হয় উপসাগরের কূলে প্রতিহত হইয়া ঝড় অন্য অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

ঝড় কোন দিকে গিয়াছে তাহার অনুসন্ধানের জন্য দিক্‌দিগন্তরে লোক প্রেরিত হইল কিন্তু তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারপর ***Englishman*** লিখিলেন : 'এত দিনে বুঝা গেল যে বিজ্ঞান সর্বৈব মিথ্যা।'

Daily News লিখিলেন : 'যদি তাহাই হয় তবে গরিব ট্যাক্সদাতাদিগকে পীড়ন করিয়া **Meteorological Office**-এর ন্যায় অকর্মণ্য অফিস রাখিয়া লাভ কী ?'

তখন ***Pioneer, Civil and Military Gazette, Statesman*** তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন : 'উঠাইয়া দাও।'

গবর্নমেন্ট বিভ্রাটে পড়িলেন। অল্পদিন পূর্বে **Meteorological Office**-এর জন্য লক্ষাধিক টাকার ব্যারোমিটার থার্মোমিটার আনানো হইয়াছে। সেগুলি এখন ভাঙা শিশি-বোতলের মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আর **Meteorological Office**-এর বড়সাহেবকে অন্য কী কার্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে ?

গবর্নমেন্ট নিরুপায় হইয়া কলিকাতা **Medical College**-এ লিখিয়া পাঠাইলেন : 'আমরা ইচ্ছা করি **Medical College**-এ একটি নূতন **Chair** স্থাপিত হয়। নিম্নলিখিত বিষয়ে **lecture** দেওয়া হইবে : **"On the Effect of Variation of Barometric Pressure on the Human System."**'

Medical College-এর **Principal** লিখিয়া পাঠাইলেন : 'উত্তম কথা, বায়ুর চাপ কমিলে ধমনী স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতে রক্ত-সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। তাহাতে সচরাচর আমাদের যে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে পারে তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তবে কলিকাতাবাসীরা আপাতত বহুবিধ চাপের নিচে আছে :

১ম চাপ	*বায়ু*	*প্রতি বর্গইঞ্চি*	*১৫ পাউন্ড*
২য়	*ম্যালেরিয়া*	...	*২০ পাউন্ড*
৩য়	*পেটেন্ট ঔষধ*	...	*৩০ পাউন্ড*
৪র্থ	*ইউনিভারসিটি*	...	*৫০ পাউন্ড*
৫ম	*ইনকাম ট্যাক্স*	...	*৮০ পাউন্ড*
৬ষ্ঠ	*মিউনিসিপাল ট্যাক্স*	...	*১ টন*

বায়ুর দুই-এক ইঞ্চি চাপের ইতর-বৃদ্ধি "বোঝার উপর শাকের আঁটি" স্বরূপ হইবে। সুতরাং কলিকাতায় এই **Chair** স্থাপন করিলে বিশেষ উপকার যে হইবে এরূপ বোধ হয় না। তবে সিমলা পাহাড়ে বায়ুর চাপ ও অন্যান্য চাপ অপেক্ষাকৃত কম। সেখানে উক্ত **Chair** স্থাপিত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।'

ইহার পর গবর্নমেন্ট নিরুত্তর হইলেন। **Meteorological** অফিস এবারকার মতো অব্যাহতি পাইলেন।

কিন্তু যে-সমস্যা লইয়া এত গোল হইল, তাহা পূরণ হইল না।

একবার এক বৈজ্ঞানিক *Nature*-এ লিখিয়াছিলেন বটে। তাঁহার theory এই যে, কোনও অদৃশ্য ধূমকেতুর আকর্ষণে বায়ুমণ্ডল আকৃষ্ট হইয়া ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ বলিলেন যে, সেই সময় ছোটলাট ডায়মণ্ড হারবার পরিদর্শন করিতে যান। তাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তাঁহার ভয়ে ঝড় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে।

এসব অনুমান মাত্র। এখনও এ-বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক জগতে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। এবার **Oxford British Association**-এ **Herr Stürm F.R.S., 'On a Vanished Typhoon'** সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। তাহা লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইবার সম্ভাবনা।

এই ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব পৃথিবীর মধ্যে একজন মাত্র জানে—সে আমি।

পরের অধ্যায়ে ইহা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গত বৎসর আমার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল। প্রায় একমাস কাল শয্যাগত ছিলাম।

ডাক্তার বলিলেন, সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জ্বর হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি জাহাজে Ceylon যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম।

এতদিন জ্বরের পর আমার মস্তকের ঘন কুন্তলরাশি একান্ত বিরল হইয়াছিল। একদিন আমার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, দ্বীপ কাহাকে বলে?' আমার কন্যা ভূগোল-তত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার উত্তর পাইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিল, 'এই দ্বীপ'—ইহা বলিয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আমার বিরলকেশ মসৃণ মস্তকে দু-এক গোছা কেশের মণ্ডলী দেখাইয়া দিল।

তারপর বলিল, 'তোমার ব্যাগে এক শিশি "কুন্তলীন" দিয়াছি, জাহাজে প্রত্যহ ব্যবহার করিও, নতুবা নোনা জল লাগিয়া এই দু-একটি দ্বীপেরও চিহ্ন থাকিবে না।'

২৮ তারিখে আমি *Chusan* জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিলাম। প্রথম দু'দিন ভালোরূপই গেল। ১ তারিখ প্রত্যূষে সমুদ্র এক অস্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিল, বাতাস একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, সমুদ্রের জল পর্যন্ত সীসার রঙের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

জাহাজের কাপ্তানের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম। কাপ্তান বলিলেন, 'যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, অতি সত্বরই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। আমরা কূল হইতে বহুদূর — এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

এই সংবাদ শুনিয়া জাহাজে যেরূপ ঘোর শোক ও ভীতিসূচক কলরব হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারিদিক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হইল। এবং দূর হইতে এক এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

তারপর মুহূর্তমধ্যে যাহা ঘটিল তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে— পাতালপুরী হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্মুক্ত হইয়া পৃথিবী সংহারে উদ্যত হইল।

সমুদ্র, বায়ুর গর্জনের সহিত স্বীয় মহাগর্জনের সুর মিলাইয়া সংহারমূর্তি ধারণ করিল।

তারপর অনন্ত ঊর্মিরাশি, একের উপর অন্যে আসিয়া একেবারে জাহাজ আক্রমণ করিল।

এক মহা-ঊর্মি আসিয়া জাহাজের উপর দিয়া চলিয়া গেল—মাস্তুল, Life-boat ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল।

আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে লোকে যেরূপ জীবনের প্রিয়বস্তু স্মরণ করে, সেইরূপ আমার প্রিয়জনের কথা মনে হইল। আশ্চর্য এই, আমার কন্যা আমার বিরল কেশ লইয়া যে-উপহাস করিয়াছিল, এ-সময়ে তাহা পর্যন্তও স্মরণ হইল।

'বাবা, এক শিশি কুন্তলীন তোমার ব্যাগে দিয়াছি।'

হঠাৎ এক কথায় আর-এক কথা মনে পড়িল। বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে এ-বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।

অমনি আমার ব্যাগ হইতে কুন্তলীন শিশি খুলিলাম। তাহা লইয়া অতি কষ্টে ডেকের উপর উঠিলাম। জাহাজ টলমল করিতেছিল।

উপরে উঠিয়া দেখি সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বতপ্রমাণ ফেনিল এক মহা-ঊর্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ করিয়া কুন্তলীন-বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, মুহূর্তমধ্যে তৈল সমুদ্র-ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্তমধ্যে সমুদ্র প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈলস্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণপরেই সূর্য দেখা দিল।

এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই। এবং এই কারণেই সেই ঘোর বাত্যা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল কুন্তলীনের সাহায্যে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

শ্রী—

পুঃ— প্রায় ছয় মাস পরে *Scientific American*-এ উপরোক্ত ঘটনার নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির হইয়াছিল :

THE SOLUTION OF A MYSTERY

The vanished cyclone of Calcutta remained so long a mystery to vex the soul of meteorologists. We are now glad to be able to offer an explanation of this seeming departure from all known laws that govern atmospheric disturbances.

It would appear that a passenger on board the Chusan *threw overboard a bottle of KUNTALINE while the vessel was in the Bay of Bengal, and the storm was at its height. The film of oil spread rapidly over the troubled waters, and produced a wave of condensation, thus counteracting the wave of rarefaction to which the cyclone was due. The superincumbent atmosphere being released from its dangerous tension, subsided into a state of calm. Thus by the merest chance, a catastrophe was averted.*— **Scientific American.**

☐ ১৮৯৬

লেখক-পরিচিতি



জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম ৩০ নভেম্বর, ১৮৫৮। মৃত্যু ২৩ নভেম্বর, ১৯৩৭। বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী। প্রথম জীবনে পদার্থবিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলেন, পরবর্তিকালে উদ্ভিদবিজ্ঞানে গবেষণা করেন। ১৮৯১ সাল নাগাদ মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য প্রবন্ধ রচনার শুরু। লিখেছেন 'মুকুল', 'দাসী', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ইত্যাদি পত্রিকায়। বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ 'অব্যক্ত', 'প্রবন্ধাবলী' ইত্যাদি। কল্পবিজ্ঞানের গল্প লিখেছেন একটিই : সঙ্কলনের অন্তর্গত 'পলাতক তুফান'। ১৮৯৬ সালে কুন্তলীন গল্প-পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য এই গল্পটি লেখক রচনা করেন। প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত গল্পটির নাম ছিল 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'। পরে 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সঙ্কলিত করার সময়ে লেখক গল্পটি সংস্কার করেন এবং নতুন নামকরণ করেন 'পলাতক তুফান'।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জন্ম সেপ্টেম্বর, ১৯০৪। মৃত্যু ৩ মে, ১৯৮৮। একাধারে প্রথিতযশা কবি ও গদ্যকার। প্রথম কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস 'পিঁপড়ে পুরাণ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'রামধনু' পত্রিকায়, গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৩১-এ। কল্পবিজ্ঞান কাহিনী রচনায় সিদ্ধহস্ত লেখকের উল্লেখযোগ্য বই 'মনু-দ্বাদশ', 'কুহকের দেশে', 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস', 'শুক্রে যারা গিয়েছিল', 'সূর্য কাঁদলে সোনা' ইত্যাদি। লেখকের কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর বিশিষ্ট চরিত্র 'মামাবাবু' এবং 'ঘনাদা'। ঘনাদাকে নিয়ে লেখা অজস্র ছোটগল্প কিশোর-মহলে আজও জনপ্রিয়। ঘনাদাকে নিয়ে শেষ উপন্যাস 'ঘনাদার চিংড়ি বৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয় ১৯৮৬-তে। লেখকের গ্রন্থসংখ্যা দেড়শোরও বেশি। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন অকাদেমি পুরস্কার (১৯৫৭) ও রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৫৮)।

লীলা মজুমদার

জন্ম ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮। লেখালিখির শুরু স্কুলজীবন থেকেই। প্রথম ছোটদের বই 'বদ্যিনাথের বড়ি', আর প্রথম বড়দের উপন্যাস 'শ্রীমতী'। উল্লেখযোগ্য কল্পবিজ্ঞান গ্রন্থ 'কল্পবিজ্ঞানের গল্প'। বিগত সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে কিশোর পত্রিকা 'সন্দেশ'-এর অন্যতম সম্পাদক। ইংরেজির কৃতী ছাত্রী এই লেখক প্রথম জীবনে অধ্যাপনা করেছেন, পরবর্তিকালে স্বাধীন সাহিত্যচর্চা। বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : রবীন্দ্র পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, লীলা পুরস্কার, শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ইত্যাদি।

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯। মৃত্যু ৩ জুন, ১৯৯০। প্রথম কল্পবিজ্ঞান গল্প 'কাশ্মীরী রহস্য' প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে, পিতা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত 'রামধনু' পত্রিকায়। লেখকের বিজ্ঞানের সচিত্র প্রবন্ধ সঙ্কলন 'বিজ্ঞান-বুড়ো' ও 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা' প্রকাশিত হয় তিরিশের দশকের শুরুতে। পেশায় অধ্যাপক, রসায়নশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র এই লেখক বেশিরভাগ কল্পবিজ্ঞানের গল্প লিখেছেন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে। উল্লেখযোগ্য কল্পবিজ্ঞান গ্রন্থ 'মেঘনাদ', 'তুষারলোকের রহস্য'। প্রয়াত সাহিত্যিক মনোরঞ্জন

ভট্টাচার্যের অনুজ এই লেখক ১৯৪০ সাল থেকে 'রামধনু' পত্রিকার সম্পাদনার ভার নেন, এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেন। শিশু সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এই লেখকের গ্রন্থসংখ্যা পঁচিশেরও বেশি। সম্পাদনা করেছেন জনপ্রিয় বিশিষ্ট গ্রন্থ 'ছোটদের বিশ্বকোষ'। সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার (১৯৮৭), কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরস্কার; শিশু সাহিত্য পরিষদের ফটিক স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮২) ও ভুবনেশ্বরী পদক (১৯৬৫)।

বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী

জন্ম ৫ আগস্ট, ১৯১৫। প্রথম কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস 'মহাশূন্যের ডায়েরী' ১৯৫৫-৫৬ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় অধুনালুপ্ত 'শিশুসাথী' পত্রিকায়। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তিনটি কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস ও দুটি কল্পবিজ্ঞানের গল্প সঙ্কলন। সুদীর্ঘ প্রায় ছয় দশকের সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি হিসেবে চারবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। পেয়েছেন দিশারী (১৯৮২) ও নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একাধিক পুরস্কার। সোভিয়েত দেশে উক্রেনিয় লেখক সম্মেলনের সংবর্ধনা ও ওদেসা শান্তি সমিতির আজীবন সদস্যপদের সম্মান লেখককে বিশিষ্ট করেছে।

সত্যজিৎ রায়

জন্ম ২ মে, ১৯২১। পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর, পিতা সুকুমার—সুতরাং সাহিত্যচর্চা যেন পারিবারিক সম্পদ। প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' প্রকাশিত হয় ১৯৬২-তে, 'সন্দেশ' পত্রিকায়। প্রথম কল্পবিজ্ঞান গ্রন্থ 'প্রোফেসার শঙ্কু' ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭-তে এই বইটি শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য গ্রন্থ হিসেবে জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যে লেখক-সৃষ্ট চরিত্র 'প্রোফেসার ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু' জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে অদ্বিতীয়। বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষা ছাড়াও শঙ্কু-কাহিনী অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, পোলিশ ও ফরাসি ভাষায়। প্রোফেসার শঙ্কুর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী লেখকের অসংখ্য গোয়েন্দা কাহিনীর জনপ্রিয় নায়ক 'ফেলুদা'। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার এই লেখক 'আশ্চর্য !' পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, অলঙ্কৃত করেছেন ভারতের প্রথম 'সায়েন্স ফিকশন সিনে ক্লাব'-এর সভাপতির পদ। উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত গ্রন্থ 'সেরা সন্দেশ' ও সুকুমার রায়ের 'সমগ্র শিশুসাহিত্য'। 'সন্দেশ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার (১৯৭১) ও বিদ্যাসাগর পুরস্কার (১৯৮২)। ১৯৯০-তে ফেবার অ্যান্ড ফেবার থেকে প্রকাশিত হয়েছে লেখকের কল্পবিজ্ঞান কাহিনী 'এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্য।

বিমল কর

জন্ম ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২১। প্রথম কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস 'হারানো জিপের রহস্য' প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালের শারদীয় 'আনন্দমেলা'য়। বাংলা ছোটগল্পে কিংবদন্তি এই লেখকের প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে, 'দেশ' পত্রিকায়। 'ছোটগল্প—নতুন রীতি' আন্দোলনের প্রবক্তা এই লেখক ঔপন্যাসিক হিসেবেও বিশিষ্ট। লেখকের উপন্যাস 'অসময়' ও 'পূর্ণ অপূর্ণ' বাংলা সাহিত্যের দুটি পথ-নির্দেশ। সুদীর্ঘ

পুরস্কারের তালিকায় উল্লেখযোগ্য : আনন্দ পুরস্কার (১৯৬৭), অকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৫), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংদাস পুরস্কার (১৯৮২), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮১) ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৭)। দীর্ঘকাল 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সম্পাদনা করেছেন 'শিলাদিত্য' পত্রিকা (১৯৮২-৮৪), আর এখন ১৯৮৮-তে প্রতিষ্ঠিত নিজের দ্বিমাসিক গল্পপত্রিকা 'গল্পপত্র' সম্পাদনায় ব্যস্ত।

দিলীপ রায়চৌধুরী

জন্ম ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮। মৃত্যু ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬। ১৯৬১-তে কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখার শুরু। অধুনালুপ্ত 'গণবার্তা' পত্রিকার ছোটদের বিভাগে যুক্ত ছিলেন। পরে 'আশ্চর্য !' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ১৯৬৫-তে প্রকাশিত হয় কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস 'অগ্নির দেবতা হেফেস্টাস'। ১৯৬৬-তে আকাশবাণী আয়োজিত কল্পবিজ্ঞান গল্প পাঠের আসরে 'সবুজ মানুষ' গল্পে অংশ নেন। গল্পটির অন্য তিনজন লেখক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিৎ রায় ও অদ্রীশ বর্ধন। বারোয়ারি গল্পটি পরে 'আশ্চর্য !' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফলিত রসায়নের ডক্টরেট এই লেখক কর্মজীবনে কৃতী রবার প্রযুক্তিবিদ ছিলেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

জন্ম ১৪ অক্টোবর, ১৯৩০। প্রথম কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস 'সাহারার সন্ত্রাস' ১৯৭২-৭৩-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় কিশোর মাসিক 'পক্ষীরাজ' পত্রিকায়। লেখকের জনপ্রিয় চরিত্র 'গোয়েন্দা কর্নেল নীলাদ্রি সরকার' এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। পরে আশির দশকের শুরুতে সৃষ্টি করেন আর-একটি জনপ্রিয় চরিত্র 'বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত'। ষাটের দশকের প্রথম ভাগে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত কল্পবিজ্ঞানের বইয়ের সংখ্যা পাঁচ। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ বিভাগে যুক্ত এই লেখক ১৯৬৪-৭১ পর্যন্ত সম্পাদনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত সমবায় অর্থনীতির পত্রিকা 'ভাণ্ডার'। সাহিত্যে আনন্দ পুরস্কার ও কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরস্কার লেখককে বিশিষ্ট করেছে।

গুরনেক সিং

জন্ম ৫ নভেম্বর, ১৯৩১। কল্পবিজ্ঞানের লেখক হিসেবে 'আশ্চর্য !' পত্রিকাতেই আত্মপ্রকাশ। মাতৃভাষা পঞ্জাবি হলেও কলকাতার বাসিন্দা শিশুকাল থেকেই। বিভিন্ন ধরনের লেখা লিখেছেন। পঞ্জাবি ভাষায় অনুবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' (সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত), গুরু নানক এবং গুরু গোবিন্দের জীবন ও বাণীর বাংলা অনুবাদ করেছেন দুই খণ্ডে (প্রকাশক ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট), আর অনুবাদ করেছেন পিটার জর্জের উপন্যাস 'রেড অ্যালার্ট'। এই উপন্যাস অবলম্বনেই তৈরি হয়েছিল স্ট্যানলি কুব্রিকের বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'ডঃ স্ট্রেঞ্জলাভ'। ১৯৭১ থেকেই আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা। বর্তমানে সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ই এস বার্ড গ্রন্থাগারের প্রধান।

বিশু দাস

জন্ম ৬ জানুয়ারি, ১৯৩২। প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প 'মহাশূন্যের আগন্তুক' ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। 'আশ্চর্য !', 'বিস্ময় সায়েন্স ফিকশন', 'ফ্যানট্যাস্টিক' ইত্যাদি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ অ্যান্ড্রু টমাসের 'আমরাই কি প্রথম ?' এবং ব্র্যাম স্টোকারের 'সপ্তর্ষির অভিশাপ'। এছাড়া ছোটদের জন্য লিখেছেন জাদুবিদ্যা বিষয়ক দুটি বই। ১৯৬২-৬৩-তে সম্পাদনা করেছেন জাদুশিল্পের পত্রিকা 'ম্যাজিক'।

আনন্দ বাগচী

জন্ম ১৫ মে, ১৯৩২। প্রথম জীবনে ষোলো বছর অধ্যাপনার পর ১৯৭৭ থেকে 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। কল্পবিজ্ঞানের আঙিনায় লেখকের প্রবেশ আশির দশকের মাঝামাঝি। একাধারে কবি ও গদ্যকার এই লেখকের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'চকখড়ি' প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। কথাসাহিত্যে বিশিষ্ট মৌলিকতার জন্য সুচিহ্নিত। ১৯৬৫-তে প্রথম সাড়াজাগানো গল্প 'গোপনকথা' প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায়। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'উজ্জ্বল ছুরির নীচে', 'স্বগত সন্ধ্যা', এবং কিশোর গ্রন্থ 'বনের খাঁচায়', 'কানামাছি', 'মালয়ের জঙ্গলে'। রম্যরচনার জগতে ত্রিলোচন কলমচী নামে খ্যাত এই লেখক উল্টোরথ পুরস্কারে সম্মানিত।

অদ্রীশ বর্ধন

জন্ম ১ ডিসেম্বর, ১৯৩২। প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখেন ষাটের দশকের গোড়ায়। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত কল্পবিজ্ঞানের বইয়ের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রথম কল্পবিজ্ঞান মাসিকপত্র 'আশ্চর্য !' প্রকাশ করেন ১৯৬৩-র জানুয়ারিতে। আকাশ সেন ছদ্মনামে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন। 'আশ্চর্য !' পত্রিকার মাধ্যমে বাংলায় কল্পবিজ্ঞানচর্চার প্রচেষ্টাকে জনপ্রিয় করেন। পরে সম্পাদনা করেছেন 'ফ্যানট্যাস্টিক' ও 'কিশোর মন'। পেয়েছেন দক্ষিণী বার্তা ও কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরস্কার।

সমরজিৎ কর

জন্ম ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৪। প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৬০-এ, আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে। ১৯৬২-তে প্রকাশিত হয় প্রথম কল্পবিজ্ঞান গ্রন্থ 'জল্পকল্প'। 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। বর্তমানে 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এবং 'দেশ' পত্রিকার নিয়মিত বিজ্ঞান-লেখক। বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গ্রন্থসংখ্যা পঁচিশ। তার মধ্যে কল্পবিজ্ঞান গ্রন্থের সংখ্যা আট।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। প্রথিতযশা কবি ও গদ্যকার। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একা এবং কয়েকজন', প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ'। কল্পবিজ্ঞানের লেখালিখির শুরু আশির

দশকের গোড়ায়। প্রথম কিশোর কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস 'আকাশ দস্যু' প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালের 'আনন্দমেলা'র শারদীয় সংখ্যায়। আর 'অমৃতের পুত্রকন্যা'— প্রাপ্তবয়স্ক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস—প্রকাশিত হয় ১৯৮২-র 'দেশ' শারদীয় সংখ্যায়। নীললোহিত ছদ্মনামেও লিখে থাকেন। সুদীর্ঘ পুরস্কারের তালিকায় উল্লেখযোগ্য : আনন্দ পুরস্কার (১৯৭২, ১৯৮৯), বঙ্কিম পুরস্কার (১৯৮৩) এবং অকাদেমি পুরস্কার (১৯৮৫)। লেখকের 'সেই সময়' ও 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাস দুটি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এই লেখক কর্মসূত্রে 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৪। কল্পবিজ্ঞানের গল্প লিখছেন সিকি শতক ধরে। অবশ্য এ-বিষয়ে প্রকাশিত বই একটিই : 'মানুষ যেদিন হাসবে না' (১৯৭৫)। সত্তরের দশকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মনু-দ্বাদশ' ও 'পিঁপড়ে পুরাণ' ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। ১৯৮৩-তে অধুনালুপ্ত 'খেলার আসর' পত্রিকার বিজ্ঞান বিভাগ পরিচালনা করেছেন কয়েক মাস। ১৯৭৪-এ 'পরমাণু জিজ্ঞাসা' গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে পুরস্কৃত হন।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

জন্ম ২ নভেম্বর, ১৯৩৫। আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প 'ভেলা' প্রকাশিত হয় ১৯৭৫-৭৬-এ। উল্লেখযোগ্য কল্পবিজ্ঞান কাহিনী 'তিন হাজার দুই', 'বনদেব', 'ভুতুড়ে ঘড়ি' ইত্যাদি। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দুবার (১৯৭৩, ১৯৮৭), আর পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার (১৯৮৫) ও অকাদেমি পুরস্কার (১৯৮৯)। 'দূরবীন', 'মানবজমিন' ইত্যাদি বিশিষ্ট উপন্যাসের রচয়িতা প্রথিতযশা এই সাহিত্যিক কর্মসূত্রে 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

নিরঞ্জন সিংহ

জন্ম ২৭ অক্টোবর, ১৯৩৬। অধুনালুপ্ত 'বিস্ময় সায়েন্স ফিকশন' পত্রিকায় ফ্রিৎস লিবার-এর একটি ছোটগল্পের অনুবাদ করে কল্পবিজ্ঞানের লেখালিখির শুরু ১৯৭৩-এ। প্রকাশিত কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস 'সমুদ্র শহরে আতঙ্ক'। দানিকেন তত্ত্বের বিষয়ে একাধিক আলোচনা গ্রন্থ লিখে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়াও লিখেছেন কয়েকটি কিশোর উপন্যাস। ১৯৮৬-তে পেয়েছেন শিশু সাহিত্য পরিষদের ফটিক স্মৃতি পুরস্কার।

জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার

জন্ম ১৯ জুলাই, ১৯৩৮। মাতৃভাষা মারাঠি। প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখেন ১৯৭৪-এ, 'মারাঠি বিদন্যান পরিষদ' আয়োজিত একটি কল্পবিজ্ঞানের গল্প প্রতিযোগিতার জন্য। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত সাতটি বইয়ের একটি ইংরেজি, দুটি হিন্দি ও চারটি মারাঠি ভাষায় লেখা। ইংরেজি বই 'রিটার্ন অফ দ্য বামন' সাম্প্রতিকতম। দীর্ঘ সাহিত্য-পুরস্কারের তালিকায় রয়েছে মহারাষ্ট্র সরকারের লঘু বিজ্ঞান-সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৯, ১৯৮৩), বিহার রাজভাষা বিভাগের আর্যভট পুরস্কার (১৯৮৭), কেন্দ্রীয় হিন্দি

সংস্থার আত্মারাম পুরস্কার (১৯৮৯) এবং উত্তরপ্রদেশ হিন্দি সংস্থার সম্মান (১৯৯০)। এছাড়া জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার জগতে লেখক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী।

বাল ফোন্ড্‌কে

জন্ম ২২ এপ্রিল, ১৯৩৯। প্রকৃত নাম গজানন পুরুষোত্তম ফোন্ড্‌কে। মাতৃভাষা মারাঠিতে কল্পবিজ্ঞানের গল্প লিখছেন ১৯৭৭ থেকে। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'অনুপ্রিতা' পত্রিকায়। কল্পবিজ্ঞান গ্রন্থের সংখ্যা চার। তিন দশক ধরে সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতি হিসেবে মহারাষ্ট্র সরকারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন দুবার : প্রথমবার 'উদিয়াচে বৈদ্যক' গ্রন্থের জন্য, আর ১৯৯০-তে দ্বিতীয়বার পুরস্কৃত হন কল্পবিজ্ঞান সঙ্কলন 'চিরঞ্জীবা'র জন্য। সম্পাদনা করেছেন নানা পত্রপত্রিকা : ইংরেজি 'সায়েন্স টুডে', হিন্দি ভাষায় 'বিজ্ঞান পত্রিকা', মারাঠি ভাষায় 'মহারাষ্ট্র টাইম্‌স' ও 'এম ভি পি পত্রিকা'। বর্তমানে ইংরেজি বিজ্ঞান পত্রিকা 'সায়েন্স রিপোর্টার'-এর প্রধান সম্পাদক।

শেখর বসু

জন্ম ১৪ জানুয়ারি, ১৯৪০। সাহিত্যচর্চা প্রায় তিন দশকের। আশির দশকের প্রথমদিকে কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখার শুরু এই সঙ্কলনের 'কলকাতায় প্রচণ্ড তুষারপাত' দিয়েই। ভিন্ন ধারার ছোটগল্প লেখায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। প্রথম উপন্যাস 'অন্যরকম', প্রথম কিশোর উপন্যাস 'সোনার বিস্কুট'। গত বছরে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'অপরাধী চিহ্ন রাখেনি' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন জাগরণী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯০)। কর্মসূত্রে 'প্রবাসী আনন্দবাজার'-এর সঙ্গে যুক্ত।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২। প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৬৪-তে, 'আশ্চর্য !' পত্রিকায়। তারপর থেকেই 'আশ্চর্য !'-র নিয়মিত লেখক। মূলত কবি। বিগত চোদ্দ বছর ধরে আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতার পেশায় যুক্ত। বর্তমানে পাক্ষিক 'আনন্দমেলা'র সহকারী সম্পাদক। এক সময়ে সম্পাদনা করেছেন স্বপ্রকাশিত দ্বিভাষিক পত্রিকা 'সন্ধাভাষা'। পরে নবপর্যায়ের 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার পুস্তক সমালোচনা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। কবিতা ও অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাতটি। প্রথম কল্পবিজ্ঞান গ্রন্থ 'সাগর পাহারা' প্রকাশের পথে।

সুব্রত সেনগুপ্ত

জন্ম ২ মার্চ, ১৯৪২। পেশায় 'আজকাল' পত্রিকার সাংবাদিক। প্রথম কল্পবিজ্ঞান কাহিনী লেখেন আশির দশকের শুরুতে, যদিও সাহিত্যচর্চায় অভ্যস্ত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে। 'জ্ঞানপীঠ প্রকাশন' প্রকাশিত ভারতীয় গল্প সঙ্কলনে তাঁর একটি গল্পের হিন্দি অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৯৮৩-তে। আর ১৯৮৫-তে মস্কো থেকে রাদুগা পাবলিশার্স প্রকাশিত 'সাম্প্রতিক বাংলা গল্প' সঙ্কলনে তাঁর গল্প স্থান পেয়েছে।

সিদ্ধার্থ ঘোষ

জন্ম ১৫ অক্টোবর, ১৯৪৮। প্রকৃত নাম অমিতাভ ঘোষ। প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প 'মন্ত্র মাহাত্ম্য' প্রকাশিত হয় ১৯৭৯-র শারদীয় 'ফ্যানট্যাস্টিক'-এ। প্রথম কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস 'গ্যাবনে বিস্ফোরণ' প্রকাশিত হয় ১৯৮০-তে। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের বইয়ের সংখ্যা এগারো। এছাড়া গবেষণামূলক লেখাতেও লেখক সিদ্ধহস্ত। এ জাতীয় উল্লেখযোগ্য বই 'বাঙালির ফোটোগ্রাফি চর্চা', 'কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ' এবং 'কলের শহর কলকাতা'। 'অন্বেষা' বিজ্ঞান পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন প্রথম সংখ্যা থেকেই। পেশায় 'সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট'-এর বিজ্ঞানী।

শংকর ঘটক

জন্ম ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৯। প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প 'প্রাণকেষ্টবাবুর বিপদ' ১৯৮৩ সালে 'সবজান্তা মজারু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'প্রতিক্ষণ', 'আজকাল', 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান', 'কিশোর বিস্ময়', 'উৎস মানুষ' ইত্যাদি পত্রিকার পাঠকের কাছে পরিচিত এই লেখক পেশায় বিজ্ঞানী। কর্মসূত্রে জড়িত রয়েছেন 'সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট'-এর সঙ্গে।

অমিত চক্রবর্তী

জন্ম ৮ এপ্রিল, ১৯৫২। প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৮১-র শারদীয় 'ঝলমল' পত্রিকায়। প্রকাশিত কল্পবিজ্ঞানের বই '২০১৩' ও 'বিশ্বসেরা সায়েন্স ফিকশন'। আকাশবাণী কলকাতার বিজ্ঞান বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত। জনপ্রিয় বিজ্ঞানের জগতে সুপরিচিত এই লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা সাত। ১৯৮৬-তে 'সাত সমুদ্র' বইটির জন্য পেয়েছেন শিশু সাহিত্য পরিষদের পুরস্কার। ১৯৮১-৮৪-তে সম্পাদনা করেছেন ছোটদের বিজ্ঞান পত্রিকা 'বিজ্ঞান মেলা'। বর্তমানে গৌহাটি বেতার কেন্দ্রের সহ কেন্দ্র-অধিকর্তা।

অনীশ দেব

জন্ম ২২ অক্টোবর, ১৯৫১। সত্তর দশকের গোড়ায় কল্পবিজ্ঞান লেখালিখির শুরু। প্রথম কল্পবিজ্ঞানের গল্প 'চিরন্তনের চোখ' প্রকাশিত হয় 'বিস্ময় সায়েন্স ফিকশন' পত্রিকায়। আর প্রথম কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস 'সবুজ পাথর' প্রকাশিত হয় 'আনন্দমেলা'য়। জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের চর্চা প্রায় দু দশক ধরে। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত এ-জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ। সম্পাদনা করেছেন দুটি কিশোর মাসিকপত্র 'সবজান্তা মজারু' ও 'কিশোর বিস্ময়'। কর্মজীবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।